এবং পাঁচ দিনের পর এক বন্দরের সমীপবর্ত্তী হইলেন। এই স্থান মোজাম্বিক নামে খ্যাত; তৎকালে এই স্থান বাণিজ্যের এক প্রধান কেন্দ্র ছিল। শুভ্র কার্পাস বস্ত্র পরিহিত অধিবাসীগণকে দেখিয়া গামা বুঝিলেন যে তাঁহারা বর্ব্বর রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিয়াছেন। জল ও খাদ্য আহরণের নিমিত্ত এবং অপরিজ্ঞাত ভারত-সমুদ্রে পথ দেখাইয়া যাইবার নিমিত্ত দুই জন চালকের (Pilot) প্রয়োজন হওয়াতে গামা এই স্থানে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি একবারও ভাবেন নাই, যে ধর্ম্ম বৈষম্য বশত বিষম বৈরভাবের উদয় হইবে। তিনি কে ও কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছেন, জিজ্ঞাসা করায় গামা উত্তর করিলেন, যে তিনি পর্ত্তুগালের রাজদূত, ভারতবর্ষে কালিকটের রাজার নিকট সন্দেশ বহন করিয়া যাইতেছেন; এবং পানীয় ও আহার সামগ্রীর প্রয়োজন হওয়ায় ও দুই জন চালকের (Pilot) আবশ্যক থাকায়, তিনি এই স্থানে আসিয়াছেন। যাঁহার সহিত এইরূপ কথা হইল তিনি ফেজের অধিবাসী। ঐ দেশের সহিত পর্ত্তুগালের যুদ্ধ চলিতেছিল। এই কারণে বিদ্বেষের সঞ্চার হইল এবং ধর্ম্মবৈষম্য হেতু তাহার সম্বর্দ্ধন হইল। কিন্তু এই ব্যক্তি আপন মনোভাব সংগোপন করিয়া কহিলেন, গামার অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। এইরূপ মৈত্রীভাবের উদয় হইলে, ঐ স্থানের শাসনকর্ত্তা স্বয়ং গামার জাহাজ দেখিতে আসিলেন। বন্ধুভাবে কার্য্য চলিতে লাগিল বটে, কিন্তু অবিশ্বাসের অভাব ছিল না। আহার সামগ্রী ও পানীয় জলের প্রয়োজন হওয়ায়, গামা প্রত্যহ দুই খানি নৌকা তীরে পাঠাইতেন, এবং দ্রব্যাদিও যথা-মূল্যে পাইতে ক্লেশ হইত না। পরন্তু এক দিবস কতকগুলি বৃহদাকার তরী আসিয়া গামার তরী আক্রমণ করিল; কিন্তু তাহারা য়ুরোপীয় অস্ত্রের সম্মুখে তিষ্ঠিতে পারিল না। তাহাদের গবর্ণর এরূপ ব্যবহারের অনুমোদন করেন নাই। এইরূপে বিবিধ কার্য্যে কিয়দ্দিবস অতীত হইল, তথাপি কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া গামা তাহাদের রাজধানী নষ্ট করিয়া দিবেন বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিলেন। এটি য়ুরোপীয়দিগের স্বভাবসিদ্ধ; আপন কার্য্যোদ্ধারের জন্য তাঁহারা মহাগুরু যীশুখ্রীষ্টের নীতি সমূহ অতল জলে নিক্ষেপ করিতে কুণ্ঠিত হন না! অসভ্য জাতির সহিত অভদ্রোচিত ব্যবহার তাঁহাদের পক্ষে লজ্জাস্কর নহে। প্রতারকের সহিত

প্রস্তাবণা করা তাঁহাদের রাজনীতি বিরুদ্ধ নহে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগেও এইরূপ উদাহরণের জন্য আমাদিগকে অধিক দূর অন্বেষণ করিতে হয় না। গামার এইরূপ ব্যবহারে, আমরা অধিক দোষা-রোপ করিতে পারিলাম না। ভয় প্রদর্শন করাতে তাহারা এক জন চালক দিল, এবং মোজাম্বা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিবে এইরূপ স্থির হইল।

এপ্রেল মাসের প্রথম দিবসে সেন্টজর্জ পরিত্যাগ করিয়া আফ্রিকার নিকট দিয়া চলিতে লাগিলেন। অল্পদিন পরেই মোজাম্বা তাঁহাদের নয়ন-গোচর হইল। এই নগরী দর্শনে নাবিকেরা পরম প্রীতি অনুভব করিল, এবং পর্ত্তুগালের ন্যায় বাতায়ন অবলোকন করিয়া তাহাদের মনে এই অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হইল, যেন তাহারা মাতৃভূমির ক্রোড়ে প্রবেশ করিতেছে। অনতিবিলম্বে তাহারা দেখিতে পাইল যে চারিজন আরোহী একখানি নৌকায় জাহাজের নিকট আসিতেছে। আকার প্রকার দর্শনে তাঁহাদিগকে উচ্চপদস্থ লোক বলিয়া মনে হইল। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া তাঁহারা কহিলেন যে পর্ত্তুগীসদিগের আগমনে তাঁহারা ও তাঁহাদের রাজা পরম পরিতোষ লাভ করিলেন ও তাঁহাদের অভাব মোচনে প্রতিশ্রুত হইলেন, তাঁহারা পোতাধ্যক্ষকে তীরে লইয়া যাইবার জন্য ঔৎসুক্য প্রদর্শন করিলেন ; কিন্তু গামা যাইতে স্বীকৃত হইলেন না। পর দিবস আর এক দল আসিয়া স্থলে অবতরণ জন্য পুনরায় জেদ করিতে লাগিল। তখন গামা স্বয়ং না যাইয়া দুইজন নাবিককে প্রেরণ করিলেন। ইহারা রাজার নিকটে বহুল সমাদর প্রাপ্ত হইল। গুজরাটি বণিকদের সহিত ইহাদের সাক্ষাৎ হওয়াতে, তাহারা আপনাদিগকে খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া পরিচয় দিল। এই স্থানে গামা তাঁহার সমধর্ম্মী লোক অনেক দেখিতে পাইলেন। তিনি আর ইতস্তত করিলেন না, এবং পরদিন প্রত্যূষে জাহাজ বন্দরে লাগাইতে আজ্ঞা দিলেন। কিন্তু তাঁহার জাহাজ তীরের সমীপবর্ত্তী হইয়াছে, এমন সময় সম্মুখে বালির চর দেখিতে পাইলেন। চরে জাহাজ লাগিলেই ভগ্ন হইয়া খান খান হইয়া যাইবে। স্বীয় বুদ্ধিবলে গামা এই আকস্মিক বিপদ-জাল হইতে মুক্ত হইলেন। এই ঘটনায় এরূপ গোলযোগ হইয়া উঠিল, যে কতকগুলি মুর ও মোজাম্বিকের পাইলট্ ঝম্ফ প্রদান করিয়া সমুদ্রে

পতিত হইল ও বেগে সন্তরণ দিয়া তীরে উপনীত হইল। এই ঘটনায় গামা বুঝিতে পারিলেন, তিনি কিরূপ বিপদজালে জড়িত হইয়াছিলেন। যাহা হউক তিনি নিরাপদে স্বস্থানে উপনীত হইলেন এবং অতি সতর্কভাবে কার্য্য করিয়া শত্রুদিগকে বিফল মনোরথ করিতে সমর্থ হইলেন। বিপক্ষ দলের একখানি নৌকা গামার হস্তে পতিত হয়; ইহাতে ত্রয়োদশ জন মাত্র লোক ছিল; তিনি ইহাদিগের প্রতি অসদ্ব্যবহার করেন নাই। ইহাদের নিকট মেলিণ্ডানগরী গমনের পথ জানিয়া লইলেন। মেলিণ্ডানগরী তৎকালে অতীব মনোহর ছিল। সুরম্য-হর্ম্ম্য-শোভিত নন্দনকাননোপম উপবন পরিবৃত এই নগরী দর্শনে নাবিকদিগের মনে অভিনব আনন্দের উদয় হইল। তত্রত্য নরপতি ইস্‌লাম ধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন; তিনি প্রজার হিত সাধনে বিধর্ম্মীদিগের সহিত সখ্য করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। এই নিমিত্ত পর্ত্তুগীজদিগের আগমনে তাঁহার অতুল প্রীতি হইল। জাহাজস্থ দুব সকল তীরে অবতরণ করিল; এবং প্রত্যাগমন করিয়া যে সংবাদ আনিল, তাহাতে অবিশ্বাসের কোন কারণ ছিল না। ইতি পূর্ব্বে পর্ত্তুগীজেরা কোন স্থানে এ প্রকার সরলতাপূর্ণ সম্ভাষণ প্রাপ্ত হয়েন নাই। দুস্তর অর্ণব পারে আসিয়া ভ্রমণের শেষভাগে এরূপ শুভ লক্ষণ বিলোকন করিয়া সুখময়ী আশায় হৃদয় পূর্ণ করিলেন। তথাপি গামা তীরে অবতরণ করিতে সাহস করিলেন না। তদীয় রাজার এবিষয়ে বিশেষ নিষেধ আছে বলিলেন; এবং জাহাজ ও তীরের মধ্যস্থলে নৌকায় রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার প্রস্তাব করিলেন। সম্রাট তাঁহার পারিষদগণের সহিত নৌকারোহণে আগমন করিলেন। তাঁহার অভ্যর্থনা হেতু জাহাজ হইতে তোপধ্বনি হইল। এই ঘটনায় গামার আশাতীত ফলোদয় হইল। প্রথমত মেলিণ্ডাবাসীরা শত্রুত আশঙ্কা করিয়া পলায়ন-পরায়ণ হইল; এতদ্দর্শনে তোপধ্বনি নিবারণ করিয়া গামা স্বয়ং নৌকারোহণে সম্রাটের বজরার নিকট আসিলেন। তাঁহাদের সাক্ষাৎ সন্তোষকর হইয়াছিল। রাজা বিশ্বস্ত চিত্তে জাহাজের চতুর্দ্দিক পরিদর্শন করিলেন ও কামানের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। পর্ত্তুগালের রাজার ক্ষমতা, সেনাবল, রণতরী সংখ্যা প্রভৃতি সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব লইলেন।

রাজার সহিত সাক্ষাৎ শেষ হইলে, কতকগুলি গুজরাটি হিন্দু বণিক তাঁহার জাহাজ দেখিতে আসিল; এবং মেরীর প্রতিমূর্ত্তি বিলোকন করিয়া পূজা করাতে গামার মনে ধারণা হইল, যে ইহাদের ধর্ম্মে খ্রীষ্টধর্ম্মের আভাস আছে। তাঁহারা কি জন্য মেরীর অর্চ্চনা করিয়াছিলেন, তাহা অনায়াসেই উপলব্ধি হইতে পারে। এইরূপ নানা কার্য্যে সখ্য দৃঢ়তর হইতে লাগিল, তথাপি রাজাজ্ঞা ব্যপদেশে তীরে পদার্পণ করিলেন না।

মালিমো কানা (Malemo Cana) নামক এক জন সুনিপুণ বিশ্বস্ত চালক (Pilot) পাইয়া আফ্রিকার উপকূল ত্যাগ করিলেন ও ২৬শে ভারত মহাসাগরে জাহাজ ভাসাইলেন। তরণী অসীম অতলস্পর্শ সলিল রাশি অতিক্রম করিয়া চলিতে লাগিল; এবং পরিশেষে অনুকূল বায়ুবশে ত্রয়োদশ দিবসে সুদূরে ভারত উপকূল তাহাদের দৃষ্টি পথে পতিত হইল। নাবিক দিগের হৃদয় অপূর্ব্ব সুখসাগরে নিমগ্ন হইল, আহ্লাদে নৃত্য করিতে লাগিল। উৎফুল্ল লোচনে একদৃষ্টে তাহারা ভারতবর্ষ অবলোকন করিতে লাগিল। এত দিন মায়াময়ী কল্পনায় যাহার অস্তিত্ব ছিল, এখন তাহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাইল। আরও চারি দিবস অতীত হইলে, জাহাজ কালিকটের সম্মুখে আসিয়া নঙ্গর করিল। সুবিস্তীর্ণ মহাসমৃদ্ধিশালী এই নগর দর্শনে পর্তুগীসেরা বিস্ময়াপন্ন হইল, বহুকাল হইতে যে ভারতের বিপুল বিভবের কথা শ্রবণ করিয়াছিল, আজ তাহারা সেই ভারত ভূমিতে পদার্পণ করিল। এদিকে ভারতবাসীর হৃদয় তন্ত্রী অকস্মাৎ বাজিয়া উঠিল, সহসা ভারতবাসীর হৃৎকম্প হইল এবং জলদগম্ভীর স্বরে আকাশ হইতে দৈববাণী হইল, যে "ইহাদের পা চিহ্ন ধরিয়া আর এক জাতি আসিয়া মোগল বংশ উৎসন্ন করিয়া আপনাদিগের আধিপত্য বিস্তার করিবে, অদৃষ্টের এই অব্যর্থ নিয়োগ।"

নবজীবন।

৫ম ভাগ। { চৈত্র, ১২৯৫। } ৭ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগ সূত্র।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

সাধনপাদ।

তে হ্লাদ-পরিতাপফলাঃ পুণ্যাপুণ্যহেতুত্বাত্। ১৪।

পদচ্ছেদ। তে, হ্লাদ-পরিতাপ-ফলাঃ, পুণ্য-অপুণ্য-হেতুত্বাত্।

পদার্থঃ। তে বিপাকাঃ, হ্লাদপরিতাপফলাঃ হ্লাদঃ সুখং, পরিতাপঃ দুঃখং, হ্লাদপরিতাপৌ ফলে যেষাং তে তথোক্তাঃ, পুণ্যং কুশলং কর্ম্ম, অপুণ্যং তদ্বিপরীতং পাপমিতি যাবৎ তে পুণ্যাপুণ্যে কারণে যেষাং তেষাং ভাবস্তত্ত্বাত্।

অন্বয়ঃ। পুণ্যাপুণ্য হেতুত্বাত্ তে (বিপাকাঃ) হ্লাদপরিপাকফলা ভবন্তীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। এতদুক্তং ভবতি পুণ্যকর্ম্মারব্ধা জাত্যায়ুর্ভোগা হ্লাদফলা অপুণ্যকর্ম্মারব্ধা পরিতাপফলাঃ ইতি। নন্থ সর্ব্বে বিপাকাঃ কথং সুখ দুঃখফলকাঃ ব্রহ্মলোকাদৌ দুঃখাসংভিন্ন সুখসত্ত্বাদিত্যাশঙ্কাং পরিহরতি ভাষ্যকারঃ—"যথাচেদং দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং এবং বিষয়সুখকালেঽপি দুঃখমস্ত্যেব প্রতিকূলাত্মকং যোগিনঃ"। অস্যার্থঃ যথাচেদং পরিদৃশ্যমানং

রোগাদি দুঃখং প্রতিকূলাত্মকং দ্বেষ্যস্বভাবং ভবতি এবং সর্ব্বত্রৈব বিষয় সুখকালেঽপি দুঃখং যোগিনাং প্রতিকূলাত্মকং তিষ্ঠতীত্যর্থঃ। অতএব যদ্যপি স্বর্গাদৌ সুখমধিকং তথাপ্যল্পমপি দুঃখং বলবদ্দ্বেষবিষয়ো ভবতি। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। তাহারা (পূর্ব্বোক্ত জাত্যায়ুর্ভোগরূপবিপাক সকল) পুণ্য এবং পাপ কর্ম্ম হইতে সম্ভূত হয় বলিয়া তাহাদের ফল সুখ এবং দুঃখ।

সমালোচন। সূত্রে কেবল এই কথা বলা হইল বিপাক সকল পুণ্য এবং পাপ এই উভয় বিধ কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া উহাদের ফল সুখ এবং দুঃখ; সূত্রের উক্তিটা কিছু অস্পষ্ট। এই অস্পষ্টতা দূর করিবার জন্য ভাষ্যকার কেবল এইমাত্র বলিলেন, যে পুণ্য কর্ম্ম হইতে আরব্ধ বিপাকের ফল—সুখ এবং পাপকর্ম্ম হইতে আরব্ধ বিপাকের ফল—দুঃখ। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, মনুষ্য মাত্রেই কিছু না কিছু পরিমাণে পাপী, নিছক পুণ্যবান্ মনুষ্য মেলে না। এমন যে ধর্ম্মাবতার ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির, তাঁহারও পাপ ঘটিয়াছিল, অপরের ত কথাই নাই। আবার ওদিকে বলিয়াছ, ভাল মন্দ সকল প্রকার কর্ম্ম পুঞ্জীভূত হইয়া বিপাক আরম্ভ করে। এক্ষণে বিবেচনা কর, কোন ব্যক্তির কর্ম্ম বিপাকে স্বর্গ প্রাপ্তি, ইন্দ্রলোক প্রাপ্তি বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি হইল। ঐ সকল স্থানে কেবল সুখ; দুঃখ লেশেরও স্পর্শ নাই। অথচ বলিতেছ পাপ কর্ম্মের বিপাকের ফল দুঃখ, এক্ষণে সে দুঃখ তাহার ঘটে কই? এই আশঙ্কার উত্তরে ভাষ্যকার বলিয়াছেন, তোমার আশঙ্কা আপাতত অকাট্য বলিয়াই বোধ হয় বটে, কিন্তু ইহার মধ্যে একটু সূক্ষ্ম কথা আছে। মূঢ় ব্যক্তিরাই কতকগুলি বস্তু বা কোন অবস্থা বিশেষকে নিত্য সুখ বা নিত্য দুঃখকর বলিয়া বিবেচনা করে। কেহ কেহ গোপাল ভোগ, বাগমভোগ, গোপালে ধোবা, ন্যাংড়া প্রভৃতি নানাবিধ স্বাদু ও সুমিষ্ট আম্রবৃক্ষ ও উত্তম উত্তম কাঁটাল, জাম, পেঁপে, পেয়ারা, নারিকেল, কদলী প্রভৃতি যাবতীয় অপরাপর ফলকর বৃক্ষে পরিপূর্ণ মধ্যস্থলে গভীরোদক বহুমৎস্য দীর্ঘিকাযুক্ত একটি সুদীর্ঘ ও সুবিস্তৃত উদ্যান দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করে, যে উদ্যান স্বামী ইহ জগতে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী, যিনি প্রচণ্ড গ্রীষ্মের সময় আপনার ইচ্ছামত ডাব নারিকেলের জল পান করিতে

পারেন, সকল সময়েরই স্বাদু ফল যথেচ্ছ উপভোগ করিতে পারেন, এ জগতে তাঁর মত পুণ্যবান্ আর কে আছে? বাস্তবিক উদ্যান স্বামী কি সেইরূপ সুখী? না, বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবে, তিনি কখনই সুখী নন। প্রথম,—উদ্যান প্রস্তুত করিবার সময়, এ গাছটি হইল না, ঐ গাছটি শুকাইয়া গেল! আহা কত পয়সা ব্যয় করিয়া কত যত্ন করিয়া মালদহ হইতে যে চারা আনা হয়, তাহার সকলগুলিই গোরুতে খেযে গেছে! ছাগলের দৌরাত্ম্যও কি কম, এমন ঘটপানা কাঁটাল গাছগুলো একেবারে মুড়িয়ে খেয়ে গেছে! ইত্যাদি নানাবিধ চিন্তায় তাঁহার চিত্ত সর্ব্বদা আক্রান্ত, সর্ব্বদা ক্লিষ্ট; একদণ্ড নিশ্চিন্ত ভাব নাই, কাজেই অসুখ। তাহার পর উদ্যান প্রস্তুত হইল, নূতন গাছে দুই একটি করিয়া ফল ধরিতে আরম্ভ হইল, চিন্তা আরও বাড়িল। এ ফলন্ত গাছ কিসে নষ্ট না হয়, কিসে ফলগুলি রক্ষা পায়, একটিও না ঝরে পড়ে, একটিও না চুরি করে, একটিও না পাখীতে খায়, যদিও বিশেষ পরিচর্য্যা দ্বারা ঝরে পড়া হইতে রক্ষা পায়, কিন্তু চোর ও পাখীর হাত হইতে এড়ানই মুস্কিল। কারণ এদিকে উদ্যান স্বামী যেমন উহাদিগকে রক্ষা করিতে সতর্ক, চোর ও পাখীও তেমনি উহাদিগকে অপহরণ করিতে সর্ব্বদাই ছোঁ ছোঁ করিয়া ছিদ্র খুঁজে বেড়াইতেছে। শেষে হয় ত পাকিবার সময় ফলগুলি চোরে লইয়া গেল, না হয় পাখীতে নষ্ট করিল! দুঃখের আর সীমা নাই! তাই বলি উদ্যান স্বামী কখনই সুখী নয়।

যাহাদের ঘরে পুত্র সন্তান নাই, তাহারা রূপ, গুণ, যৌবন ও উৎসাহশালী, বিনীত পুত্র পৌত্র পূর্ণ একটি বৃহৎ পরিবার দেখিয়া মনে মনে বিবেচনা করেন, এই সংসারে ঐ বাড়ীর কর্ত্তাই প্রকৃত সুখী। পূর্ব্বজন্মে অতি কঠোর তপশ্চরণ করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহারই ফল ভোগ করিতেছেন। কিন্তু তোমাকে যদি ঐ কর্ত্তার স্থানীয় করা যায়, এবং তুমি যদি মোহাভিভূত না হও, তাহলে তুমি অবশ্য বুঝিতে পারিবে সৎ পরিবার লাভে যৎকিঞ্চিৎ সুখ আছে বটে, কিন্তু তাহা দুঃখ শূন্য নয়। প্রথম চিন্তা পুত্র সন্তান হোক; যদি পুত্র হইল, তখন চিন্তা রূপবান্ হোক, অন্তত কানা, খোঁড়া, কুঁজো, কুৎসিত একটা কিম্ভূত কিমাকার ছেলে

না হয়; যদি তাহা হইল, তবে হাবা গোবা না হয়, এই চিন্তা আসিয়া হৃদয়কে অধিকার করে। গুণবান্ হইলে, যেন অর্জ্জন-ক্ষম হয়, সচ্চরিত্র হয়, এই সকল চিন্তা আসিয়া চিত্তে উদিত হয়। তার উপর পীড়ার চিন্তা ত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরক্ষণ হইতে যাবজ্জীবন লেগেই আছে। তাহার পর পুত্র রূপ-গুণ-সম্পন্ন হইলে, সর্ব্বদাই তাহার জীবন রক্ষার চিন্তা এবং তাহার সঙ্গে আতঙ্কও নানা প্রকার। এইরূপ যাহার যত পরিবার অনেক, তাহার চিন্তাও সেই পরিমাণে অধিক। তাই বলি তাহার সুখের সহিত তুলনা করিলে দুঃখের ভাগই অধিক বোধ হইবে।

এইরূপ দরিদ্রদিগের নিকট রাজারাজড়া ধনী ব্যক্তি মাত্রেই সুখী বলিয়া কল্পিত হয়। কিন্তু ধনের অর্জ্জনে দুঃখ, অর্জ্জিত ধনের রক্ষণে আরও দুঃখ। রাজার মস্তকের উপর সর্ব্বদা একখানি তীক্ষ্ণ তরবারি দোদুল্যমান, একটু অসাবধান বা অসতর্ক হইলেই উহা শিরশ্ছেদ করিয়া ফেলিবে। কিন্তু বিবেকের চক্ষুতেই ঐ রূপ দেখা যায়; অবিবেকীর নিকট উহা সুখ। আমরা একথা বলি না, ধনী বা রাজাদিগের আদৌ সুখ নাই; তবে তাহাদের সুখ কেবল সুখ নয়, উহা দুঃখের সহিত মিশ্রিত; এমন কি তুলনা করিলে দুঃখের ভাগ অধিক হইলেও হইতে পারে। এই জন্যই মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন;—

"রাজ্য, স্বহস্তে যাহার দণ্ড ধারণ করা হইয়াছে, এরূপ ছত্রের মত।"

এখানে ছত্র শব্দে অবশ্য আড়ানি ছাতি বুঝিতে হইবে। দারুণ গ্রীষ্ম কালের মধ্যাহ্নে সেই রূপ একটি বৃহৎ ছত্র স্বয়ং ধারণ করিয়া কান্তার মধ্যে পদব্রজে গমন করিলে সুখ দুঃখের যেরূপ ভাগ হয়, রাজ্যভোগেও সুখ দুঃখের সেইরূপ ভাগ।

এইরূপ স্বর্গভোগে, ইন্দ্রলোক বা ব্রহ্মলোক প্রাপ্তিতে যে কেবল সুখ, একেবারে দুঃখ নাই বলা হইয়াছে, তাহা অজ্ঞানীর পক্ষে। যোগীগণ স্বর্গসুখের সহিতও দুঃখ দেখিতে পান। অতএব স্বর্গাদি সুখ দুঃখ শূন্য নয়। এক্ষণে দেখ তুমি যে আশঙ্কা করিয়াছিলে, কর্ম্মভোগ নিবন্ধন স্বর্গাদি লাভ হইলে, তাহাতে দুঃখভোগ কিরূপে সম্ভবে? তাহা খণ্ডিত হইল। স্বর্গবাসীর চিন্তা, কবে স্বর্গভোগ ক্ষয় হইবে? তাহার উপর স্বর্গবাসী মাত্রেরই সমান

পদবী নয়, পদের তারতম্য, উচ্চতা নীচতা আছে সুতরাং আপনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পদবীস্থিত ব্যক্তিকে দেখিয়া মনের একটা মালিন্যই বল, দুঃখ বল, আর হিংসা বল হইয়া থাকে, ইহা ভোগীর পক্ষে স্বভাব সিদ্ধ, তাহাও দুঃখ।

আমরা একটা গল্প বলিয়া এই সমালোচনার শেষ করিব। কোন এক জেলার ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট বাবুর পিতা গিয়া কোন কার্য্যবশত পুত্রের কর্ম্মস্থলে কিছু দিন অবস্থান করেন। তাঁহার বয়স পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হইয়াছে কাজেই বৃদ্ধ বলিতে হইবে; স্বাভাবিক মিষ্টভাষী এবং ঐ রূপ বৃদ্ধ বয়সে আমাদের দেশের ভদ্র বংশীয় বৃদ্ধেরা যেরূপ মনোরঞ্জন গল্প গুজব করিয়া লোকের মনোরঞ্জন করেন, তাঁহার সে গুণ কিছু অধিক পরিমাণে থাকায়, সেখানকার ভদ্রলোক মাত্রেরই তিনি বিশেষ সম্মানের পাত্র হইয়াছিলেন; অনেকেই সন্ধ্যার পর তাঁহার নিকট গল্প শুনিতে আসিতেন, প্রত্যহই সন্ধ্যার পর সেই ডেপুটী বাবুর বাসায় একটি ছোট খাট মজলিস হইত। এইরূপ কিছু দিন যায়, এক দিন নানা কথার পর সকলে তাঁহার পূর্ব্ব জন্মের সুকৃতির ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বলিলেন, সংসারের সুখ আপনিই প্রকৃত ভোগ করিতেছেন। তাহাতে তিনি হাসিয়া বলিলেন তবে শুনুন। চিত্তে কোন খলতা বা কপটতা নাই, হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

"আমি যৌবন অবস্থায় কোন জমীদারের সরকারে গোমস্তাগিরি কার্য্য করিতাম, অল্প বয়সে পিতা মাতা উভয়েরই স্বর্গারোহণ হয়, সংসারের মধ্যে এক মাত্র সহধর্ম্মিণী আর দুই একটি ছেলেপিলে। প্রাতঃকালেই দুই জন লাঠিয়াল সঙ্গে করে খাজনা সাধিতে যাইতাম। জমিদারীর খাজনা আদায় অতি নির্দ্দয়ের কায, অনেক বকাবকি করিতে হয়, অনেক মারপীটও করিতে হয় সুতরাং প্রত্যহ প্রাতঃকাল হইতে প্রায় বেলা ১টা অবধি ঐ কার্য্যেই যাইত। তবে ইহার মধ্যে প্রজার নিকট হইতে মিষ্ট কথা বলিয়াই হোক, বল প্রকাশ করিয়াই হোক, অথবা পয়সা দিয়াই হউক, কাহারও নিকট হইতে শাক, কাহারও নিকট হইতে মাছ এক এক করিয়া সংগ্রহ করে বাড়ী পাঠাইতাম। নানা লোকের সহিত নানারূপ ঝগড়া কাজিয়ে করে বেলা দ্বিপ্রহরের সময় যখন বাড়ী ফিরে যাইতাম, তখন মনে

মনে এরূপ কষ্ট হইত, যে কালই সংসার ত্যাগ করে যাইব, এ কষ্টময়, যন্ত্রণাময়, সংসারে এক দণ্ডও থাকিব না। বাড়ী আসিবামাত্রই যখন দেখিতাম গৃহিণী দাবার উপর পীঁড়ে পেতে, পা-ধোবার জল, গামছা, তেলের বাটি সাজাইয়া রেখে তামাকু সাজিবার উদ্যোগ করিতেছেন, তখন যেন দুঃখের অনেক হ্রাস হইত। তাহার পর আহার করিতে বসিতাম; খাওয়া শেষ হয় হয়, এমন সময় গৃহিণী যখন নথ নাড়িয়া বলিতেন 'খাওনা, কেবল খেটেই মরিবে? ভাল করে পেটে দুটো ভাত দাও, আর এক খানা ঝোলের মাছ দিব?' তখন বোধ হইত এই সংসার বুঝি স্বর্গ। পরদিন প্রাতে পূর্ব্বের যন্ত্রণা একেবারে বিস্মৃত হইয়া দ্বিগুণ উৎসাহে খাজনা আদায় করিতে যাইতাম। এইরূপে যৌবন কাল কাটিল, ছেলে পিলে মানুষ হইল। এখন আর পরের চাকরী করিতে হয় না বটে, কিন্তু বৃদ্ধ বয়সে পরিশ্রম করিতে হয়, সকল কার্য্য নিজে করিতে হয়; কষ্ট ভোগ করিয়া করিয়া অনেক সময় সংসারে বৈরাগ্য হয়। মনে হয়, চিরকালই যদি দুঃখে গেল তবে আর সংসারে থাকি কেন? কিন্তু আমার চটি জুতার শব্দ শুনিয়া ঐ কর্ত্তা আসিতেছেন বলে যে সকলে তটস্থ হয়, তাহাতেই মরে আছি!! বৌ ঝি গুলো অসাবধান হয়ে ফিস্ ফাস করে কথা কহিতেছে, এমন সময় আমার জুতার শব্দ হইল, অমনি "কর্ত্তা কর্ত্তা" বলে সামলে একপাশে চোরের মত দাঁড়াইল; ছেলেপিলে লুকিয়ে তামাক খাইতেছে, এমন সময় আমার পায় শব্দ শুনিয়া "কর্ত্তা কর্ত্তা" বলে হুকাটা ফেলে দিলে; চাকর বাকরে বদমায়সি করিবার উদ্যোগ করিতেছে, এমন সময় আমাকে দেখিয়া সভয়ে "কর্ত্তা কর্ত্তা" বলে অমনি সরে যায়। এইরূপে 'কর্ত্তা' শব্দ যত বার কর্ণে প্রবেশ করে, তত বার চিত্ত আনন্দে মাতিয়া উঠে!!" দেখুন, সুখ দুঃখ কেমন জড়িত।

পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ
দুঃখমেবসর্ব্বং বিবেকিনঃ ॥ ১৫ ॥

পদচ্ছেদঃ। পরিণাম-তাপ-সংস্কার-দুঃখৈ, গুণ-বৃত্তি-বিরোধাত্ চ, দুঃখং, এব, সর্ব্বং, বিবেকিনঃ।

পদার্থঃ। পরিণামশ্চ, তাপশ্চ, সংস্কারশ্চ তজ্জাতানি দুঃখানি তৈঃ পরিণাম-তাপ-সংস্কার দুঃখৈঃ উপভুজ্যমানাঃ বিষয়াণাং যথাযথং তৃষ্ণাবর্দ্ধনাত্ তদপ্রাপ্তি কৃতস্য দুঃখস্যাপরিহার্য্যত্বাত্ দুঃখান্তর সাধনত্বাচ্চ যা দুঃখরূপতা তদেব পরিণামদুঃখত্বং। উপভুজ্যমানেষু সুখসাধনেষু তৎ প্রতিপক্ষিনং প্রতি দ্বেষস্য সর্ব্বদৈবাবেস্থিতত্বাত্ সুখানুভব কালেঽপি যত্ দুষ্পরিহার্য্যং দুঃখ মনুভূয়তে তত্তাপদুঃখম্। সংস্কার দুঃখং নাম সংস্কারবশেন যদ্দুঃখং জায়তে তত্। যথা স্বাভিমতাং নাভিমতাবিষয় সন্নিধানে সুখসংবিচ্চোপজায়মানা তথাবিধমেব স্বক্ষেত্রে সংস্কার মারভ্যতে, সংস্কারাচ্চ পুনস্তথাবিধ সংবিদনুভব ইত্যপরিমিত সংস্কারোত্পত্তিদ্বারেণ সংস্কারানুচ্ছেদাত্ সর্ব্বৈশ্চৈব দুঃখত্বং এভি র্দুঃখৈহেতুভিঃ চ। (পুনঃ) গুণ-বৃত্তি বিরোধাচ্চ- গুণানাং সত্ত্ব রজস্তমসাং যা বৃত্তয়ঃ সুখদুঃখমোহরূপাস্তাসাং যো বিরোধঃ পরস্পরমভিভব্যাৎ। বিভাবকত্বরূপস্তস্মাৎ হেতোঃ বিবেকিনঃ ঐকান্তিকীং চ দুঃখনিবৃত্তিমিচ্ছতঃ পুরুষশ্চ সর্ব্বং এব দুঃখং সর্ব্বে বিষয়া দুঃখরূপতয়া প্রতিভান্তীত্যর্থঃ।

অন্বয়ঃ। পরিণাম তাপ-সংস্কার দুঃখৈঃ, গুণবৃত্তি বিরোধাচ্চ বিবেকিনঃ সর্ব্বং এব দুঃখং প্রতিভাতীতি শেষঃ।

ভাবার্থ। পূর্ব্ব সূত্রেণ বিপাকানাং সামান্যতঃ সুখ দুঃখরূপে ফলে উক্তে, সম্প্রতি তদ্বিশেষং কথয়তি। বিবেকিনস্তত্ত্বজ্ঞস্য ঐকান্ততোঽত্যন্ততশ্চ দুঃখনিবৃত্তিমিচ্ছতঃ। পুরুষস্য সর্ব্বএব দুঃখং তত্র হেতুচতুষ্টয়মাহ (১) পরিণামদুঃখৈঃ, (২) তাপদুঃখৈঃ, (৩) সংস্কারদুঃখৈ সর্ব্বেষাং বিষয়াণাং তৈঃ সম্বন্ধাদিত্যর্থঃ), (৪) গুণ-বৃত্তি-বিরোধাত্ যতঃ সর্ব্বে বিষয়া পরিণাম তাপ সংস্কার দুঃখসম্বন্ধা, তদুপাদানীভূত সত্ত্বাদিগুণবৃত্তিনাং পরস্পর বিরোধশ্চ দৃশ্যতে। অতস্তে সর্ব্বে তত্ত্বজ্ঞস্য পুরুষস্য দুঃখরূপতয়ৈব প্রতিভান্তি। ননু সুখ সাধনতয়া সুখ সংভিন্নতয়া চ সুখমেব কথং সর্ব্বং ন ভবতীতি চেত্ ন বলবদ্বেষস্যোক্তত্বাত্ সামান্যাতো বাহুল্যস্যাপাত্র নিয়ামকত্বাচ্চ বৈশেষ্যা ভবাদ ইতি ন্যায়াৎ। তদুক্তং বিষ্ণুপুরাণে—কলত্রমিত্র পুত্রার্থ গৃহক্ষেত্রধনাদিকৈঃ। ক্রিয়তে ন তথা ভূরি সুখং পুংসাং যথা হসুখং।

অনুবাদ। পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ এবং সংস্কার দুঃখের সহিত বিষয়ের

সম্বন্ধহেতু এবং (সত্ত্ব, রজ, এবং তমঃ) এই গুণত্রয়ের বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে পরস্পরে বিরোধ হেতু বিবেকী পুরুষের নিকট সবই দুঃখরূপে প্রতিভাত হয়।

সমালোচন। পূর্ব্বসূত্রে বলিয়াছি বিপাক সকল পুণ্য পাপ এই দুই প্রকার কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া সুখ এবং দুঃখরূপ ফল প্রদান করে। অর্থাৎ পুণ্য কর্ম্মবিপাকের ফল—সুখ এবং পাপ কর্ম্মবিপাকের ফল—দুঃখ। তাই বলি, যাহাদের পুণ্যকর্ম্ম অধিক, তাহারাই সুখী এবং যাহাদের পুণ্য কর্ম্ম কম, তাহারা দুঃখী। এই কথা পূর্ব্বে পূর্ব্বসূত্রে সামান্যভাবে বলা হইয়াছিল, এক্ষণে বিশেষ করিয়া বলিতেছেন। যে ব্যক্তি বিবেকী, যে সংসারের সকল তত্ত্ব সম্যকরূপে দর্শন করিয়াছে এবং দুঃখের ঐকান্তিক আত্যন্তিক উচ্ছেদ করিবার সর্ব্বদা অভিলাষী, এইরূপ ব্যক্তির নিকট সকলই দুঃখ; এক্ষণে কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, ভাল বিবেকী ব্যক্তির নিকট সকল বস্তুই দুঃখরূপে প্রতীয়মান হয় ইহা স্বীকার করিলাম, কিন্তু তাহার প্রতি তুমি যে হেতু নির্দ্দেশ করিয়াছ, সে কথাগুলির অর্থত কিছুই হৃদয়ঙ্গম হইল না। পরিণাম দুঃখই বা কি? তাপ দুঃখই বা কি? সংস্কার দুঃখই বা কি? আর গুণ-বৃত্তির বিরোধই বা কি? এগুলি প্রথমে না বুঝিলে সূত্রের অর্থ ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম হওয়া অসম্ভব। কাযেই আমাদের প্রথমে ঐ সকল কথার অর্থ লেখা যাইতেছে। (১) পরিণাম দুঃখ, পরিণাম শব্দের অর্থ অবসান (শেষ) বা উত্তরকাল (পর)। শেষ বা পরে সম্ভাবিত দুঃখের নাম পরিণাম দুঃখ। সুখভোগের সময় সুখের উপর স্বভাবতই লোকের এক প্রকার আসক্তি জন্মে, সেই আসক্তিবশত মনে মনে ইচ্ছা হয়, এই সুখ আমার চিরস্থায়ী হোক, হে পরমেশ্বর আমার এই সুখের নাশ না হয়, অথবা আমি যেন ইহা অপেক্ষা অধিক পরিমাণে এই জাতীয় সুখ পাই, এইরূপ অনুরাগবশত সুখতৃষ্ণা প্রবল হয়। তৃষ্ণা প্রবল হইলে তাহার প্রাপ্তির উপায়াদি পরিকল্পিত হইতে থাকে। পরিণামে ঐ উপায় পরিকল্পনাদি নানাবিধ মানসিক কর্ম্ম জন্য দুঃখ পরম্পরা ভোগ করিতে হয়, বিষয়ে অনুরাগবশত যেমন পরিণাম দুঃখ হেতু মানসিক কর্ম্ম সকলে প্রবৃত্তি হয়, সেইরূপ বিষয়ে দ্বেষ বা মোহবশত পরিণাম দুঃখকর বিবিধ মানসিক কর্ম্মের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে। সুখভোগের সময়

কেহ কেহ এরূপও ভাবিয়া থাকেন, যে আমার সুখের অবসান হইলে যেন কোনরূপ দুঃখ না হয়; যাহাদের নিকট হইতে দুঃখের সম্ভাবনা, এরূপ শত্রু সকল বিনষ্ট হয়। কিন্তু ফলে তদনুকূল উপায় পরিকল্পনাদি মানসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে পরিণামে দুঃখ হয়। এইরূপ মোহবশত লোকে দুঃখকে সুখ ভাবিয়া তাহার প্রাপ্তির উপায়াদি পরিকল্পন করিয়া পরিণামে দুঃখ প্রাপ্ত হয়। নিজের যে সুখ নাই, তাহা লাভ করিবার ইচ্ছা করিলে অবশ্য অন্যের নিকট হইতে গ্রহণ করিতে হইবে, কাজেই ছল করিয়াই হৌক আর বল করিয়াই হৌক অপরের সুখের প্রতি হন্তা না হইলে অর্থাৎ অপরকে উৎপীড়িত না করিলে আপনার সুখ লাভ করা দুর্ঘট সুতরাং মনে মনে তাদৃশ সুখ প্রাপ্তির উপায়ের পরিকল্পনার সঙ্গেই হিংসাজনক শারীরিক ব্যাপারের প্রয়োগ ও আবশ্যক হয় এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে অভিলাষ বা প্রার্থনাদি বাচনিক ক্রিয়ার ও অনুষ্ঠান আবশ্যক হয়। এক্ষণে দেখ মানসিক শারীরিক, এবং বাচনিক এই তিন প্রকার কর্ম্মের বিপাক হইতে পরিণামে প্রবল দুঃখরূপ ফল উৎপন্ন হয়। ফলত, সুখ ভোগের জন্য চেষ্টা কেবল অজ্ঞানের কার্য্য মাত্র। কারণ ভোগেচ্ছার নিবৃত্তিই সুখ এবং ভোগেচ্ছার অনিবৃত্তিই দুঃখ। যত দিন অবধি ভোগের অনুষ্ঠান থাকিবে, তত দিন অবধি কখনই পরিতৃপ্তি হইবে না; আর তৃপ্তি না হইলে তাহাতে উপেক্ষাও নাই, উপেক্ষা না হইলে বৈরাগ্য অসম্ভব। যতই বিষয় ভোগ করা যায়, ততই ইন্দ্রিয়গণের বিষয়াসক্তি এবং বিষয় প্রাপ্তির কৌশল বৰ্দ্ধিত হয়, অতএব বিষয় ভোগ সুখের কারণ নয়। বিছের জ্বালা সহিতে না পারিয়া আপনাকে সাপের দ্বারা দংশন করান যেমন, সুখার্থী হইয়া বিষয়ে আসক্তিবশত দুঃখরূপ মহৎ পঙ্কে নিমগ্ন হওয়াও তেমনি। ইহার নাম,—পরিণাম দুঃখ। ইহা বর্ত্তমান সুখভোগাবস্থায়ও বিবেকী ব্যক্তিকে সুখী না করিয়া অত্যন্ত ক্লিষ্ট করে।

পরিণামদুঃখ কি, তাহা পাঠক বুঝিতে পারিলেন, তথাপি আর একবার সংক্ষেপে বলিব। বোধ হয়, সকলেই জানেন, রাজ্য ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি যে কোন সুখ আমাদের অনায়াসে স্বভাবত লাভ হয়, সে টুকুর পরিতৃপ্তিতে তাহার বৃদ্ধির আশা হয়; আশা হইলে কিরূপে তাহার লাভ

হইবে, সেই উপায় চিন্তা হয়; উপায় চিন্তার সঙ্গেই শারীরিক ক্রিয়া বা চেষ্টা এবং বড়লোকের তোষামোদ, হীন বলের উপর তম্বি করা প্রভৃতি বাচিক ক্রিয়ারও অনুষ্ঠান করিতে হয়; ঐ সকল কার্য্যের পরিণাম কেবল দুঃখ। এখানে একথা অবশ্য স্মরণ করা উচিত, আধুনিক যুরোপীয়-দিগের মতে কর্ম্ম করাই সুখ, সর্ব্বদা নিজের উন্নতির চেষ্টা করিয়া লোকের সহিত কটাকাটি মারামারি করিয়া, আপনার প্রভুত্ব স্থাপনই সুখ। এইজন্য যুরোপে যাহার যত কর্ম্মে ব্যাপৃতি এবং অবকাশাভাব, সেই তত বড়লোক এবং সুখী বলে বিবেচিত হয়। আমাদের পণ্ডিতদিগের মত ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত; তাঁহারা অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া এবং নানাবিধ পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছেন, শান্তিই সুখ, সন্তোষই সুখ, নিবৃত্তিই সুখ। তাঁহারা বলেন 'সন্তোষামৃত তৃপ্তানাং যৎসুখং শান্ত চেতসাং। কুতস্তদ্ধন লুব্ধানা মিতশ্চেতশ্চধাবিতাম্?" সন্তোষরূপ অমৃতে পরিতৃপ্ত হইয়া যাহাদের চিত্ত শান্তি অর্থাৎ স্থিরতা লাভ করিয়াছে, তাহাদের যে সুখ, সে সুখ কি যাহারা ধন লোভে সর্ব্বদা ছটফট করিয়া বেড়ায়, তাহারা লাভ করিতে পারে? আমরা বলি কখনই না; কারণ আমাদের সুনীতি আপনার বালক পুত্রকে এই বলিয়া উপদেশ দেন 'বাছা যস্য যাবৎ স তেনৈব স্বেন তুষ্যতি বুদ্ধিমান্।" যাহার যতটুকু সুখ, স্বাভাবিক বা আপনা হইতে উপস্থিত হয় তাহার তাহাতেই সন্তোষ লাভ করা উচিত। তাহাতে সন্তোষ লাভ না করাই পরিণাম দুঃখ। ঝঞ্ঝাট যত বাড়াইবে, ততই দুঃখ হইবে, ইহা মূঢ় ব্যক্তিরা বুঝিতে পারে না, তাহারা বিষয় সুখে নিমগ্ন হয় কিন্তু বিবেকী বুঝিতে পারেন, তাই তিনি বিষয় সুখে একেবারে পরাঙ্মুখ। তাঁহাদের কথা—

"ন জাতু কামঃ কামনা মুপভোগেন শাম্যতি॥
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মে'ব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥

(২) তাপ-দুঃখ বলিতে মনের পরিতাপ জন্য যে দুঃখ হয়। আমরা যখন সুখ ভোগ করি, তখন আমাদের মনে সেই সুখের প্রতিবন্ধক বা ব্যাঘাতকারীর উপর দ্বেষ হয়। সেই দ্বেষ জন্য আমরা কায়মনোবাক্যে সেই দ্বেষানুসারে কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হই, সেই সকল কর্ম্মের পরিণামে যে দুঃখ পাই, তাহার নাম তাপ। দ্বেষাগ্নি উদ্দীপ্ত হইয়া চিত্তকে ঘৃণিত কার্য্যে

প্রবৃত্ত করে, দুঃখ দেয়, বলিয়া উহাকে তাপ দুঃখ বলে। সুখের সময় সেই সুখের প্রতিকূল দুঃখপ্রদ বস্তু বা ব্যক্তির স্মরণে মনে যে সেই প্রতিকূল বস্তুর উপর উৎকট দ্বেষ হয়, সেই দ্বেষজন্য দুঃখকে তাপদুঃখ বলে। যেমন বসন্তকালের পূর্ণিমার রাত্রে স্বচ্ছন্দ গমনোপযোগী পথে বর্ষাকালের সেই তামসী রাত্রির ঘোর ঘন ঘটা সমাচ্ছন্ন কর্দ্দমাকীর্ণ পথের স্মরণ করিয়া তাহার উপর দ্বেষহেতুক মনে মনে যে দুঃখ হয়, এইরূপ দুঃখকে তাপ দুঃখ বলে। সুখের সময় তাহার প্রতিকূল দুঃখের স্মরণ করিয়া যেমন দুঃখ হয়, দুঃখের সময় তাহার বিপরীত সুখ স্মরণ করিয়া সেইরূপ দুঃখ হয়।

(৩) সংস্কার-দুঃখ বলিতে পূর্ব্ব সংস্কারবশত সুখ ভোগকালেও সহসা যে দুঃখ ভোগ হয়। মহাকবি কালিদাস এই সংস্কার দুঃখের একটি উত্তম উদাহরণ দিয়াছেন।

রাজা দুষ্মন্ত নিশ্চিন্ত; আপাতত তাঁহার কিছুই অসুখ নাই; যদিও অসুখের কারণ আছে, তাহাও তিনি একেবারে বিস্মৃত; বর্ত্তমান সুখের ফোয়ারা তাঁহার সম্মুখে; তাঁহার মন কেবল সুখেই উৎফুল্ল, দুঃখের রেখাও তাঁহার মনে নাই। তিনি সহসা সুমধুর তান, লয়, মূর্চ্ছনাদি শোভিত বীণার ঝঙ্কার শুনিলেন। শুনিয়া চিত্ত চঞ্চল হইল, বৈশাখ মাসের সুনির্ম্মল নভোমণ্ডল যেমন দেখিতে দেখিতে সুগাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালায় আবৃত হয়, রাজার চিত্ত ঠিক সেইরূপ দুঃখরাশিতে আবৃত হইল। রাজা বলিলেন, 'এ কি! আমার দুঃখের কোন কারণ উপস্থিত নাই অথচ দারুণ দুঃখ অনুভব করিতেছি, একি হইল।' কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন।

'রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান্
পর্য্যুৎসুকো ভবতি যৎ সুখিতোঽপি জন্তুঃ।
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥'

লোকের সুখের অবস্থায় থাকিয়া ও রম্যবস্তু দেখিয়া অথবা মধুর সঙ্গীতাদির শব্দ শুনিয়া যে ব্যাকুল চিত্ত হয়, তাহার প্রতি কারণ আর কিছুই নয়, সে কেবল অজ্ঞান পূর্ব্বক সংস্কারোপহিত জন্মান্তরের সৌহার্দ্দ স্মরণ করে।

পূর্ব্বে কোন জন্মে হয় ত কোন প্রণয়িনী অতি সুচারু বীণা বাজাইতে

পাবিত, অকালে তাহাব বিয়োগ হওয়ায়, বীণার শব্দ দারুণ দুঃখপ্রদ হয়, যখনি বীণা শুনা যাইত, অমনি চিত্ত ছাঁত্ করিয়া উঠিত; প্রণয়িনীব বীণাব শব্দ কাণে প্রতিধ্বনিত হইত, হৃদয় করুণার বসে মন আপ্লুত হইত; বাবম্বাব ঐরূপ হওযাতে বীণার শব্দ শুনা নিতান্ত দুঃখকর হইয়া উঠিল, চিত্তেও সেইরূপ সংস্কাব জন্মিল। এখন সে জন্ম অতীত হইযা গেল, তাহাব পব কত জন্ম গেল, কিন্তু সংস্কাবটুকু চিত্তে রহিয়া গেল, বীণাব শব্দ শুনিলেই সেই দুঃখ আসিযা উপস্থিত। অপব কোনরূপ মধুব শব্দ শ্রবণ করিয়া বা রম্যবস্তু দর্শন কবিযা চিত্ত যে বিনা কাবণে কাতব হয়, তাহাব কাবণ কেবল সংস্কাব; সেই সময কোন জন্মান্তবেব দুঃখকে স্মবণ কবাইয়া দেয়।

প্রথমে সুখ বা দুঃখেব অনুভব দ্বাবা মনে সুখ বা দুঃখেব সংস্কাব জন্মে, সেই সংস্কাব অনুদ্বুদ্ধ অবস্থায অবস্থিতি করে। পবে কাল আদি উদ্বোধক উপস্থিত হইলে, সেই সংস্কাবেব উদ্বোধ হয। সংস্কাবেব উদ্বোধ হইলে স্মরণ হয অর্থাৎ পূর্ব্বানুভূত সুখ বা দুঃখেব স্মবণ হয় কিন্তু ইহ জন্মে সকলই দুঃখরূপে প্রতীযমান হয। এই দুঃখেব নাম সংস্কাব দুঃখ।

পবিণাম-দুঃখ শব্দে শেষ দুঃখ, সুখ ভোগেব শেষ হইলেই যে দুঃখ হয়। কাহাকে আপনা অপেক্ষা অধিক সুখভোগ কবিতে দেখিযা যে দুঃখ হয, তাহা তাপ-দুঃখ; বিষয় মাত্রেবই এই তিন প্রকাব দুঃখেব মধ্যে একটা না একটা দুঃখেব সহিত সম্বন্ধ।

এই অনাদি দুঃখ স্রোত বিদ্বান ব্যক্তিকে ক্লিষ্ট কবে অবিদ্বানকে নয়। ভাষ্যকাব বলেন চোখেব ভেতব যদি মাকড়সাব সুত লাগে তাহলে চোখ অমনি কব কর কবে কিন্তু অন্য গাত্রে উহার স্পর্শে কিছুই বোধ হয় না। সেইরূপ বিদ্বান ব্যক্তিই এই সকল দুঃখে দুঃখী হয়েন। মূঢ়েবা কেবল বর্ত্তমান সুখের মাধুর্য্যে মুগ্ধ হয়।

তাহার পর বুঝিতে হইবে, গুণ-বৃত্তি বিরোধাৎ—কি। পূর্ব্বে যে তিনটি দুঃখের কথা বলা হইল, অনেকে তাহাদিগকে কল্পনার বিলাস বলিয়া উড়াইয়া দিতে পাবে, এই নিমিত্ত শেষ হেতুটিব উল্লেখ করিয়াছেন।

(৪) গুণবৃত্তি বিরোধাৎ। গুণ বলিতে সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ অথবা অন্য কথায় প্রখ্যা—প্রকাশ, প্রবৃত্তি—কার্য্যে উদ্যোগ এবং স্থিতি—নিশ্চেষ্টতা।

ইহাদের বৃত্তি—সুখ, দুঃখ, মোহ; এই গুণেরা পরস্পর বিরোধী অথচ সকলেই আপন আপন অধিকার বাড়াইবার জন্য সর্ব্বত্র বর্ত্তমান। সাংসারিক বিষয় বা বস্তু মাত্রেরই ঐ গুণ ত্রয় উপাদান সুতরাং সমুদয় বস্তু বা বিষয় সুখ দুঃখ মোহ স্বভাব। কাযেই বলিতে হইবে, নিছক সুখের বস্তু কিছুই নাই। অতএব সিদ্ধ হইল বিবেকী পুরুষের সকলই দুঃখ।

গুরু নানক কৃত জপজী বা জপ-পরমার্থ।

তীরথ তপ দয়া দত দান,
জে কো পাবে তিল কা মান,
সুনিয়া মনুনিয়া মন কীতা ভাউ,
অন্তর্গত তীরথ মলি নাউ ॥
সভি গুণ তেরে মৈ নাহি কোই,
বিনু গুণ কীতে ভগতি ন হোই।
সুঅসৃতি আথ বাণী বরমাউ
সৎ সুহান, সদা মন চাঁউ ॥

অর্থ

যে ব্যক্তি তীর্থ দর্শন, তপ, দয়া, দান ইত্যাদি গুণের তিল মাত্র পরিমাণ প্রাপ্ত হয়, এবং পরমাত্মার মহিমা শ্রবণ ও মনন পূর্ব্বক মনোমধ্যে ভক্তি দৃঢ় করিয়া রাখে, সে অন্তর্গত তীর্থে স্নান করিয়া মলিনতা দূর করে।* হে পরমপুরুষ! সকলই তোমার কৃপা, আমার কোন গুণই নাই। তোমার কৃপা ব্যতীত ভক্তির উদয় হয় না। তুমি স্বস্তি এবং ব্রহ্মবাণী, তুমি সত্য, সুন্দর এবং নিত্য আনন্দময়।

---

* টীকা গ্রন্থে এই স্থলের নানা অর্থ দেখা যায় যথা, "যে ব্যক্তি তীর্থ দর্শন প্রভৃতি সৎ কর্ম্মের তিল মাত্র অনুষ্ঠান করিয়াছেন, তিনি তৎ পুণ্য ফলে মণ পরিমাণ সুখভোগাদি প্রাপ্ত হন"। "তীর্থ দর্শন প্রভৃতি সৎ কর্ম্মের সম্মান (শ্রবণ মননাদির সহিত তুলনায়) তিল মাত্র, অর্থাৎ অতি অল্প" ইত্যাদি।

কৌন সুবেলা, বখ্‌ত কৌন, কৌন থিতি, কৌন বার,
কৌন সি রুতী, মাহ কৌন, জিৎ হোআ আকার।
বেল ন পায়া পণ্ডিত জি, হোবে লেখ পুরাণ,
বখ্‌ৎ ন পাযা কাদীয়া জি, লিখন লেখ কৌবাণ।
থিতি বার ন যোগী জানে, রুতী মাহ্‌ ন কোই,
জা করতা সিরঠী কো সাজে, আপে জানে সোই।
কিবঁ কর আখা, কিবঁহ সালাহী, কিবঁ বরণী, কিবঁ জানা?
নানক, আখন সভকো আখে, ইক দূ ইক সিয়ানা।
বড়া সাহিব, বড়ী নাঁই কীতা জাঁকা হোবে,
নানক, জেকো আপে জানে, অগে গয়া ন সোহে॥ ২১॥

অর্থ

ঈশ্বর যখন সংসার সৃজন করেন, তখন কত বেলা, কত সময়, কোন্ তিথি, কোন্ বাব, কোন্ ঋতু, কোন্ মাস ছিল, কে বলিতে পারে? যে পণ্ডিত পুবাণ লিখিযাছেন, তিনি নির্ণয় কবিতে পারেন নাই; কাজী সাহেব যিনি কোরাণ লিখিযাছেন, তিনিও নিশ্চয় কবিতে পারেন নাই। সে তিথি এবং বার যোগীরা অবগত নহে, অর্থাৎ যোগশাস্ত্রে নির্ণীত হয় নাই; সে ঋতু এবং মাস কেহই অবগত নহে; যে কর্ত্তা সৃষ্টি রচনা করিয়াছেন; কেবল তিনিই জানেন। অন্য কেহ কিরূপেই বা বলিবে, কিরূপেই বা প্রশংসা করিবে, বর্ণনা কবিবে, অথবা জানিবে? আপন আপন কথা ত সকলেই বলিয়াছেন, অর্থাৎ যাহাব যেমন বুদ্ধি, বলিতে ত কেহই ছাড়েন নাই; একের অপেক্ষা অন্যে বুদ্ধিমান *। সেই পবমাত্মা যিনি সমস্ত জগৎ সৃজন করিয়াছেন, তিনি শ্রেষ্ঠ, তাঁহাব নাম শ্রেষ্ঠ; নানক বলেন, যে ব্যক্তি অহঙ্কার কবে, সে ভবিষ্যতে (পরলোকে) শোভিত হয় না। ২১

---

* ইক দু ইক সিয়ানা—একতঃ একো বুদ্ধিমান্, অর্থাৎ সকলেই "তারে বড় তারে বড়" পণ্ডিত, কিন্তু আসল কথা কেহই জানেন না, কেবল অহঙ্কার প্রকাশ করেন মাত্র।

পাতালঁ পাতাল লখ, আগাসাঁ আগাস,
উঢ়ক উঢ়ক ভাল থকে বেদ কহেন্ ইক বাত,
সহস আঠারহ কহেন্ কতেবাঁ, অসল ইক ধাত,
লেখা হোই তৌ লিখিএ, লেখে হোই বিনাস,
নানক, বড়া আখিএ আপে জানে আপ ॥ ২২ ॥
সালাহি সালাহি এতী সুরত ন পায়া,
নদীয়া অতে বাহ পবেহ্ সমুন্দ ন জানিয়েহ,
সমুন্দ সাহ সুলতান গিরহা সেতী মাল ধন,
কীড়ি তুল ন হোবনী জে তিস্ মনহ্ ন বিসরেহ্ ॥২৩॥

অর্থ

আকাশের উপর লক্ষ আকাশ, পাতালের নীচে লক্ষ পাতাল; অর্থাৎ ঊর্দ্ধে বা অধস্তলে যে দিকে দেখ; কিছুরই সীমা নাই।

চারি বেদ ক্রমিক বিচার করিয়া ক্লান্ত হইয়া অবশেষে এই নিশ্চয় করিয়াছে যে, ঈশ্বরের অন্ত নাই, তিনি জ্ঞানাতীত।

অষ্টাদশ সহস্র পুস্তক এই কথার বিচার করিয়াছে,* কিন্তু সকল পুস্তকেরই মূল তাৎপর্য্য এক; অর্থাৎ সকল পুস্তকেই স্বীকার করিতেছে যে, ঈশ্বর জ্ঞানাতীত। তাঁহার সৃষ্টির বর্ণনা কি সম্ভব, যে বর্ণনা করিবে? বর্ণনা করিতে করিতে জীবনান্ত হয়, বর্ণনার অন্ত নাই। নানক বলেন, বড় এই মাত্র বলিতে পার, যে তিনি আপনাকে আপনিই জানেন; ইহার অতিরিক্ত বলিবার সাধ্য মনুষ্যের নাই। ২২।

গায়কেরা তাঁহার স্তুতি গান করিয়া আসিতেছে, কিন্তু তাঁহার স্বরূপ বিদিত হয় নাই; তাহারা নদী নালার বিচরণ করিতেছে, সমুদ্রের বিষয় কিছুই জানেন না। যদি রাজার রাজ্য সমুদ্র তুল্য বিস্তৃত হয়, মান ও ধন পর্ব্বত সমান হয়, তথাপি যদি তাঁহার মন ঈশ্বরের প্রতি না থাকে, তবে সে কীটের তুল্যও নহে। ২৩।

* কথিত আছে যে মুসলমানদিগের অষ্টাদশ সহস্র ধর্ম্মপুস্তক বিদ্যমান আছে।

অন্ত ন সিফৎ কহন ন অন্ত,
অন্ত ন করণৈ দেন নঅন্ত,
অন্ত ন বেথন সুনন ন অন্ত
অন্ত ন জাপে কিয়া মন অন্ত,
অন্ত ন জাপে কীতা আকার,
অন্ত ন জাপে পাবাবাব,
অন্ত করণ কেতে বিললাহি,
তাকে অন্ত ন পায়ে জাহি,
এহু অন্ত ন জানে কোই,
বহুতা কহিএ বহুতা হোই।
বড়া সাহিব উচা থাঁউ,
উচে উপরি উচা নাউ,
এ বড় উচা হোবে কোই,
তিস্ উচে কো জানে সোই,
জে বড় আপ জানে আপি আপ,
নানক, নদরী করমী দাত ॥ ২৪ ॥

অর্থ

ঈশ্বরের গুণের অন্ত নাই, কহিয়া শেষ হয় না। তাঁহার কার্য্যের ও দয়ার অন্ত নাই। তাঁহার সৃষ্টি দেখিয়া এবং তাঁহার মহিমা শ্রবণ করিয়া শেষ হয় না। তাঁহার অভিপ্রায় কেহই মনোমধ্যে চিন্তা করিতে সক্ষম নহে। তিনি কত আকার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। সেই পারা-পারের অন্ত, চিন্তার বহির্ভূত। তাঁহার অন্ত পাইবার জন্য কত লোক কত চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু পাইতেছে না। তাঁহার অন্ত কেহই জানেন না; যতই অধিক চেষ্টা করা যায়, ততই গাঢ় প্রতীতি জন্মে, যে উহা জানিবার নহে। সেই প্রভু মহান্, তাঁহার স্থান উচ্চ, এবং তাঁহার নাম সর্ব্বোপরি উচ্চ। যদি কেহ ইহার অপেক্ষাও উচ্চ থাকে, তবেই মহান্ ঈশ্বরকে

বহুতা করম লিখিয়া ন জাই,
বড়্‌ দাতা তিল ন তমাই,
কেতে মংগে জোধ অপার,
কেতিয়া গণত নাহি বিচার,
কেতে খপ তুটে বেকার।
কেতে লৈলৈ মুকর পাহ্‌।
কেতে মুরখ খাহি খাহ্‌,
কেতিয়া দুখ ভুখ সদমার,
যহ্‌ ভী দাত তেরি, দাতার!
বন্দ খালাসী ভাণৈ হোই।
হোর্‌ অখন সকে কোই॥
জে কো খাই কু আখনি পাই,
ওহু জানে জেতীয়া মুহ্‌ খাই,
আপে জানে আপে দেই,
অখেহ্‌ সে ভী কেই কেই।
জিসনো বখসে সিফত সালাহ,
নানক, পাতসাহিঁ পাতসাহ্‌॥২৫॥

অর্থ

জানিতে সক্ষম। তিনি স্বয়ং যাহা তাহা, কেবল আপনি জানিতেছেন। নানক বলেন, মনুষ্য যাহা কিছু প্রাপ্ত হয়, সকলই তাঁহার কৃপা দৃষ্টি দ্বারা এবং নিজ কর্ম্মানুসারে পাইয়া থাকে। ২৪।

তাঁহার দয়া অনেক (সর্ব্বভূতে) গণনা হয় না। তিনি শ্রেষ্ঠ দাতা, তিল মাত্রও তমঃ (অর্থাৎ যশঃ ইত্যাদির লোভ) নাই। কত কত ব্যক্তি প্রভূত যুদ্ধ প্রার্থনা করিতেছে, কত লোক যে তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, তাহার সংখ্যা নাই। কত লোক বৃথা ভ্রমণ করিতেছে; কত

অমূল গুণ অমূল বাপাব, অমূল বাপারীএ অমূল ভাণ্ডাব,
অমূল আবেঁ অমূল লে জাই, অমূল ভাই অমূল সমাই,
অমূল ধরম, অমূল দিবান, অমূল তুল অমল পরবান,
অমূল বখ্‌সীস, অমূল নীসান, অমূল করম অমূল ফরমাণ।
অমুলো অমুল আখিয়া না জাই, আখি আখি রহে লিব লাই।
আখে বেদ পাঠ পুবাণ, আখে পড়ে করে বাখিয়ান,
আখে বরমে আখে ইন্দ, আখে গোপী তৈ গোবিন্দ,
আখে ঈসর আখে সিধ, আখে কেতে কীতে বুধ,
আখে দানব আখে দেব, আখে সুব নব মুনি জন সেব।
কেতে আখে আখণ পাহ্, কেতে কহ্ কহ্ উঠ উঠ জাহ্,
এতে কীতে হোব্ করেহ্, তাঁ আখ ন সকে কেই কেই।
যে বড ভাবে তে বড় হোই, নানক জানে সাচা সোই,
জে কো আখে বোল বিগাড়, তাঁ লিখিএ সিব গাবারাঁ গাবারা॥২৬॥

অর্থ

লোক তাঁহার অনুগ্রহ পাইয়াও অস্বীকাব কবিতেছে, অর্থাৎ কৃতজ্ঞ হইতেছে না; কত মূর্খ আহাব কবিয়া জীবন ধারণ করিতেছে। আবার দেখ কত লোক দুঃখ এবং ক্ষুধায় কষ্ট পাইতেছে; হে দাতা! এই ক্ষুধাদি দুঃখও তোমারই কৃপাদান। তোমাব কৃপাতেই (মোহরূপ) বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ হয়। ইহার অধিক আর কেহই বলিতে সক্ষম নহে।

যে ব্যক্তি পাপাচবণ দ্বাবা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, সেই জানে তাহাকে কত (মনস্তাপরূপ) দণ্ড ভোগ কবিতে হয়। ঈশ্বর স্বয়ং সকলেব অভাব জানিতেছেন এবং পূবণ করিতেছেন। পরন্তু সকলেই এতৎ সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিয়া থাকে। যাহাকে তাঁহার স্তুতি করিবাব গুণ প্রদান কবিয়াছেন, সে রাজার রাজা। (তাহাব অপেক্ষা ভাগ্যবান কে আছে?)॥ ২৫॥

[এই পদের প্রথমভাগে নানক সংসার প্রতিপালন কার্য্যেব সহিত বাণিজ্য ব্যাপারের তুলনা করিয়াছেন।] তাঁহাব গুণ ও বাণিজ্য (সংসার-কার্য্য) আশ্চর্য্য; সেই বণিকের ব্যাপারী ও ভাণ্ডার (অর্থাৎ ভক্ত ও

সে দর কেহা, সো ঘর কেহা, জিৎ বহি সরব সমালে ?
বাজে নাদ অনেক অসংখা, কেতে বাবণ হারে ?
কেতে রাগ পরি সিঁউ কহিঅন্ কেতে গাবনহারে ?
গাবে ভুহ্ নো পবন পাণি বৈসন্তর, গাবে রাজা ধরম দুয়ারে,

অর্থ

পণ্যদ্রব্য) অমূল্য। যে ব্যক্তি এই পবিত্র ভাণ্ডার লইবার জন্য আসেন এবং লাভ করিয়া যান, তিনিও অমূল্য। এই ভাণ্ডারে যে সকল সঞ্চিত পদার্থ আছে, তাহা অমূল্য এবং উহা বিক্রয়ের ভাউ (বা নিরখ) আশ্চর্য্য (অর্থাৎ পার্থিব দোকানের নিয়মমত উহা বিক্রয় হয় না।) বিচার এবং বিচারালয় লেখনী এবং হুকুম সকলই অমূল্য। তাঁহার পুরস্কার এবং নিসান, দয়া এবং আজ্ঞা সকলই অমূল্য। কতই যে অমূল্য পদার্থের তিনি অধিকারী তাহার বর্ণন হয় না, বর্ণন করিতে করিতে তাঁহার ধ্যানে লিপ্ত থাকিতে হয়। বেদ, পাঠ, পুরাণ তাঁহাকেই বর্ণনা করিতেছে, বিদ্বানলোক পাঠ করিতে করিতে তাঁহাকেই ব্যাখ্যা করিয়া থাকে। ব্রহ্মা, ইন্দ্র, গোপী, গোবিন্দ, শিব, সিদ্ধ, কত কত বুদ্ধিমানলোক (অথবা কত কত বুদ্ধদেব) দানব, দেব, সুরলোক, নরলোক, মুনিগণ এবং ভক্তগণ তাঁহারই গুণ বর্ণন করিয়া থাকেন। কত ব্যক্তি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাঁহার গুণ বর্ণন করিতেছে। কতলোক করিতে করিতে ক্লান্ত হইতেছে (সীমা পাইতেছে না)। আরও কতই চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু কেহই তাঁহাকে বর্ণনা করিতে সক্ষম হইতেছে না। তাঁহার পক্ষে যত কিছু কল্পনা কর, সকলই সম্ভব। নানক বলেন, সেই ঈশ্বর সত্যস্বরূপ। যে কেহ বলে যে তাঁহাকে জানিয়াছি, তাহার বাক্য মিথ্যা এবং তাহাকে মূর্খ মধ্যে মূর্খপ্রধান গণনা করা উচিত। ২৬।

সেই দ্বার কোথায়, সেই ঘরই বা কোথায়, যেখানে বসিয়া ঈশ্বর সমস্ত জগত রক্ষা করিতেছেন ! অসংখ্য বাদ্য বাজিতেছে, বাদক কত জন ? অর্থাৎ প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু তাঁহার মহিমা বাদ্য বাজাইতেছে, কে তাহাদিগকে গণনা করিতে সক্ষম ? কত রাগ রাগিণীর সহিত তাঁহার গুণ গীত হইতেছে, গায়কদিগের সংখ্যা কত, কে গণনা করিবে ?

গাবে চিতগুপ্ত্‌ লিখ জানে, লিখ লিখ ধরম বিচারে।
গাবে ঈসর বরমা দেবী সোহন্‌ সদা সবারে,
গাবে ইন্দ ইন্দাসন বৈঠে দেবতীয়াঁ দর নালে,
গাবে সিধ সমাধি অন্দর গাবে সাধ বিচাবে,
গাবে জতী সতী সন্তোখী গাবে বীব করারে,
গাবে পণ্ডিত পঢ়ন রিখীসব জুগ জুগ বেদাঁ না লে,
গাবে মোহনীয়াঁ মনমোহনী সুরগা মছ পইয়ালে,
গাবে রতন উপায়ে তেবে অঠসঠী তীরথ লালে,
গাবে জোধা মহাবল সূরা, গাবে খাণী চারে,
গাবে খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ডা কব কর রখে ধারে,
সোই তুধ নোগবে জো তুধ ভাবে, রতে তেরে ভগত রসালে,
হোব্‌ কেতে গাবে সে সৈ চিত্ত ন আবে, নানক কিয়া বিচারে॥

অর্থ

হে ঈশ্বর, জল বায়ু অগ্নি তোমাবই মহিমা গান কবিতেছে; ধর্ম্মরাজ যম তোমার দ্বারে তোমারই মহিমা গান কবিতেছেন; চিত্রগুপ্ত জীবের কর্ম্মের হিসাব রাথিয়া এবং ধর্ম্মসংগত বিচাব পূর্ব্বক তোমাবই মহিমা প্রকাশ করিতেছেন; শিব, ব্রহ্মা এবং দেবী পার্ব্বতী, সর্ব্বদা সুন্দর অলঙ্কারে শোভিত হইয়া, তোমাবই মহিমা গান কবিয়া থাকেন। ইন্দ্র দেবীগণে পরিবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রাসনোপবি বসিয়া তোমাব স্তুতিগান করিতেছেন। সিদ্ধগণ সমাধির মধ্যে, এবং সাধুলোক জ্ঞানালোচনাব মধ্যে তোমাবই মহিমা গান করিয়া থাকেন। যতি (ইন্দ্রিয় সংযমী), সতী এবং সন্তোষী (অর্থাৎ সংসার মায়া পরিত্যাগে যাহাব নিত্য আনন্দ হৃদয়) এবং সাহসী বীবগণ তোমার গুণ গান করিতেছেন; পণ্ডিত ও মহর্ষিগণ চারিবেদের মধ্যে তোমাকে পাঠ করিয়া যুগ যুগ তোমাব মহিমা গান করিতেছেন; স্বর্গ মর্ত্ত পাতালে মনমোহিনীগণ তোমার গুণ গান করিতেছে। তোমারই সৃষ্ট রত্ন-সমূহ ৬৮ তীর্থের সহিত তোমার গান করিতেছে; যোদ্ধা মহাবলবীরগণ

সোই সোই সদা সচ, সাহিব সাচা, সাচা নাঁই,
হৈ ভী হোসী, জাই ন জাসী, রচনা জিনি রচাই।
রঙ্গী রঙ্গী ভাঁতি কর কর জিন্সাঁ জিন উপাই,
কর কর বেখে কীড়া আপনা, জিব তিসদী বড়িয়াই।
জো তিস্ ভাবে সোই করসী, হুকম ন করনা জাঁই,
সো পাতসাহ্, সাহাঁ পাতি সাহিব, নানক, রহণ বজাই ॥২৭॥

অর্থ

এবং চারি প্রকারে উৎপন্ন জীব সকল * তোমার মহিমা গান করিতেছে; পৃথিবীর খণ্ড সকল, রাশিমণ্ডল এবং ব্রহ্মাণ্ড, যাহাদিগকে তুমি হস্তে ধারণ করিয়া রক্ষা করিতেছ, সকলেই তোমার মহিমা গান করিতেছে। যে তোমার ভক্ত তোমাতেই অনুরক্ত হইয়া তোমার ভাবনা করে, সেই তোমার গুণ গান করিয়া থাকে। আর কত সৃষ্টবস্তু তোমার মহিমা গান করিতেছে, তাহা আমি চিত্তে অনুভব করিতেও সক্ষম নহি; তাহার বিচার বা গণনা কে করিবে? তিনিই সত্য, তাঁহার প্রভুতা সত্য, তাঁহার নাম সত্য; যে মহাপুরুষ এই জগৎ রচনা করিয়াছেন, তিনি বিদ্যমান আছেন, এবং ভবিষ্যতেও থাকিবেন। নানা রঙ্গের নানা প্রকারদ্রব্য এবং মায়া তিনি সৃজন করিয়াছেন †; তিনি আপনার কীর্ত্তি আপনই নিরীক্ষণ করিতেছেন, ‡ তাঁহার মহিমা অনন্ত। তিনি যাহা মনে করেন, তাহাই সম্পন্ন করেন, তাঁহার আজ্ঞার বিপরীত কার্য্য করিতে কেহই সক্ষম নহে। তিনি রাজা, রাজার রাজা, প্রভু; সকল জগৎ তাঁহারই ইচ্ছায় স্থিতি করিতেছে। ২৭।

---

* স্বেদজ, অণ্ডজ, জরায়ুজ এবং উদ্ভিজ্জ।

† "জিন্সাঁ" মায়া ইহার অর্থ কেহ কেহ "মায়াময় জিনিস" এইরূপ করিয়া মায়াবাদের পোষকতা করিয়াছেন।

‡ ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যেমন কোন কারিগর স্বীয় নির্ম্মিত বস্তুকে বারংবার নিরীক্ষণ পূর্ব্বক তাহার পূর্ণতা সম্পাদন করে, সেইরূপ ঈশ্বর তাঁহার সৃষ্ট পদার্থের কোন অংশ অসম্পূর্ণ রাখেন নাই।

মুন্দা সন্তোষ, সরম পত ঝোলি, ধিয়ান কী করে বিভুতি,
খিন্থা কালকুয়ঁারি কায়া, জুগতি ডণ্ডা পরতীত।
আয়ী পন্থা সগল জমাতী, মন জীতে জগ জীত॥
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি, জুগ জুগ একো বেস॥ ২৮॥
ভুগতি গিয়ান, দয়া ভণ্ডারণ, ঘট ঘট বাজে নাদ,
আপি নাথ, নাথী সভ জাকি, রিধি সিধি ঊরা সাদ।

অর্থ

[নানক এই দুই পদে যথার্থ যোগীর লক্ষণ কহিতেছেন।] সন্তোষ তাঁহার মুদ্রা বা কর্ণবেধ, লজ্জা এবং প্রতিষ্ঠা তাঁহার ঝুলি, ধ্যান তাঁহার ভস্ম লেপন, কালের সহিত অবিবাহিত অর্থাৎ মৃত্যু ভয় শূন্য দেহ তাঁহার আবরণ কান্থা; এবং যুক্তি ও পরমাত্মার প্রতীতি বা বিশ্বাস তাঁহার আশ্রয় দণ্ড। (প্রকৃত যোগীর বাহিক ঝুলিদণ্ড প্রভৃতির প্রয়োজন নাই) মনোজয় করিতে পারিলেই জগত জয় করা হইল, এই নিয়ম সকল সম্প্রদায়ের একমাত্র শ্রেষ্ঠ পন্থা।

নমস্কার, সেই প্রভুকে নমস্কার, যিনি অনাদি পুরুষ, নির্ম্মল বা গুণহীন, অনাদি, অক্ষয় এবং নিত্য একভাবে স্থিত॥ ২৮॥

যথার্থ যোগী পরমাত্মার দয়ারূপ ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান ভিক্ষা করিয়া থাকেন, (কাহারও নিকট অন্য বস্তু ভিক্ষা করেন না)। তাঁহার শঙ্খ-নাদের আবশ্যক নাই, কারণ প্রত্যেক সৃষ্ট বস্তু হইতে পরমাত্মার মহিমা বাদ্য বাদিত হইতেছে। সমস্ত জীব যাহার আশ্রিত, সেই পরমপুরুষই ঈদৃশ যোগীর একমাত্র প্রভু, অর্থাৎ তিনি অন্য কাহারও অধীন নহেন। ঋদ্ধি বা সিদ্ধি অন্যের পক্ষে, অর্থাৎ তিনি ঋদ্ধি বা সিদ্ধির প্রয়াসী নহেন। সেই প্রকৃত যোগী আপনার ভাগ্যলিপি অনুসারে সংযোগ এবং বিয়োগ এই দুই অনুচরের দ্বারা সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন (অর্থাৎ তিনি অন্য "চেলা" রাখেন না)। সেই পরমাত্মাকে নমস্কার, যিনি আদি, অনাদি, অনীল, অক্ষয়, এবং যুগ যুগ এক বেশধারী॥ ২৯॥

সংযোগ বিযোগ দুই কার চলাবে লেখে আবে ভাগ ॥ *
আদেশ তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জুগ একো বেস ॥ ২৯ ॥
একা মাই, জুগতি বিয়াই, তিন চেনে পরবাণ,†
ইক সংসারী, ইক ভণ্ডারী, ইক লায়ে দিবান।
জিঁব তিস্ ভাবৈ, তিঁব চলাবৈ, জিঁব হোবৈ ফরমাণ,
ওহু বেখে, ওনা নদরী ন আবৈ, বহুতা এহু বিড়াণ।
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জুগ একো বেস ॥ ৩০ ॥

অর্থ

এক মাতা তিনজন‡ অনুচরকে সাক্ষীস্বরূপ রাখিয়া যুক্তির সহিত এই জগৎ প্রসব করিয়াছেন। ঐ তিন অনুচরের মধ্যে একজন সংসারী, একজন ভাণ্ডারী এবং একজন বিচার কর্ত্তা। তাঁহার ইচ্ছা ও আজ্ঞামাত্র ঐ অনুচরেরা সমস্ত সম্পাদন করিয়া থাকে। তিনি সকলকে দেখিতেছেন, কিন্তু তাঁহাকে কেহ দেখিতে পায় না, এ বড় বিড়ম্বনা। হে ঈশ্বর তোমাকে নমস্কার ইত্যাদি ॥ ৩০ ॥

---

* সংসারের সমস্ত কার্য্যই সংযোগ এবং বিয়োগ, অর্থাৎ সৃষ্টি এবং ধ্বংস সম্ভূত। যোগী ঐ সংযোগ বিয়োগরূপ উপায় অবলম্বন করিয়াই উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকেন। পরন্তু তিনি কর্ম্ম বা ভাগ্যলিপির অধীন। গুরু নানকের মতে পরমাত্মার কৃপা ব্যতীত কেহই কর্ম্ম হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

† মায়াবাদী অর্থ করিয়াছেন, এক পরমাত্মা মায়ার সহিত ব্রহ্মার সংযোগ ঘটাইয়া জগৎ প্রসব করিয়াছেন।

‡ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, এবং রুদ্র নামা ত্রিগুণ অবলম্বন করিয়া জগৎমাতা জগৎ প্রসব করিয়াছেন; তন্মধ্যে ব্রহ্মা বা রজোগুণ সংসার সৃজন কার্য্যে ব্যাপৃত, বিষ্ণু বা সত্বগুণ পালন কার্য্যে ব্রতী এবং রুদ্র বা তমোগুণ জীবের কর্ম্ম পর্য্যবেক্ষণ পূর্ব্বক দণ্ড পুরস্কার প্রদান করিতেছেন।

আসন লোঅ লোঅ ভণ্ডার,
জো কিছু পায়া সু একবার,
কর কর বেখে সিরজন হার,
নানক, সচে কী সাচী কার।
আদেস তিসৈ আদেস,
আদি অনীল অনাদি অনাহতি জুগ জুগ একো বেস॥ ৩১॥
ইকদূ জীভো লখ হোবে, লখ হোবে লখ বীস,
লখ লখ গেড়া আখিএ ইক নাম জগদীস।
এতুরাহ্ পত পৌড়িঁয়াঁ চঢিএ হোই ইকীস?
সুনি গলাঁ আকাস কী কীটা আয়ী রীস।
নানক, নদরী পাইয়ে, কুড়ী কুড়ে ঠীস*॥ ৩২॥

অর্থ

তাঁহার আসন ও ভাণ্ডার লোক সকল অর্থাৎ ত্রিলোকব্যাপী; জীব যাহা কিছু ঐ ভাণ্ডার † হইতে প্রাপ্ত হয়, তাহা একেবারেই প্রাপ্ত হয়; সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর সৃষ্টি করিয়া উহাকে নিরীক্ষণ করিতেছেন, অর্থাৎ অভাব পূরণ করিতেছেন, কদাচ বিস্মৃত হয়েন না। নানক বলেন, সেই ঈশ্বর সত্য, তাঁহার কার্য্যও সত্য। ঈশ্বরও তাঁহার সৃষ্টি কিছুই অসত্য বা মায়া নহে॥ ৩১॥

এ জিহ্বা যদি দুই হয়, অথবা যদি লক্ষ বা বিংশতি লক্ষও হয়, এক জগদীশ নাম যদি লক্ষ লক্ষ বার উচ্চারিত হয়, তাহাতেই বা কি হইবে? এই উচ্চ সিঁড়ির কএকটী মাত্র ধাপ চড়িয়া বা কি হইবে? আকাশের ‡

* ঠীস=আত্মগরিমা। ইহা পারস্য শব্দ।

† ইহার অর্থ দুই প্রকারে করা হইয়াছে। ১। ঈশ্বরের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পরিপূর্ণ, যাহার যাহা অভাব একবারেই প্রদত্ত হয়। ২। সকল জীব এক সময়েই ঈশ্বরের অনুগ্রহ ভোগ করে, জাতি বা ব্যক্তি বিশেষে অগ্র পশ্চাৎ নাই।

‡ ঈশ্বরের মহিমা বর্ণনের শেষ নাই, মেঘ গর্জ্জন শুনিয়া শ্লাঘাপূর্ব্বক কীটের ঝিল্লিরব যেমন হাস্যাস্পদ, ঈশ্বরের গুণ কথন বিষয়ে মনুষ্যের চেষ্টাও সেইরূপ।

আখ ন জোর, চুপে নহ জোর,
জোরি ন মাংগন, দেন ন জোর,
জোর ন জীবন, মরণ নহ জোর,
জোর ন রাজ, মাল মনি সোর,
জোর ন সুরতি গিয়ান বিচার,
জোর ন জুগতি ছুটে সংসার,
জিস হথ জোর কর বেখে সোই,*
নানক, উত্তম নীচ ন কোই ॥ ৩৩ ॥
রাতী রুতী থিতি বার,
পবন পানি অগ্নি পাতাল,
তিস্ বিচ ধরতী থাপ রখী ধরমসাল। †

অর্থ।

গর্জ্জন শুনিয়া কীটের হিংসা হইয়াছে। নানক বলেন, তাঁহার কৃপা দৃষ্টিতে সকলই প্রাপ্য, নতুবা মিথ্যাবাদীর আত্ম গরিমা মাত্র ॥ ৩২ ॥

স্তব বা সমাধির শক্তি নাই যে ঈশ্বরকে প্রাপ্ত করে; তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবার বা তাঁহার দয়ার উপর বল প্রয়োগ করিবার শক্তি মনুষ্যের নাই, অর্থাৎ তিনি প্রসন্ন হইয়া ইচ্ছামত কৃপা করিয়া থাকেন। জীবন বা মরণের উপর, রাজ্যধন বা প্রভুতার উপর এবং সুরতি (অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রেম), জ্ঞান এবং বিচারের উপর মনুষ্যের বল খাটে না। সংসার বন্ধন হইতে পরিত্রাণ পাইবার উপায় বা যুক্তি বলপূর্ব্বক প্রাপ্য নহে। যাহার হস্তে শক্তি আছে, নিজ শক্তি চালনা করিয়া দেখুক। নানক বলেন, ঈশ্বর-সমীপে নীচ বা উচ্চ কেহ নাই, অর্থাৎ সকলেই সমান হীনবল ॥ ৩৩ ॥

রাত্রি, ঋতু, তিথি, বার, বায়ু, জল অগ্নি এবং পাতাল সৃষ্টি করিয়া

* যাহার হস্তে শক্তি আছে, সে নিজ শক্তি চালনা করিয়া উহার বিফলতা হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে; এ বিষয়ে উত্তম এবং নীচের প্রভেদ নাই, সকলেরই শক্তি সমান অকার্য্যকরী। নিজের শক্তির বিফলতা দেখিয়াই ঈশ্বরের শক্তি জীবের হৃদয়ঙ্গম হয়।

† এই পৃথিবী ধর্ম্মশালা অর্থাৎ ধর্ম্ম শিক্ষা ও ধর্ম্মআচরণের স্থান।

তিস্ বিচ জীব জুগতি কে রংগ,
তিনকে নাম অনেক অনন্ত।
করমী করমী হোই বিচার
সচা আপ সচা দরবার।
তিথে সোহন পঞ্চ পরবাণ
নদরী করম পবৈ নীসান।
কচ পকাই উথে পাই
নানক, গয়া জাপৈ জাই॥ ৩৪॥
ধরম খণ্ড কা এহো ধরম
গিয়ান খণ্ড কা আখে করম।
কেতে পবন পানি বৈসন্তর, কেতে কান মহেস,
কেতে বরমে খাতে ঘড়িএ রূপ রঙ্গ কে বেন।

অর্থ।

তন্মধ্যে এই পৃথিবীকে ধর্ম্মশালারূপে স্থাপিত করিযাছেন। সেই পৃথিবীর মধ্যে জীব ও যুক্তি নানাবর্ণের এবং তাহাদের নামও অসংখ্য। সেই ধর্ম্মশালাস্বরূপ পৃথিবীব মধ্যে কর্ম্মীদিগেব কর্ম্মেব বিচাব হইতেছে, কাবণ ঈশ্বব স্বয়ং ন্যায়স্বরূপ এবং তাঁহার বিচাবালয় ন্যাযযুক্ত। সেই বিচাবালয়ে সাধুলোক প্রমাণ স্বরূপ শোভা প্রাপ্ত হয়, এবং তাঁহার দৃষ্টিতে সৎকর্ম্ম সম্মান প্রাপ্ত হয়। কে কাঁচা কে পাকা সেইখানেই স্থিব হয় †, সেইখানে গিয়াই সকল কথা জানা যায়॥ ৩৪॥

ধর্ম্ম খণ্ডের ধর্ম্ম এইরূপ। এক্ষণে জ্ঞান খণ্ডেব কর্ম্ম নিম্নে কথিত হইতেছে। সেখানে কত পবন, বরুণ, অগ্নি, কানু (কৃষ্ণ), মহেশ (মহাদেব) রহিয়াছে কে গণনা করিবে? সেখানে কত কত ব্রহ্মা নানাপ্রকার সৃষ্ট কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

---

* জয়পতাকা বা চিহ্ন প্রাপ্ত হয়।

† পরমাত্মা অন্তর্যামী, তাঁহার নিকট পাপ পুণ্য অবিদিত থাকে না।

কেতয় করম্ম ভুমি, মের কেতে, ধূ উপদেস,*
কেতে ইন্দ চন্দ সুর কেতে, কেতে মণ্ডল দেস।
কেতে সিধ বুধ, নাথ কেতে, দেবী বেস।
কেতে দেব দানব, মুনি কেতে, কেতে রতন সমুন্দ,
কেতীয়া খাণী, কেতীয়া বাণি, কেতে পাত নবিন্দ, †
কেতীয়া সুরতী, সেবক কেতে, নানক, অন্ত ন অন্ত ॥ ৩৫ ॥
গিয়ান খণ্ড মহি গিয়ান প্রচণ্ড,
তিথে নাদ বিনোদ কোড় অনন্দ।
সরম খণ্ড কী বাণি রূপ,
তিথৈ ঘাঢ়ত ঘড়িএ বহুত অনুপ।
তাঁ কীয়া গলাঁ কথিয়াঁ ন জাই,
জে কো কহে পিছে পছতাই।
তিথে ঘড়িএ সুরতি মতি মন বুধ,
তিথে ঘড়িএ সুরাঁ সিবাঁ কী সুধ ॥ ৩৬ ॥ ‡

অর্থ।

সেখানে কর্ম্মভূমি, মেরু, ধ্রুব, উপদেশ,* ইন্দ্র, চন্দ্র, দেবতা, গ্রহ, দেশ, সিদ্ধ, বুদ্ধ, নাথ, দেব, দেবী, দেব, দানব, মুনি, রত্ন, সমুদ্র, খাণি, ভাষা, উচ্চপদ, মহারাজা, ধর্ম্ম সম্প্রদায় এবং উপাসক. এই সকল কত কত রহিয়াছে, তাহার অন্ত নাই, অন্ত নাই ॥ ৩৫ ॥

জ্ঞানখণ্ডের মধ্যে জ্ঞান প্রচণ্ড প্রদীপ্ত রহিয়াছে। সেখানে নানা-

---

* ধূ উপদেশ অর্থে "ধ্রুবের ন্যায় উপদেষ্টা" কেহ কেহ বুঝিয়াছেন।

† খাণী = স্বেদজ অণ্ডজ প্রভৃতি জীব সকল।

‡ নানক মানব শিক্ষা দুই ভাগে বিভাগ করিয়াছেন; (১) কর্ম্ম বা শ্রমকাণ্ড, (২) জ্ঞান বা ধর্ম্মকাণ্ড। পরমাত্মার নাম শ্রবণ মনন প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ডের অন্তর্গত; তাঁহার অসীম ভাব উপলব্ধিকরণ জ্ঞান কাণ্ডের অন্তর্গত।

করম খণ্ড কী বাণি জোর, তিথে হোর ন কোই হোর।
তিথে জোধ মহাবল সূব, তিন মহিরাম রহিয়া ভরপুর।
তিথে সীঁতো সীতাঁ মহিমা মাহি, তাঁকে রূপ ন কথনে জাই।
না উহ্ মরে ন ঠাগে জাহি, জিনকে বাম বসে মন মাহি।
তিথে ভগত বসে কে লোঅ, করে অনন্দ সচা মন সোহ।
সচ খণ্ড বসে নিরংকার, কর কর বেখে নদর নিহাল।
তিথে খণ্ড মণ্ডল বরভণ্ড, জে কো কথে ত অন্ত ন অন্ত।
তিথে লোঅ লোঅ আকার, জিবঁ জিবঁ হুকম, তিবঁ তিবঁ কার।
বেখে বিগসে কর বিচার, নানক, কথনা করড়া সার ॥৩৭॥

অর্থ।

প্রকার আহ্লাদ আমোদ এবং কোটী কোটী প্রকার আনন্দ উপভোগ হইতেছে।

শ্রমখণ্ডের বর্ণনা সৌন্দর্য্য; সেখানে নানা অনুপম দ্রব্য গঠিত হইতেছে; উহার বর্ণনা বাক্যের অতীত, যদি কেহ বর্ণনা করিতে চেষ্টা করে, সে শীঘ্রই নিজ অজ্ঞানতা উপলব্ধি করিয়া বিরত হয়। ইহাতে স্মৃতি মতি মনঃ বুদ্ধি পরিমার্জ্জিত হয়; ইহাতে সুর এবং সিদ্ধগণের জ্ঞানের উদয় হয় ॥ ৩৬ ॥

কর্ম্মখণ্ডের বর্ণনা শক্তি-সাক্ষেপ অর্থাৎ কঠিন। সেখানে যাইতে সকলের সাধ্য নাই। যে সকল মহাবল সুরের অন্তঃকরণে পরমাত্মা পূর্ণ বিরাজ করিতেছেন, তাঁহারাই সেখানে অবস্থান করেন। তাঁহার মহিমার মধ্যে এতাদৃশ শান্তি একত্রীভূত হইয়া রহিয়াছে, যে তাহার স্বরূপ বর্ণন অসাধ্য। যাহার মনোমধ্যে পরমাত্মা বিরাজ করেন, তাহার মৃত্যু বা বঞ্চনার ভয় নাই। সেখানে (কর্ম্মখণ্ডের মধ্যে) ভক্তলোক বাস করে, এবং মনঃ-শুদ্ধির সহিত আনন্দ উপভোগ করে। সত্য খণ্ডের (জ্ঞানখণ্ডের অপর নাম) মধ্যে নিরাকার পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন, এবং তথায় (সৎ-পুরুষের) সৃষ্টি করিয়া কৃপাদৃষ্টি দ্বারা সুখী করিতেছেন। সেই সত্য-খণ্ডের মধ্যে খণ্ড, মণ্ডল এবং ব্রহ্মাণ্ড বিদ্যমান রহিয়াছে, উহার বর্ণনার

জত্ হাপরা, ধীরজ সুনীয়ার,
অহরণ মতি, বেদ হতিয়ার
ভউ খলা, অগ্নি তপ তাউ,
ভন্ডা ভাউ, অমৃত তিত ঢাল,
ঘড়িএ সব্দ, সচী টকসাল।
জিন কো নদর করম তিন কার,
নানক, নদরী নদর নিহাল ॥ ৩৮ ॥

উপসংহার শ্লোক।

পবন গুরু, পানি পিতা, মাতা ধরতী মহৎ,
দিবস রাতী দুই দাই দাইয়া, খেলে সগল জগত।

অর্থ।

শেষ নাই। সেখানে অনেকানেক লোক, অনেকানেক আকার বিদ্যমান আছে। পরমাত্মার আদেশানুসারে তথায় কার্য্য হইতেছে। তিনি বিচার পূর্ব্বক দেখিয়া প্রফুল্লিত হইতেছেন। নানক বলেন সেই জ্ঞানখণ্ডের বর্ণনা অতি কঠিন ব্যাপার। ৩৭।

[নানক এই পদে ধর্ম্মসাধন উপায়কে অলঙ্কার প্রস্তুতকারী স্বর্ণকারের কার্য্যের সহিত উপমা দিতেছেন।]

ইন্দ্রিয় সংযম ইহার হাপর বা ভাঁটী; ধৈর্য্য বা শান্তি ইহার স্বর্ণকার; মতি বা সুবুদ্ধি ইহার আহরণ লৌহ (vise); বেদ বা সত্যজ্ঞান ইহার কার্য্যযন্ত্র; ভয় ইহার বায়ু নিষ্পেষক চর্ম্মযন্ত্র; তপ ইহার অগ্নিতাপ; ঈশ্বরভক্তি সাঁচা (mould), উহাতে কর্ম্মী অমৃত হয়; পরমাত্মার নামরূপ গালিত স্বর্ণ ঢালিয়া শব্দরূপ (ঈশ্বর ভজন) অলঙ্কার প্রস্তুত করেন। সত্যজীবন ইহার টাকশাল বা কর্ম্মগৃহ। যাহার প্রতি পরমাত্মার কৃপাদৃষ্টি থাকে, তাহারই ঐ অলঙ্কার প্রস্তুত কার্য্য সফল হয়। তাঁহার কৃপাতেই কর্ম্মী চরিতার্থ হয় অর্থাৎ জ্ঞাননেত্র উন্মীলিত হইলে পরমানন্দ উপভোগ করে॥৩৮॥

বায়ু গুরুস্বরূপ, জল পিতা স্বরূপ, পৃথিবী গরীয়সী জননী স্বরূপ, দিবা

চংগিয়াইয়াঁ বুরিয়াইয়াঁ বাচে ধরম ইদুর
করমী আপো আপনি, কে নেড়ে কে দূর।
জিনী নাম ধিয়াইয়া, গয়ে মুস্‌কত ঘাল,
নানক, তে মুখ উজলে, কেতী ছুটী নাল * ॥ ৩৯ ॥

অর্থ।

এবং রাত্রি রূপিণী দুই ধাত্রী সকল জগতকে খেলাইতেছে অর্থাৎ প্রকাশিত করিতেছে। ধর্ম্মেই পরমাত্মার নিকট জীবের উত্তম ও অধম কর্ম্ম সকল জ্ঞাপন করে। শীঘ্রই হউক বা বিলম্বেই হউক, জীব স্ব স্ব কর্ম্মফল ভোগ করে। যাঁহারা সেই পরমাত্মাব ধ্যান করেন, তাঁহাদের সকল বিপদ দূর হয়, এবং অনির্ব্বচনীয় আনন্দের সহিত তাঁহাদের মুখ উজ্জল হয় ॥ ৩৯ ॥

জপজী সমাপ্ত।

মূর্খ।

ত্রিংশৎ অধ্যায়।

যে যুবক, মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সঙ্গে রমার কুটীরে প্রবেশ করিয়া ছিলেন তাঁহার নাম ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য। ভূতনাথই গ্রামের সেই মূর্খ। ভূতনাথ মাতার নিকট বিদায় লইয়া ঢাকা গমন করেন, তাহার পর আর কোন সংবাদ নাই। সুতরাং তাহার পর কি হইল, তিনি কি করিলেন, তাহাই বিবৃত করা এ অধ্যায়ের উদ্দেশ্য।

পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে ভূতনাথের একজন আত্মীয় নিজ কার্য্যে ঢাকা যান—ভূতনাথও সেই সঙ্গে যান। ঢাকায় অপরিচিত লোকের থাকিবার

* কেহ অর্থ করিয়াছেন, সেই মহাত্মাদিগের সঙ্গ করিয়া কত কত লোক সংসার বন্ধন ছেদন করিতে সমর্থ হয়।

স্থান—নৌকা; সহজে বাড়ী ভাড়া পাওয়া যায় না, অথবা বাসায়ও কেহ স্থান দেয় না। যে কয়দিন ভূতনাথের আত্মীয় ঢাকায় ছিলেন, সে কয়দিন সে নৌকাতেই ছিল; তাহার পর আত্মীয় ভূতনাথকে বলিলেন—"ভূতনাথ বাড়ী চল, ঢাকা বড় বদ যায়গা, থাকিবার স্থান হবে না।" ভূতনাথ বলিল "স্থান হবে, আপনার কোন ভয় নাই—বাড়ী যান—মাকে বলিবেন—আমার এখানে সুবিধা হইবে।" আত্মীয় আর বিশেষ পীড়াপীড়ি না করিয়া নৌকা ছাড়িয়া দেশে চলিলেন। যতক্ষণ সেই নৌকা দেখা গেল, ভূতনাথ তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। নৌকা অদৃশ্য হইলে, একটী দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িয়া সহরে প্রবেশ করিল। ভূতনাথ যে সাহস করিয়া ঢাকায় আসিয়াছিল, ঢাকার অবস্থা দেখিয়া তাহা অন্তর্হিত হইল। হায়, সুন্দর সুশীল, ত্রয়োদশ বর্ষীয় ব্রাহ্মণকুমার সমস্ত ঢাকা প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত ঘুরিয়া বেড়াইল। অনাহারে ম্লান মুখে কত হিন্দু, কত ব্রাহ্ম, কত সদাশয়, কত দাতা, কত উদার লোকের কৃপা প্রার্থনা করিল, কাহারই কৃপা হইল না। ভাবিল, একি জীবন্ত নরকে আসিলাম! হায় বিদ্যা শিক্ষা করিতে আসিয়া এখন যে অনাহারে প্রাণ যায়! মনের হুতাশে ও পেটের ক্ষুধায় ভূতনাথ নদী তীরে বসিয়া কান্দিতে লাগিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে ঢাকার অনেক ভদ্রলোক ও স্কুলের বালক নদীতীরে বেড়াইতে আসেন। আশ্চর্য্য কত লোক বেড়াইতেছে—আসিতেছে—যাইতেছে—কিন্তু ভূতনাথের ক্রন্দনে কেহই কর্ণপাত করিতেছে না—ভূতনাথের বোধ হইতে লাগিল সকলেই যেন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়া যাইতেছে—"দেখ্ তুই কেমন গরীব—আর দেখ্ আমি কেমন বড় মানুষ, বুট পায়ে কেমন মচ্ মচ্ করিয়া চলিয়া যাইতেছি।"—ভূতনাথ ভাবিতেছে, ঢাকা শ্মশান, ঢাকার লোক কলের পুতুল, চলে হাসে, কিন্তু প্রাণ নাই; প্রাণ থাকিলে প্রাণে বাজিত—হায়! গ্রামে এক বিশ্বনাথ! ঢাকায় সব বিশ্বনাথ!

এই সময় একটী ভদ্রলোক স্বর্ণচসমা চক্ষে এক হাতে ছড়ি, আর এক হাতে একটী বালিকার অঙ্গুলি ধরিয়া ধীরে ধীরে সেই দিক দিয়া যাইতেছিলেন। বালিকাটীর বয়স ৭ বৎসর। ভদ্রলোকটীর উচ্চ চক্ষু দরিদ্র

ভূতনাথের উপর পড়িল না। কিন্তু বালিকা তাহাকে দেখিয়া বলিল—"বাবা ও কে?"

"ও স্কুলের ছেলে।"

"না বাবা ও কাঁদচে কেন?"

"কোন বালকের সঙ্গে হয়ত মারামারি করেছে।"

"না বাবা ওর জামা নেই, যুত নেই—ও গরীব, বুঝি খেতে না পেয়ে কাঁদ্‌চে।" পিতা এই কথা শুনিয়া বালিকাকে বলিলেন "চল ঘরে যাই।"

বালিকা না যাইয়া বলিল—"বাবা ওর বুঝি কেউ নাই, ওকে সুধাও না?" ভদ্রলোকটী বিরক্ত হইয়া ভূতনাথের নিকট যাইয়া ছড়ি চমকাই জিজ্ঞাসিলেন "হাঁ রে এখানে বসে কাঁদচিস্ কেন?" এ সম্বোধনে বালিকার হৃদয়ে আঘাত লাগিল—ক্ষুদ্র বালিকা একটু উচ্চৈস্বরে কহিল—"বাবা"—"বাবা।"

পিতা চাহিয়া দেখিলেন, বালিকার চক্ষে জল। বুঝিলেন—হাসিয়া বলিলেন "তুমি কাঁদিতেছ কেন?"

ভূতনাথ পিতাপুত্রীর মুখ পানে চাহিলেন—চক্ষের জল আরো বেশী ঝরিল—বলিল "আমার কেউ নাই, স্কুলে পড়িব বলে, এখানে এসেছি, হাতে পয়সা নাই—কোথাও স্থান হলো না—সারাদিন খাই নাই—এখন রাত হলো কি করি—কোথা যাই?"—এই বলিয়া আবো কাঁদিতে লাগিল।

ভদ্রলোকটী পকেট হইতে একটী দুয়ানী বাহির করিয়া বালিকার হাতে দিয়া বলিলেন "দাও।"—

বালিকা, পিতার মুখপানে বিষাদ নয়নে চাহিয়া রহিল—দুয়ানী ছুঁইল না।

পিতা জিজ্ঞাসা করিলেন—"কেন দিবে না?" বালিকা বলিল "বাবা দুয়ানীতে ওর কি হবে? আমিইত রোজ চারি আনার খাবার খাই।" বালিকার কথায় পিতা বিস্মিত, তাহা হইতে ভূতনাথ আরো বিস্মিত হইল। তাহার নীলার কথা মনে পড়িল। আরো মনে হইল নীলা ঠিক এমনই মিষ্ট কথা কয়।

এদিকে ভদ্রলোকটী বালিকাকে বলিলেন "তবে কি করিবে?"

"বাবা"—এই বলিয়া পিতার মুখপানে কাতর দৃষ্টে চাহিল। পিতা বলিলেন "বল মা—বল।"

বালিকা পিতার নিকট ছোট করিয়া বলিল "ওকে বাড়ী নে যাই বাবা,"—

পিতা কিছুকাল গম্ভীর বদনে চিন্তা করিলেন—পরে হাসিয়া বলিলেন "একটা লোক, সহজ যায়গায় রাখ্‌তে গেলে। কত খরচ তা জানিস ?"

বালিকা আবার ছোট করিয়া বলিল "আমি যে রোজ চার আনার খাবার খাই—তা আর আমায় দিও না।" শিশুর কথায় প্রাচীন পিতার চৈতন্য হইল, বুঝিলেন সাত বৎসরের বালিকা তাঁহা হইতে কত উচ্চ—তাঁহার মনে বালিকা আজ করুণাস্রোত ঢালিয়া দিল; তিনি ভূতনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন।

"তোমার নাম ?"

"শ্রীভূতনাথ শর্ম্মা—ভট্টাচার্য্য।"

"চল,আজ আমাদের বাসায় চল।"

বালিকার আর আনন্দের সীমা রহিল না। ভূতনাথ ধীরে ধীরে তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল।

একত্রিংশ অধ্যায়।

ভূতনাথ যাহার সঙ্গে চলিলেন তাঁহার নাম "বরদাপ্রসাদ রায়"। ইনি ঢাকায় নূতন উকিল হইয়া আসিয়াছেন। বরদা বাবু ব্রাহ্ম—ব্রাহ্ম বলিয়া গিপ্‌সি ব্রাহ্ম নহেন। দেশে ইঁহার মান সম্ভ্রম বাড়ী ঘর দ্বার সকলই আছে; দোল দুর্গোৎসব সকলই হয়। কিন্তু বিশ্বাস ব্রাহ্মধর্ম্মে—তাই নগরে ব্রাহ্ম—দেশে হিন্দু। কিন্তু হিন্দু হইলেও কোন স্বজাতীয় ব্রাহ্মের সুশিক্ষিতা ও বয়োধিকা কন্যা বিবাহ করিয়াছেন। নিজের ও পরিবারের

উভয়েরই চরিত্র নির্ম্মল। বরদা বাবুর বয়স প্রায় ৩৯ বৎসর হইয়াছে। এই বয়সে একটী পুত্র ও একটী কন্যা। পুত্রের নাম কমলা, বয়স বার বৎসর। পুত্রীর নাম অমলা, বয়স সাত বৎসর। উভয়েই স্কুলে পড়ে। বাড়ীতেও দু বেলা শিক্ষক আসিয়া পড়াইয়া যায়। বরদা বাবু মেয়েটীকে বড় ভাল বাসেন—তাই অনেক সময় তাহার কোমল অত্যাচার সহিয়া থাকেন—আজিও সহিলেন। তারই অত্যাচারে আজ একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান দুটী অন্ন পাইবার তরে তাঁহার বাসায় আসিল।

বরদা বাবু বাসায় আসিয়া স্ত্রীর নিকট অমলার অত্যাচারের উল্লেখ করিলেন—বরদা বাবুর স্ত্রী একটু মুখ ভার করিয়া বলিলেন—"মেয়ে পাগল, তুমিও সঙ্গে সঙ্গে পাগল হ'তে চাও—তা যাক্, যখন এনেছ, তখন থাক্‌বে।" বরদা বাবু "ছেলেটী সারাদিন খায়নি, এলে খেতে দিও," এই বলিয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

বরদা বাবু চলিয়া গেলে অমলা কমলা সঙ্গে করিয়া ভূতনাথকে মায়ের কাছে আনিল। ভূতনাথকে দেখিয়া বরদা বাবুর স্ত্রীর ভার মুখ হাস্যময় ও প্রসন্ন হইল। মনে মনে বলিলেন "আহা এমন ছেলে। এ কোন বড় মানুষের ছেলে পালিয়ে এসেছে, নহিলে এমন রূপ, এমন মুখ, এমন সুন্দর চক্ষু কি গরিবের ঘরে হয়।"

ভূতনাথ আহারে বসিলে বাবুর স্ত্রী অতি স্নেহ ও যত্ন সহকারে তাহাকে খাইতে দিলেন। ভূতনাথের আহার হইলে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন "তুমি আমায় মায়ের মত ভাল বেস।" ভূতনাথের চক্ষে আনন্দের অশ্রু দেখা দিল। বাবুর স্ত্রী আপন অঞ্চলে সেই অশ্রু মুছাইয়া বলিলেন—"কাল তোমায় নূতন কাপড় ও যুত কিনিয়া দিব।"

ভূতনাথকে অমলা কমলা পড়ার ঘরে লইয়া গেল। শিক্ষক আসিয়া তাহাদিগকে পড়াইলেন—শিক্ষক চলিয়া গেলে কমলা ভূতনাথকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"তুমি কি পড়েছ?" ভূতনাথ অতি বিনম্র ভাবে পাঠের কথা বলিল। শুনিয়া কমলা বিস্মিত হইল—বলিল "তুমি আমা চেয়ে অনেক বেশি পড়।" ইহা শুনিয়া অমলা খুসী হইল।

ভূতনাথের সহিত ভাই ভগিনীর অনেক আলাপ হইল—কমলা তাহার টিনের বাক্স খুলিয়া মত কাপড় জামা টানিয়া বাহির করিল—আর হাসি মুখে এক একটী লইয়া বলিতে লাগিল। "এ কাপড়ে তোমার বেশ হবে, এ জামা আমার একটু বড় হয়, তোমার গায় বেশ হবে—তুমি দুটো জামা নেবে—কাপড় চারখানে কি এখন হ'বেনা? আমার দুজোড়া নূতন যুত, ঐ দেখ—তোমার পায় হবে, কোন্ জোড়া তুমি নেবে?" ইত্যাদি—ইত্যাদি—ভূতনাথ অমলা কমলার ব্যবহার দেখিয়া ভাবিল—"মানুষ? না দেব দেবী ইহারা?" ফলত পিতা মাতা ভাল হইলে সন্তানও ভাল হয়। তাহাদের দাস দাসীও ভাল হয়। বসোরার গোলাপের গাছ ভাল, ফুল, ভাল আবার পাতাও সুগন্ধ। বরদাপ্রসাদ বাবু ফুল-পত্রে খাটি বসোরার গোলাপ।

কমলাপ্রসাদ ভূতনাথকে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত দেখিয়া বলিল—"কেন ভাই নাও না কেন?" ভূতনাথ বলিল "এত ভাল জামা জুত কাপড় আমায় দিলে তোমার মা যদি কিছু বলেন?"

অমলা কমলার মা চুপ করিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইয়া ছেলেদের দেখিতে ছিলেন—এখন আর থাকিতে পারিলেন না—ভূতনাথের কথা শুনিয়া মনে একটু ব্যথা পাইলেন—ঘরে আসিয়া বলিলেন "আমি কিছু বলিব না, কমলার যে যুত জামা কাপড় তোমার পছন্দ হয়, নাও।" ভূতনাথ বড় লজ্জা পাইল। ভূতনাথ পরদিন মায়ের কাছে চিঠি লিখিল—"এখানে আর এক মা, এক ভাই ও নীলার মত বড় এক ভগিনী পাইয়াছি।"

* * * * * ** *

অল্প দিনের মধ্যেই ভূতনাথ সকলের প্রীতি লাভ করিল। এমন কি এক দিন স্নানান্তে কাপড় শুকাইতে দিবার সময় বরদা বাবুর দাসী তাহার হাত থেকে কাপড় খানি নিয়া বলিল—"বাবু আমি অমলা কমলার যেমন, তোমারও তেমনই দাসী।" ভূতনাথ অবাক হইয়া দাসীর মুখ পানে চাহিয়া রহিল—দাসী হাসিল।

আর এক দিন ভৃত্য অমলা কমলা ও ভূতনাথকে স্কুলের ছুটির পরে আনিতে গিয়াছে—অমলা কমলা বহি শ্লেট ভৃত্যের হাতে দিয়াছে। ভূত-

নাথ আপনার ক্ষুদ্র বোঝা আপনি বহিয়া আনিতে ছিল, ভৃত্য তাহা আপনি কাড়িয়া লইয়া বলিল—"বাবু, আমি বুঝি তোমার চাকর নই ?"

অমলা কমলা হ'তে ভূতনাথের মুখ লাল ; স্কুল হইতে আসিলে সে সুন্দর রাঙা মুখ ক্ষুধায় শুষ্ক ও রৌদ্রতাপে আরো রাঙা হয়। অমলা কমলার মা আগেই ভূতনাথের মুখখানি অঞ্চলে পুছিয়া দেন।

এইরূপে ছয় মাস গেল। এক দিন বরদাপ্রসাদ বাবু বলিলেন তিনি আর ঢাকায় থাকিবেন না। এলাহাবাদ যাইবেন। শুনিয়া ভূতনাথ চিন্তিত হইয়া বলিল, "মা, আপনারা কি এলাহাবাদ যাইবেন ?" অমলার মা হাসিয়া বলিলেন "তুমিও ত যাইবে।" শুনিয়া ভূতনাথ নিশ্চিন্ত—নিশ্চিন্ত কেন ? একটু আহ্লাদিতও হইল। পরদিন বৈকালে সকল সম-পাঠীদের সহিত দেখা করিতে গেল। সেই দিন রমা ও ভূতনাথে দেখা হইয়াছিল !

"নীলা—প্রাণের নীলা নাই ! সেই জন্য কি বিধাতা তাহার সকল স্নেহ, সকল কোমলতা, অমলার ক্ষুদ্র হৃদয়ে ঢালিয়া দিয়াছেন ?"—নীলার মৃত্যু সংবাদ শুনিয়া অবধি ভূতনাথ ইহাই ভাবিত ; আর কখনও কখনও অমলার কমল মুখপানে চাহিয়া অশ্রুজলে সিক্ত হইত। অমলাও সঙ্গে সঙ্গে কান্দিয়া অঞ্চলে তাহার মুখ মুছাইয়া জিজ্ঞাসা করিত। "দাদা কি তোমায় কিছু বলেচে ?" নীলার শোক অমলার নির্ম্মল স্নেহে ধীরে ধীরে নিবিয়া গেল।

ভূতনাথ এলাহাবাদ গমন করিলেন।

দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

বরদাপ্রসাদ বাবুর খুড়ার এলাহাবাদ হাইকোর্টে বিশেষ প্রতিষ্ঠা ও পসার। তিনি প্রাচীন হইয়াছেন ; এখন বিষয় কর্ম্ম ছাড়িয়া দেশে থাকিবেন ; নিজের যোগ্য পুত্র নাই ; তাই বরদাপ্রসাদকে নিজের কাছে আনিয়া সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়া দিয়াছেন এবং আপনার মক্কেলগণকে বরদার মক্কেল করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং অল্প দিনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিষ্ঠা ও পসার হইল। বরদা বাবু বড় উকিল হইলেন।

এদিকে দেখিতে দেখিতে ছয় বৎসর চলিয়া গেল। অমলা তের বৎসরের হইল। অমলা এখন স্কুলে যায় না; প্রাতে সন্ধ্যায় ভূতনাথ ও কমলা তাহাকে পড়ায়। কমলার বয়স এখন আঠার ও ভূতনাথ উনিশ বৎসরের হইয়াছে। কমলা ক্ষীণ তাহাকে ষোল বৎসরের অধিক বলিয়া বোধ হয় না। কিন্তু ভূতনাথের সৌন্দর্য্য এবং যৌবন দুইই উনিশ বৎসরে পূর্ণ হইয়াছে। ভূতনাথকে হঠাৎ কেহ দেখিলে, পঞ্চবিংশ বর্ষীয় পরম রূপবান যুবাপুরুষ বলিয়া নিশ্চয় মনে করিবে। ভূতনাথ শুদ্ধ সৌন্দর্য্য ও যৌবনে পূর্ণতা লাভ করে নাই, বিশ্ব বিদ্যালয়ের শিক্ষায়ও পূর্ণতা লাভ করিয়াছে। আর এক বৎসর পরে ভূতনাথও বরদা বাবুর সঙ্গে হাইকোর্টে যাইতে পারিবে। অমলা দেখিতে সুন্দরী নহে কিন্তু সুশিক্ষা ও সুশীলতায়—তাহাকে রূপবতীর রাণী বলিয়া বোধ হয়। অমলা ভূতনাথকে সাত বৎসর বয়স হইতে ভাল বাসে; সে ভাল বাসা এখন তের বৎসরের হইয়াছে। যে ভালবাসা এতদিন গঙ্গার স্রোতের ন্যায় কল কল রবে নাচিয়া নাচিয়া ছুটিত, সেই ভালবাসা এখন বিরাট পাষাণ বাঁধে প্রতিহত হইয়া উচ্ছ্বসিত। এখন আর সে আবর্ত্ত বহির্তরঙ্গ নাই। এখন অমলা ভূতনাথের দুঃখ হইলে মুখে সান্ত্বনা করে না, শয়নঘরে একাকিনী শুইয়া প্রাণ ভরিয়া কান্দে। এখন ভূতনাথের রূপ দেখিয়া সে বিস্মিত হয় না, নীরবে স্থিরলোচনে সে রূপ মাধুরী পান করে। ভূতনাথ মনে করে, অমলা এখন নির্দয়া হইয়াছে। আবার কখনও বা মনে করে "যে যারে মনে বেশী ভালবাসে,লোকের কাছে সে তারে কি তত কম ভালবাসে?" কবি বলিয়াছেন "ভালবাসা নীরব হইলেই প্রমাদ—নীরব হইলেই মধু। মৌন প্রেমের কুল কিনারা নাই—যেখানে প্রেমে মৌনভাব, সেইখানে প্রেমের পূর্ণতা। যেখানে প্রেমের বহির্তরঙ্গ নাই সেইখানে প্রবল অন্তর্তরঙ্গ। এই অন্তর্তরঙ্গ সংঘাতেই প্রেমোন্মাদ।"

এক দিন অমলার মা বরদা বাবুকে বলিলেন—"ভূতনাথের সঙ্গে অমলার বে দিলে কেমন হয়?" বরদা বাবু বলিলেন "বেশ হয়, কিন্তু অমলা যদি ভাল না বাসে?" "কি অমলা ভাল বাসিবে না? এ বিবাহ না হইলে অমলা অসুখী হবে।" এই বলিয়া অমলার মাতা হাসিলেন।

বরদাপ্রসাদ বলিলেন—"তুমি কি করে জান্‌লে ?"—অমলার মা আবার হাসিয়া বলিলেন—"আমি ঐ বয়েসে তোমাকে যেমন ভাল বাসিতাম, যেমন যেমন করিতাম—অমলাও ঠিক্ তাই করে। ভুক্ত ভোগী হলেই এ সব বুঝতে পারা যায়।"

বরদা বাবু সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন "অমলা নিজেই বর জুটাইয়াছে—যদি ভালবাসে, বিবাহ হউক, আমি সুখী হইব। ভূতনাথকে বলিয়া দেখ, সে যদি রাজি হয়, তবে অমলা চৌদ্দ বৎসরের হইলে বিবাহ দিব।"

অমলার মা ভূতনাথকে সুসময় বুঝিয়া বলিলেন—"বাবা তোমার কাছে একটী ভিক্ষা চাই, দিবে কি না বল ?"

ভূতনাথ সহাস্যে বলিলেন—"যে নিজে ভিক্ষুক, তার কাছে কি ভিক্ষা চান মা ?"—ভূতনাথের কথায় অমলার মা হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন—বলিলেন "অমন কথা কহিলে, আমি মনে বড় ব্যথা পাই—তাইকি তুমি ঐ কথা শুনিয়ে সুখী হও ?"

ভূতনাথ অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন—"আপনি কি চান,—বলুন—যা করিতে বলেন, করিব।"

"যদি ঘৃণা না কর, অমলাকে বিবাহ করিলে আমরা সুখী হইব। যদি মনে কর, আমাদের কাছে তুমি কিয়ৎ পরিমাণে ঋণী—অমলারে বিবাহ করিয়া সে ঋণ শোধ কর।" এই বলিয়া অমলার মা উত্তরের প্রতীক্ষা করিলেন।

ভূতনাথ এত দিন যে "সোনার গাছে, হীরের পাতা, মণির ফুল" কল্পনা করিতেছিল—তাহা আজ সত্য হইল। ভূতনাথের হৃদয় বিস্ময় ও আনন্দে কাঁপিয়া উঠিল। ভূতনাথের শরীরে ঘর্ম্ম ছুটিল—আকুলিত লোচনে কম্পিত স্বরে বলিল "মা——————"

মা বলিলেন—"বল, বল, আমি তোমার মুখের কথা শুনিবার জন্য উৎকণ্ঠিত"——

ভূতনাথ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল ; আবার ঐ সঙ্গে অশ্রু দেখা দিল—সেই নিরুপায় অবস্থা—অনাহার—নদীতীরে—আর সেই সাত বৎসর বয়সের পূর্ণ দয়ার মূর্ত্তি—মনে পড়িল—বলিল——"মা, এক দিন এই অমলা

আমায় পথ হ'তে কুড়িয়ে এনে ছিল—সহায়হীন, দরিদ্র ভিক্ষুক—তাহার দয়ায় আপনার অন্নে প্রতিপালিত—সেত দাসের যোগ্য—তার কি এ উচ্চ আশা শোভা পায়—মা? অমলা একথা শুনিলে ঘৃণায় লজ্জায় আত্মঘাতিনী হ'বে।"

অমলা ঘরের ভিতর দরজার আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিতেছিল; এই মর্ম্ম-ভেদী কথা শুনিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

এই সময়ে কমলা প্রসাদ আসিয়া বলিল "ভূতনাথ দেখ, তোমার দেশ-থেকে কে এসেছে।" ভূতনাথ বিস্মিত হইয়া বাহিরে চলিয়া গেলেন।

ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

বহির্বাটিতে বরদা প্রসাদ বাবু ও অনেকগুলি বড় লোক বসিয়া আছেন, কত হাস্য পরিহাস, কত খোসগল্প হইতেছে—এমন সময় সবল, সুদীর্ঘ ও পক্ককেশ, মলিন বসন, শূন্যপদ, অনাবৃত শরীরে এক ব্যক্তি তথায় উপস্থিত হইল।

বরদাবাবু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি চাও?"

"ভূতনাথ ভট্টাচার্য্য এখানে আছেন?"

"আছেন"

"আমি তাঁরে চাই।"

"কি প্রয়োজন?"

"আমি তাঁর দেশের লোক।"

"চিঠি আছে?"

"আছে।"

"দাও।"

"না—তাঁরই হাতে দিব"—এই বলিয়া সেই ব্যক্তি একটা থামে ঠেশ দিয়া দাঁড়াইল। বরদা বাবু একটু হাসিয়া বলিলেন "কমল ভূতনাথকে ডেকে দে।"

ভূতনাথের রাজোপম সুন্দর মূর্ত্তি, মূল্যবান বেশ ভূষণ; আগন্তুক সহসা

তাহাকে চিনিতে পারিল না,—কিন্তু ভূতনাথ আসিয়াই নির্ম্মল চিত্তে সেই কদাকার ও ধূলা-ধূষরিত বৃদ্ধকে বাহুপাশে জড়াইয়া ধরিয় কান্দিযা বলিল—"রামা দাদা! বিপদের বন্ধু—আশ্রয় দাতা! বল বল মা কেমন আছেন?"

রামা ভূতনাথের প্রেমালিঙ্গনে ভাব মুগ্ধ হইযা অশ্রু ধাবা ছাড়িয়া দিল; বরদা বাবু বিস্মিত—বরদা বাবুব সম্মানিত বন্ধুগণ আবো বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন। একজন উৎসাহে বলিয়া উঠিলেন "What heroism!" "কি বীরত্ব!"—বীবত্ব বটে—একজন পূর্ব্ব বাঙ্গালাব ডিপুটীব পিতা দেশ হইতে আসিয়াই পুত্র মুখ দর্শন কামনায় একেবারে কাছাবিতে গিয়া উপস্থিত হইযাছিলেন—সেরেস্তাদাব জিজ্ঞাসা কবিলে, হাকিম পিতাব মলিন বেশে ঘৃণা ও লজ্জা কবিয়া বাটীর চাকর বলিয়া পরিচয় দিয়াছিলেন। সুতবাং সেই ডিপুটী-কুল-কলঙ্কেব তুলনায় ভূতনাথ বীবকুলরত্ন—তাহাব আব সন্দেহ কি?

* * * * * * * *

মাধব সকল অবস্থা এক খানি স্বতন্ত্র কাগজে বিবৃত করিয়া—ভূতনাথকে দিযাছিলেন—পত্রে লিখিয়া দিয়াছিলেন"ছদ্মবেশে রজনীযোগে রামার কুটীরে আসিয়া, আগে আমাব সঙ্গে দেখা করিয়া যাইও। আব সকল কথা বিশ্বস্ত রামচন্দ্রের মুখে শুনিবে। পত্র পাঠমাত্র আসিবে; তিলার্দ্ধ গৌণ করিবে না।"

ভূতনাথ বরদা বাবুকে কাগজ পত্র ও পত্র পড়িতে দিলেন। তিনি পাঠ করিয়া বলিলেন "যাও—বিপদ সম্ভাবনা দেখিলে টেলিগ্রাফ করিও,—আমি যাইব।"—

ভূতনাথের যাওয়া স্থিব হইল। বরদাবাবু বলিলেন—"যত টাকাব দরকার হয়, সঙ্গে লইয়া যাও"—রামা শুনিতেছিল; এখন বলিল "কর্ত্তা! বাবুব যত টাকা চাই আমি দিব, আমার সঙ্গে ৪০০৲ টাকা আছে।" তথাপি বরদা বাবু আরো ২০০৲ টাকা দিলেন।

ভূতনাথ প্রস্তুত হইয়া বাড়ীর ভিতর দেখা করিতে গেলেন; অমলাব মা কান্দিয়া বলিলেন—"এখানেও তোমার এক মা রহিল, ভুলিয়া যাইও না শীঘ্র আসিও।" অমলা ভূতনাথের মুখপানে সতৃষ্ণ নয়নে চাহিয়া রহিল; বারিধারার ন্যায় ঘন অশ্রু ধারায় সে মুখ দেখিতে পাইল না।

ভূতনাথ ভগ্ন হৃদয়ে গাড়িতে চাপিলেন—লৌহ অশ্ব মহা গর্জ্জনে ধাবিত হইল। বরদা বাবু ও কমলা সঙ্গে গিয়াছিলেন, তাঁহারাও ভগ্ন হৃদয়ে গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। গৃহে সকলেই শোকমগ্ন—সকলেরই যেন কোন অমূল্য বস্তু হারাইয়াছে। কিন্তু অমলা আজ যে বস্তু হারাইলেন—কাহারও বস্তু তেমন উজ্জ্বল, তেমন সুন্দর নহে।

রামা উপযুক্ত সময়ে ভূতনাথকে লইয়া রমার কুটীরে উদয় হইল। মাধব তাহাকে বলিলেন "তোমার প্রতিহিংসার সময় উপস্থিত হইয়াছে, পিতৃ শত্রু মাতৃ শত্রুর নিষ্ঠুরতার প্রতিহিংসা কর।" ভূতনাথ ধীরতার সহিত বলিল—"প্রতিহিংসা নীচ ব্যক্তির কাজ—ক্ষমাতেই পুরুষার্থ।"

মাধব বলিলেন, "বেশ বলিয়াছ, তোমার হৃদয় উচ্চ; আমি তোমার কথায় ও উদারতায় সন্তুষ্ট হইলাম। কিন্তু দেখ প্রতিহিংসা একাকার বিশিষ্ট নহে—যে প্রতিহিংসায় দেশ রক্ষা করা হয়, সতীর সতীত্ব, মানীর মান, নিরীহ ও নির্দ্দোষ ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা হয়, সহস্র সহস্র প্রজা অত্যাচার হইতে উদ্ধার পায়, সে প্রতিহিংসা কি সৎকার্য্য নহে?—সে প্রতিহিংসায় কি পুরুষার্থ নাই?—"

"তুমি আমার সকল কথা শুনিলেই বুঝিতে পারিবে।" এই বলিয়া মাধব এমন মিষ্ট করিয়া সকল কথা তাহাকে বলিল, যে ভূতনাথ মাধবের মুখপানে ক্ষণকাল অবাক হইয়া চাহিয়া রহিল। পরে বলিলেন—"বলুন, আমি প্রস্তুত আছি।" তখন মাধব একখানি বড় লেফাফা তাঁহার হাতে দিয়া বলিলেন, "কুটীতে মাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিয়া এই চিঠি তাঁহার হাতে দিবে। দিবার পূর্ব্বে ইহা একবার পাঠ করিবে। তুমি প্রজার হিত কামনায় এলাহাবাদ হইতে আসিয়াছ, এ কথা জানাইবে। হাকিম বলিয়া ভয় করিবে না—বেগতিক দেখিলে বলিবে, 'গোপনানুসন্ধানে সব প্রমাণ হইবে; তাহা যদি তিনি না করেন, তবে সর্ব্বনাশ হইবে, এবং তাহা হইলে তিনি শুদ্ধ মহা বিপদগ্রস্ত হইবেন।' আমি রোজ টেলিগ্রাম করিব, তুমি রোজ টেলিগ্রাম করিবে। যে যে টেলিগ্রামে আমার পূর্ণনাম থাকিবে, সেই সকল টেলিগ্রাম যখন পাও, তখনই মাজিষ্ট্রেট্‌কে দেখাইবে। মাজিষ্ট্রেট্ গোপনে আসিতে চাহিলে, পূর্ব্বে সংবাদ দিবে

এবং পরে তুমি তাহাকে লইয়া এই কুটীরে আসিবে। তিনি গোপনানুসন্ধান করিতে না চাহিলে, অথবা অসতর্কভাবে না আসিতে চাহিলে, তাহাও জানাইবে। রামা তোমার সঙ্গে থাকিবে—কিন্তু যখন তাহাকে আমি চাই, অমনি পাঠাইয়া দিবে।"

ভূতনাথ কার্য্যভার স্কন্ধে লইয়া সেই রজনীতেই ছদ্মবেশে রমার সঙ্গে যাইয়া মায়ের সঙ্গে দেখা করিলেন—এবং সেই রজনীতেই বামা চণ্ডালের সঙ্গে জেলায় যাত্রা করিলেন। বলা বাহুল্য ভূতনাথের যাত্রা সফল হইয়াছিল।

চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেট সাহেব প্রায় বত্রিশ জন কর্ম্মচারী এবং পাইক বরকন্দাজ ধরিয়া জেলায় চালান দিয়াছেন। তাহারা সকলেই শেসনে অর্পিত হইয়াছে, পুলিস কর্ম্মচারিদেরও সেই দশা হইয়াছে। কৈলাশচন্দ্র কলিকাতা চলিয়া গিয়াছেন। বংশীধরের জেল হইয়াছে। সকল দুষ্ট লোক নির্ম্মূল হইয়াছে; সকল অত্যাচার নিবারিত হইয়াছে। প্রজাকুল স্বাধীন হইয়াছে আর তাহাদিগকে শাসন করিবার কেহ নাই। জমিদারের লোক যে দুই চারি জন আছে, তাহারাও আর ভয়ে কিছু কহে না। খাজনা বন্ধ হইয়াছে—জমিদারির সর্ব্বস্থল ঘোর উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। মাধবের কার্য্য শেষ হইয়াছে—দুষ্টের দমন হইয়াছে—শাসন তাহার কার্য্য নহে। সুতরাং ঘোর অরাজকতা উপস্থিত হইলে যাহা হয়, তাহাই হইয়াছে। আগে জমীদার অত্যাচারী ছিল, এখন প্রজারা আপনারাই অত্যাচারী হইয়াছে। যে দুর্ব্বল সে অত্যাচার সহিতেছে, যে বলবান সে অত্যাচার আরম্ভ করিয়াছে। কেহ কাহাকে মানে না, যাহার যাহা খুসী, সে তাহাই করিতেছে। জেল ভাঙ্গিয়া গেলে, কয়েদিরা যেরূপ উন্মত্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খলতা উৎপাদন করে, স্কুলের ছুটী হইলে বালকগণ যেরূপ দলে দলে কেহ খেলে, কেহ হাসে, কেহ মারে, কেহ কান্দে, কেহ ফল খায়, কেহ ডাল ভাঙ্গে, কেহ গাছে উঠে, কেহ নাচে, কেহ গায়, সেই রূপ বিশ্বনাথ বাবুর সমস্ত রাজ্যের অবস্থা দাঁড়াই-

যাছে। বিশ্বনাথ কলিকাতা হইতে আসিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িযাছেন। নূতন কর্ম্মচারিগণ কিছুই করিতে পারে না। লাঠিয়ালগণ প্রাণের ভয়ে আর প্রজাকুলের বিরুদ্ধে লাঠি ধরিতে স্বীকৃত নহে—নূতন পুলিস আর ভয়ে জমীদারের অর্থ খাইয়া প্রজা শাসনের সহায়তা করিতে সম্মত নহে। সুতরাং বিশ্বনাথ একেবারে ভীত ও মর্ম্মাহত হইয়া পড়িয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি দূরে পলায়ন করিযাছে; মস্তিষ্কে বিকার উপস্থিত হইয়াছে। তাঁহার আর আহারে রুচি নাই, মনে সুখ নাই, হৃদয়ে শান্তি নাই।

এই ভাবে এক মাস গেল। সংবাদ আসিল, দেওয়ানজী চির জীবনের জন্য দ্বীপান্তর; আর তাহার সঙ্গিগণের প্রায় সকলেরই তত্তুল্য গুরুদণ্ড হইয়াছে। প্রজারা এই সংবাদে আরো ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিযাছে। ঠিক এই সময়ে মাধব, ভূতনাথ, রমা, রামা চণ্ডাল ও তাঁহাদের সঙ্গিগণ জেলা হইতে আসিলেন। মাধবের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য এত প্রজা আসিল, যে বিশ্বনাথ দিনে ডাকাত পড়িল বলিয়া ভয়ে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন।

ভূতনাথ এ ব্যাপারে লিপ্ত ছিল, তাহা কেহ জানিতে পারিল না। বিনোদ অনেক দিন পরে তাহাকে পাইয়া আনন্দে অধীরা হইলেন। রামা চণ্ডাল মহোল্লাসে মাথায় একটা লাল কাপড় জড়াইয়া বিনোদকে প্রণাম করিয়া বলিল—"মা এই তোমার দুঃখ ঘুচিল—সকলের দিন সমান যায় না।" রামার স্ত্রী ও সুখী ভূতনাথকে দেখিয়া উলুধ্বনি করিতে লাগিল—পাড়ার মেয়েরা আসিয়া তাহাতে যোগ দিল। রমা দাসী ভিক্ষার ঝুলি দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিনোদের পদ সেবায় নিযুক্ত হইল।

* * * * * *

এ দিকে বিশ্বনাথ নিরুপায় হইয়া মাধবকে ডাকিয়া বলিলেন "মাধব বাবু আপনার কি ক্ষমতা তাহা এত দিনে বুঝিলাম। আপনি আমার সর্ব্বনাশ করিয়াছেন—এখন যাহাতে রক্ষা পাই, তাহা করুন।" মাধব বলিলেন "পাপের ফল এড়াইবার কারো সাধ্য নাই, আপনিও পারিলেন না। যদি আর অত্যাচার অসৎ কাজ না করেন, যদি আমার ইচ্ছামত কর্ম্ম করেন, প্রজা শাসিত হইবে, আপনার যশও হইবে।" বিশ্বনাথ বলিলেন "আমি

আপনার হাতে সকল ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইব। আপনাকে দেওয়ান করিব।"

ইহা শুনিয়া মাধব হাসিয়া বলিলেন—"দেওয়ান হইতে চাই না—অর্থোপার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা রাখি না। আপনার উচ্ছৃঙ্খল সংসার সুশৃঙ্খল করিয়া দিব।"

বিশ্বনাথ বলিলেন, "তাহা হইলেই যথেষ্ট।"

মাধব বলিলেন—"যাহার যে অনিষ্ট অপচয় করিয়াছেন, তাহার ক্ষতি পূরণ করিবেন কি না?"

বিশ্বনাথ বলিলেন "করিব।"

মাধব বলিলেন—"তবে নিশ্চিন্ত হউন।"

পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

মাধব অসাধারণ কৌশল ও ক্ষমতায় অল্প দিনের মধ্যেই জমীদারির সর্ব্বত্র শান্তি স্থাপন করিলেন। যাহার অঙ্গুলি সঙ্কেতে ঘোর বিপদ ঘটিয়াছিল, আবার তাহারই অঙ্গুলি সঙ্কেতে সকল সুশৃঙ্খল হইল। ভূতনাথকে তাহার পিতৃ সম্পত্তি প্রত্যর্পিত হইল। বিনোদকে তাহার গহনা ও হীরকাঙ্গুরি প্রত্যর্পিত হইল। যাহার, যে ক্ষতি হইয়াছিল, মাধব তাহারই ক্ষতি পূরণ করিয়া দিলেন। জমীদারির সর্ব্বত্র নূতন জরিপ করিয়া প্রচলিত হারে জমাবন্দি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া "পাট্টা কবুলিয়ত" সর্ব্বসম্মতিক্রমে রেজেষ্টারী করিয়া লইলেন। সুতরাং আর কোনও গোল রহিল না। যে বিশ্বনাথ বাবুর অত্যাচার ও পীড়ন দোষে কুখ্যাতি রটিয়াছিল, এখন সেই বিশ্বনাথ ক্রমে আদর্শ ভূম্যধিকারী বলিয়া যশ পাইতে লাগিলেন। বিশ্বনাথ বাবু এখন মাধবের উপর অপরিসীম সন্তুষ্ট হইয়া একেবারে সকল ক্ষমতা তাহার উপর ন্যস্ত করিলেন।

ভূতনাথ সর্ব্বদা মাধবের গুণ পক্ষপাতি হইয়া তাঁহার বৈষয়িক ক্ষমতা এবং কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করেন। একদিন ভূতনাথ মাধবকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মহাশয় কোন্ নীতি অবলম্বন করিলে বঙ্গীয় জমীদার নিরুদ্বেগে এবং প্রশংসা সহকারে বিষয় রক্ষা করিতে পারেন?"

মাধব হাসিয়া বলিলেন, বিষয় রক্ষার জন্য কুট নীতির প্রয়োজন নাই; দয়াশীল ও লোভশূন্য হইলেই বিষয় রক্ষা হয়। সামান্য জমীদারের কথা দূরে থাকুক রাজাধিরাজ সম্রাটও সাধু ও নির্লোভ হইলে দয়ায় সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন। যেখানে লোভ ও নিষ্ঠুরতা সেইখানে ধ্বংস ও বিপদ।"

"প্রজাকে যিনি ইক্ষুদণ্ড মনে করেন, তাঁহার পতন অনিবার্য্য। প্রজাকে যিনি সন্তান মনে করেন, তিনিই কৃতকর্ম্মা হন। দয়া ও প্রেমে পথের ভিক্ষুকও সম্রাট হইতে পারে। বুদ্ধ সাম্রাজ্য,—নানক-সাম্রাজ্য—চৈতন্য-সাম্রাজ্য ও যিশু সাম্রাজ্যের দিকে চাহিয়া দেখ। আবার নিত্যসম্রাট (১) বিষয় নীতিবিদ্‌গণের শিরোমণি লাইকরগস, সোলন, জষ্টিনিয়ান, এড্‌গার এবং জ্ঞানী অলফন্‌সসের (২) দিকে চাহিয়া দেখ, তাঁহাদের বদনেও দয়া ক্ষমা ও বাৎসল্যের শুভ্র জ্যোতি দেখিতে পাইবে। অণু পরমাণু—যোগ শক্তিবলে হিমালয়। প্রজাণু—প্রেম শক্তি বলে ভূপতি। অণু ক্ষুদ্র হিমালয়—প্রজা ক্ষুদ্র রাজা। ক্ষুদ্রকেও ঘৃণা করিতে নাই, কেন না ঐ বহু ক্ষুদ্র একত্র হইলে তোমা হইতে বড় হইবে। এক বিন্দুকে ঘৃণা করিও না, এই বিন্দুগণের সমষ্টি-তরঙ্গে শত লক্ষ "ফলি" (৩) ডুবিয়া যাইতে পারে। "সাইএটি-পরটিডস্" (৪) "ভূপতি ও প্রজার" কিরূপ সম্বন্ধ নিরূপণ করিয়াছেন, একবার দেখিতে পার। "দয়া, ক্ষমা ও সাম্য"—ইহার কাছে কোন্ অস্ত্র ভাস্কর?

(১) "Perpetui principes"—বা, Perpetual sovereigns—মৃত্যু রাজার শাসন-দণ্ড কাড়িয়া লয়, কিন্তু আইন কর্ত্তার শাসনদণ্ড মৃত্যু স্পর্শও করিতে পারে না, এই জন্যই উঁহারা অমর বা নিত্যরাজ বলিয়া কথিত।

(২) Alphonsus, the Wise, of Castile.

(৩) জুলিয়স কৈশর (সীজর) কোন রাজা কর্ত্তৃক একখানি জাহাজ উপহার পাইয়াছিলেন, সে জাহাজ এত বড় ছিল, যে দুই সহস্র খালাসী না হইলে, চলিত না এবং সমুদ্রের মাঝখানেই ঠেকিয়া যাইত; সুতরাং তীরে উঠিবার জন্য আর একখানি বড় জাহাজকে অন্তত দশবার যাতায়াত করিতে হইত; জুলিয়স ইহার নাম "Folly" রাখিয়া ছিলেন।

(৪) ক্যাষ্টিলিয়ন আইন সংগ্রহ। ইহা অতি শ্রদ্ধের বলিয়া গণ্য। ইহাতে রাজা প্রজাকে রক্ষাকর্ত্তা, মুক্তিদাতা, দেশবিস্তারয়িতা, জীবস্রষ্টা, বীর ও সমভাবসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে পূজা করিবেন ও ভালবাসিবেন, এরূপ বিধান আছে।

ইহার কাছে কোন্ শক্তি বড় ?—শুধু দয়া ও ক্ষমা মন্ত্র জপ কর ; ইহকালে যশ, বল ও ঐশ্বর্য্য পাইবে, পরকালে মুক্তি মিলিবে। আমি রাজনীতি সমাজনীতি বুঝি না, বুঝিবার চেষ্টা আছে—কেবল ঐ তিনটী কথা। বিশ্বনাথ বাবু এত দিন তাই বুঝেন নাই বলিয়াই বিনাশের মুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন।

দেখ রোমান পণ্ডিতগণ যাহা কিছু ভাল, তাহাকেই (Pietate) "দয়া" বলিতেন। (Humanity) "দয়া" বলিলে সুকুমার সাহিত্যকেও বুঝাইত। লিসিপস, ডিমক্রটস্, এপিকুরস, ডিয়াগরস্, রাইরস, লুসিয়ান প্রভৃতি ঈশ্বর নাই সিদ্ধান্ত করিয়াও, দয়ার পূজা করিতেন। যে দিন দয়ার সিংহাসনে নিষ্ঠুরতা বসিল, সেই দিন প্রতাপশালী রোমের অধঃপতন হইল। রোমের শাসননীতি সম্বন্ধে মহামতি শিশিরো কি বলিয়াছেন একবার শুন—"সৈন্যবলে আমরা স্পেনিয়ার্ডগণকে পরাভূত করি নাই,—বল পরাভূত করি নাই,—কুটনীতিতে কার্থেজ জয় করি নাই,—বিজ্ঞান বা কৌশলে গ্রীকগণকে করতলে আনি নাই,—অথবা বুদ্ধি বল দেখাইয়া লাটীন ও ইটালি অধিকৃত করি নাই, কেবল আমাদের দয়া ও ধর্ম্ম বলেই নানাদেশ, নানা জাতি অধিকৃত ও শাসিত হইয়াছে।"

ভূতনাথ সামান্য স্কুল মাষ্টারের ক্ষমতায় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন, আজ আবার সেই সামান্য স্কুল মাষ্টারের পাণ্ডিত্যে চমৎকৃত হইয়া ভাবিলেন "ক্ষুদ্রকে উপেক্ষা করিও না"—ইহাত এখনই শুনিলাম—আহা, ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র নহে, ক্ষুদ্রই বড়! মানব কি মোহান্ধ, কি অহঙ্কারী, কি গর্ব্বিত।—পিতা হয়ত চুরি করিয়া আমার জন্য কিছু পয়সা রাখিয়া গিয়াছেন, আমি উদর পূরিয়া ভোজন করি এবং নিস্ব ও অনাহারী দরিদ্র প্রতিবেশীকে দারিদ্র্যের জন্য ঘৃণা করি—যেন অর্থহীন ব্যক্তি কতই না পাপী! এই মাধবকে কে না ঘৃণা করিত ? কে না পাগল বলিত? কেনা ইহার মলিন বসন দেখিয়া ইহার সহিত কথা কহিতে ঘৃণা করিয়াছে? আর আমি—আমি দরিদ্র ছিলাম বলিয়া গ্রামের লোকে বাল্যকালেই আমাকে মূর্খ হইব বলিয়া ঘৃণা করিত। আবার এখন সেই গ্রামের লোকেই আমাকে পণ্ডিত বলিয়া আদর করিতেছে। আমি কি পণ্ডিত? একি পাণ্ডিত্যের আদর ? তাহা

নহে—পিতৃ সম্পত্তি পাইয়াছি, তাই আমার গুণ বাড়িয়াছে। হায়! মানব—গর্বিত মানব! তোমা হইতে মূর্খ এ সংসারে কে ?"

ভূতনাথ এইরূপ ভাবিতেছেন এমন সময় ডাক-হরকরা একখানি রেজে· ষ্টরীপত্র দিয়া গেল ; ভূতনাথ পত্র খুলিয়া পড়িলেন ; পত্রে এইরূপ লেখা।

কল্যাণবরেষু—

তোমার আসিবার প্রয়োজন নাই। দিন স্থির করিয়াছি, * * * তারিখে তোমার বিবাহ। আমরা শীঘ্রই আসিতেছি। ব্যয় বিধানের জন্য চিন্তিত হইও না।

আশীর্ব্বাদক

শ্রীবরদাপ্রসাদ শর্ম্মা।

ভূতনাথ তাড়াতাড়ি বাড়ী চলিলেন ; মাধব বলিলেন, সংবাদ কি ?

ভূতনাথ হাসিয়া বলিলেন,—"আমার বিবাহ।"

ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

আজ বিনোদের বড় সুখের দিন—নানা দুঃখ বিড়ম্বনা ভোগ করিয়া বিনোদ আবার সুখের মুখ দেখিতে পাইয়াছেন। স্বামীর অপহৃত ঐশ্বর্য্য হস্তগত হইয়াছে। পুত্র সুশিক্ষিত হইয়া কোলে আসিয়াছে ; আবার সেই পুত্রের বিবাহ। বরদা বাবু কন্যাসহ আসিয়াছেন। পুত্রবধূকে দেখিয়া বিনোদের আর সুখের সীমা নাই ; সেই অপার সুখে আবার অশ্রু। এ অশ্রু সুখে বিষাদে জড়িত। অমলার মুখ ও বর্ণ ঠিক নীলার মত ; আজ নীলা থাকিলে ঠিক ঐমত অত বড় হইত। বিনোদ অমলাকে কোলে নিয়া কান্দি-লেন। বিবাহের পূর্ব্বে পুত্রবধূর মুখ দেখিতে অনেকে নিষেধ করিয়াছিল, বিনোদ কাহারও কথায় কাণ দেন নাই। তিনি এক একবার এই বলিয়া অশ্রু মুছিতেন, আর সকলকে ডাকিয়া বলিতেছেন "একি সত্য—না স্বপ্ন—দেখিতেছি ?"—

এ দিকে রমা আনন্দে নাচিয়া নাচিয়া কত কাজ করিতেছে। রামা চণ্ডাল আজ সকলের চেয়ে বেশী সুখী ; সে, তাঁহার মেয়ে, স্ত্রী ও জামাই—যাহার যাহা সাধ্য—কোমর বান্ধিয়া প্রাণপণে কাজে উন্মত্ত হইয়াছে। আজ

বামা খায় নাই, বিনোদ খাইতে বলিলে বলে "মা এত সুখে কি খাওয়া যায়? আজ আমার ক্ষুধা তৃষ্ণা নাই।"

অস্তগত সূর্য্যকে কে ভক্তি করিয়া থাকে?—ভূতনাথের নবোদিত দীনমণির পূজা সকলেই করিতে আসিল। এত দিন গায়ে গা লাগিলে যে ফিরিয়া চায় নাই, কথা কয় নাই, সেও আজ আসিয়া আত্মীয়তা জানাইতে লাগিল। নীলার শ্রাদ্ধে ব্রাহ্মণ ভোজন হয় নাই; আজ ব্রাহ্মণেরা সে কথা ভুলিয়া আপনারা পাত পাতিয়া দধি আন্—চিড়া আন্—লুচি আন্—মণ্ডা আন্ বলিয়া আনন্দের কোলাহল তুলিয়া দিল। সেই কুলাঙ্গার বিশু বাবুও আজ বর পক্ষের প্রধান অভিভাবক হইয়া—"এ রে, ও রে, হাঁরে" বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিলেন।

দেখিতে দেখিতে শুভ রজনী আগত হইল। ঢোল সানাই বাঁশী কাঁসী বাজিয়া উঠিল—গ্রামময় সকলে উৎসবে মাতিয়া ভূতনাথের বাড়ীতে কিলি কিলি, হিলি হিলি—আরম্ভ করিল। গ্রাম শূন্য, সকলেই—বিবাহ বাড়ীতে।

কেবল মাধব আপন গৃহে শুইয়া আছেন! সারাদিন বিবাহ বাড়ীর পরিশ্রমে ক্লান্ত হইয়া বৈকালে আহারান্তে—বিশ্রাম করিতেছেন। আর একটু পরেই বিবাহ দেখিতে যাইবেন। দুর্ভাগ্যবশত ক্লান্তি হেতু উঠিতে পারেন নাই, তন্দ্রাবেশে স্বপ্ন দেখিতেছেন—"ভয়ঙ্কর আবারে পৃথিবী কম্পিত হইতেছে; সূর্য্যমণ্ডল মহাবেগে ভূপৃষ্ঠে পড়িতেছে; বৃক্ষগুল্ম তরুলতা অট্টালিকা ভেদ করিয়া ভয়ঙ্কর ধূমরাশি গগণ আচ্ছন্ন করিতেছে; সেই মহামেঘ ঘোরধূমরাশি ভেদ করিয়া হুহুঙ্কার গর্জ্জনে লক্ষ লক্ষ অনলশিখা প্রলয়াগ্নির ন্যায় উর্দ্ধে উঠিতেছে; সেই শিখা মণ্ডলে এক অসীম রূপ-শালিনী ত্রিভুবন-মোহিনী শুভ্র বসনা ললনা নাচিয়া নাচিয়া হাসিয়া বলিতেছে "মাধব রূপ পূজা করিবি ত আয়?" মাধব হৃদয়ে হাত দিয়া ভয়ে চীৎকার করিলেন—বোধ হইল যেন মহাপ্রাণ ছুটিয়া হৃদয় ভাঙ্গিয়া চলিয়া যাইতে চাহে; অমনি জাগিলেন। পৃথিবী যথার্থই মহামেঘ ভয়ঙ্করা—হৃদয় যথার্থই অব্যক্ত বেদনাময়—সম্মুখে প্রখর তীক্ষ্ণ রক্ত প্লুত ছুরিকা হস্তে ভীষণরূপ রাশি দাঁড়াইয়া! মৃদুস্বরে, ভয়ের স্বরে, যাতনার স্বরে বলিলেন—"কি শ্যামা তুমিই।" উঠিতে পারিলেন না। সেই ছুরী আবার তাঁহার হৃদয়ে বিদ্ধ হইল—মাধব ভগ্নকণ্ঠে

বলিলেন—"শ্যামা আর না—এই যথেষ্ট; পালাও—পুলিস—ফাঁসি——" মুখে আর বাক্য সরিল না।

শ্যামাসুন্দরী উন্মাদের মত ছুটিয়া, পালাইলেন।

সেই সময় অকস্মাৎ রমা গৃহে প্রবেশ করিয়া ভয়ে বিস্ময়ে ও শোকে কান্দিতে কান্দিতে "সর্ব্বনাশ হলো রে" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। মাধবের জ্ঞান এখনও আছে, শক্তি নাই; তথাপি ইঙ্গিতে চেঁচাইতে নিষেধ করিলেন। রমা কান্দিয়া বলিল "কে তোমার এ দশা করিল?" মাধব কেবল স্বর্গপানে অঙ্গুলি তুলিলেন। নয়নে দর দর অশ্রুধার পড়িতে লাগিল। রমা দৌড়িয়া বিবাহ বাড়ীতে গিয়া সংবাদ দিল। হায় হায়! করিয়া সকল লোক ছুটিয়া আসিতে লাগিল; গৃহে স্থান হয় না, প্রাঙ্গনে স্থান হয় না—রমা সেই ভিড় ঠেলিয়া কান্দিতে কান্দিতে গঙ্গাজল আনিয়া মাধবের মুখে দিল—মাধব আর একবার পৃথিবী ভাল করিয়া দেখিবার জন্য বড় করিয়া চাহিলেন। রমা তাড়াতাড়ি কলমে কালি দিয়া তাঁহার হাতে দিল; কাগজ আপনি ধরিয়া বলিল—"বল কে, এ—সর্ব্বনাশ করিয়াছে?" মাধব লিখিবার চেষ্টা করিলেন না। ভূতনাথ চীৎকার করিয়া বলিল—"কথা কহিবার শক্তি নাই, যদি কাহাকে কিছু বলিবার ইচ্ছা থাকে লিখিয়া দিন।" মাধব এইবারে লিখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু হায়, যে বিপুল বাহু এক দিন আহত অতিথিকে তুলা মুষ্টির ন্যায় তুলিয়া ক্রোশ দূরে বহিয়া লইয়াছিল—আজ সেই বাহু হংস পুচ্ছ তুলিতে অক্ষম হইল। মাধব লেখনী পরিত্যাগ করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িলেন। রমা আবার তাঁহার মুখে গঙ্গাজল প্রদান করিল—মাধব ক্ষীণস্বরে বলিলেন "বাতাস"—সকলে তাড়াতাড়ি তাঁহাকে বাহিরে খোলা স্থানে নামাইল। অমনই ভয়ানক কোলাহল চারিদিক হইতে সমুত্থিত হইল—"দেখি দেখি একবার দেখি—কোথায় মহাপুরুষ—কোথায় মহাপুরুষ।" কাহার সাধ্য সেই ক্রন্দনময় মহাকোলাহল নিবারণ করে—কাহার সাধ্য সেই অগণ্য—অসংখ্য লোক প্রবাহ রোধ করিতে পারে?—আজ মাধব নাই—আজ মাধব জনমের তরে চলিয়া যাইতেছেন। আর মাতৃহীন শিশুর দুধ কে যোগাইবে—আর পতি-পুত্র-হীনা দুঃখিনীর অশ্রু কে মুছাইবে—

আর অন্ধ আতুরের অন্ন-গ্রাস কে মুখে তুলিয়া দিবে,—আর কে পরের বিপদে বুক পাতিয়া দিবে—কে পরের আঘাত আপনার বুকে লইয়া সহিবে —আর কে জমীদারের পীড়ন, পুলিসের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবে— মাধব চলিলেন—দয়া চলিল—ক্ষমা চলিল—বাৎসল্য চলিল—প্রেম চলিল— আজ যথার্থ-মাতা চলিলেন—অভয় চলিলেন—আশীর্ব্বাদ চলিলেন— রক্ষাকর্ত্তা চলিলেন—পিতা চলিলেন—আর আসিবেন না—আর কেহ দেখি-বে না—হায় মাধব—যাইতেছেন—আর কে থাকিতে পারে—বাড়ীতে চীৎকার, পথে চীৎকার, ঘাটে চীৎকার, অবিরাম অবিশ্রাম চীৎকার— "আর কে দেখবি আয়—দুঃখিনীর ধন,—কাঙ্গালের জীবন,—দুর্ব্বলের বল— বিপদের বন্ধু—আমাদের মাধব—আমাদের ফেলিয়া চলিলেন।"

মাধবের প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গেল—রমা উচ্চরবে কান্দিয়া উঠিল—নিকটের লোক "হরিবল হরিবল" বলিল। আর যাবে কোথা—একেবারে সহস্র সহস্র কণ্ঠে "গেল গেল" বলিয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। সেই কোলা-হল ক্রমে রোদনে পরিণত হইয়া যেন অকূল সাগরে বিপুল তরঙ্গ তুলিল।

পুলিস পূজা পাইলে আত্মহত্যা স্থিরীকৃত করিল। মহাপুরুষের অন্ত্যেষ্টি নির্ব্বাহিত হইল।

পঞ্চ ত্রিংশ অধ্যায়।

ভূতনাথের বিবাহ হইল।—বিবাহ বাড়ী জন-শূন্য। সকলে বিবাহের আমোদ ভুলিয়া শশ্মানে গিয়াছে। ঢোলের তাল কাটিয়া যাইতে লাগিল, সানাইয়ে ফু সরিল না—নারীগণ উলুধ্বনি করিতে পারিল না—জিহ্বা অচল—অশ্রু মুছিতে মুছিতে বিবাহ সম্পন্ন হইল।

* * * * *

শ্যামাসুন্দরী কোথা? বিবাহ বাড়ীতে নাই। বিশু বাবু বাড়ীতে তাহাকে দেখিতে না পাইয়া মনে করিলেন,—বিবাহ বাড়ী। লোকে খুঁজিয়া দেখিল তথায় নাই। সর্ব্বনাশ হইল—চারি দিকে লোক ছুটিল, কিন্তু কোথায় শ্যামাসুন্দরী!——

প্রভাতে, নদী তীরে, শশ্মানক্ষেত্রে, শ্যামা বিচরণ করিতেছেন। সে মুখের শোভা নাই—সে বর্ণ নাই—আরক্ত ও বিকটাকার লোচন। লোহিত প্লুত বসনের অর্দ্ধ—শরীরে, অর্দ্ধ—ভূমিতলে লুটায়িত—বিপুল কেশ রাশি মুক্ত-ফণীদলের ন্যায় বিশৃঙ্খলে এলাইয়া রহিযাছে।—সেই প্রেত ভূমিতে শ্যামা কি করিতেছেন? উন্মাদের ন্যায় অট্টহাস্য করিতেছেন, কখন কাঁদিতেছেন, কখনও বা স্নেহ ভাবে বলিতেছেন—"মাধব ঘুমাইও না। তোমার ঐ মধুর কণ্ঠে গাও—আবার গাও শুনি। গাইবে না, শ্যামার উপর রাগ করিযাছ, আমি গাই?"—এইরূপ প্রলাপ বকিতেছেন, আর কান্দিতেছেন—হাসিতেছেন ও গাইতেছেন—"ধরম জ্যোতি পাপ—অনল ভেল—
হের লক লক জীভ ধক ধক জ্বলি—সকলি দহল——"

দুই জন পরিচিত লোক শ্যামাকে বলপূর্ব্বক ধরিযা আনিল—শ্যামা "শ্যামা—পালাও—পালাও—পুলিষ—ফাঁসি" বলিয়া চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের সঙ্গে আসিল।

সকলে দেখিযা অবাক হইল—বিশ্বনাথ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"একি!"

শ্যামা সেই ভযঙ্করা বেশে, সেই বিকটস্বরে, সেই অট্টহাস্যে সেই ভৈরব ক্রন্দনে বস্ত্রের শোণিত এবং হাতের রক্তমাখা ছুরী দেখাইয়া বলিলেন—"একি—একি!"

তখন সকলে বুঝিল, শ্যামা এই সর্ব্বনাশ করিযাছে। বিশ্বনাথ বিষাদে, লজ্জায়, ঘৃণায়—ক্রোধে গর্জ্জন করিয়া বলিলেন—"তবে পাপিয়সী! তুই মাধবকে মারিয়াছিস?"

শ্যামা সেই উন্মাদের ভাবে, যাতনার স্বরে, করুণ বচনে, কান্দিয়া বলিলেন "কি আমার মাধব নেই?" আবার হাহা রবে হাসিযা বলিলেন—"আছে—আছে—শ্যামা পালাও—পালাও—পুলিষ—ফাঁসি—"

* * * *

পুলিষ আসিল; তদারক হইল—শ্যামাকে ধরিয়া লইযা গেল। শ্যামা উন্মাদিনী; উন্মাদের জেলে নিক্ষিপ্ত হইল—আর ভাল হইল না।

বিশ্বনাথ সংসার বিরাগী হইয়া বিষয় আশয় সকল ভূতনাথকে লিখিয়া

দিয়া তীর্থবাসী হইলেন। যে বিনোদ, শ্যামা ও বিশ্বনাথকে ক্রোধে অভি-সম্পাত করিতেন—সেই বিনোদ—শ্যামার দুর্দ্দশা ও বিশ্বনাথের দুঃখে অশ্রু-জলে সিক্ত হইতে লাগিলেন।

* * * * * *

অনেক দিন পরে রমা একদিন জিজ্ঞাসা করিল—"গাঁয়ের লোক মূর্খ—বিশ্বনাথ মূর্খ—না ভূতনাথই মূর্খ?"

ভূতনাথ বলিলেন "দেবত্ব না জন্মিলে মানব চিরদিনই মূর্খ—যাঁহার আপনার মূর্খত্বে বিশ্বাস নাই—জীবনের ক্ষণস্থায়িত্বে বিশ্বাস নাই—তিনিই আরো—**মূর্খ**।"

সমাপ্ত।

সিপাহি বিপ্লবে সিপাহিদিগের সৌজন্য ও সদাশয়তা।

(বারাণসী ও আজিম গড)

মহামতি লর্ড ক্যানিং যখন দিল্লী পুনরধিকার করিতে সেনাপতিদিগকে উত্তেজিত করিতেছিলেন, তখন গঙ্গা ও যমুনা তীরবর্ত্তী নগর সমূহের বিষয় চিন্তা করিয়া তিনি সাতিশয় উদ্বিগ্ন হন। এই সকল নগরে বহু সংখ্যক ইউরোপীয় পরিবারের সহিত সুখে ও শান্তিতে বাস করিতেছিল। কিন্তু ইউরোপীয় সৈনিকগণ কর্ত্তৃক তাহারা সুরক্ষিত ছিল না। কেবল দানাপুরে এক দল ইউরোপীয় সৈনিক ছিল। এতদ্ব্যতীত কতিপয় কামানরক্ষক ইউরোপীয় সৈনিক পুরুষ ইঙ্গরেজের পক্ষ সমর্থন করিতেছিল। এই সকল সৈন্য ছাড়া গঙ্গা ও যমুনার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থান সমূহে কোন ইউরোপীয় সৈন্যদল ছিল না। কাজেই এই সকল স্থানের উপর লর্ড ক্যানিংএর দৃষ্টি পড়িল। যদি উত্তেজিত সিপাহীরা এই সকল স্থান আক্রমণ করে, তাহা হইলে তত্রত্য ইউরোপীয়দিগের জীবন যে মহা বিপত্তিপূর্ণ হইয়া উঠিবে, তাহা লর্ড ক্যানিং স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন। মিরাটে যখন ভয়ঙ্কর

কাণ্ড ঘটে, দিল্লী যখন সিপাহীদিগের হস্তগত হয়, যদি তখনি গঙ্গা ও যমুনার জল-বিধৌত নগর সকলের সম্মুখ ভাগে সমস্ত সিপাহী একেবারে ইঙ্গরেজদিগকে আক্রমণ করিত, তাহা হইলে ইঙ্গরেজ এক সময়ে সর্ব্বত্র সর্ব্ব-বিধ্বংশের বিকট মূর্ত্তিতে স্তম্ভিত ও কর্ত্তব্য বিমুখ হইয়া পড়িত। কিন্তু ইউরোপীয়েরা যখন প্রাণের দায়ে মোগলের রাজধানী হইতে ইতস্ততঃ পলাইতে থাকেন, তখন অন্যান্য সৈনিকনিবাসে বিপ্লবের ভয়াবহ মূর্ত্তি পরিদৃষ্ট হয় নাই। অন্য স্থানের আকস্মিক দুর্ঘটনায় গবর্ণমেণ্টকে অধিকতর উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া তুলে নাই। কিন্তু বাঙ্গালের সৈনিক নিবাসে সর্ব্বত্রই সকলের মধ্যে গভীর উত্তেজনার চিহ্ন দেখা যাইতেছিল। এই উত্তেজনা হইতে যে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঘটিবে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছিল। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে এই দুর্ঘটনা হইল। এবং উহা দেখিতে দেখিতে অধিকতর ভয়ঙ্কর ভাবে সমগ্র উত্তর পশ্চিম প্রদেশে সর্ব্ব সংহারক কালের বিকট-ছায়া বিস্তার করিতে লাগিল।

কলিকাতা হইতে কিঞ্চিদধিক ৪০০ মাইল দূরে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে হিন্দুর পবিত্র তীর্থ বারাণসী অবস্থিত। এই স্থান হিন্দু সমাজে যেমন তীর্থের মধ্যে চির প্রসিদ্ধ, সেইরূপ জ্ঞান-গরিমার জন্য জ্ঞানী সমাজে চিরকাল সমাদৃত; পুণ্য-সলিলা গঙ্গা হইতে এই স্থান অতিরমণীয় দেখায়। ইহার অসংখ্য দেব-মন্দির বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সম্প্রদায় কর্ত্তৃক গঠিত হওয়াতে বৈচিত্র্য-জনক হইয়াছে। ইহার সমুন্নত প্রস্তরময় প্রাসাদাবলী শ্রেণীবদ্ধ থাকাতে, আলেখ্যবৎ রমণীয়তা অধিকতর বর্দ্ধিত করিয়া দিতেছে। এবং ইহার ঘাট সমূহের সোপানরাজী গঙ্গার তটভাগের শোভা দ্বিগুণিত করিয়া দিতেছে। হিন্দুর শিল্প চাতুরী ব্যতীত এই স্থান হিন্দু ধর্ম্ম ও হিন্দু শাস্ত্রের জন্যও আপনার প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিতেছে। গঙ্গাতটে স্নাত ব্যক্তিদিগের শত সহস্র কণ্ঠ হইতে যখন "হর হর শিব শিব" ধ্বনি সমুত্থিত হয়, সায়ং সময়ে যখন সামবিৎ সংযতচিত্ত ব্রাহ্মণগণ বিশ্বেশ্বরের আরতিতে ভক্তিরসার্দ্র হৃদয়ে সমস্বরে সামগান করেন, তখন হিন্দুর হৃদয়ে গভীর উদারভাবের সঞ্চার হইয়া থাকে। বহু শতাব্দী অতীত হইয়াছে, অদ্যাপি এই পবিত্র তীর্থের পবিত্রতার রেখামাত্রও বিচলিত হয় নাই। ভারতের

শেষ প্রতাপান্বিত মোগল সম্রাটের নির্ম্মিত মস্‌জিদ হিন্দুর দেবালয়ের পার্শ্বে রহিয়াছে, খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচারকদিগের বিদ্যালয় ও ভজনালয় স্থানে স্থানে স্থাপিত আছে, তথাপি পবিত্র বারাণসী তীর্থে পবিত্র হিন্দুধর্ম্মের মহিমা বিচলিত হয় নাই। সুকুমারমতি ব্রাহ্মণ বালকগণ আজ পর্য্যন্ত ইহার সর্ব্ব স্থানে কোমল কণ্ঠে সামগান করিয়া বেড়াইতেছে। তত্বজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ আজ পর্য্যন্ত এখানে বেদ বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া সাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতেছেন। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও পাশ্চাত্য সভ্যতায় ইহার চিরন্তন খ্যাতি বিলুপ্ত হয় নাই। মৌলবী ও মিশনরীদিগের চেষ্টায় ইহার পণ্ডিত ও পুরোহিতগণ ইহার চিরন্তন প্রথায় জলাঞ্জলি দেয় নাই।

কিন্তু বক্ষ্যমাণ সময়ে এই পবিত্র তীর্থের অধিবাসীগণ আপনাদের কর্ত্তব্য কার্য্যে অভিনিবিষ্ট থাকিয়া শান্তভাবে কালাতিপাত করে নাই। যে উত্তেজনা মিরাটবাসীদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছিল, দিল্লীর অধিবাসীদিগের মধ্যে পরিস্ফুট হইয়াছিল, তাহা এখন বারাণসীর লোকদিগের মধ্যে দেখা যাইতে লাগিল। ১৮৫৭ অব্দে গ্রীষ্মকালে খাদ্য দ্রব্য অতিশয় দুর্ম্মূল্য হয়। সাধারণ লোকের বিশ্বাস জন্মে যে, ফিরিঙ্গীদিগের শাসন দোষে তাহাদের আহার সামগ্রী দুর্ম্মূল্য হইয়াছে। এজন্য জন সাধারণ ক্রমে ব্রিটিশ শাসনের উপর বিরক্ত হইয়া উঠে। এতদ্ব্যতীত অন্য কারণে উত্তেজনার গতি প্রসারিত হইয়াছিল। দিল্লীর রাজবংশীয়গণের অনেকে বারাণসীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ইহাদের মন্ত্র এ সময়ে একেবারে ব্যর্থ হয় নাই। জাতীয় সম্মান ও জাতীয় ধর্ম্মের বিলোপ ভয়ে, ইহার উপর খাদ্য দ্রব্যের মূল্য বৃদ্ধিতে, বারাণসীর হিন্দু মুসলমান অনেকেই গভীর উত্তেজনার আবেগে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে থাকে।

নগরের তিন মাইল দূরে শিক্রোল অবস্থিত। ইউরোপীয়গন এই স্থানে বাস করিয়া থাকেন। এই স্থানে ইংরেজের সৈনিক নিবাস, আদালত, গির্জ্জা, গবর্ণমেণ্ট কলেজ, হাঁসপাতাল, ভ্রমণ উদ্যান প্রভৃতি সমস্তই রহিয়াছে। সৈনিক নিবাসে এই সময়ে তিন দল এতদ্দেশীয় পদাতিক ও কতিপয় ইউরোপীয় কামান-রক্ষক সৈন্য ছিল। এই তিন দল এতদ্দেশীয় সৈন্যের এক দল ৩৭ গণিত পদাতিক, আর এক দল লুধিয়ানার শিখ সৈন্য

এবং অপর দল ১৩ গণিত অশ্বারোহী। সর্ব্ব সমেত প্রায় দুই হাজার সৈনিক পুরুষ এই তিন দলে ছিল। ইংরেজ কামান রক্ষকের সংখ্যা ত্রিশ জন। হেন্‌রি টুকার এই সময়ে বারাণসীর কমিশনর; ফ্রেডরিক গবিন্স—জজ; ওলিণ্ট সাহেব ম্যাজিষ্ট্রেট্ ছিলেন। ইহারা মিরাট ও দিল্লীর শোচনীয় ঘটনার সংবাদ পাইয়া আপনাদের শাসনাধীন জনপদ নিরাপদ রাখিতে বিশেষ যত্নপর হন। কিন্তু তাঁহাদের যত্ন সফল হয় নাই। যে ঘটনা মিরাটে ও দিল্লীতে ঘটিয়াছিল, বারাণসীতেও তাহা সংঘটিত হয়।

জুন মাসের প্রারম্ভে সিপাহীদিগের কতকগুলি শূন্য গৃহ অগ্নিতে দগ্ধ হয়; ইহার পরে বারাণসীর ৬০ মাইল দূরবর্ত্তী আজিমগড় হইতে সংবাদ আইসে যে, তথাকার সিপাহীরা গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। আজিমগড়ের এই ১৭ গণিত সৈনিক দল মেজর বরুস নামক এক জন সৈনিক পুরুষের অধীনে ছিল। এই সৈনিক পুরুষ তাদৃশ তেজস্বী ছিলেন না। তিনি সিপাহীদিগের উত্তেজনার গতিরোধ করিতে অসমর্থ হইলেন। মে মাসের শেষে সিপাহীদিগকে যে অতিরিক্ত টোটা দেওয়া হয়, তাহা তাহারা ব্যবহার করিতে অসম্মত হয়। এই সময়ে নিদারুণ অর্থলোভ তাহাদিগকে অধিকতর উত্তেজিত করিয়া তুলে। পাঁচ লক্ষ টাকা ১৭ গণিত দলের কতিপয় সিপাহী ও ১৩ গণিত দলের কতিপয় অশ্বারোহীর তত্ত্বাবধানে গোরক্ষপুর হইতে আসিতেছিল। লেফটেনাণ্ট পালিসার এই সকল সৈন্যের অধিনায়ক ছিলেন। ঐ টাকা আজিমগড়ে পৌঁছিলে আজিমগড়ের উদ্বৃত্ত দুই লক্ষ টাকার সহিত উহা বারাণসীতে পাঠাইয়া দেওয়ার বন্দোবস্ত হয়। একবারে সাত লক্ষ টাকা নিকটে পাইয়া সিপাহীরা উহার জন্য সাতিশয় লোলুপ হয়। তাহারা প্রকাশ্যভাবে, আজিমগড় হইতে টাকা পাঠাইবার প্রতিকূলতা করিতে থাকে। এই প্রতিকূলতা কিছু সময়ের জন্য দূর হয়। মুদ্রা রক্ষকগণ ৩রা জুন উক্ত সাত লক্ষ মুদ্রা লইয়া আজিমগড় হইতে যাত্রা করে। কিন্তু স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ বুঝিতে পারিল যে, ইহাতে বিপদের শান্তি হইল না। উত্তেজিত সিপাহীরা এক সময়ে প্রকাশ্য ভাবে গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হয়। অফিসরেরা আপনাদের পরিবারবর্গের সহিত ১৭ গণিত সৈনিক দলের সিপাহীদিগের লাইনে আহার করিতেছিলেন, এমন

সময়ে তাঁহাদের আশঙ্কা ফলবতী হইল। তাঁহারা অদূরে কামানের ধ্বনি শুনিতে পাইলেন। এই শব্দ যে কাওয়াজের প্রশস্ত ক্ষেত্রের দিকে হইতেছে, ইহা তাঁহাদের স্পষ্ট বোধ হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে রণবাদ্য বাজিয়া উঠিল; সুতরাং ব্যাপার কি বুঝিবার জন্য সংবাদবাহকের কোন প্রয়োজন হইল না। তাঁহারা স্পষ্ট বুঝিতে পারিলেন যে, সমস্ত সিপাহী তাঁহাদের বিরুদ্ধে সমুত্থিত হইয়াছে। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে গভীর সন্ত্রাস উপস্থিত হইল। ইউরোপীয় মহিলাগণ ও সামরিক কার্য্যে অনভ্যস্ত পুরুষেরা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিল। জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট ও তাঁহার সহযোগীগণ কাছারি গৃহ সুরক্ষিত করিয়াছিলেন। অন্যান্য ইউরোপীয়েরা কুলনারীগণের সহিত এই স্থানে আসিয়া আশ্রয় লইলেন। এ দিকে সিপাহীরা আপনাদের কোয়ার্টার মাষ্টার ও কোয়ার্টার মাষ্টার সার্জ্জেণ্টকে হত্যা করিল; কিন্তু অন্যান্য অফিসরদিগের কোন ক্ষতি করিল না। এই ঘোরতর উত্তেজনার সময়েও সিপাহীরা আপনাদের অফিসরদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্র সঞ্চালন করে নাই। তাহারা ধন সম্পত্তি বিলুণ্ঠিত করিয়াছে; কারাগারের কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দিয়াছে; ইউরোপীয়দিগের অধ্যুসিত গৃহ সকল জ্বলন্ত হুতাশনে দগ্ধ করিয়া ফেলিয়াছে; এইরূপে সর্ব্বত্রই তাহাদের ভয়াবহ উত্তেজনার চিহ্ন বিকাশ পাইয়াছে। কিন্তু তাহারা অনেক সময়ে আপনাদের অফিসরদিগের সহিত সদয় ব্যবহার করিতে পরাঙ্মুখ হয় নাই।

আজিমগড়ের সিপাহীরা অফিসরদিগকে হত্যা না করিয়া যে টাকা বারাণসীতে যাইতেছিল, তাহা হস্তগত করিবার জন্য ধাবিত হইল। সেনানায়ক পলিসাহেবের রক্ষণাধীন ভৃত্য সকল দ্রব্য সামগ্রী রক্ষায় অসমর্থ হইল। সমস্তটাকা সিপাহীদিগের হস্তগত হইল। কিন্তু সিপাহিদিগের অফিসরেরা প্রাণে বিনষ্ট হইলেন না। ১৭ গণিত সিপাহীরা এই সময়ে অফিসরদিগের প্রতি সদয় ব্যবহারের এক শেষ দেখাইয়া ছিল। তাহারা আপনাদের অফিসরদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া কহে, যে,তাহাদের কেশাগ্রও স্পর্শ করা হইবে না, তাহারা তাঁহাদিগকে আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিবে। উত্তেজিত সিপাহীদিগের কেহ কেহ কোন কোন অফিসরকে হত্যা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছে, এজন্ত গাড়ীতে উঠিয়া

সকলের তাড়াতাড়ি প্রস্থান করা উচিত।—আফিসরেরা কহিলেন, "এখন কিরূপে আমাদের গাড়ী পাওয়া যাইবে?" সিপাহীরা কহিল, "না পাওয়া যায়, আমরা আপনাদিগকে পৌঁছিয়া দিব।" ইহা কহিয়া তাহাদের কয়েকজন আফিসরকে সঙ্গে করিয়া ষ্টেসন হইতে গাজীপুরের দিকে দশ মাইল পর্য্যন্ত গিয়াছিল। তাহারা যে টাকা হস্তগত করিয়াছিল, তাহা হইতে আফিসরদিগের এক মাসের বেতন দিতে চাহিয়াছিল। এ সময়ে সিপাহীরা আপনাদের আফিসরদিগের প্রতি এরূপ দয়া ও সৌজন্য দেখাইয়াছিল। তাহারা অভীষ্ট অর্থ লইয়া আজিমগড়ে ফিরিয়া আসিল। তাহাদের কেহ কেহ আফিসরদিগকে নিরাপদ স্থানে পৌঁছিয়া দিবার জন্য সঙ্গে গেল। ইহার মধ্যে আজিমগড়ের ইউরোপীয়েরা গাজীপুরে পলায়ন করিল। সিপাহীরা আসিয়া দেখিল, গাজীপুরে কোন ইউরোপীয় নাই, কাছারি, সৈনিক নিবাস সমুদয় শূন্য পড়িয়া রহিয়াছে। তাহারা বিজয়োল্লাসে আড়ম্বরের সহিত ফৈজাবাদের অভিমুখে প্রস্থান করিল।

লক্ষ্মীর কথা।

নীলগঞ্জে ছিল বাস, নাম তার প্রেমদাস,
চাষা পুত্র, চাষ করে খায়।
সাত ছেলে ছিল তার, তাহাদের বধূ আর
সবে মিলে বড় দুঃখ পায়॥

দুবেলা না যোড়ে ভাত, উপবাসে কাটে রাত,
বস্ত্রাভাবে, ছিন্ন-বাস পরে।
খেটে খেটে হাড় মাটী, দ্বিপ্রহরে ফিরে বাটী,
তৈলাভাবে, রুক্ষ স্নান করে॥

নানাবিধ করে চাষ, তবুও না পূরে আশ,—
কমলার কৃপা নাহি ছিল।

এক দিন শুন সবে, বিস্তারিয়ে কহি তবে,
তাহাদের, কিরূপ ঘটিল ॥

লক্ষ্মীসহ চড়ি রথে, একদিন সেই পথে,
নারায়ণ, করেন গমন।
দুঃখ দেখে কৃষকের, দয়া হলো তাঁহাদের,
ধন দিতে, করেন মনন ॥

সুন্দর শস্যের শোভা, আহা কিবা মনলোভা,
নেত্র পড়ে তিল-ক্ষেত্র প্রতি।
কমলা সে ফুল তুলে, পরিয়া মাথার চুলে,
পুলকিত হইলেন অতি ॥

তাই দেখে নারায়ণ, ছল করি তাঁরে কন,
কি অন্যায় করিলে কমলা।
গাছ গুলি হলো নষ্ট, কৃষকের কত কষ্ট,
প্রকাশিয়ে, নাহি যায় বলা ॥

আমার বচন ধর, অন্যথা কভু না কর,
থাক হেথা একই বৎসর।
বিলম্বে নাহিক ফল, চাষাদের গৃহে চল,
এত বলি হন অগ্রসর ॥

নারায়ণ আগে আগে, কমলা পশ্চাৎভাগে,
চাষা-বাটী, হন উপস্থিত।
কৃষক রমণী সতী, ব্যাকুলিতা হয়ে অতি,
নিকটেতে আইল ত্বরিত ॥

কহে ধনী সম্ভাষিয়া, "আগমন কি লাগিয়া,
কে বট তোমরা, দুইজন।

করি আমি অনুমান, হবে কোন ভাগ্যবান,"
শুনি তাবে নারায়ণ কন॥
"শুন চাষা অর্দ্ধাঙ্গিনি, আমাব রমণী ইনি,
জাতিতে ব্রাহ্মণ, কুলনাবী।
এঁবে যদি দয়া কবে, রাখ তোমাদেব ঘরে,
উপকাব হয় মোব ভাবী॥"
কৃষক কামিনী কয়, শুন দ্বিজ মহাশয়,
করযোড়ে কবি নিবেদন।
আমবা না পাই খেতে, চা' এঁবে বেখে যেতে,
কেমনেতে, কবিব পালন॥"
বধূরা শুনিতে পেয়ে, অমনি আসিল ধেয়ে,
বলে, "মা গো রাখুন ওঁযারে।"
আমবা খাইব যাহা উনিও খাবেন তাহা,
এত বলি রাখিল তাহারে॥
"যখন আসিব ফিবে, লয়ে যাব বমণীবে,"
বলিয়া গেলেন নারায়ণ।
কৃষকেব বধূগণে, আনন্দিত হয়ে মনে,
একে একে বন্দিল চবণ॥
কমলা সন্তুষ্ট অতি, আশীর্ব্বাদ কবি সতী,
তাহাদেব কন সম্ভাষিয়া।
"সংসাবেব 'পাট' নিয়ে সকলে সাবগে গিয়ে,
নেয়ে এস নদীতে যাইয়া॥"
শুনি চাষা বধূগণ, কবে তাঁরে নিবেদন,
"এক্ষণেতে কি কাজ করিব।
কিছুই নাহিক ঘরে, আনিবেন দ্বিপ্রহরে,
তেল মেখে তখন যাইব॥"

শুনিয়া তাদের বাণী, কন লক্ষ্মী ঠাকুরাণী,
ঘরগুলি ঝাঁট দাও গিয়ে।
কাজ সারা হলে পরে, তেল মেখে থপ করে,
সকলে আইস ডুব দিয়ে ॥”

কৃষকের বধূগণ, সকলেতে ততক্ষণ,
নিজ নিজ ঘর ঝাঁট দিল।
সবে মিলে তার পরে, প্রবেশ করিয়া ঘরে,
তেল পূর্ণ ভাঁড়, নিরখিল ॥

আহ্লাদ না ধরে দেখে, সকলেতে তেল মেখে,
স্নান লাগি করিল গমন।
কমলার কটাক্ষেতে, অট্টালিকা সেখানেতে,
নির্ম্মাণ হইল ততক্ষণ ॥

পরিধেয় বস্ত্র কত,— আহারীয় দ্রব্য যত,
রাখেন প্রচুর পরিমাণে।
স্নান করি বধূগণ, আসি করি দরশন,
সবে চায় তাঁর মুখ পানে।

লক্ষ্মী কন সম্ভাষিয়া, সবে জল খাও গিয়া,
বেলা হলে পিত্ত পড়ে যাবে।
ভিজা বস্ত্র ত্যাগ করে, যাহা কিছু থাকে ঘরে,
তাই নিয়ে সকলেতে খাবে ॥”

ঘরে গিয়ে বধূগণে, আশ্চর্য্য মানিয়ে মনে,
বস্ত্র ছেড়ে করিল ভক্ষণ।
আহারান্তে সবে এসে, কমলার কাছ ঘেঁসে,
একে একে বসিল তখন ॥

তখন গিন্নীর প্রতি, কহেন কমলা সতী,
"যাও গো মা সদর-মহলে।
তোমার সন্তানগণ, না জানিয়া এ ভবন,
ঘূরে ঘূরে, বেড়াবে সকলে॥

তাহারা আসিলে পরে, ডাকিয়া আনিয়া ঘরে,
আহারের, দ্রব্য সবে দিবে।
জল খেলে ঠাঁই করে, যাইয়া রন্ধন-ঘরে,
ভাত দিতে আমারে ডাকিবে॥"

সে কথা শুনিয়া সতী, তখনই দ্রুতগতি,
বহির্দ্বারে, করেন গমন।
হেরিলেন নয়নেতে, স্বামী পুত্র সকলেতে
করিতেছে বাটী অন্বেষণ॥

তখন ডাকিয়া আনি, সবা প্রতি কন বাণী,
"এসো সবে বাটীর ভিতর।"
কিছুই না জানে তারা, সকলেই দিশাহারা,
পিছু পিছু হয় অগ্রসর॥

ঘরেতে বসায়ে সবে, খাদ্য দ্রব্য আনি তবে,
কহিলেন, করিতে ভোজন।
লক্ষ্মীরে সংবাদ দিয়ে, কাছে এসে বিস্তারিয়ে,
সবিশেষ, বলেন তখন॥

শুনিয়া আশ্চর্য্য সবে, মুখ হাত ধুয়ে তবে,
বস্ত্র ছাড়ি, আনন্দেতে খায়।
সকলে এসেছে বাড়ী, শুনি লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি,
ভাত দেন, স্বর্ণ থালায়।

সবার আহার হ'লে, বাহিরেতে গেলে চ'লে,
গিন্নীরে ডাকিয়া তবে কন।
"বসো সবে থালা নিয়ে, ভাত আমি যাই দিয়ে,
হইযাছে বেলা অতিশয়।"

এই কথা আকর্ণিযা, গিন্নী কয় সম্ভাষিযা,
"আমাদের বেশী, বেলা নয়॥
বেলা হোল আপনার, বিলম্ব করোনা আর,
মাগো তুমি, আগে খেয়ে নাও।
পাতের প্রসাদ নিয়ে, বসিব সকলে গিয়ে,
তার পরে, আমাদের দাও॥"

"রান্ধুনী আগেতে খায়, এতো নাহি দেখা যায়,
কেন কহ, এরূপ বচন।
অন্নাদি ব্যঞ্জন আর, প্রয়োজন হবে যার,
চাহিলে গো, কে দিবে তখন?"

তা শুনিযা ব্যস্ত হযে, গিন্নী বধূগণে লযে,—
বসিলেন থালা লযে সবে।
রান্না ঘরে প্রবেশিয়ে, পঞ্চাশ ব্যঞ্জন দিযে,
লক্ষ্মী দেবী ভাত দেন তবে॥

তাঁদের আহার হলে, আমি খেতে যাই বলে,
নিজ অংশ, রাখেন পুঁতিয়া।
এইরূপে রোজ রোজ, কৃষকেরা খায় ভোজ,
সুখে যায়, সময় কাটিয়া॥

এক দিন বলে সবে, "গঙ্গাপূজা দিতে হবে,
রেখে ছিনু মেনে বহুকাল।

এখন ফিরিবার বেলা, আর না করিব হেলা,—
চলো সবে, পূজা দিব কাল।”
কৃষকেরা আয়োজন, করিলেক ততক্ষণ,
পরদিন, পূজা দিতে যায়।
এক কড়া কড়ি লয়ে, লক্ষ্মী দ্রুতগতি হয়ে,
হেনকালে, কহেন সবায়॥

“ফুল কিনে এই দামে, দিবে তাঁরে মোর নামে ;”
সে কথায়, সায় তারা দিল।
পূজা দিয়ে ঘটা করে, সবে ফিরিতেছে ঘরে,
তার কথা মনে না পড়িল॥

অর্দ্ধ পথে পড়ে মনে, ফিরি সবে ততক্ষণে,
ফুল নিতে যায় ব্যস্ত হয়ে।
কড়ি পেয়ে সেই মালী, ঝাঁকা শুদ্ধ দিল ডালি,
বলে “মাগো সব যাও লয়ে॥”

সকলে বিস্ময় হয়, মনে মনে সবে কয়,
এ যে অতি অদ্ভুত ঘটন।
মোরা দিনু এত টাকা, তবু নাহি দিল ঝাঁকা,—
এইরূপ করে আন্দোলন॥

ভাসিয়া বিস্ময় নীরে, গিয়ে সবে গঙ্গাতীরে,
পুষ্প গুলি জলে দিল ছুড়ে।
গঙ্গাদেবী তা পাইয়া, দুই হস্ত বিস্তারিয়া,
লইলেন উঠি জল ফুঁড়ে॥

দেখি কয় চাষা জায়া, কোন দেবী করি মায়া,
এসেছেন মোদের ভবন।

এত ভাবি তাড়াতাড়ি, সকলে ফিরিয়া বাড়ী,
গিয়া তাঁর বন্দিল চরণ॥

কান্দিয়া কহিল সবে, "কিসে মাগো মুক্তি হবে,
করিয়াছি কত অপরাধ।
নিজগুণে করি দয়া, শুন গো মা পদ্মালয়া,
পুরাও সবার মনো সাধ॥"

শুনিয়া কমলা কন, কাঁদ কেন অকারণ,
তোমাদের নাহিক ভাবনা।
আশীর্ব্বাদ করি সবে, সুখী হয়ে থাক ভবে,
পূর্ণ হোক সবার বাসনা॥

উঠানে অগণ্য ধন, করিয়াছি সংস্থাপন,
তোমাদের রবে চির সুখ।
আবশ্যক যবে হবে, খনন করিয়া লবে,
কেহ না জানিবে, কভু দুখ॥"

লক্ষ্মী কহিছেন কথা, নারায়ণ আসি তথা,
হেন কালে, উপস্থিত হন।
কাটিল একই বর্ষ, লক্ষ্মীর হইল হর্ষ,
করিলেন স্বর্গেতে গমন॥

—

নবজীবন।

৫ম ভাগ। { বৈশাখ, ১২৯৬। } ৮-১১ ৫ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

এই প্রবাহ ধারায় প্রবাহিত মহাদুঃখ নিচয়ের মূল অবিদ্যা। সেই অবিদ্যার উচ্ছেদের প্রতি একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানই কারণ। যেমন চিকিৎসা শাস্ত্রের চারিটি ব্যূহ বা সোপান আছে (১) রোগ, (২) রোগ হেতু, (৩) ঔষধ, (৪) আরোগ্য,—সেইরূপ তত্ত্ব শাস্ত্রেরও চারিটি ব্যূহ বা সোপান আছে; যেমন (১) সংসার, (২) সংসারের হেতু, (৩) মোক্ষের উপায় এবং (৪) মোক্ষ। এই দুঃখ বহুল সংসার হেয় অর্থাৎ পরিত্যজ্য, এই পরিত্যজ্য সংসারের প্রতি প্রকৃতি পুরুষের সংযোগই হেতু। ঐ সংযোগের অতিশয় নিবৃত্তির নামই মোক্ষ; সেই মোক্ষের উপায় তত্ত্বজ্ঞান অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপ দর্শন। কোন কোন নাস্তিক বলিয়াছিল প্রকৃতি পুরুষের সংযোগ নিবৃত্তির নাম মোক্ষ যে বলিতেছ, তাহা অপেক্ষা চিৎরূপ আত্মার পরিত্যাগকে মোক্ষ বলা অতি সহজ। অর্থাৎ সংসার বিজ্ঞানের উচ্ছেদ দ্বারা জীবন্মুক্তি বিষয়ক বিজ্ঞান লাভই মোক্ষ। ইহার উত্তরে ভাষ্যকার বলেন, আত্মা হেয় বা উপাদেয় হইতে পারে না, কারণ আত্মার হেয়ত্ব স্বীকার করিলে আত্মার উচ্ছেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে আত্মার উচ্ছেদ হইলে সকল কথাই ফুরাইয়া গেল; কারণ আত্মার উপকারের জন্যই পুরুষার্থ লাভের চেষ্টা, সেই আত্মাকেই যদি ত্যাগ করিতে হইল, তবে কাহার জন্য পুরুষার্থ বিষয়ে চেষ্টা হইবে? আর আত্মার উপাদেয়ত্ব স্বীকার করিলে আত্মাকে কার্য্য বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। এক্ষণে

দেখ কার্য্য মাত্রেই অনিত্য, কাজেই আত্মার অনিত্যতা স্বীকার না করিয়া আর থাকিতে পারা যায় না। তবে অনিত্য বস্তুর মোক্ষ লাভের জন্য চেষ্টাই নিষ্প্রয়োজন। কাজেই আত্মা হেয় বা উপাদেয় নয। আত্মার হেয়ত্ব উপাদেয়ত্বের নিষেধ হইতেই আত্মার নিত্যত্ব সিদ্ধ হইল। এই পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্যূহ শালি যোগ শাস্ত্র হইতেই আত্মার সম্যক্ দর্শন অর্থাৎ জ্ঞান হয। এই যোগ শাস্ত্রই আত্মার স্বরূপ জ্ঞানের একমাত্র উপায়। এক্ষণে ক্রমে উক্ত চারি প্রকার ব্যূহের স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

হেয়ং দুঃখ মনাগতম্। ১৬॥

পদচ্ছেদঃ। হেয়ং, দুঃখং, অনাগতম্।

পদার্থঃ। ন আগতং অনাগতং অভুক্তং ভাবীতিযাবং দুঃখং সাংসারিকঃ ক্লেশঃ হেযং হাতব্যম্।

অন্বযঃ। অনাগতং দুঃখং হেযং ভবেৎ ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। অতীতং হি দুঃখং সম্ভোগেনৈবাতিবাহিতং ন হেযপক্ষে বর্ত্ততে, বর্ত্তমানঞ্চ তৎক্ষণমেবানুভূয়মানং ন ক্ষণান্তরে হেযতামাপদ্যতে তস্মাৎ অনাগতং অদ্যাপ্যননুভূয়মানমেব দুঃখং যোগিনং ক্লিশ্নাতীতি তদেব হেয়তামাপদ্যতে ইতি তদেব হাতব্যম্।

অনুবাদ। অনাগত অর্থাৎ যে সকল দুঃখের অদ্যাপি অনুভব হয় নাই, তাহারাই হেয অর্থাৎ পরিত্যাগ-যোগ্য।

সমালোচন। যে সকল দুঃখ অতীত হইযাছে, তাহারা ত একপ্রকার উপভুক্ত, তাহাদের পরিত্যাগ আর কিরূপে সম্ভব হয়! আর যাহারা বর্ত্তমান, তাহাদের ত ভোগ হইতেছে, তাহারাও হেয হইতে পারে না, কারণ একবার এসে যখন আমল করেছে, তখন তাহাদের আস্বাদও হইতেছে, আর তাহাদিগকে ছাড়ান যেতে পারে না। অনাগত অর্থাৎ এখনও আসে নাই, যাহারা ভাবী, তাহাদিগকেই পরিত্যাগ করা উচিত। যদি বল যে সকল দুঃখ আসে নাই, তাহাদের জন্য ক্লেশও নাই এবং ভবিষ্যতের উদরে থাকায় তাহারা আসিবে এরূপ কোন নিশ্চয়ও নাই, তবে তাহাদের পরিত্যাগ কেন? ইহাতে ভাষ্যকার বলেন যে ভবিষ্যৎ দুঃখ সকল মোহাবৃত চিত্ত সাধারণ ব্যক্তির ক্লেশ-

কর না হইতে পারে, কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরা উহাদের অবশ্যম্ভাবিতা বুঝিতে পারিয়া ঐ সকল দুঃখ হইতে অশেষ প্রকার ক্লেশ ভোগ করেন; অতএব তাঁহাদের পক্ষে উহা অবশ্য পরিত্যজ্য। যদি বল চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ স্বভাবত নির্ম্মল, তাঁহার সহিত আদৌ দুঃখের সম্বন্ধ নাই। ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, দুঃখের সহিত পুরুষের সাক্ষাৎ কোন সম্বন্ধ না থাকিলেও, পরম্পরায় ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ আছে, সেই ভোক্তৃত্ব সম্বন্ধ পরিত্যাগই দুঃখের পরিত্যাগ। সেই দুঃখ নিবৃত্ত হইলে পুরুষকে পুনর্ব্বার আর তাপত্রয়ের অধীন হইতে হয় না। এই নিমিত্ত ন্যায়াদি শাস্ত্রে দুঃখ নিবৃত্তিকেই পুরুষার্থ বলা হইয়াছে। হেয় কি তাহা বলা হইল, এক্ষণে সেই হেয়ের কারণ নির্দ্দেশ করিতেছেন।

দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ সংযোগো হেয়-হেতুঃ। ১৭ ॥

পদচ্ছেদঃ। দ্রষ্টৃ-দৃশ্যয়োঃ, সংযোগঃ হেয়-হেতুঃ।

পদার্থঃ। পশ্যতে বুদ্ধ্যারূঢানি বস্তুজাতানীতি দ্রষ্টা চিদ্রূপঃ পুরুষঃ, দৃশ্যন্তে পুরুষেণ ইতি দৃশ্যাঃ বুদ্ধি সত্ত্বোপারূঢাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ, দ্রষ্টা চ দৃশ্যাশ্চ তেষাং সংযোগঃ ভোগ্যভোক্তৃত্বরূপসম্বন্ধেন সন্নিধানং হেয়স্য দুঃখস্য গুণপরিণামরূপ সংসারস্যেত্যর্থঃ হেতুঃ কারণম্।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সুখদুঃখমোহাত্মকদৃশ্যশালিন্যা বুদ্ধ্যা সহ দ্রষ্টুঃ সাক্ষিণঃ পুরুষস্য কাষ্ঠাগ্নিবৎ সম্বন্ধো বন্ধাখ্যঃ পুরুষস্য দুঃখহেতুঃ। ন তু বুদ্ধ্যারূঢে দৃশ্যে দ্রষ্টু জ্ঞানরূপঃ সংযোগো হেয়হেতুরত্র বিবক্ষিতঃ স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ ইত্যাগামি সূত্রেণাস্য সংযোগস্য জ্ঞানহেতুত্বেনৈব লক্ষণীয়ত্বাৎ ন তু জ্ঞান রূপত্বেন।

অনুবাদ। দ্রষ্টা চৈতন্য স্বরূপ পুরুষ, দৃশ্য বুদ্ধির গোচরীভূত বস্তু সমূহ—এই উভয়ের সংযোগ ভোগ্য ভোক্তৃত্বরূপ সম্বন্ধে সন্নিধানই দুঃখের হেতু।

সমালোচন। হেয় কি তাহা পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইল। হেয় শব্দের ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ পরিত্যজ্য বা পরিহরণীয়। যাহার হাত হইতে আপনাকে সর্ব্বতো-

ভাবে রক্ষা করা কর্ত্তব্য তাহাই হেয়। দুঃখই একমাত্র হেয়। ইহার মধ্যে সূত্রকার একটু সূক্ষ্ম বাহির করিয়াছেন। তিনি বলেন হেয় শব্দের অর্থ পরিহরণীয়; অতএব যে দুঃখ হইয়া গিয়াছে অথবা বর্ত্তমান, যাহা উপস্থিত, যাহা পরিহার করিতে পারা যায় নাই, তাহা আর পরিহরণীয় হইবে কিরূপে? অতএব যাহা আসে নাই, যাহা অদ্যাপি ভবিষ্যৎ গর্ভে নিহিত তাহাই হেয়। এ বিষয় বক্তব্য পূর্ব্বেই বলা হইযাছে। আমাদের বর্ত্তমান সমালোচ্য সূত্রে হেয় শব্দ ঠিক্ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। ইহা দুঃখ সামান্যরূপ অর্থেই ব্যবহৃত হইযাছে। কি অতীত, কি বর্ত্তমান আর কি ভবিষ্যৎ সকল প্রকার দুঃখের নিদান অনুবাদোক্ত চৈতন্য এবং বুদ্ধিতে আরূঢ় বস্তু নিচয়ের সংযোগ। যত দিন হইতে ঐ সংযোগ আরব্ধ হইযাছে, তত দিন হইতে দুঃখের আরম্ভ এবং যতদিন পর্য্যন্ত ঐ সংযোগ থাকিবে ততদিন অবধি দুঃখের বিরাম নাই। ঐ সংযোগকে শাস্ত্রকারেরা 'বন্ধন' বলিয়া নির্দ্দেশ করিযাছেন। তাহাদের মতে বন্ধন অনাদি সুতরাং অনাদিকাল হইতেই দুঃখের উৎপত্তি, বন্ধন অনাদি বটে কিন্তু অনন্ত নয়। তত্ত্বজ্ঞান হইলে উহার নাশ হইবে, সেই সঙ্গে দুঃখেরও নাশ হইবে।

ইহার পূর্ব্বে বলা হইয়াছে আমাদের চৈতন্য শক্তির নামই পুরুষ ও উহা নির্ম্মল স্বচ্ছ এবং অত্যন্ত পালিশকরা পদার্থের ন্যায় মসৃণ সুতরাং নলিনী পত্রে যেমন জল বিন্দু অবস্থান করিতে পারে না, সেইরূপ পুরুষেও কোন ধর্ম্ম বা গুণ আশ্রয় করিয়া থাকিতে পারে না এবং শাণদ্বারা সংস্কৃত হীরকাদি মণিতে যেরূপ কোন রঙ্গের লেপ লাগে না, সেই রূপ পুরুষেও কোন বস্তুর লেপ লাগে না, পুরুষ সহজেই নির্লিপ্ত এবং বিশুদ্ধ ইহা দ্বারা সিদ্ধ হইল, যে পুরুষের হিত কোন বস্তুর আধার আধেয় সংযোগ বা সমবায় আদি সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই, তবে যে সূত্রে দুঃখের কারণ সংযোগ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সে সংযোগ কিরূপ?

উপরের দৃষ্টান্ত দ্বারা সিদ্ধ করিয়াছি, পুরুষ কোন বস্তুর আশ্রয় হইতে পারে না, বা উহাতে কোন বস্তুর লেপ লাগে না। ইহা সম্পূর্ণ সত্য কিন্তু সংস্কৃত হীরক বা স্ফটিক মণিতে সম্মুখ বস্তুর ছায়া বা প্রতিবিম্ব পতিত হয় এবং ঐ প্রতিবিম্ব দ্বারা হীরকাদি উজ্জ্বল মণিতে সেই প্রতিবিম্বিত বস্তুর রঙ্

সংক্রামিত হয়।' হীরকাদির সম্মুখে কোন রূপ রক্ত বস্তু থাকিলে হীরকের রঙ্ লাল হয়, নীল বর্ণ থাকিলে নীল হয়, আর জবাফুল থাকিলে উহার রঙ্ জবাফুলের মত হয়। সেই রূপ আত্মাতেও সম্মুখস্থ বস্তু প্রতিবিম্বিত হয়, এবং ঐ প্রতিবিম্ব দ্বারা প্রতিবিম্বিত বস্তুর গুণ বা ধর্ম্ম উহাতে সংক্রামিত হয়।

বুদ্ধি এবং চৈতন্য এরূপ ভাবে অবস্থিত যে, যেমন অপর বস্তুর প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে পতিত হয়, সেই রূপ বুদ্ধির প্রতিবিম্ব আসিয়া চৈতন্যে পতিত হয়। এই জন্য চৈতন্যকে দ্রষ্টা বা বুদ্ধির সাক্ষী বলা হইয়াছে। বুদ্ধিতে কেবল যে ঘটপটাদি বাহ্য বস্তুর প্রতিবিম্ব পতিত হয়, তাহা নহে। প্রকৃতি, অহঙ্কার প্রভৃতির এমন কি আত্মার প্রতিবিম্বও বুদ্ধিতে পতিত হয়। ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, বাহ্য বা অন্তর্বিন্দ্রিয়দ্বারা বস্তুর প্রতিবিম্ব আসিয়া বুদ্ধিতে পতিত হয় এবং সেই সকল প্রতিবিম্ব-গর্ভিত বুদ্ধির প্রতিবিম্ব, যখন আত্মার চৈতন্যে আসিয়া পতিত হয়, তখন সেই সকল বস্তুর জ্ঞান বা দর্শন হয়, এই জন্য যাবৎ বস্তুর প্রতিবিম্ব বুদ্ধিতে আসিয়া পতিত হয়, তাহারা সকলেই দৃশ্য। এ হিসাবে আত্মাও দৃশ্য, তবে আত্মা না স্বভাবত দুঃখশূন্য, সুতরাং তাহার দর্শনও দুঃখপ্রদ নহে অর্থাৎ আত্মপ্রতিবিম্ব-গর্ভিত বুদ্ধির প্রতিবিম্ব আত্মাতে পতিত হইয়া, যে আত্মবিষয়ক জ্ঞান উৎপাদন করে, তাহা কেবল আনন্দ ময়, তাহাতে দুঃখের লেশও নাই। এই জন্য এস্থলে দৃশ্য শ্রেণীর মধ্যে আত্মার গণনা নাই। দৃশ্য বলিতে এখানে আত্মা ভিন্ন বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত সমুদয় বস্তুই ধরিতে হইবে। দ্রষ্টা এবং দৃশ্য উভয়ই বলা হইল। ইহাদের সংযোগই দুঃখের হেতু। সংযোগ শব্দের অর্থ সন্নিকর্ষ বা সান্নিধ্য। এই মাত্র বলা হইল যে, আধার আধেয় প্রভৃতি সংযোগ বা সমবায় সম্বন্ধে আত্মার সহিত কোন বস্তুর সান্নিধ্য হইতে পারে না, অতএব অন্য সম্বন্ধে বলিতে হইবে। অন্য আর কি? স্বস্বামিভাব বা ভোগ্যভোক্তৃত্বরূপ সম্বন্ধে। অয়স্কান্তমণি যেমন সান্নিধ্য মাত্রেই অপর বস্তুর স্বর্ণত্ব সম্পাদন করে, সেই রূপ বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত দৃশ্য সমূহ, যখন আত্মাতে প্রতিম্বিত হয়, তখন আত্মাতে একটি আত্মীয় ভাবের উদয় করে। যাহার দ্বারা আত্মার ঐ সকল বস্তুর উপর নিজের বলিয়া একটা মমতা হয়। আত্মা বিবেচনা করেন, এই সকল দৃশ্য

আমার ভোগ্য, আমিই ইহাদের এক মাত্র ভোক্তা, ইহারা আমার সম্পূর্ণ অধীন, আমিই ইহাদের প্রভু ইত্যাদি। ইহাকেই ভোগ্য ভোক্তৃত্ব বা স্বসামিভাব সম্বন্ধ বলে। এই সম্বন্ধে চৈতন্যরূপ পুরুষ এবং দৃশ্য সমূহের যে সন্নিকর্ষ, তাহাই জগতের যাবতীয় দুঃখের মূল। কারণ জাগতিক বস্তুমাত্রেই ত্রিগুণ সুতরাং প্রত্যেকেই সুখদুঃখ মোহ স্বভাব, অতএব ঐ সকল বস্তুর উপর মমতা জন্মাইলে যে অবশ্য দুঃখ হইবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভাষ্যকার বলেন ঐ সংযোগের কারণ অনুসন্ধান করিতে পারিলে দুঃখের আত্যন্তিক প্রতীকার হইতে পারে। কারণ যাহা হইতে ঐ সংযোগ হইয়াছে, তাহার পরিহার করিতে পারিলেই, দুঃখের প্রতীকার হয়। দুঃখের কারণ জানিতে পারিয়া তাহা পরিত্যাগ করিতে পারিলে যে দুঃখের নিবৃত্তি হয় জগতে সেরূপ দৃষ্টান্তের অসদ্ভাব নাই। কারণ যদি জানিতে পারা যায় কণ্টক পায়েয় ভেদক, এবং পা কণ্টকের ভেদ্য, তাহাহইলে অনেক প্রকারে ঐ কণ্টক হইতে পাকে বাঁচান যাইতে পারে। (১) কণ্টকাকীর্ণ স্থানে না যাওয়া, (২) পাদুকা ব্যবহার করা ইত্যাদি। যে এই সন্ধান জানে, সে আর কখনই কাঁটাফোটার জন্য কষ্ট ভোগ করে না।

সত্ত্ব, রজঃ ও তম, এই গুণত্রয়ের পরস্পর তপ্য তাপক ভাব থাকিলেও উহাদের মধ্যে তীব্রকে তাপক এবং মৃদুকে তপ্য বলিয়া কল্পনা করা হয়। সত্ত্ব তপ্য এবং রজঃ তাপক। সেই তপ্যমান সত্ত্বের প্রতিবিম্ব নির্ম্মল দর্পণ স্বরূপ পুরুষে নিপতিত হইলে, পুরুষ সেই তপ্যমান সত্ত্বের সহিত একরূপতা প্রাপ্ত হইয়া আপনিও অনুতপ্ত হয়। ইহাতেই আমাদের দুঃখ। এই দুঃখের প্রতীকার করিতে হইলে যাহাতে বুদ্ধিতে অপর বস্তুর প্রতিবিম্ব না পড়ে, এই চেষ্টা করিতে হয় অর্থাৎ অন্য প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া কেবল নির্ম্মল চৈতন্য স্বরূপ পরমাত্মার চিন্তাতেই কাল অতিবাহিত করিবার চেষ্টা করিতে হয়।

প্রকাশক্রিয়াস্থিতি শীলং—ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভোগাপবর্গার্থং দৃশ্যম্। ১৮॥

পদচ্ছেদঃ। প্রকাশ-ক্রিয়া-স্থিতি-শীল, ভূত-ইন্দ্রিয়-আত্মকং ভোগ-অপবর্গ অর্থং দৃশ্যম।

পদার্থঃ। প্রকাশ ঔজ্জ্বল্যং সত্ত্বস্য ধর্ম্মঃ। ক্রিয়া প্রবৃত্তিরূপা রজসঃ ধর্ম্মঃ। স্থিতিনিয়মরূপা তমসঃ তাঃ প্রকাশক্রিয়াস্থিতয়ঃ শীলং স্বাভাবিকং রূপং যস্য তৎ তথাবিধং ভূতেন্দ্রিয়াত্মকং ভূতানি স্থূলসূক্ষ্মভেদেন পৃথিব্যাদীনি তন্মাত্রাদীনি চ, ইন্দ্রিয়াণি, বুদ্ধীন্দ্রিয়কর্ম্মান্তঃকরণভেদেন ত্রিবিধানি উভয়মেতদ্‌ গ্রাহ্যগ্রহণ রূপং আত্মা স্বরূপাভিন্নঃ পরিণামঃ যস্য তৎ তথাবিধং ভোগঃ বিষয-ভোগঃ অপবর্গঃ সংসারনিবৃত্তিঃ তৌ অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তৎ।

অন্বয়ঃ: দৃশ্যং প্রকাশ ক্রিয়া স্থিতি শীলং ভূতেন্দ্রিযাত্মকং ভোগাপ-বর্গার্থং ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সর্ব্বংহি দৃশ্যসত্ত্বরজস্তমসাং গুণত্রয়াণাং সাক্ষাৎ পরম্পরয়া বা পরিণাম প্রথমতঃ প্রকাশশীলং ক্রিযাশীলং স্থিতিশীলঞ্চেতি ত্রিবিধং যদ্ধি সত্ত্ব প্রধানং প্রকাশশীলং রজঃপ্রধানং ক্রিয়াশীলং তমঃপ্রধানঞ্চ স্থিতিশীলমিতি স্বরূপমস্য নির্দ্দিষ্টম্‌ ভূতানি চেন্দ্রিয়াণি আত্মাস্বরূপাভিন্নঃ পরিণামোযস্যেতি স্থূলসূক্ষ্মরূপাণাং ভূতানাং স্থূলসূক্ষ্মরূপাণাঞ্চেন্দ্রিয়াণাং কারণমিতি যাবৎ এতেন মহদাদ্যখিলং কার্য্যকারণত্বমুক্তম্‌। ত্রিগুণাত্মকানাং চ জড়কার্য্যাণাং ত্রিগুণা-ত্মক জড়কারণং বিনাঽনুপপত্তেঃ। ইতিতেষাং কার্য্যমুক্তং। সম্প্রতি তেষাং প্রয়োজনমাহ ভোগাপবর্গার্থমিতি দৃশ্যস্য প্রয়োজনং ভোগঅপবর্গশ্চ। যথা যোদ্ধৃপুরুষেষু বর্ত্তমানে জয়ঃ পরাজয়ো বা স্বামিন্যপদিশ্যতে তথা বুদ্ধি রূতৌ বুদ্ধাবেব বর্ত্তমানৌ ভোগাঽপবর্গৌ পুরুষেঽপদিশ্যেতে। ইতিভাবঃ॥

অনুবাদ। দৃশ্যদিগের প্রকাশ ক্রিয়া এবং স্থিতি এই তিন প্রকার স্বভাব স্থূল সূক্ষ্ম রূপে দ্বিবিধ ভূত এবং স্থূল সূক্ষ্ম রূপে দ্বিবিধ ইন্দ্রিয় ইহারা কার্য্য এবং ভোগ ও মোক্ষ ইহারা প্রয়োজন।

সমালোচন। সত্ত্ব রজঃ এবং তম এই গুণত্রযের অসংখ্য প্রকার সংযোগ বশত এই উচ্চাবচ পদার্থ পূর্ণ জগন্মণ্ডলের উৎপত্তি হইয়াছে। সুতরাং সমুদয বস্তুরই প্রকাশ, ক্রিয়া এবং স্থিতি এই তিন প্রকার স্বভাব। এবং পুরুষের ভোগ ও মোক্ষে ইহাদের প্রয়োজন;

এই ভোগ আর মোক্ষ কি? ভোগ শব্দে • বিষয় বন্ধন এবং মোক্ষ শব্দে মুক্তি বা বিষয বন্ধন নিবৃত্তি। যখন বিষয় সকল বুদ্ধিতে প্রতিবিম্বিত হয় এবং সেই বিষয়ের প্রতিবিম্ব-যুক্ত বুদ্ধি আবার আত্মাতে প্রতিবিম্বিত হয়,

তখন আত্মার ঐ সকল বস্তু আমার বলিয়া যে ভ্রম ঘটে, সেই ভ্রমের নামই ভোগ এবং যখন ঐ ভ্রমের নিবৃত্তি হয়, তখনই মোক্ষ হয়। ঐ ভ্রমের নিবৃত্তি কারণ বুদ্ধিতে বিষয়ের প্রতিবিম্ব না পড়া। বুদ্ধি যখন অন্যবিষয় চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মার চিন্তা করে, তখন উহাতে বিষয়ের প্রতিবিম্ব পড়ে না, আর সেই আত্মচিন্তা পূর্ণতা লাভ করিলেই মোক্ষ হয়। ইহার দ্বারা সিদ্ধ হইতেছে যে, বন্ধ এবং মোক্ষ উভয়েই সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধি বর্ত্তমান। তথাপি উহা আত্মার বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ আত্মার চৈতন্য জড় সুতরাং জড় বুদ্ধির পরিচালক অর্থাৎ প্রভু। আমরা দেখিতে পাই এই পৃথিবীতে অধীনস্থ ব্যক্তির কার্য্যের ফল ভোগী প্রভু। সৈন্যেরা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে যুদ্ধে জয় লাভ করে, কিন্তু রাজার জয় হইল বলিয়া লোকে প্রসিদ্ধি হয়। সেইরূপ বন্ধ এবং মোক্ষ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে বুদ্ধিতে থাকিলেও, উহারা আত্মার বলিয়া প্রসিদ্ধ।

দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ।

আর্য্যগণ ভারতের নানাস্থানে বিস্তীর্ণ হইলে পর, তাঁহারা দশ ভাগে বিভক্ত হইলেন। যাঁহারা উত্তর দিকে রহিলেন তাঁহারা সারস্বত, কান্যকুব্জ, মৈথিল, গৌড় এবং উৎকল নামে অভিহিত হইলেন। এই পাঁচ সম্প্রদায় পঞ্চ গৌড় বলিয়া প্রসিদ্ধ। যাঁহারা দক্ষিণ দিকে বাস করিলেন, তাঁহারা গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র, কর্ণাটক এবং দ্রাবিড় নামে অভিহিত। এই পাঁচটি সম্প্রদায়কে পঞ্চ দ্রাবিড় বলে। কিন্তু ঘটনাক্রমে, সারস্বত এবং গৌড় ব্রাহ্মণও দাক্ষিণাত্যে আগমন করিয়াছিলেন। যে কএকটী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায় এতদঞ্চলে বিদ্যমান আছেন, তাঁহাদের বিবরণ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

অতি পূর্ব্বে, আর্য্যগণ পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেন। ইঁহারা এই প্রদেশস্থ সরস্বতী নদীর তীরে থাকিতেন বলিয়া সারস্বত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন যে সারস্বত নামে একজন প্রভাবশালী পরমজ্ঞানী ঋষি ছিলেন। তাঁহা হইতেই এতদঞ্চলের ব্রাহ্মণগণ সারস্বত আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দধিচি মুনির সারস্বত নামে এক পুত্র ছিল, তিনি সরস্বতী তীরে বেদ অধ্যয়নে কালযাপন করিতেন। একদা তথায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। লোকে জল ও অন্নাভাবে হাহাকার করিতে লাগিল। ক্রমে অসংখ্য লোক কালগ্রাসে পতিত হইল। কতক লোক স্থানান্তরে গমন করিল। সে সময়ে, সকলেই উদরান্নের জন্য অস্থির। কে বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, আর কেই বা শাস্ত্র অধ্যয়ন করায়। সুতরাং, শাস্ত্র ও ধর্ম্ম আলোচনা লোপ পাইল। কিছুকাল পরে, জলবর্ষণ আরম্ভ হইল, ধরণী শস্য ও ফলে পূর্ণ হইল এবং লোকের অন্ন ও জল-কষ্ট দূর হইল। আর্য্যদিগের মন চিরকালই ধর্ম্ম-প্রবণ। শাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনা ব্যতীত তাঁহারা কোন মতেই স্থির থাকিতে পারেন না। যখন অন্ন ও জল-কষ্ট দূর হইল, তাঁহারা জ্ঞান লাভের বাসনায় চারি দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, এমন কোন ব্যক্তি দেখিতে পাইলেন না, যিনি শাস্ত্র ব্যাখ্যা করিতে পারেন। অবশেষে, সরস্বতী নদীর তীর দিয়া ভ্রমণ

করিতে করিতে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন যে একজন ঋষি যজ্ঞ কার্য্যে রত আছেন। তাঁহাকে এই ভাবে দেখিয়া, আর্য্যগণের আর আনন্দের সীমা রহিল না। তাঁহারা এই ঋষির কাছে উপদেশ পাইবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। ঋষি তাঁহাদের আগ্রহ দেখিয়া পরিতুষ্ট হইলেন এবং শিষ্যরূপে বরণ করিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। তাঁহার সদুপদেশে অনেক আর্য্য শাস্ত্রজ্ঞ হইলেন। ইনিই সারস্বত ঋষি। কথিত আছে, যে উল্লিখিত দুর্ভিক্ষ সময়ে, সারস্বত ঋষি নদী হইতে মৎস্য লইয়া যজ্ঞ করিতেন এবং যজ্ঞেতে প্রদত্ত মৎস্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করিতেন। তাঁহার শিষ্যগণ সারস্বত বলিয়া অভিহিত লাগিলেন। ক্রমে তাঁহাদের বংশ বৃদ্ধি হইল। স্থানাভাব জন্য তাঁহারা ভারতের নানা স্থানে গমন করত অবস্থিতি করিলেন। তাঁহাদের দাক্ষিণাত্যে আগমন সম্বন্ধে এইরূপ কিম্বদন্তী আছে;—

ত্রেতাযুগে, জমদগ্নি নামক একজন মহাতেজস্বী সারস্বত ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার কাছে একটী কামধেনু ছিল। একদা সহস্রার্জ্জুন নামে একজন ক্ষত্রিয় রাজা মৃগয়ার্থে বনে গিয়াছিলেন। মৃগয়া করিয়া পরিশ্রান্ত হওয়াতে, বিশ্রাম জন্য উক্ত ব্রাহ্মণের আশ্রমে গমন করিলেন। জমদগ্নি সমাদর পূর্ব্বক তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। বিশ্রামের পর, সহস্রার্জ্জুনের কামধেনুটীর প্রতি দৃষ্টি পড়িল। তিনি এই ধেনুটী লইবার জন্য উৎসুক হইলেন এবং তাঁহার মনের ভাব জমদগ্নির কাছে জ্ঞাপন করিলেন। জমদগ্নি ইহাতে অসম্মত হওয়াতে, সহস্রার্জ্জুন তাঁহাকে বধ করিলেন। এবং তাঁহার স্ত্রী রেণুকাকে বিলক্ষণ রূপে প্রহার করিলেন। প্রহারের যাতনায় রেণুকা অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন, এই সুযোগে সহস্রার্জ্জুন কামধেনুটী লইয়া প্রস্থান করিলেন। জমদগ্নির পুত্র পরশুরাম একটু দূরে তপস্যা করিতেছিলেন। এই লোমহর্ষণ সংবাদটী তাঁহার শ্রবণ গোচর হইবামাত্র তিনি গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন এবং ক্রোধে অধীর হইয়া এই প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, ক্ষত্রিয় মাত্রকেই বধ করিবেন। প্রথমে সহস্রার্জ্জুনের সহিত যুদ্ধ করিয়া তাঁহাকে হত করিলেন। তাহার পর ক্ষত্রিয় কুলকে নির্ম্মূল করিয়া বাস উপযোগী স্থান মাত্রই ব্রাহ্মণগণকে দান করিলেন। তদনন্তর তিনি বিবেচনা করিলেন যে, যে সকল স্থান ব্রাহ্মণ-

দিগকে দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে কোন স্থানেই বাস কবা তাঁহাব উচিত নহে। এই রূপ স্থিব করিয়া তিনি সমুদ্র তীরে, সাহ্যাদ্রি পর্ব্বতের পশ্চিমে অবস্থিতি কবিলেন। এই স্থানটী কোকন নামে অভিহিত এবং পবশুবাম ক্ষেত্র বলিয়া বিখ্যাত। এখন ইহা একটী তীর্থরূপে পরিণত হইয়াছে এবং ইহা দর্শন জন্য অগণ্য লোক বৎসব বৎসব আগমন কবিযা থাকে। কিছু কাল পবে, পবশুবাম একটী বৃহৎ যজ্ঞ আবম্ভ কবিলেন। এই মহাযজ্ঞ গোমান্তকেব (গোযা) সান্নিধ্য পেড়নে জেলাব অন্তর্গত হারমল নামক গ্রামে সমাধা হইয়াছিল। এই যজ্ঞে, তিনি নানা স্থান হইতে ব্রাহ্মণদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনয়ন কবিয়াছিলেন। যজ্ঞ সমাধা হইলে পব, তিনি ব্রাহ্মণগণকে বাস উপযোগী স্থান দিতে প্রস্তুত হইলেন। কেবল কএকজন সাবস্বত ব্রাহ্মণ এতদঞ্চলে বাস কবিতে সম্মত হইল। তাঁহাদিগকে, পরশুরাম আটখানি গ্রাম দান করিলেন, যথা—মঠগ্রাম, বরেণ্য, কুটতবি, বানাবলী, শঙ্খাবলী, বাবচুবী, লোটলী এবং এবং নাগওয়ে। কথিত আছে, ইঁহাবা দ্রাবিড়ী বমণী বিবাহ করিয়াছিলেন। এইরূপে এ প্রদেশে সারস্বত ব্রাহ্মণেব বাস হইল।

এই ঘটনাব বহুকাল পবে আবো কতকগুলি ব্রাহ্মণ এতদঞ্চলে আগমন করিলেন। তাঁহাবা কান্যকুব্জ হইতে তীর্থদর্শন জন্য বামেশ্বরে আগমন কবিয়াছিলেন। পরে তথা হইতে প্রত্যাগমন কবিয়া তাঁহারা আর তাঁহাদের আবাসস্থানে গমন কবিলেন না; তাঁহাবা গোমন্তক দর্শন কবিয়া সেই স্থানেই অবস্থিতি কবিলেন। ইঁহাদেব মধ্যে বাৎস্য গোত্রেব দেব শর্ম্মা এবং কৌণ্ডিল্য গোত্রেব লোমশর্ম্মা কুশস্থলী নামক গ্রামে বহিলেন এবং কৌশিক গোত্রের শিবশর্ম্মা কেড়োশী নামক গ্রামে অবস্থিতি কবিলেন। তাঁহারা এই গ্রাম দুইটীর নাম অনুসাবে কুশস্থলীকব এবং কেড়োশীকব নামে পবিচিত হইলেন।

সারস্বত ব্রাহ্মণগণ বহুকাল পবম সুখে বাস করিয়াছিলেন। পরে ১৪৩২ শকে পর্তুগিজ জাতি এতদঞ্চল আক্রমণ কবিল। কিছুকাল বিগ্রহেব পর, তাহারা এতদঞ্চল অধিকাব করিল। তাহাদের রীতি, নীতি, এবং বেশ ভূষা দেখিযা ব্রাহ্মণগণ ভীত হইল। ক্রমে তাহারা হিন্দুগণকে নিজ ধর্ম্মে আনিবাব জন্য চেষ্টা কবিল। তাহাবা অত্যাচাব পর্য্যন্ত কবিতে

লাগিল। সারস্বত ব্রাহ্মণগণ পর্ত্তুগিজদের পীড়ন সহ্য করিতে না পারিয়া চারি দিকে পলায়ন করিল। কেহ সায়াদ্রির পূর্ব্বে, কেহ দক্ষিণে, কানাড়া ও মালবার দেশে গমন করিল। এইরূপে ব্রাহ্মণগণ নানা স্থানে গমন করিলে, দেশ শ্রীভ্রষ্ট হইল। তখন পর্ত্তুগিজগণ শিক্ষা পাইল। তাহারা চারিদিকে ঘোষণা করিয়া দিল. যে তাহারা আর কাহাকেও তাহাদের ধর্ম্মে আনিতে চেষ্টা করিবে না এবং প্রজাগণ যাহাতে সুখে থাকে তৎপক্ষে যত্নবান থাকিবে। যে সকল ব্রাহ্মণ অধিক দূরে যায় নাই, তাহারা এই সংবাদ পাইয়া ক্রমে ক্রমে তাহাদের পূর্ব্ব আবাস স্থানে প্রত্যাগমন করিল। যাহারা অধিক দূর গিয়াছিল, তাহারা আর ফিরিয়া আসিল না।

কথিত আছে যে, যে সকল ব্রাহ্মণ দেশস্থ বলিয়া পরিচিত, তাহারা পূর্ব্বে শেণুই ব্রাহ্মণছিল। সারস্বত ব্রাহ্মণদের প্রধান আবাস স্থান গোমন্তক। কিন্তু কোকনের অন্তর্গত দমন হইতে রামেশ্বর পর্য্যন্ত তাহারা বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। বোম্বাই, বসাই প্রান্ত (Bassein) রত্নগিরি, রাজাপুর, মালবন, সান্তবাড়ী, উত্তর কানাড়া, দক্ষিণ কাণাড়া, মালাবার, দক্ষিণ মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত বেলগাম, ধারোয়ার এবং সায়াদ্রির নিকটস্থ স্থান সকল তাহাদের আবাস ভূমি বলিয়া প্রসিদ্ধ। এতদ্ভিন্ন, দক্ষিণ হাইদরাবাদ, সিন্ধু হাইদরাবাদ, কারাচি, গোয়ালিয়ার, হারদা, হোসেঙ্গাবাদ, ইন্দোর ও বরদাতেও তাঁহাদের বসতি আছে। কিন্তু মহারাষ্ট্রদেশের মধ্যে ইহাদের অতি অল্পই দেখা যায়। বোম্বায়ে সারস্বত ব্রাহ্মণের সংখ্যা ৬০,০০০ হইবে। এতদঞ্চলে সর্ব্বশুদ্ধ ইহারা এক লক্ষের অধিক হইবে না।

ক্রমশ।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

ধারোয়ার (দক্ষিণাত্য)।

উন্মাদ-কল্পনা।

১

শূন্য প্রাণে শূন্য মনে, বসি আছি নিরজনে,
শান্তি-প্রদা প্রবাহিনী তটে ;
সুষুপ্ত নিশীথ রাতি, আকাশে তারকা পাঁতি,
ভাতি তার, জলে নদীপটে।
স্নেহভাঙ্গা বীচিমালা, বুকে ধরি শৈলবালা,
বহে ধীরে সোহাগে গলিয়া ;
কুল কুল প্রেমগানে, মাতাইয়া বিশ্ব প্রাণে,
ভাবে ঢলি চলেছে মাতিয়া।

(২)

প্রফুল্ল ফুলের মেলা, ফুলে ফুলে করে খেলা,
করে খেলা, নৈশ বায়ু সনে ;
মুঞ্জরিত লতা দুলি, প্রণয় তুফান তুলি,
চুমিতেছে কুসুম বদনে।
সোহাগেতে ঢলি ঢলি, আধ'ফোটা ফুল কলি,
তুলিতেছে ভাবের তুফান ;
সে ভাব সাগরে ডুবি, ধরিয়া কল্পনা ছবি,
ঘুমাইতেছে অনন্ত বিমান।

(৩)

ঘুমায় অনন্ত শূন্য— নাহি লেশ পাপ পুণ্য !
—জাগে সুধু অনন্ত স্বপন !
সেই স্বপনেতে ভাসি, গভীর সৌন্দর্য্যরাশি
হইতেছে মদিরা মগন।

গগনে তারকা ফুল, ভূতলে কুসুম কুল,
ঢুলিতেছে হাসি সম বায়,
ক্ষুদ্র পূত ভাব যত, ক্ষুদ্রশিশু হাসি মত,
খেলিতেছে আকাশের গায়।

(৪)

ফুল্ল-তারা-হাসি-মালা, পরি গলে নিশাবালা,
হাসে হাসি আঁধার ভরিয়া,
সুনীল আকাশ গায়, সুকোমল নৈশ বায়,
নাচে, খেলে, ভাবেতে মাতিয়া।
গভীর অনন্ত হাসি, অনন্ত স্বপন রাশি,
উভে মিশি, হয়েছে বিভোর;
নিশা বালা ধীরে ধীরে, বিজনিছে দম্পতিরে,
সুপ্ত প্রেমে ভাঙ্গে কি গো ঘোর?

(৫)

হেরিতে হেরিতে বিশ্ব, প্রকৃতির এই দৃশ্য,
মন-প্রাণ হইল পাগল;
উঠিল তরঙ্গ মনে, মিশি গেল বায়ুসনে,
স্মৃতি-শক্তি হইল বিকল!
ভুলিলাম আসি কোথা, কি খেলে আকাশে হোথা,
কিবা গায় রঙ্গিনী-তটিনী;—
ভুলিলাম আমি কে বা, আমার আমিত্ব যে বা,
ভুলিলাম কিবা এ মেদিনী!

(৬)

ভাসি গেল সুখ-শান্তি, দেখাইয়া ঘোর ভ্রান্তি,
গেল ভাসি সৌন্দর্য্য-জগত;—
গেল ভাসি ক্ষুদ্র প্রাণ, মিলাইল বিশ্ব-গান,
মিলাইল স্মৃতি-গাথা যত।

আরো প্রাণ শূন্য হ'ল, অন্ধকার নেমে এল,
পূরাতে সে হৃদয়-শূন্যতা !—
শূন্য-গর্ভ ভরাইয়া, শূন্যস্থান বিদরিয়া,
ডাকে কাক—কাঁপে গভীরতা !!

(৭)

ভাঙ্গি গেল সে চমক, ক্ষীণ প্রাণ ধ্বক ধ্বক,
চমকিল অনন্ত বিমান,
এ ঘোর স্বপন রাশি, কল্পনার সনে ভাসি,
লযে গেল উন্মাদ পরাণ !
কল্পনা করেতে ধরি, শূন্যপথে ভর করি,
হেসে হেসে লাগিল উঠিতে ;
ঘোর ছায়া ভেদ করি, তারকার রশ্মি ধরি,
স্বপ্নরাজ্যে আনিল ত্বরিতে ।

(৮)

হেরি মর্ত্যবাসী নরে, মেঘদল অনাদরে,
দূরে দূরে দাঁড়া'ল সরিয়া ,
ঘৃণাছলে দূরে সরি, বিদ্যুৎ উগার করি,
স্তরে স্তরে হাসিল চলিয়া ।
নিরখি জলদ ব্যঙ্গ, শিহরিল সর্ব্ব অঙ্গ,
ছুটিলাম আরো ঊর্দ্ধপানে ;
যত উঠি, তত জোরে, কিসে যেন টানে মোরে,
প্রাণ যেন ছিঁড়ে সেই টানে ।

(৯)

এইরূপে কতদূরে, উঠিলাম তারা-পুরে,
হেরি দীপ্ত তারকার বন ;
হাসে তারা, নাচে তারা, ফুল্ল যত তারকারা,
হেসে হেসে মাতায় গগন ।

অনন্ত আঁধার বুকে, তারা-শিশু ছুটে সুখে,
ছুটে ছুটে করে তারা খেলা ;
তারাপুঞ্জ কতশত, ফুল্ল পুষ্প-গুচ্ছ মত,
বসায়েছে সৌন্দর্য্যের মেলা।

(১০)

মানুষ দেবতা নয়, কুবাসনা কত হয়,
হ'ল ইচ্ছা—চুমি ফুল্ল তারা ;
সৌন্দর্য্যে বিভোর হয়ে, মরুপ্রায় এ হৃদয়ে,
হ'ল ইচ্ছা—ধরি প্রেম ধারা।
ছুটিলাম—ধরি ধরি, হাসি গেল—সরি সরি,
স্তব্ধ হ'য়ে রহিনু একান্ত ;
কত ক্ষণ পরে তার, ছুটিলাম আর বার,
নাহি জ্ঞান, আত্মহারা—ভ্রান্ত!

(১১)

হেরিনু আঁধার ঘোর, ছিঁড়িল সংসার ডোর,
—দৃশ্য পট ভেসে গেল কোথা!
সে ঘোর আঁধার-কোলে, সুধু এক তারা দোলে,
হেরি যা'য় মত্ত প্রাণ হোথা।
প্রেম, শান্তি, আশা রাশি, কি এক বালিকা-হাসি,
ভাসে যেন সে জ্যোতি-বয়ানে!
স্বপনে মদিরা-মোহ, তাড়িত জীবন লোহ,
একদৃষ্টে চাহিমুখ পানে।

(১২)

আছে যাহা সে বয়নে, নাহি আছে ত্রিভুবনে,
আছে তাহা সুধু রে তাহায়!
যত অগ্রসর হই, ততই দূরেতে রই,
ফেলে মোরে অদ্ভুত ধাঁধায়।

উন্মত্ত হইল প্রাণ, সেই ধ্যান—সেই জ্ঞান,
ধরিবারে ছুটিলাম বেগে,
হাসিয়া সে জ্যোতি-বালা, জ্বালিয়া রূপের আলা,
গেল দূরে, মাতায়ে আবেগে !!

(১৩)

শেষে হেরি জ্যোতি রাশি অতি দূর দূরে ভাসি,
বলি গেল ভ্রকুটি হাসিয়া—
"মানুষ রে,—পাতকী রে আর নয়—যাও ফিরে,
যাও ফিরে আঁধার দেখিয়া।'
মর্ত্ত্যবাসী পাপ বায়ু নাশিছে তারকা আয়ু,
নিবিতেছে কত দীপ্ত তারা।
সহ' না এ শান্তি-মেলা, প্রেম হেথা করে খেলা,
ঝরে সদা অমিযার ধারা !

(১৪)

"মানুষ, তোদের দুখ দেখে—দেখে ফাটে বুক,
দুখ-নদী মর্ত্ত্য ধামে বহে।
মিটে না প্রাণের সাধ, কাটে না প্রাণের গাদ,
মলা মাটী জড়াইয়া বহে।
যারে যার প্রাণ চায়, কেহ নাহি পায় তায়,
শেষে প্রাণ হয় রে শ্মশান ॥
ফুরায় প্রাণের গান, ছিঁড়ে জীবনের তান,
হয় মরু আশার উদ্যান।

(১৫)

"মানব অবোধ অতি, মানে না নিয়তি-গতি,
আঁধারেতে ছুটিয়ে বেড়ায়।
উগারি অনন্ত বিষ, দেয় জ্বালা অহনিশ,
মরে শেষে মরীচি'—ধাঁধায়।

মানুষ, আর না,—দূরে, মর'না আঁধারে ঘুরে,
পাবে সুধু জলন্ত যাতনা!
স্বার্থ-প্রেম পরিহরি, বিশ্ব প্রেমে প্রাণ ভরি,
কর দূর উন্মাদ-কল্পনা॥"

(১৬)

মুহূর্ত্তে সে ফুল্ল তারা, ছড়ায়ে অমিয় ধারা,
ডুবি গেল কোথায় আঁধারে,
সুধু বিশ্ব একাকার, উগারিযে অন্ধকার,
এল যেন গ্রাসিতে আমারে!
ভীষণ আঁধার-ফুল প্রজ্বলিত উল্কা কুল,
ফুটিল সে অনন্ত ভরিয়া,
বিদরিয়া সে আঁধার, কাপাইয়া চারি ধার,
ছুটে উল্কা আমোদে মাতিয়া।

(১৭)

যে দিকে ফিরাই আঁখি, দীপ্ত চিতা শিখা মাখি,
উল্কাকুল দেখায় মরণ।
হেরি এ আঁধার খেলা, ভুলিনু প্রাণের মেলা,
ভয়ে মরি আকুল জীবন!
কল্পনা ছাড়িয়া হাত, হাসি মৃদু অকস্মাৎ,
ফেলি মোরে করিল গমন,
ভাঙ্গি গেল স্বপ্নাবেশ, ভাসি গেল উল্কা-দেশ,
পড়িলাম দেখিয়া স্বপন!

(১৮)

চাহি দেখি—সেই ধরা, সেই ফুল হাসি-ভরা,
সে আকাশ তারকা-খচিত,
সেই ফুল্ল কল্লোলিনী, সেই ফুল্ল নিশীথিনী,
সে ধরণী আঁধার পূরিত।

বসি আমি সেই একা, নাহি সে তাবাব দেখা,
ধন্য মবি দুবাশা-ছলনা ॥
চাহিনু আকাশ পানে, শূন্য হাসি' বলে কাণে,
"কব দূব উন্মাদ-কল্পনা ॥"

শ্রীমহেন্দ্র নাথ মিত্র।

আমাদের গুরুকরণ।

গুরুব কাছে না শিখিলে, কোন বিদ্যাই উপার্জ্জন হয় না। ভাষা বল বিজ্ঞান বল, শিল্প বল, সাহিত্য বল, সকলই গুরূপদেশ-সাপেক্ষ; আর সকল বিদ্যাব সাব, সর্ব্ব ধর্ম্মের সাব, মনুষ্যজীবনেব সাব বস্তু যে ধর্ম্ম, তাহাও গুরূপদেশ ব্যতীত লব্ধ হয় না। তুলসীদাস কহিয়াছেন—

সদ্‌গুরু পাওয়ে, ভেদ বতাওয়ে,
জ্ঞান্ করে উপদেশ।
তব কয়লাকি ময়লা ছোটে,
যব আগ্‌ করে পরবেশ॥

অগ্নিস্পর্শে কয়লার যেমন ময়লা ছুটিয়া যায়, তেমনি সদ্‌গুরুব সমীপে জ্ঞানোপদেশ পাইলে আমাদেরও মনের মালিন্য বিনষ্ট হয়।

কিন্তু গুরু আবার সদ্ গুরু হওয়া চাই। গুরু কেমন? গুরু কাহাকে বলা যায়, গুরু কি বস্তু? সোজা কথায় সকলেই যা জানে, শুনিয়াছ ত।

অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

এই অখণ্ডমণ্ডলাকার চরাচর বিশ্ব ব্যাপিয়া যিনি অবস্থান করিতেছেন, সেই পরাৎপরের পরম পদ যিনি দেখাইয়া দিতে পারেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া প্রণাম করি।

গুরুপ্রণামের অন্য মন্ত্রও আছে—

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥

জীবের চক্ষু অজ্ঞান তিমিরে অন্ধীকৃত। যিনি জ্ঞানাঞ্জনরূপ শলাকা দ্বারা সেই অন্ধের চক্ষুদান করিতে পারেন, তাঁহাকেই গুরু বলিয়া মান্য করি, তাঁহারই চরণতলে প্রণত হই।

কিন্তু এমন গুরু আজিকার দিনে আর কোথায় পাইব। এখন চাল-কলা-লুচি-সন্দেশ-ভোজী অর্থলোভী অনর্থ-কারীর নাম মন্ত্রগুরু। তাঁহাদের অখণ্ড মণ্ডলাকার,—এখন গোল গোল চক্রাকার লুচির দিস্তা, অথবা মুটাভরা রূপার চাকৃতি। চরাচর ব্যাপিয়া এই দুইটা মাত্র সার জিনিস আছে বলিয়া তাঁহারা নিজে বুঝেন, শিষ্য সেবককে তাহাই বুঝাইতে প্রস্তুত আছেন। গুরু-প্রণাম মন্ত্রের অর্থ এখন উল্টাইয়া গিয়াছে। দ্বিতীয় মন্ত্র সম্বন্ধে একটা চমৎ-কার গল্প আছে, অনেকেই বোধ হয় তাহা জানেন।

দুই সহোদরে একান্নে থাকিয়া গুরুগিরি করিতেন। ক্রমে পরস্পর বিবাদ হইলে বিষয় বিভাগ হইতে লাগিল; কোন্ কোন্ শিষ্যঘর কাহার ভাগে পড়িবে, এই বিষয় লইয়া বাদানুবাদ হইতে লাগিল। কনিষ্ঠ ঠাকুরটি বড় সুচতুর। তিনি এক ঘর শাঁসালো গোছের শিষ্যালয়ে গিয়া দীক্ষার্থী এক ব্যক্তিকে বুঝাইতে লাগিলেন, শুন বাপু,—এই, "অজ্ঞান তিমিরান্ধস্য," অর্থাৎ কি না অজ্ঞান যে ব্যক্তি, সে তিন মণ দশসের, যেমন আমার দাদা মহাশয়। (দাদাঠাকুর কিঞ্চিৎ স্থূলাকায় ছিলেন)। আর, "জ্ঞানাঞ্জন শলাকয়া।" কি না জ্ঞানী যে জন, সে শোলার ন্যায় হাল্কা, যেমন আমি। (ছোট ঠাকুরটি নিজে

বাস্তবিক বড় কাহিল ছিলেন)। "চক্ষুরুন্মীলিতং যেন" এই জ্ঞান, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিলাম, "তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ," অতএব এখন কাহাকে গুরু করিবে, কাহার নিকট মন্ত্র গ্রহণ করিবে বল।" উপযুক্ত শিষ্য অবশ্য উপযুক্ত গুরুর নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলেন।

বাস্তবিক আমাদের গুরুকরণপ্রণালী এখন এইরূপই হইয়া পড়িয়াছে। দেশে সদ্‌গুরু আর পাওয়া যায় না, অবুতের মধ্যে এক আধজন যাহা আছেন, আমরা উপযুক্ত শিষ্য, তাঁহাদিগকেও মানিতে চাহি না।

এখন কলির গুরু ইংরাজ। দেশে গুরু নাই, কিন্তু এখন আমাদের পরম গুরু এই ইংরাজ। মাতৃস্তন্য ছাড়িতে না ছাড়িতে সেই গুরুর মন্ত্রে আমরা দীক্ষিত হই, বয়োবৃদ্ধি সহকারে হাড়ে হাড়ে সে মন্ত্র বিঁধিয়া বসিয়া মিশিয়া যায়।

কলির ব্রাহ্মণ ইংরাজ গুরুগিরিতে বাহাল হইয়া অহরহ ডাকিতেছেন—'এস ভাই, মন্ত্র গ্রহণ কর, অদীক্ষিত থাকিও না, আমি তোমায় ধর্ম্ম কর্ম্ম শিখাইব, আহার ঔষধ, ধরণ করণ, শিখাইয়া পড়াইয়া, বুঝাইয়া সমঝাইয়া দিব। তুমি কি চাও, সমাজশিক্ষা! আমার এই সমাজকে আদর্শ কর, এই পাখির বাসা দেখিয়া লও,—কেবল স্ত্রীপুরুষ, আর নিতান্ত শিশু শাবক, উড়ো উড়ো যেই হইবে, অমনি তাহাকে ছাড়িয়া দিবে, সে আপনি পলাইবে, আপনি চরিয়া খাইবে, যখন যাহাকে পাইবে লইয়া শাবকসংখ্যা বৃদ্ধি করিবে, যখন যেখানে ইচ্ছা বাসা পাতিয়া, সময় পাইলেই আবার সরিয়া পড়িবে। বিবাহ করিতে চাও, আমার এই মেম সাহেবকে আদর্শ কর, ভোগ বিলাসের চরম কামনা ইহাঁকে লইয়া চরিতার্থ হইবে। বিজ্ঞান শিখিতে চাও, দেখ ইহ জগৎ আপনি সৃষ্ট, আপনি রক্ষিত; স্রষ্টা পাতা ইহার কেহই নাই। আবার ধর্ম্ম শিখিতে চাও, সপ্তাহে সপ্তাহে গির্জ্জায় গিয়া যীশুখৃষ্ট ভজিলেই চলিবে; তোমার দেশী কৃষ্ণ ঘোর কদাচার, কপট লম্পট শঠ-শিরোমণি, গোপাঙ্গনারত গোপগৃহের ইতর বালক মাত্র। রাজনীতি শিখিবে ত ধর্ম্মের কথা মুখে আনিও না, জানিও যে ছলে কৌশলে পররাষ্ট্র-গ্রহণই উৎকৃষ্ট রাজনীতি। ইতিহাস শিখিবে ত বুঝিও তোমরা মহামূর্খ ঘোর অসভ্য; তোমরা চিরদুর্ব্বল, তোমরা জুয়াচোর, জালিয়াৎ, মিথ্যাকথার সর্দ্দার। বহুকাল পূর্ব্বে

তোমরা আমাদের জাতি-ভাই ছিলে বটে, কিন্তু ভাবতে গিয়া কুসংস্কার-জালে আবদ্ধ হইয়া তোমরা উৎসন্ন হইয়াছ; ভগবানের কৃপায় তোমাদের রাজা হইয়া এখন আমরা উদ্ধার করিতে বসিয়াছি।

মানুষের যখন দুঃসময় পড়ে, বিধাতা যখন বিমুখ হন, তখন বুদ্ধিও আপনা আপনি বিকৃত হইয়া বসে। নারায়ণাবতার স্বয়ং রামচন্দ্রও স্বীয় জীবনে এই তত্ত্বের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন—

"সুবুদ্ধিরপি যদ্রামো হৈমং হরিণমন্বগাৎ।"

সুবোধ হইয়াও রামচন্দ্র সোণার হরিণের পশ্চাদনুসরণ করিয়াছিলেন। হরিণ কি কখন সোনার হয় গা?

দুর্দ্দিনে, বিধাতার বিড়ম্বনায়, আমরা আজ ঘোরতর দুর্ম্মতিরোগে ব্যাধি-গ্রস্ত। নহিলে ইংরাজকে গুরু করিয়া, ইহপরলোকের কর্ত্তব্যজ্ঞান শিখিতে যাইব কেন? কাজীর কাছে হিন্দুর পরবের বার্ত্তা জিজ্ঞাসিব কেন? বারাঙ্গনার কাছে প্রণয় ভিক্ষা করিতে ছুটিব কেন?

———o———
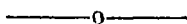
বোম্বাই পরিদর্শন।

কতকগুলি দ্বীপপুঞ্জ একত্রিত হইয়া বোম্বাই সহর। ইহার একধারে সমুদ্র, অপর তিন ধারে খাড়ি। খাড়ির উপর দিয়া পদব্রজে যাইবার পুল ও রেলগাড়ী যাইবারও পুল আছে। প্রাচীন লেখকেরা বোম্বাইকে বোম্বাইম কহিতেন। ইউরোপীয় লেখকেরা কহেন যে পর্টুগীজদিগের সংস্রব বিধায় ইহার নাম বোম্বাই হইয়াছে। (Briggs) ব্রিগস্ নামক জনৈক সাহেব কহেন যে বোম্বাইয়ের একাংশের নাম মাহিম অপর অংশের নাম মম্বাই ছিল। অত্রস্থ কোন এক দেবীমূর্ত্তির নাম ছিল মম্বাই। মাহিম বলিয়া স্থান এখনও আছে এবং ইহাও সত্য এখন যেস্থানকে Esplanade এস্প্লানেড কহে, পূর্ব্বে তথায় এক প্রাচীন মন্দিরছিল এবং সেই মন্দিরে মম্বা নামে এক দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত

ছিল। আমি মাড়োয়ারি বাজারের এক স্থানে এই মম্বা দেবীর মন্দির ও পুষ্করিণী দেখিয়া আসিয়াছি এবং ইহাও শুনিয়া আসিয়াছি যে এস্প্লানেড্ নামক স্থান হইতে এই দেবী উক্তস্থানে সরাইয়া আনা হইয়াছে। যাহা হউক বোম্বাই সম্বন্ধে যখন পর্টুগীজদিগের পূর্ব্বকার ইতিহাস নাই, তখন বোম্বাই নাম কেন হইল এবং এই মম্বা দেবী কাহাকর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত তাহার মীমাংসা করিতে চেষ্টা পাওয়া বৃথা।

পর্টুগীজেরা অধিকার করিবার পূর্ব্বে বোম্বাই গুজরাটের অধীন থানার রাজার অধিকারে ছিল। সে সময় গুজরাটের নাম বিদার ছিল। আনুমানিক ১৫২৯ খৃষ্টাব্দে নগ্নদা কুন্হা নামক পর্টুগীজ রাজ-প্রতিনিধি দ্বারা বোম্বাই পোর্টুগীজদিগের অধিকারে আইসে, পরে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দে বেসিন, স্যাল্সিট্ ও বোম্বাই প্রভৃতি কয়েকটি দ্বীপ গুজরাটের সুলতান বাহাদুর কর্ত্তৃক পর্টুগীজদিগকে রীতিমত প্রদত্ত হইয়াছিল। পর্টুগীজ অধিকারে বোম্বাই কিছু প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ইংরেজেরা ভারতে বাণিজ্য করিতে আসিয়া বোম্বাইয়ের প্রতি লোভপরবশ হইয়াছিলেন, এবং আত্মসাৎ করিবার জন্য দুইএকবার চেষ্টাও করিয়াছিলেন। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হয় নাই, শেষে ইনফ্যান্টা কেথিরাইনের সঙ্গে দ্বিতীয় চার্লসের বিবাহ উপলক্ষে যৌতুক স্বরূপ ইংলণ্ড, বোম্বাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে সেই অযত্ন-পরিত্যক্ত ও দস্যু-প্লাবিত বোম্বাই, বৃটিশ অধিকারে পশ্চিম ভারতে অথবা সমগ্র ভারতে এক কারণে শ্রেষ্ঠতম স্থান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। * কিছু

---

* বোম্বাই উপকূল এবং ভারতবর্ষের সমস্ত পশ্চিম উপকূল, বহুকাল হইতে দস্যুতে পরিপ্লুত ছিল। দ্বিতীয় শতাব্দীর ভৌগোলিক ইতিবৃত্ত-লেখক টলেমী এই উপকূলের নাম(ই) Pirate coast রাখিয়াছিলেন। এবং তৃতীয় শতাব্দীতে Marco Polo এই দস্যুদের সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়া গিয়াছেন ;—

"From this Kingdom of Malabar, from the Kingdom of Tanna, and from another near it called Guzrat, there go forth every year more than a hundred corsair vessels on cruize. These pirates take with them their wives and children, and stay out the

দিন পূর্ব্বে বোম্বাইয়ের এত সমৃদ্ধি ছিল না। এই গত কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনটি প্রধান প্রধান রেলের লাইনে যাতায়াতের প্রধান স্থান এইখানে হওয়াতে একেবারে বোম্বাইয়ের গৌরব বৃদ্ধি হইয়া পড়িয়াছে। ১৮৭০ সালে ১ লা এপ্রেলে বোম্বাই হইতে জব্বলপুর পর্য্যন্ত রেল খুলিল, এবং ইষ্টইণ্ডিয়া রেলের সঙ্গে এই পথ মিশিয়া, কলিকাতার সহিত নিকট সম্বন্ধ হইয়া পড়িল। ১৮৮১ সালে আজমির হইতে রেল আসিয়া বোম্বাই পৌঁছিল এবং তাহাতে উত্তর-ভারত অঞ্চলের সহিত বোম্বাইয়ের ঘনিষ্ঠতা. নিকটতর হইয়া পড়িল। এবং মান্দ্রাজ রেল, বোম্বাইয়ের অনতিদূরে জি. আই, পি, লাইনের সহিত কালিয়্যান জঙ্গসনে মিশিয়া দক্ষিণ ভারতের সহিত খুবই নৈকট্য হইয়া উঠিল। তুলার ব্যবসা দেখিতে দেখিতে ভারতে অধিক হইয়া পড়িল। উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতের যাবতীয় উৎপন্নের রপ্তানি ও বৈদেশিক দ্রব্যের আমদানি, বোম্বাই বন্দর হইতে চালান হইতে লাগিল। এই সকল কারণে দেখিতে দেখিতে বোম্বাইয়ের শ্রীবৃদ্ধি হইয়া পড়িল।

---

whole summer. Their method is to join in fleets of twenty or thirty of these pirates together, and they then form what they call a sea cordon—that is, they drop off till there is an interval of five or six miles between ship and ship, so that they cover something like 100 miles of sea, and no merchant-ship can escape them For, when any one corsair sights a vessel, a signal is made by fire or smoke, and then the whole of them make for this, and seize the merchants and plunder them

ইনিই আর একস্থানে বলিয়াছেন যে "The people of Guzrat are most desperate pirates in existence When they have taken a merchant vessel, they force the merchants to swallow a stuff called tamarind, mixed in sea water, which produces violent purging. This is done in case the merchant, on seeing their danger, should have swallowed their most precious stones and pearls, and in this way they secure the whole. এমন কি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই সকল দস্যুদিগের প্রাদুর্ভাব ছিল। পরে ইংরেজেরা ইহাদের দলপতির সহিত রীতিমত যুদ্ধ করিয়া ইহাদিগকে দমন করিয়াছেন।

আমি বোম্বাইয়ের এতটুকু ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত বলিলাম, কেবল মাত্র দেখাইবার জন্য যে ব্যবসা বাণিজ্যে যেমন জাতীয় উন্নতি হইতেছে, তেমনি স্থানের উন্নতিও হইতেছে।

সাহেবেরা কহেন যে ইউরোপীয় ভারত প্রবাসীদিগের পক্ষে, বোম্বাইয়ের মত স্বাস্থ্যকর নগর ভারতবর্ষে আর কোথাও নাই। এখানে কি সাহেব বদর কি দেশীয়দিগের মৃত্যুর সংখ্যা এত অল্প, যে মৃত্যুর তালিকা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। সাহেবেরা ইহাও বলেন, যে কি স্বাভাবিক দৃশ্য, কি ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা, পৃথিবীর আর কোন বন্দরেই এরূপ নাই।

বোম্বাই হইতে দেখিবার প্রধান প্রধান এই কয়টি স্থান আছে।

১ম—সমুদ্র।

২য়—কেনেরি গিরিগুহা।

৩য়—এলিফেণ্টা গিরিগুহা।

৪র্থ—বেসিন।

৫ম—বিহার ও তুলসী হ্রদ।

৬ষ্ঠ—বোম্বাইয়ের লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম্।

৭ম— ,, টাঁকশাল। মিণ্টমাষ্টারের অনুমতি পত্র লইয়া দেখিতে যাইতে হয়।

৮ম— ,, সেণ্ট টমাস্ কেথিড্র্যাল্। প্রতিদিন অনাবৃত দ্বার।

৯ম— ,, গবর্ণমেণ্ট ডক্‌ইয়ার্ড এবং প্যাক্টরি।

১০ম— ,, পবলিক ওয়াকস আফিস এসপ্ল্যানেড।

১১— ,, টেলিগ্রাফ্ আফিস।

১২— ,, সেক্রেটারিয়েট আফিস।

১৩— ,, পোষ্ট আফিস।

* ১৪— ,, এলফিনস্টোন্ সার্কল্ উদ্যান।

---

* এই উদ্যানে Lord Wellesly র সম্মানার্থ শ্বেতপ্রস্তরের প্রতিকৃতি আছে। প্রতিকৃতিতে তিনটি মূর্ত্তি আছে, যেটি সর্ব্বাধিক উচ্চ তাহার নাম জ্ঞান, উহার একপার্শ্বে এক সশস্ত্র যুবাপুরুষ উপবিষ্ট, তাহার নাম (Energy)

১৫— „ ক্রফোর্ড বাজার।

১৬— „ Sasoon's Mechanics' Institute, Rampant Row, Esplanade

১৭— „ Grant Medical College এবং Jemsetjee Jeejeebhoy হাঁসপাতাল। এই কলেজের অধ্যক্ষ কিম্বা হাঁসপাতাল সার্জ্জনের অনুমতি পত্র লইয়া দেখিতে যাইতে হয়।

১৮— „ বিক্টোরিয়া উদ্যান ও অ্যালবর্ট্ মিউজিয়ম, প্রতিদিন প্রভাত হইতে সন্ধ্যাপর্য্যন্ত অবারিত দ্বার। ঘোড়া গাড়ী বা কুক্কুর প্রভৃতির প্রবেশ নিষেধ।

১৯— „ Colaba Memorial Church. প্রভাত হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অবারিত দ্বার। আফ্গান যুদ্ধে যাঁহারা হত হইয়াছেন তাহাদের স্মরণার্থ ইহা প্রস্তুত হইয়াছে।

২০—David Sasoon's School of industry, Chunabaty এই স্কুলের Secretaryর নিকট হইতে অনুমতি পত্র লইলে প্রবেশ করিতে পারা যায়।

২১—কাপড় বুনিবার ও সুতা প্রস্তুত করিবার মিল্। এই সকল মিলের অধ্যক্ষের নিকট হইতে অনুমতি পত্র লইলে দেখিতে পাওয়া যায়। অধ্যক্ষেরা সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোক, অনুমতি চাহিলেই প্রদান করিয়া থাকেন।

২২—Framjee Cowasjee Institute ; Dhobi Talao.

২৩—Pinjrapool অর্থাৎ পীড়িত অথবা অথর্ব্ব পশুদিগের হাঁসপাতাল ও প্রতিপালন স্থান।

২৪—মহারাজ্ঞীর শ্বেতপ্রস্তর মূর্ত্তি। Esplanade।

উৎসাহ। অপর পার্শ্বে এক সুন্দরী রমণী মূর্ত্তি উহার নাম Integrity অর্থাৎ ন্যায়পরতা। এই ত্রিমূর্ত্তির পশ্চাতে সিংহ ব্যাঘ্র নতশিরে উপবিষ্ট, অর্থাৎ এই তিন গুণে সকলই বশ হয়। সম্মানার্হ ব্যক্তির স্মরণার্থ এইরূপ প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করায় নূতনত্ব ও ভক্তির গভীরত্ব লক্ষিত হয়। আমার এরূপ সম্মান চিহ্ন বড় মিষ্ট লাগে।

২৫—Northbrook উদ্যান, Grant Road।

২৬—যুবরাজ প্রীন্স অব্ ওয়েলসের প্রতিমূর্ত্তি Esplanade.

২৭—Sir Cowasjee Jehangir University Hall

২৮—Rajabye University Tower এবং তৎসংশ্লিষ্ট লাইব্রেরী। সেঠ্‌প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের মাতার নাম রাজাবাই, সেঠ্‌প্রেমচাঁদ মাতার নামে Uinersity হলের সম্মুখেই বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া এই স্তম্ভ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছেন। ইহার উপরে উঠিয়া বোম্বাই-য়ের দৃশ্য দেখিতে বড় চমৎকার।

২৯—কেনেরি লাইট হাউস্।

এই সকল দৃশ্য ও স্থানের মধ্যে আমি কয়েকটীর সম্বন্ধে পরে একটু বিশেষ করিয়া বলিব।

বোম্বাই সহরের ভিতর বুড়ীবন্দর এষ্টেসনে বেলা ৯ টা ১৫ মিনিটের সময় পৌঁছিলাম। সেখানকার ৯ টা ১৫ মিনিট এখানকার ১০ টা ১৫ মিনিট, ঠিক এক ঘণ্টার প্রভেদ। ট্রেন হইতে নামিবা মাত্র পার্শী হোটেল ওয়ালারা আসিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিতে লাগিল, আমি তাঁহাদের হোটেলে থাকিব কি না। "ইচ্ছুক নহি" বলিলেও নিরস্ত হইল না, কোথায় থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়াছি তাহার হিসাব দিলে, তবে তাহারা চলিয়া গেল। প্লাটফরমের ধারে যাইতে যাইতেই গাড়ীয়ান আসিয়া ইংরাজিতে জিজ্ঞাসা করিল, আমার গাড়ীর প্রয়োজন আছে কি না? ইহারা অবশ্য নেহাত অশুদ্ধ ইংরাজি কহে। আমি একখানি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। এই সময়ে একটু সাহেবি করিয়া পরে ঠকিয়াছিলাম। গাড়ীয়ানের সঙ্গে দর দস্তুর কিছু না করিয়া গাড়ীতে উঠিয়াছিলাম, সেই অপরাধে গাড়ওয়ান পরিশেষে বিল-ক্ষণ অনুচিত ভাড়া আদায় করিয়া লইয়াছিল। আমাদের যে বন্ধুর বাসায় থাকিবার মানস করিরাছিলাম, ৩৮ নম্বর এল্‌ফিন্‌ষ্টোন রোড বলিয়াই তাঁহাদের ঠিকানা জানিতাম, কিন্তু গাড়ীয়ান কহিল ঐ নামে কোন স্থান বোম্বায়ে নাই, এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ চক্র বলিয়া একস্থান আছে, তথায় কলিকাতার এক সেট্‌জি আসিয়া আফিস খুলিয়াছেন। এ অঞ্চলে ভদ্রলোকেদের সেট্‌জি কহে। অত্যগা সেই খানেই প্রথম যাইতে কহিলাম। গাড়ী

থামিলে দেখিলাম, এক বৃহৎ অট্টালিকা, দেখিতে অতিসুন্দর, কারখানা চমৎকার। তাহারি এক দ্বারে দেখাইয়া গাড়ীয়ান কহিল "এই আফিস"। আমার বোম্বাই প্রবাসী বন্ধুর আফিসের নাম সেখানে লেখা না দেখিয়া আমরা ইতস্তত করিতে লাগিলেন, শেষে আমার সমভিব্যাহারী বন্ধু উপরে সন্ধান করিতে গেলেন, আমি বোম্বায়ের অট্টালিকাগুলি ভাল করিয়া দেখিতে লাগিলাম। বোম্বাই সহরের অথবা উপসহরের অট্টালিকা গুলি দেখিতে ঠিক্ ছবির মত। বাড়ী বড় বড় আছে, এমন কি ৫।৬ তোলা পর্য্যন্ত বাড়ী দেখিয়াছি, কিন্তু সকল বাড়ীরই খোলার চাল। এমন কি গবর্ণর সাহেবের বাড়ীরও খোলার চাল। চারিদিকে ইটের দেয়াল, মাথার উপর, এখানে সামান্য চালার যেরূপ খোলার চাল, সেই রূপই খোলার চাল। আজকাল হাইকোর্ট, ইউনিবরসিটি হল, পোষ্ট আফিস প্রভৃতি যে বড় বড় অট্টালিকা হইতেছে, তাহা প্রস্তরে নির্ম্মিত হইতেছে বটে কিন্তু ছাদের পরিবর্ত্তে খোলার ঢালু চাল সকলকারই উপর। ইহার কারণ এখানে বৃষ্টি এত জোরে হয়, যে Flat ছাদ টেকে না, ইটসুর্কি দিয়া ঢালুছাদ করিলেও হইতে পারে, কিন্তু সে ছাদও বদলাইতে হয় ইহাও এক কারণ বটে এবং লোহিত বর্ণের খোলার চালের একপ্রকার শোভাও আছে, সেই জন্যই বোধ হয় এখানে এরূপ খোলারচালের প্রথা হইয়া পড়িয়াছে। আফিসের বাড়ীগুলি এইরূপ, বসতবাটী একটু ভিন্ন প্রকার। বসত বাটী যত বড়ই হউক না কেন, অধিকাংশেরই বাহিরের ভিত্তিটি লাল নীল পীত সবুজ প্রভৃতি বর্ণের কাঁচের। শার্শীতে যেরূপ ছোট ছোট চতুষ্কোণ কাঁচলাগান হয়, সেইরূপ ছোট ছোট চতুষ্কোণ নানা রঙের কাঁচ কাষ্ঠের ফ্রেমে পরাইয়া, কোন বাটীর সম্মুখের, কোন বাটীর সম্মুখ ও উভয় পার্শ্বের, কোন বাটীর চারিধারে ভিত্তি নির্ম্মিত, দেখিতে ঠিক ছবিগুলির মত। সমুদ্রতীরে এই সকল ফঙ্গুগঠনের বাটী দেখিয়া আমার হাসি পাইত। বোম্বে কোন মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোক একদিন আমায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে বোম্বাইয়ের ঘর বাড়ী আমার কেমন লাগে? তাহার উত্তরে আমি কহিয়াছিলাম "You all seem to be temporary settlers, waiting as if to be swept away by the next cyclone অর্থাৎ আপনাদের বাড়ীঘর দেখিয়া বোধ হয় যেন আপনারা

দুইচার দিনের জন্য ঘর বাঁধিয়া আছেন, একটি ঝড়হইলেই সমুদ্রসাৎ হইয়া পড়িবেন। আর একদিন জনৈক বোম্বাইবাসী সম্ভ্রান্ত লোক জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন "কলিকাতা ভাল না বোম্বাই ভাল?" আমি উত্তরে বলিয়াছিলাম "কাহার সঙ্গে কাহার কথা? কলিকাতা City of palaces—তাহার সহিত বোম্বাই সহরের তুলনাই হয় না।" ইঁহার সহিত আমার বিস্তর কথা হইয়াছিল, বাঙ্গালার মধ্যে দেশ হিতৈষী কে, পণ্ডিত কে, রাজনীতিজ্ঞ কে, ব্রাহ্মধর্ম্মের অবস্থা কিরূপ, হিন্দুধর্ম্মেরই বা অবস্থা কেমন, মহাত্মা কেশব সেনের উদ্দেশ্য মহৎ কি না, সুরেন্দ্রবাবুর উদ্দেশ্য প্রশংসনীয় কিনা, প্রভৃতি বিস্তর প্রশ্ন তিনি জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। সে সকল প্রশ্নের উত্তর, আমি নিজের বিশ্বাস মত দিয়াছিলাম। বোম্বাইবাসীরা সুরেন্দ্র বাবু, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কেশব সেন, আনন্দ মোহন বাবু প্রভৃতির বিষয় বিশেষ অবগত আছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় যে পণ্ডিতবর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামগন্ধ অনেকেই জানে না। "বাঙ্গালার বড়লোক কে?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমি প্রথমেই বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম করিয়াছিলাম, কিন্তু সে ভদ্রলোক তাঁহার নাম পর্য্যন্ত শুনেন নাই। তাঁহার বিষয় বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন আমি কহিলাম তাঁহার গুণের পরিচয় দুইচার কথায় কি দিব? আপনার সম্মুখে এই যে সমুদ্র দেখিতেছেন, দরিদ্রবঙ্গদেশে বিদ্যা সাগর মহাশয় সেইরূপ, দয়ার সমুদ্র। অবশেষে তিনি বিদ্যানুশীলনের কথা উত্থাপন করিয়া কহিলেন যে বাঙ্গালীরা লেখা পড়ায় ভারতে অগ্রগণ্য। আমি কহিলাম, বোম্বাইবাসীরা ব্যবসা বাণিজ্যে ও স্বদেশের প্রকৃত হিতব্রতে অগ্রগণ্য। এইরূপ নানা কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, এক্ষণে বোম্বাইয়ে প্রথম দিন আমাদের আহারাদির কি হইল, বলিব তাহাই।

সমালোচনা।

নূতন প্রণালী ও তাহার লক্ষণ।

কাব্য-শাস্ত্রের প্রসূতী কল্পনা। কল্পনা অনন্তব্রহ্মাণ্ড-বিহারিণী। তাই কবিতা শক্তি ও সৌন্দর্য্য-শালিনী। অসীম গগণের শীতল স্বাধীন বায়ু সর্ব্বদা সমভাবে না পাইলে, কল্পনা জীবিত থাকে না, কবিতাও থাকে না। সীমা-বদ্ধ সংকীর্ণ স্থানে কল্পনার মৃত্যু, কবিতারও মৃত্যু। অনন্তের মহা-মধ্যস্থলে কল্পনার জন্ম, অসীমতার ঊষা ও আকাশ তাহার কর্ম্মভূমি এবং ক্রীড়াস্থল। কবিতার আদ্য, মধ্য, অন্ত তিনই অসীমতার সহিত মিশ্রিত। মায়ের স্বাধীন-তায় মেয়ের পুষ্টি, মায়ের 'ধাতে' মেয়ের 'ধাৎ'। যদি কল্পনাকে ব্যাকরণ অলঙ্কারের বিধি-বিধানে, সমালোচন-শাস্ত্রের বিবিধ বন্ধনে, অষ্ট-পৃষ্ঠে ললাটে পেটে পিঠে মোড়া দিয়া বাঁধা যায়, তাহা হইলে তাঁহার কোমলাঙ্গী কবিতা-কন্যার কি বিষম অপমৃত্যু ঘটে, তাহা পাঠক অনুমানই করুন। অতি-নিয়মে অনেকবার অপঘাত মৃত্যু কবিতার যে হইয়াছে, তাহার উদাহরণ স্থল, সাহিত্যের ইতিহাসে বিরল নহে। অতিনিয়মই কবিতার পক্ষে অনি-য়ম ;—কাহার পক্ষেই বা নয় ?

কবিতার আকার অবয়ব, বহিঃ মূর্ত্তির সৌষ্ঠব সম্বন্ধে বিধি বিধান চালা-ইলে ও চালাইতে পার,—তাহাও অতিরিক্ত হইলে অনিষ্টকর ; কিন্তু যাহা কবিতার আভ্যন্তরিক অংশ, যে টুকুতে তাহার জীবন,—জীবনের স্ফূর্ত্তি ও সজীবতা—যাহা জননী কল্পনার অনন্ত স্পর্শী ধমনীর সহিত এক সূত্রে গ্রথিত, তাহা সম্বন্ধে কোনও বাঁধা বাঁধি নিয়ম খাটে না ; নিয়ম করিলেও তাহা বহু দিন টিঁকে না। নির্দ্দিষ্ট নিয়ম দ্বারা কার্য্যের সে অংশের সমালোচনা চলে না। সে অংশ বিচার বিতর্কের বিষয় নহে, বুঝিবার এবং ব্যাখ্যা কবি-

ধারই বিষয;—তাহা নিন্দা প্রশংসার বিষয় নহে, ধ্যান-ধারণাব বিষয়, কাব্যেব এই ধ্যান-ধাবণা-ভাবনা ও ব্যাখ্যা কবিবাব জন্যই নবপ্রণালীর সমালোচনার আবির্ভাব।

এই প্রণালীর মতে, কাব্য প্রকৃত প্রস্তাবে বুঝিতে হইলে, তাহার যথার্থ বিচার ও ব্যাখ্যা করিতে হইলে, কবিব সহিত একীভূত হইয়া কাব্যেব মধ্যে প্রবেশ করা আবশ্যক। ধর্ম্মেব আধ্যাত্মিক অংশেব ন্যায় কাব্যেবও আধ্যাত্মিক অংশ আছে এবং তাহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সারাদপি সাব অংশ। সেই আধ্যাত্মিক অংশ আধ্যাত্মিক ভাবেই অনুভবনীয়,—অন্য ভাবে নয়। নব প্রণালীব সমালোচনা এই আধ্যাত্মিক অনুভূতিমূলক। পুরাতন প্রণালীব সহিত নব প্রণালীর সমালোচনাব পার্থক্য এই যে, নব প্রণালী অনুধাবন কবে,—প্রতিবাদ কবে না, ব্যাখা কবে, বিচাব কবিয়া "রায়" লিখে না।

কালিদাসের কবিত্বেব কথা পড়িয়া তুমি আমি যে সে লোকেই একটা মতামত প্রকাশ কবিতে পারি এবং সে মত আমাদের মত লোকের মধ্যে গ্রাহ্যও হয়। কিন্তু কালিদাস কি ইহা পূর্ণ মাত্রায় বুঝিতে এবং বুঝাইতে কালিদাসেব সমকক্ষ ব্যক্তিই সুপাবগ হয়েন। কালিদাসের সমালোচকেব 'কালিদাসীয়' শক্তি ও সহানুভূতি অন্তত কতক অংশেও থাকা চাই, নতুবা প্রকৃত সমালোচনা সম্ভবে না। এই প্রকৃতিব সমালোচনাই আদর্শ সমালোচনা। নব প্রণালীব সমালোচকগণ বলেন যে এই আদর্শ সম্যক রূপে সাধনীয় না হইলেও ইহাকে দৃষ্টিব বহির্ভূত কবা উচিত নহে।

নব-প্রণালীব সমালোচদিগেব আদর্শ যাহাই হউক, তাঁহাবা তাঁহাদের সমালোচ্য কাব্য কবিতাব সম্যক ব্যাখ্যা বা সম্পূর্ণ বিবরণ বিবৃত করেন না। সমালোচ্য কাব্য ও কবিতা স্পৃষ্ট হইয়া সমালোচকেব হৃদয়-মনে যে সদ্ভাব নিচয় উত্তেজিত বা উচ্ছ্বসিত হব, তাহাই ব্যক্ত করেন। সমালোচকের এই হৃদয়োচ্ছাস স্বতন্ত্র আকারে কবিতাময়ী বচনা এবং সমালোচ্য কবিব সহিত আত্যান্তিক সহানুভূতিমূলক। তবে এই সহানুভূতি সমালোচকে সচারাচর কবির সহিত তাদৃশ একীভূত কবে না যদ্দ্বাবা কাব্যেব আধ্যাত্মিক অংশ অবিকল প্রতিবিম্বিত হইতে পারে। যাহাউক এই শ্রেণীর সমালোচকগণ কবির বা শিল্পীর উচ্চ আসন গ্রহণ কবিয়া বিচারক

রূপে সমালোচ্য বিষয়ের দোষগুণ কীর্ত্তন করেন না, পরন্তু শিল্পীর সমকক্ষ হইয়া, শিল্পের অপরিদৃষ্ট প্রচ্ছন্ন অংশ আবিষ্কার করিতে ইঁহারা অগ্রসর হয়েন না। ইঁহারা গ্রন্থকারের অনেক নিম্নে বসিয়া, তাঁহার মানস-পট নিজে নিজে যে রূপ নিরীক্ষণ ও অনুভব করেন তাহারই প্রতিকৃতি অঙ্কিত করেন এবং সে নিরীক্ষণে ও অঙ্কনে সমগ্র দৃশ্য নিরীক্ষিত ও অঙ্কিত হইল, এরূপ বিবেচনাও করেন না, বিবেচনা প্রায়ই এইরূপ করেন, যে চিত্রের যতটুকু তাঁহারা দেখিতে বা অনুভব করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাহা অপেক্ষা তথায় দেখিবার ও অনুভব করিবার এখনও অনেক আছে।

প্রকৃতি এবং প্রণালীতে এই সমালোচকদিগের কার্য্য শিল্পির কার্য্যেরই মত। ইঁহাদের সৌসাদৃশ্য সমালোচক অপেক্ষা শিল্পীর সঙ্গেই অধিক। ইঁহারা সমালোচনা ততটা করেন না, যতটা 'সৃষ্টি' করেন। ইঁহাদের সমালোচনা প্রকারান্তরে নূতন সৃষ্টি বা তাহার সমতুল্য। উহা বিশ্লেষণ মূলক না হইয়া সংশ্লেষণ মূলক। উহা সমালোচ্য বিষয় ভাঙ্গিয়া চুরিয়া তাহার অণু পরমাণু বাহির করে না, সমালোচ্য বিষয়ের সৌন্দর্য্য অতি সাবধানে সন্তর্পণে গ্রহণ করিয়া তাহাতে অন্য রকম সুন্দর বস্তু মিশাইয়া, রঙের উপর রঙ্ ফলাইয়া এক নূতন তর স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি করে।

মূল গ্রন্থকার, কবি বা শিল্পী প্রকৃতির বা পুরাবৃত্তের দৃশ্য বা স্থল বিশেষ গ্রহণ করেন, তাহার ধ্যান ধারণা করিয়া, কল্পনায় বর্ণনায় রঙ্ ফলাইয়া (অবশ্য প্রকৃতত্ত্ব রক্ষা করিয়া,) অভিনব চিত্র অঙ্কিত করেন। এক সৃষ্টি অবলম্বন করিয়া আর এক নূতন সৃষ্টি প্রস্তুত করেন। নব-প্রণালীর সমালোচকও প্রায় ঠিক তাই করেন, তবে মূল গ্রন্থকার, প্রকৃতির বা পুরাবৃত্তের দৃশ্য গ্রহণ, করেন আর এই সমালোচক পুস্তকের বা প্রতিকৃতির, কবিত্বের বা সাহিত্যের বা শিল্পের বা তাহাদের অংশ বিশেষের কোন মূর্ত্তির বা ভাবের ধ্যান ধারণা করিয়া নূতন চিত্র রচনা করেন; এই মাত্র প্রভেদ।

পুরাতন ও নূতন প্রণালীর সমালোচনায় আরও একটু সংক্ষিপ্ত তুলনা করুন। পুরাতন প্রণালীতে সমালোচ্য বিষয়ের বিচার বিবৃতি, নূতন প্রণালীতে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রতিকৃতি। প্রথমে প্রবন্ধ, দ্বিতীয়ে চিত্র।

একে,—বিচারকের ছত্র-দণ্ড, অপরে,—ভাবুকের কুসুম-মালা। পুরাতন প্রণালী বিচার, বিশ্লেষ, বিবেচনা করিয়া বুঝাইতে চায়, নূতন প্রণালী সম্ভোগ করিয়া, সম্ভোগ করায়। বস্তুত সমালোচনায় সুকুমার সাহিত্যের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করাইতে নূতন প্রণালীরই প্রাধান্য। তবে নূতন প্রণালীর সমালোচকগণ বলেন যে, পুরাতন প্রণালীর সমালোচনায় সমালোচ্য বিষয়ের বহিঃপ্রকৃতি মাত্র দৃষ্ট হয়, অন্তঃপ্রকৃতি আদৌ বিকশিত হয় না,—তাহা কেবল নূতন প্রণালীর দ্বারাই হয়, একথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে না। দার্শনিক সমালোচনা (Philosophic Criticism) ইংরেজি সাহিত্যে এখন আর বড় বিরল নহে। ইহার জন্য ইংরাজ জর্ম্মনের নিকট ঋণী। কোলরিজ প্রথমত ইংরেজি সাহিত্যক্ষেত্রে উহা প্রবর্ত্তিত করেন। তবে দোকানদারের দেশে দর্শনের শ্রীবৃদ্ধিটা বড় হয় না, কাজেই ইংরেজী সাহিত্যে দার্শনিক সমালোচনা তাদৃশ পুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই, অন্তত যতটা উচিত ছিল ততটা করে নাই। দার্শনিক বিষয়ে হিন্দুর ন্যায় জর্ম্মন বড় মজবুত। সে যাহা হউক, দার্শনিক সমালোচনায় সমালোচ্য বিষয়ের অন্তঃপ্রকৃতি,—আধ্যাত্মিক অংশ আদৌ উদ্ঘাটন করে না, একথা কেমনে বলা যাইতে পারে?

নূতন প্রণালীর সমালোচনায় ভবিষ্যতে আশা আশঙ্কা দুই আছে। আশার ন্যায় আশঙ্কাও অল্প নহে। আমাদের সাহিত্যের বর্ত্তমান অবস্থায় সে আশা আশঙ্কার কথা আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন। একটা কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

আশা যাহাই থাকুক, আশঙ্কার আপদটা অগ্রেহ আমাদের স্কন্ধে আসিয়া পড়ে, অতএব আশঙ্কার কথাটা উল্লেখ করা ভাল কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে আনুসঙ্গিক আবশ্যকীয় আর আর দুই চারি কথা বলা প্রয়োজন। বাঙ্গালা সাহিত্য পুরাতন কি নূতন প্রণালীর অনুকরণ করিতেছে এমুহূর্ত্তে ঠিক করিয়া বলা ভার। বাঙ্গালা সাহিত্যের যাঁহারা বিচক্ষণ ও গণনীয় সমালোচক তাঁহারা পুরাতন প্রণালী অবলম্বন করিয়া বা খুব সাবধানে তাহার এক-আধটু পরিবর্ত্তন পরিবর্দ্ধন করিয়া, বাঙ্গালা ভাষায় সমালোচনা সৃষ্টি করিতেছিলেন। ইঁহাদের কৃতকার্য্যে উক্ত প্রকৃতির সাহিত্যের যেরূপ সূত্রপাত হইতে দেখা

যাইতেছিল, তাহা তাচ্ছিল্যের বিষয় নহে, প্রত্যুত তাহা ক্রমে বিকাশ লাভ করিয়া বাঙ্গালার গৌরবস্থল হইবে, এমনও আশা ছিল। কিন্তু কিছু কাল হইতে যেরূপ দেখা যাইতেছে, তাহাতে আমাদের সাহিত্যের সকল বিভাগেই কেমন যেন একটা বেতর ভাব প্রবেশ করিয়াছে। লেখক ও সমালোচক নব্যদিগের মধ্যে এখন আমাদিগের যাঁহারা তাঁহাদিগের অধিকাংশ ব্যক্তি বোধ হয়, স্বস্ব কার্য্যের উপযুক্ত নহেন। নতুবা আমাদিগের সাহিত্যে আজকাল চিন্তাশীলতা ও গাম্ভীর্য্যের এমন এবং এত অভাব হইতেছে কেন? আমাদের সম্বাদ এবং সাময়িকপত্র নিচয়ে সাহিত্য ও তদানুসঙ্গিক বিষয়ের আলোচনা খুব কমই হয়; যাহা এক আধটু হয়, তাহা আমাদের প্রশংসার ও গৌরবের নহে;—তাহা আশু উপদেশও নয়, ভবিষ্যতেও তদ্দ্বারা আমাদিগের কোন উপকারের সম্ভাবনা নাই।

উপরি উল্লিখিত নবপ্রণালী অনুকারী কাব্য-কবিতা-সমালোচকও মধ্যে মধ্যে মুদ্রিত পুস্তকে ও পত্রে দেখা দিতেছেন। 'নবপ্রণালী অনুকারী' আমি লিখিলাম বটে কিন্তু কথাটা ঠিক হইল না। ইহাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে কোন্ প্রণালীর অনুকরণ করেন, স্থির করা কঠিন। কেননা ইহাঁদের রচনায় ও সমালোচনায় আদৌ প্রণালীর অভাব। ইহাঁরা 'বিশ্লেষক' কি সংশ্লেষক, উপাসক কি বিচারক, ভাবুক কি নিন্দুক, এই সমুদায়ের সব। অথবা কিছুই নয়, তাহা তাঁহারা বোধ করি নিজে নিজেই জানেন, আর কেহ জানে না। ইহাঁদের লক্ষণ নির্ণয় করিতে আমি সমর্থও নহি, সাহসীও নহি। তবে সময়ে সময়ে এই শ্রেণীর লোক কবিতা ও ভাবুকতার উৎসাহ খুলিয়া বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় কাব্য উপন্যাসের, 'চরিত্র চিত্রের' মানব-প্রকৃতি উদ্ঘাটিত করিতে বসেন দেখিয়া থাকি বটে। এই বৈজ্ঞানিক নিয়মে কোন কবির কাব্য, সমালোচনা পাঠ করিয়া আমাদের জনৈক মহিলা বন্ধু বলিতেছিলেন যে "সেই সমালোচনা পুস্তক এত উত্তম, যে কবির কাব্য গ্রাস করিয়াছে। তাহাতে কবি ও সমালোচক কাহাকেই দেখা যায় না; দেখা যায় কেবল কাব্য হইতে উদ্ধৃত কতকগুলি কবিতা লাইন। মধ্যে মধ্যে গ্রন্থকার সেগুলিকেও গিলিয়াছেন, তবে একেবারে হজম করিতে পারেন নাই, তাই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে।"

সে যাহউক সমালোচনায় কবিত্ব ও ভাবুকতা প্রকাশ সম্বন্ধে আমাদের একটু ইঙ্গিত আছে। কবিতা ও ভাবুকতা বা ভাব-গ্রাহিতা অতি উত্তম সামগ্রী এবং তদ্দ্বারা কাব্য সম্ভোগ বা সমালোচনা যারপর নাই প্রশংসনীয় হয়, কিন্তু এই প্রণালীর যেমন মহৎ গুণগৌরব আছে, তেমনি উহার অন্তর্নিহিত ভয়ানক দোষ-দুর্ব্বলতাও আছে। সে দোষ-দুর্ব্বলতা হইতে শ্রেষ্ঠতর সমালোচককেও সাবধান হইতে হয়। স্বয়ং সুইন্‌বরণও, যিনি এ স্কুলে উচ্চস্থানীয়, সময়ে সময়ে সেই দোষ-দুর্ব্বলতা হইতে অধিক দূরে থাকিতে পারেন নাই। অতএব অসমর্থ অনুকরণকারী ও তদনুকরণকারীদিগের পক্ষে কতটা সাবধান হওয়া দরকার, বলাই বাহুল্য। উক্ত প্রণালীর অন্তর্নিহিত দোষ-দুর্ব্বলতা, প্রধানত, ভাবানুভূতি প্রকাশার্থে, ভাষা ব্যবহার সম্বন্ধে। কথাটা ক্রমে পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

চিন্তার ভাষা ও কল্পনার ভাষা পরস্পর স্বতন্ত্র। বিচার বিতর্ক, যুক্তি-প্রমাণ-প্রয়োগ, প্রকাশের ভাষা এক, ভাব অনুভূতি ও ভাব উচ্ছাস প্রকাশের ভাষা অন্যবিধ। সাধারণত ভাব প্রকাশের ভাষা ও ভাব অনুভূতি প্রকাশের ভাষা এক নহে। কবির ভাষা ও কাব্যের কবিতাময় সমালোচনা-লেখকের ভাষাও ঠিক এক হইতে পারে না। কোন বিষয় প্রকাশের পূর্ব্বে অবশ্য তাহার অনুভূতি সর্ব্বত্র সকল বিষয়েই হইয়া থাকে। কোন বিষয়ের অনুভূতি ব্যতীত তাহা আর প্রকাশিত হইবে কি রূপে, প্রকাশিত হইবেই বা কেন? বিচার বিবেচনা তর্ক যুক্তিতেও অনুভূতি অবশ্য সর্ব্বাগ্রে। তথাচ উপরে যে কথাটা বলা হইয়াছে তাহা যে সত্য, একটু সূক্ষ্মরূপে অনুধাবন করিলে বুঝা যাইবে।

ভাবের তীক্ষ্ণানুভূতি ও উচ্ছাসের ভাষা প্রধানত কবিতাময়ী। সুতরাং নব প্রণালীর সমালোচনা—গদ্যে কবিতাময়ী রচনা। এখন কথা হইতেছে এই যে, গদ্যে কবিতাময়ী বা কবিতা-প্রবণা ভাষা, বিশেষ সাবধানতার সহিত ব্যবহার করিতে না পারিলে বড়ই হাস্যাস্পদ হয়; তাহা ভাবের বা কল্পনার কেন্দ্র স্থায়ী হইয়া সার ও সৎসৌন্দর্য্য প্রকাশের পরিবর্ত্তে কেবল বেতালা ও বিদ্রূপজনক আওয়াজ করে। গদ্যে ভাবুকতা-প্রবণ ভাষা প্রয়োগ, উপযুক্ত রূপে না করিতে পারিলে বড়ই বিপদজনক; উহা অস্পষ্ট, অপরিমিত, আলস্য

ও অবসাদময়, অবোধগম্য বচনা হয় এবং তজ্জন্যই কেহ কেহ আমাদের এই আলোচ্য প্রণালীকে মূলত নেহাত অসার পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করেন। উহাতে শক্তির অভাব বলিয়া অনেকে বিবেচনা করেন এবং উহাতে যে সৌন্দর্য্য তাহাও ক্ষণস্থায়ী ও কষ্টকল্পনাজাত বলিয়া অনেকে অভিহিত করেন। এমত অবস্থায় যদি উহার ভাষা প্রয়োগ বিকৃত হয়, তবে ত আর কথাই নাই। তাহাতে কেবল বাক্য আর বাক্য, তথায় কেবল একটা কুৎসিত কুয়াসা মাত্র উৎপাদিত হয়। নব প্রণালীর সমালোচনায় ব্যভিচারের আশঙ্কা পদে পদে আছে।

কিন্তু আশঙ্কার মধ্য দিয়াই প্রায় অভীষ্টস্থলে উপস্থিত হইতে হয়। এই ব্যাখ্যানুভূতিমূলক কবিতাময়ী সমালোচনা মধ্যম শ্রেণীর লেখকদিগের সাধনীয় সামগ্রী নয়। উহাতে হস্তক্ষেপ করিয়া কৃতকার্য্য তাঁহারাই হইতে পারেন, যাঁহাদিগের শক্তি কবি-শক্তির সহিত দৌড়িয়া কুলাইতে পারে,—যাহাদের হৃদয় স্বভাবতই কবিতা-প্রবণ ও বুদ্ধি সম্যক রূপে সুশিক্ষা ও সুরুচি মার্জ্জিত এবং ভাষার উপর যাঁহাদের অপরিসীম অধিকার ও আধিপত্য আছে। কাব্যের আলোচনা করিতে হইবে স্বতন্ত্র কবিতার দ্বারা। আধ্যাত্মিকতার উদ্বোধন করিতে হইবে, তদনুরূপ আধ্যাত্মিক ভাবে। ব্যাপার সহজ নয়। উপযুক্ত ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তবে উপাস্য দেবতাকে আহ্বান করিতে হইবে, নতুবা উপাস্য আগমন করেন না, উপাসনা লয়েন না, অবমানিত হয়েন। ভাষার উপর অধিকার থাকা চাই, সে কেমন?— সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্ম অনুভূতির অতি সূক্ষ্মতম অংশ, বাক্য-যোজনায় বর্ণিত, শব্দশক্তি দ্বারা সজীব সুন্দর ও শোভা-শালী করিতে হয়, রচনা-লীলার উচ্চতম স্থানে না উঠিতে পারিলে তাহা সম্পাদিত হয় না।

সমালোচকের সূক্ষ্ম অনুভূতি ও দ্রুতদৃষ্টি সমালোচ্য বিষয়ের নিগূঢ় মর্ম্ম স্থলে প্রবেশ করিয়া, সূক্ষ্ম শিরা ধমনীতে প্রবেশ করিয়া, সুপ্ত সৌন্দর্য্য মাত্রই স্পর্শ করিবে, তাহার ভাষা তাহাদিগকে উজ্জ্বল বর্ণে দেদীপ্যমান করিবে, বিচক্ষণতা তাহাদের প্রত্যেকের অতিক্ষুদ্র অংশেরও বৈচিত্র্য-বিভিন্নতা ও বিশেষত্ব (তাহা যতই সূক্ষ্ম ও সাদৃশ্য-মূলক হউক না) বুঝাইয়া দিবে। সমালোচককে সূক্ষ্ম অংশেরই সম্বন্ধ নির্ণয় করিতে হয়, স্থূল অংশগুলি সকলেরই

চক্ষে সুস্পষ্ট। শিল্পই হউক আর সাহিত্যই হউক, কাব্যই হউক আর চিত্রই হউক, আলোচ্য বিষয়ে যে আনন্দ উৎপাদিত বা উত্তেজিত করে তাহার, গতি-প্রকৃতি, বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব কি এবং তাহা অন্যত্র প্রাপ্তব্য কিনা, প্রধানত এই একই প্রশ্ন সমালোচককে উঠাইয়া তাহার যথোচিত উত্তর করিতে হয়। সুবিচারকদিগের নিকট হইতে একই বিধ প্রশ্নের, প্রায় একই অর্থ-মূলক উত্তর পাওয়া যায়, কেবল সমালোচনার প্রণালীভেদে, সে উত্তরের অবয়ব মাত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র হয়।

শ্রীঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায়।
ঝঙ্কারপুর।

:——

"ভাল মিলেছে দুজনে।"

বরষা রে এস এস করি আলিঙ্গন,
বড় সুসময়ে আজ দিলে দরশন।
বর্ষে বর্ষে এস যাও, আমারে না ফিরে চাও,
কোথা যাও কোথা থাক নাহি নিরূপণ।
এস আর যাও চলে, দেখনা নয়ন মেলে,
প্রাণে প্রাণে কেবা তোমা করে অন্বেষণ।
কোথায় আগাছা দলে, কোথাই বা বিলে খালে,
কোথায় অপাত্র স্থলে কর বরিষণ।
পবিত্র প্রণয় পয়, কেন বৃথা কর ক্ষয়,
যে বুঝে না তার শিরে অমূল্য রতন।
কেন রে বারিদ তোর বৃথা আকিঞ্চন॥

তাপিত পরাণে বারি পার না ঢালিতে।
পরাণে পরাণে কি রে জান না জড়াতে।
তাপিত এ বক্ষস্থল, ঢাল দেখি অবিরল,
দিলাম পাতিয়া বুক অনন্ত শূন্যেতে।
ঢাল ঢাল ঢাল জল, দেখি তোর কত বল,
সবল হইবি কি রে অনল নিভাতে?
কাঙ্গালে কর রে দান, ঊর্দ্ধ মুখে করি পান,
বিমল পিযূষ ধারা দাও রে তৃষিতে।
কিন্তু এ যে ঘোর ভ্রান্তি, ইথে কি হইবে শান্তি,
অদৃষ্টে অশান্তি লেখা পারি কি মুছিতে?
বিধাতা গঠেছে মোরে জনম কাঁদিতে॥

বরষা রে তুমি মোর হৃদয়ের ধন;
তুমি বন্ধু, তুমি প্রিয়, অমূল্য রতন।
বুঝিয়াছি তোর মর্ম্ম, রোদন তোমার ধর্ম্ম,
অদৃষ্টে আমারো লেখা অনন্ত ক্রন্দন।
এস রে একান্ত প্রাণে, আলিঙ্গিয়া দুই জনে,
অবিরল অশ্রুজল করি বরিষণ।
রোদন তোমার ভাষা, রোদনি আমার আশা,
কেঁদে কেঁদে মর্ম্ম কথা করি আলাপন।
রোদন পবিত্র অতি, রোদনেই ভক্তি প্রীতি,
রোদনে জন্মিছে জীব অন্তিমে রোদন।
হেন রোদনের মর্ম্ম বুঝে কয় জন?

রোদনের সঙ্গী নাহি পাই রে ধরায়;
যথা যাই, সবে হাসে, কাঁদে না কোথায়।
আজি বহু অন্বেষণে, পাইয়াছি তোমা ধনে,
এস রে দুজনে বসি কাঁদি উভরায়।
মিলিয়াছি তোমা সনে, এস বাঁধি প্রাণে প্রাণে,

জুড়াই প্রাণের ব্যথা বধূ দুজনায়।
দিনমণি বুক পেতে, ঢাকিয়াছে আঁধারেতে,
আমারো বুকেতে মণি চাপা আছে হায়।
বিদ্যুৎ তোমার বুকে, আমিও রেখেছি ঢেকে,
থেকে থেকে চমকিবে কি আছে উপায়।
থেকে থেকে বুকে বুকে গুরু গরজায়॥

নির্ম্মম প্রকৃতি ওই হাসিছে নিয়ত,
নশ্বর জগৎ গায় মাতি অবিরত।
নাচে লতা তালে তালে, গায় ফুল দুলে দুলে,
গায় পাখী, গায় কীট, গায় মধুব্রত।
সমীরণ বেণুবনে গাইতেছে এক তানে,
হাসিছে সংসার যেন পাগলের মত।
পিতা পুত্রশোক ভুলি, ধরেছে টপ্‌পার বুলি,
কাচা গলে পুত্র বসি নাচায় যোষিত।
রাক্ষসী রমণী হের, হারাইয়া প্রাণেশ্বর,
হাসে, ভাষে, নাচে, গায়, রঙ্গরসে রত।
ধিক্ জগতের ধর্ম্ম—ধিক্ রে জগত॥

জগতে ব্যথার ব্যথী হেরি না কোথায়;
এস বর্ষা, এস সথে! যেথা প্রাণ চায়।
এস ওই গঙ্গাজলে, অশ্রুবারি দিই ঢেলে,
দ্রবময়ী জানে ভাই কাঁদিতে ধরায়।
আকণ্ঠ ডুবায়ে জলে, বসি আমি কুতূহলে,
তুমি ঢাল পূত ধারা আমার মাথায়।
মাথে তব জল ঝারা, নয়নে আমার ধারা,
জাহ্নবীর ধারা সনে কেমন মিশায়।
প্রাবৃটে পর্ব্বত সুতা, মুরারি-চরণ-চ্যুতা,

রাঙ্গাপদ রক্তধূলি রঙ্গে মাখি গায়।
হের কিবা রাঙ্গা রঙে তরঙ্গ ছুটায়॥

নির্লজ্জ জগত হাসে, হাসুক সংসার,
কাঁদিবার স্থান সখে পেয়েছি এবার।
কাঁদে গঙ্গা কলকলে, কাঁদে আর যায় চলে,
সাগর সঙ্গম স্থলে বহে শতধার।
জাহ্নবীর সঙ্গে সঙ্গে, কাঁদিয়া বেড়াই রঙ্গে,
কে কোথায় কাঁদে এস দেখি একবার।
প্রয়াগে যমুনা মরি, জাহ্নবীর গলা ধরি,
জলে জল মিশাইয়া করে হাহাকার।
কাঁদে সিন্ধু গোদাবরী, নর্ম্মদা ফেলিছে বারি,
সরস্বতী আদি পুণ্য প্রবাহিনী আর।
তীর্থে তীর্থে চল অশ্রু করি পরিহার॥

কাঁদে বৃদ্ধ হিমগিরি অনন্ত দহনে,
ঝর ঝর ঝরে ধারা সহস্র নয়নে।
ভারতের গায় গায়, জলধি কাঁদিয়ে ধায়,
গম্ভীর যে জন সখে কাঁদিতে সে জানে।
যে চায় বসন্ত গীতি, গাক্ তায় নাহি ক্ষতি,
মল্লারে মিলেছে ভাল তোমা আমা সনে।
মল্লারে তুলিয়া তান, এস গাই মর্ম্মগান,
মাঠে, ঘাটে, সিন্ধুতটে, পর্ব্বতে গহনে।
তুমি বর্ষা আমি বন্ধু, আমি শূন্য তুমি সিন্ধু,
সাগরে আকাশে মিশে অনন্ত মিশ্রণে ;—
নির্বোধ বলিবে—"ভাল মিলেছে দুজনে।"

শ্রীবর্ষা-বন্ধু।

———০———

আমাদিগের জাতীয় চরিত্র।*

প্রথমেই কথা উঠিতেছে যে, আমাদিগের জাতির কথা আমাদিগের নিজের বলা উচিত কিনা? মনুষ্য মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ধর্ম্ম যে, অন্যান্য জাতি অপেক্ষা স্বজাতিকে অধিকতর দোষহীন দেখে। দীপ যেমন চারিদিকে আলোক ছড়াইয়া নিজের নীচের অন্ধকারটা দেখিতে পায় না, সেই মত অনেকেই স্বজাতির দোষগুলি দেখিয়াও দেখে না, বা জানিয়াও সব দোষ বলিয়া স্বীকার করে না, জাতিবৎসলতাই ইহার মূলকারণ। শিক্ষিত সভ্য জাতিমাত্রেই স্বজাতিকে অন্যান্য জাতি অপেক্ষা বড় দেখে। স্বজাতির কোন দোষ স্বজাতির কোন লোক প্রকাশ করিলে, তাহাকে নিন্দুক বলে, জাতির কলঙ্ক বলে। সুতরাং সেই ভয়ে এবং স্বজাতি বৎসলতার জন্য, সকল জাতীয় লোকই স্বজাতির সুখ্যাতি করিতেই লিপ্ত। এ হেন অবস্থায় আমি যে, আমাদের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে দুকথা বলিতে যাইতেছি, তাহাতে আমিও অবশ্যই সেই পথের পথিক হইব, ইহা সহজেই মনে হইতে পারে। কাজেই আমি যদি কেবল আমার স্বজাতির প্রশংসাকীর্ত্তন করি, তাহাতে বাহাদুরি কিছুই নাই। সকলেই আপনার প্রশংসা আপনি করিতে পারে। কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় না। দেখিতে শুনিতেও ভাল দেখায় না, অনেকে একথা বলিবেন। আবার আমি যে, স্বজাতির দোষগুলি সযত্নে ঢাকিয়া রাখিব ইহাও অনেকে সম্ভবপর বোধ করিতে পারেন। এখন যদি আমাকে ঐ মতে চলিতে হয়, অর্থাৎ আত্ম প্রশংসা করা বিধেয় নহে বলিয়া স্বজাতির প্রকৃত প্রশংসনীয় গুণগুলির উল্লেখ করিতে ক্ষান্ত হই, এবং স্বজাতি বাৎসল্যের বশম্বদ হইয়া আবার যদি দোষগুলি ঢাকিয়া রাখি, তাহা হইলে আমাকে এই খানেই ইতি করিয়া বসিয়া পড়িতে হয়। তবে একটা কথা

---

* এই প্রবন্ধটী নাসনাল রিডিং সোসাইটীর ডিবেটিং ক্লবের প্রথম অধিবেশনে পঠিত হয়।

উঠিতেছে যে, স্বজাতি বাৎসল্য ভাবের বশবর্ত্তী হইয়া, জাতীয় গুণগরিমা প্রকাশের সঙ্গে স্বজাতির দোষ গুলি, গুণের অভাব গুলি,—নিন্দা ব বৃথাকলঙ্ক নহে—প্রত্যেক দোষগুলির যদি আমরা উল্লেখ করি,এবং আমরা অপরের দ্বারা সেই সকল দোষ এবং অভাবের জন্য নিন্দিত এবং ঘৃণিত হইবার পূর্ব্বে, আমরা সেই সকল দোষ সংস্কৃত করিবার জন্য উপদিষ্ট হইবার পূর্ব্বে, আমরা নিজেই স্বজাতির সকলে মিলিয়া সেগুলির সংস্কার করিতে যত্নবান হই, তাহা হইলে স্বজাতির গুণগরিমা প্রকাশাপরাধে অপরাধী হইলেও, আমরা দোষ প্রকাশ সূত্রে অনেকটা উপকার পাইতে পারির না কি? এবং সেই উপকার পাইবার জন্য আমাদের পক্ষে চেষ্টা করা বিহিত নহে কি? তবে স্বজাতির দোষ গুলির উল্লেখ করিতে যাইলেই অনেকের বক্ষে সেগুলি বিষাক্ত বাণের ন্যায় বিঁধিতে পারে। অনেকে সেই জন্য হয়ত আমাকে জাতির কুলাঙ্গার বলিতে পারেন। উপস্থিত সভ্যগণের নিকট আমার প্রার্থনা যে, আমার মুখদিয়া স্বজাতির দোষ প্রকাশক কোন কথা বাহির হইলে, কেহ যেন কুভাবে গ্রহণ না করেন।

মনুষ্য বড়ই একত্র বস-বাস-প্রিয়। সেই একত্র বসবাস প্রিয়তার গুণে মনুষ্য সমাজ বদ্ধ হইয়া বসবাস করিয়া আসিতেছে। সেই সূত্রেই জাতির সৃষ্টি। কোন এক দেশের সমধর্ম্মাবলম্বী, সমভাষাভাষী, সম আচারব্যবহার সম্পন্ন মনুষ্য সমষ্টিকে লইয়াই জাতির সৃষ্টি হইয়া আসিতেছে। যে সকল গুণ এবং দোষ থাকিলে মনুষ্যের ব্যক্তিগত সুখ দুঃখ, শান্তি নিগ্রহ, ধন দারিদ্র, স্বাধীনতা দাসত্ব, প্রতাপ দুর্ব্বলতা, গৌরব কলঙ্ক, পুণ্য পাপ, নির্ম্মলতা মলিনত্ব ঘটে, সেই মত সেই সকল গুণ এবং দোষের জন্যই জাতি ভাগেও সেই শান্তি, নিগ্রহ, ধন, দারিদ্র্য, দাসত্ব স্বাধীনতা, গৌরব কলঙ্ক, প্রভৃতি ঘটে। যে জাতির মধ্যে সে সকল দোষগুণ সম্পন্ন লোক অধিক থাকে, সে জাতি সেই মত জগতে সুখদুঃখাদি ভোগ করে, এবং গৌরবান্বিত বা নিন্দিত হয়। আমরা প্রত্যেকেই জাতির এক একটী অংশস্বরূপ। আমাদিগের প্রত্যেকের দোষগুণের উপর আমাদিগের জাতির সৌভাগ্য দুর্ভাগ্য নির্ভর করিতেছে। সুতরাং জাতির কথা বলিতে গেলে, প্রকারান্তরে আমাদিগের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত কথাই বলা হয়। আমরা প্রত্যেকে যে ভাবে চলিব, যেরূপ করিব, জাতির আকৃতি তদনুসারেই গঠিত হইবে। আমা-

দিগের ব্যক্তিগত দোষগুণের বলে, ব্যক্তিগত সম্ভোগ হয় বটে, অপরকে তাহা ভোগ করিতে হয় না বটে, কিন্তু আবার স্বজাতির সমস্ত মনুষ্যের সেই ব্যক্তিগত দোষগুণ সমষ্টি এক হইয়া এমন মূর্ত্তি ধারণ করে যে, তাহার সহিত জাতির প্রত্যেক ব্যক্তির স্বার্থের অকাট্য সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায়। তাহার ফল প্রত্যেককে বিভাগ করিয়া সমান অংশে ভোগ করিতে হয়। জাতির মধ্যে জাতির চক্ষে প্রার্থনীয় গুণ সম্পন্ন লোক অধিক হইলে, দোষ সম্পন্ন লোকেরা সেই গুনসম্পন্ন লোকদিগের কল্যাণে শুভ ফল ভোগ করে, আবার দোষ সম্পন্ন লোকের সংখ্যা—যে সকল দোষ থাকিলে জাতির পতন এবং নিগ্রহ ভোগ অনিবার্য্য, সেই সকল দোষ সম্পন্ন লোক সংখ্যা—অধিক থাকিলে, জাতির অল্পসংখ্যক গুণসম্পন্ন লোকদিগকে সেই নিগ্রহ ভোগ করিতে হয়। এমত অবস্থায় আমাদিগের পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া একজন মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান হইয়া স্বজাতির দোষগুলি সংশোধন করিয়া স্বজাতিকে উন্নতির পথে—শান্তির পথে লইয়া যাইতে আমরা জাতির প্রত্যেকে স্বাভাবিক নিয়মানুসারে দায়ী—অবশ্য বাধ্য। সেই দায়িত্বটুকু অনুভব করাই প্রধান এবং প্রথম কাজ।

কোয়েটা হইতে ভামো পর্য্যন্ত হিমালয় হইতে কন্যা কুমারী পর্য্যন্ত বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে যে হিন্দু জাতির বাস, সর্ব্বাদৌ প্রধানত আমি সেই সমধর্ম্মাবলম্বী জাতির কথাই বলিব কিন্তু মধ্যে মধ্যে আমাকে এমন কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিতে হইবে, এমত কতকগুলি কথা বলিতে হইবে যে, অনেকে হয়ত ভাবিতে পারেন যে, সে গুলির সহিত আমাদিগের বঙ্গবাসী হিন্দুদিগের কোন সম্বন্ধ নাই। সুতরাং সেই ভুলটা দূর করিবার জন্য এখানে আমাকে গোড়াতেই একটি কথা বলিতে হইতেছে। কাহারও কাহারও ধারণা যে, বাঙ্গালী একটা স্বতন্ত্র জাতি, ভারতবাসী অন্যান্য হিন্দুদিগের সহিত আমাদিগের কোন সম্বন্ধ নাই, বেদে এবং পুরাণে যে সকল মুনি ঋষির উল্লেখ আছে, রামায়ণ মহাভারতে যে সকল ব্রাহ্মণের কীর্ত্তি কাহিনী—ক্ষত্রিয়গণের বীর গথা কীর্ত্তিত হইয়াছে, কেহ কেহ ভাবেন যে, সেগুলির সহিত বাঙ্গালী জাতির কোন সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এ ধারণাটা বড়ই ভুল। প্রথমত মীমাংসা করিতে হইবে যে, আমরা কে? দেখিতে

হইবে যে, এই বঙ্গদেশে কোন্ কোন্ বর্ণ সর্ব্বোপরি প্রাধান্য বিস্তার করিয়া, জাতির প্রধান অংশরূপে বিদিত। সকলেই জানেন যে, ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ এই দুইটী বর্ণই বাঙ্গালী জাতির শীর্ষ স্থান দখল করিয়া আছে। সেই ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ দুইটী বর্ণই এখানকার বাঙ্গালার আদিম অধিবাসী নহে, নবাগত উপনিবেশী। কামান বন্দুক, গুলিগোলা [illegible] লইয়া নহে, কূটরাজনৈতিক জাল বিস্তার করিয়া নহে নরশোণিত স্রোতে বাঙ্গালা ভাসাইয়া নহে, কেবল মাত্র বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান-বল নৈতিক বল এবং পবিত্রতা বলেই এই ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থবর্ণ বাঙ্গালা জয় করিয়া, বাঙ্গালী জাতির শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। বঙ্গের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে অনেক বর্ণের লোপ হইয়া গিয়াছে, অনেক বর্ণ অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। অন্যপক্ষে এই ব্রাহ্মণ কায়স্থের সংখ্যা দিন দিন বাড়িয়া আসিতেছে। আবার ব্রাহ্মণ কায়স্থ ভিন্ন অন্যান্য বর্ণেরাও এখানকার আদিম অধিবাসী নহে। সকলেই জানেন যে, নবম শতাব্দীর শেষ ভাগে বঙ্গরাজ আদিশূর বা বিজয় সেনের দ্বারা কান্যকুব্জ হইতে শ্রীহর্ষ প্রভৃতি পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থ বা ক্ষত্রিয় বঙ্গে আনীত হয়েন। তাঁহাদিগেরই বংশধর বন্দ্যোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধিধারী ব্রাহ্মণগণ এবং ঘোষ, বসু, মিত্র, গুহ দত্ত প্রভৃতি কায়স্থ বা ক্ষত্রিয়গণ এখন বাঙ্গালা জাতির প্রধান অংশরূপে বিরাজ করিতেছেন। এখন দেখা যাইতেছে যে কিছু কম হাজার বৎসর হইল, আর্য্য জাতির আদি বাসভূমি হইতে আমাদিগের ছাড়াছাড়ি হইয়াছে। আর্য্যজাতির অভ্যুদয় সময় হইতে হাজার বর্ষ পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর্য্যজাতির যে কিছু গৌরবজনক ঘটনা ঘটিয়াছে, অবশ্যই আমরা এই বাঙ্গালায় বসিয়া ভারতের অন্যান্য স্থানের হিন্দুদিগের ন্যায় অতীত স্মৃতির সাহায্যে সেই গৌরব অনুভব করিবার অধিকার রাখি বৈ কি? হাজার বৎসর হইল, আমাদিগের মধ্যে কেবল ভৌগোলিক বিচ্ছেদ এবং ভাষাগত বিভেদ দাঁড়াইয়াছে বৈত নয়। এ বিচ্ছেদ বিভেদ থাকিলেও আমরা একজাতীয়। যখন সুদূর মণিপুরের হিন্দুগণ যে বেদবিধিতে—যে মনু ব্যবস্থাতে, যে মন্ত্রে জাতকর্ম্ম, অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, দীক্ষা, বিবাহ, প্রেতকৃত্য, শ্রাদ্ধশান্তি সমাধান করিতেছেন, আমরা এই বাঙ্গালায় সেই বিধি, সেই

ব্যবস্থা, সেই মন্ত্রে, সেই সকল ক্রিয়া সমাধান করিতেছি, আবার আরব সাগর তীরবর্ত্তী বোম্বাইয়ের হিন্দুগণ, ভারতসাগর তীরবর্ত্তী মান্দ্রাজী হিন্দুগণ, মধ্যভারতের হিন্দুগণ, এবং করাচিস্থ হিন্দুগণও সেই বিধি, সেই ব্যবস্থা এবং সেই মন্ত্রে সেই সকল কার্য্য সম্পন্ন করিতেছেন, সেই এক বিধ ধর্ম্ম পালন করিতেছেন,—আমি বাঙ্গলায় বসিয়া যে, "ভরদ্বাজগোত্র, সামবেদী, কুথুম-শাখী" বলিয়া পরিচয় দিতেছি, সমস্ত ভারতের হিন্দুমধ্যে অনেকেই সেইমত পরিচয়দাতা দেখিতে পাইবে, আবার যে পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থ বঙ্গে প্রথমে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদিগের বংশধর গণের দ্বারা যেমন বাঙ্গলা পূর্ণ হইতেছে, সেই মত আদি পঞ্চব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ কায়স্থের অতি নিকট আত্মীয় জ্ঞাতিদিগের বংশধরগণ আজিও কেবল কান্যকুব্জ নহে, ভারতের নানা স্থানে বিরাজ করিতেছেন। কেবল মাত্র ভৌগোলিক বিভেদের জন্য ভাষাগত বিভেদ এবং কতকগুলি লৌকিক স্থানীয় আচার ব্যবহারের পার্থক্য দাঁড়াই-য়াছে মাত্র, নতুবা আর সকল বিষয়ই এক। যখন সমগ্র ভারতের সমস্ত হিন্দুর মধ্যে এরূপ অভিন্নতা, তখন কেমন করিয়া বলিব যে, বাঙ্গালি হিন্দুর সহিত ভারতের অন্যান্য হিন্দুর কোন সম্বন্ধ নাই? কেমন করিয়া বলিব যে, বেদপুরাণ রামায়ণ মহাভারতের সহিত আমাদিগের কোন সংশ্রব নাই? কেমন করিয়া বলিব যে, আর্য্য ঋষিকুল, আর্য্য ক্ষত্রিয় মণ্ডলীর গৌরব গরিমা প্রকাশক কার্য্যাবলির জন্য আমরা এক্ষণে গৌরবানুভব করিবার অধিকারী নই? আবার বলি, অতঃপর আমাকে এমত কতকগুলি উক্তি উদ্ধৃত করিতে হইবে, বা এমত কয়টী কথা বলিতে হইবে যে, কেহ যেন মনে না করেন যে, সেগুলির সহিত বাঙ্গলার বর্ত্তমান ব্রাহ্মণ কায়স্থ জাতির কোন সম্বন্ধ নাই।

এখন আমাদিগের জাতীয় চরিত্রকে দুইভাগে বিভক্ত করিতে হইবে। প্রথম অতীত, দ্বিতীয় বর্ত্তমান। এখানে অতীতকে টানিয়া আনিবার কারণ এই যে, তুলনায় সমালোচনার বিশেষ প্রয়োজন। তুলনায় সমালোচনা না করিলে, অতীতের সহিত বর্ত্তমানকে মিলাইয়া না দেখিলে, আমরা ভাল মন্দ বুঝিতে পারিব না। অবশ্য অতীত কালের হিন্দুদিগের সকল বিষয়ের অবস্থার সহিত আমাদিগের অবস্থাগত পার্থক্য বিলক্ষণ দাঁড়াইয়াছে। কেহ বলিবেন

যে, এই অবস্থাগত পার্থক্যের অবশ্যম্ভাবী ফল যখন জাতীয় চরিত্রগত পার্থক্য, তখন অতীতকে বিস্মৃতির গর্ভ হইতে টানিয়া আনিয়া বর্ত্তমানের পার্শ্বে খাড়া করিবার দরকার কি? আমি বলি, দরকার আছে বৈকি। সেই অতীতের সহিত বর্ত্তমানের তুলনা করিলেই আমরা বেশ দেখিতে পাইব যে, কোন্ কোন্ গুণ বশে আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ স্বজাতিকে উন্নতির রত্নাসনে বসাইয়া সুখশান্তি স্বাধীনতা সম্ভোগ করিয়া গিয়াছেন, এবং কোন্ কোন্ দোষের জন্যই বা আবার সেই সিংহাসন-চ্যুতি ঘটে। তুলনায় সমালোচনা করিলে আমরা আরও দেখিতে পাইব যে, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের কোন্ কোন্ গুণ আমাদিগের মধ্যে আজিও প্রচলন রহিয়াছে এবং কোন্ কোন্ পুরাতন বা নূতন দোষ আমাদিগকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। সেই জন্যই বলি যে, অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমানের তুলনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, যে সকল গুণ থাকিলে, মনুষ্য উন্নতি সুখ শান্তি গৌরবগরিমা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া জন সমাজে প্রশংসিত হয়, জাতির সমধিক সংখ্যক লোকের সেই সকল গুণ থাকিলেই আবার জাতি উন্নতির উচ্চসোপানে আরোহণ করিতে পারে। যে সকল কারণে মনুষ্যের ব্যক্তিগত পতন ঘটে, সেই সকল কারণেই আবার জাতিগত পতন ঘটে। সঙ্গ, আদর্শ, উপদেশাদি যেমন ব্যক্তিগত চরিত্র গঠনের সহায়তা করে, সেইমত জাতিগত চরিত্র গঠনের বিশেষ সহায়তা করে। মানসিক অবস্থা, রুচি এবং শিক্ষা যেমন ব্যক্তিগত অবস্থার উৎকর্ষাপকর্ষতা সাধন করে, সেইরূপ সেগুলি জাতিগত চরিত্রকেও উন্নতি বা অবনতি পথে লইয়া যায়। এখন দেখিতে হইবে, জাতীয় চরিত্রের উন্নতি সাধন জন্য কোন্ কোন্ গুণের প্রয়োজন।

দোষগুণ মানুষ মাত্রেরই আছে। কোন মনুষ্যই একেবারে দোষশূন্য এবং সমস্ত প্রার্থনীয় গুণসম্পন্ন হয় না, সেইমত জগতের কোনজাতিই অবশ্যই সকল দোষশূন্য বা সমস্ত প্রার্থনীয় গুণসম্পন্ন হইতে পারে না, ইতিহাস ইহা দেখাইয়া দিতেছে। তবে কোন কোন মনুষ্যের যেমন গুণভাগ বা দোষভাগ অধিক, সেইমত কোন কোন জাতির গুণ বা দোষভাগ অধিক হইয়া থাকে। তবে অধিক গুণ থাকিলেই দোষ কয়টিকে ঢাকিয়া রাখিয়া জাতিকে গুণের বলে উন্নতির দিকে লইয়া যায়।

এখন দেখিতে হইবে যে, কোন্ কোন্ গুণ থাকিলে জাতি উন্নতি প্রাপ্ত হইতে পারে। জগতের ইতিহাস বলিয়া দিতেছে যে, যে জাতির মধ্যে স্বধর্ম্মরত, সত্যপ্রিয়, পবিত্রস্বভাব, নৈতিকবলশালী, দৃঢপ্রতিজ্ঞ, উদ্যমশীল, সাহসী, মৈত্রীভাবসম্পন্ন, বলিষ্ঠ, স্বদেশানুরাগী, ত্যাগ স্বীকারকারী, সরল এবং জাতীয়-দায়িত্ব-পালন-কর্ত্তব্য-জ্ঞান-বিশিষ্ট লোক অধিক, সেই জাতির উন্নতি অনিবার্য্য, এবং যে জাতির অধিকাংশ লোকের স্বভাব তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত, সে জাতির পতন নিশ্চিত। এখন দেখিতে হইবে, আমাদিগের পূর্ব্বপুরষগণের—অতীতকালের হিন্দুজাতির উক্ত বিধ গুণগুলি ছিল কিনা? তাহা জানিতে হইলেই আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সে সম্বন্ধে যে সকল নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদিগের শিক্ষা, জ্ঞান, উন্নতির পরিচায়ক বেদ, উপনিষদ, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি যে সকল অমূল্য গ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন, সেই গুলির আশ্রয় লইতে হয়। কিন্তু এখনকার দিনে বেদ পুরাণাদির শরণ লওয়া নাকি মূর্খতা ও ধৃষ্টতার পরিচায়ক হইতে চলিল,—ইংরাজি ভাষায় শিক্ষিত, অবলম্বিত ব্যবসায়ে লব্ধপ্রতিষ্ঠ, স্ববর্ণের মধ্যে গণ্য মান্য কিন্তু সংস্কৃত ভাষার কথা দূরে থাক, মাতৃভাষায় যাঁহারা নাম স্বাক্ষর করিতে গলদ্‌ঘর্ম্ম হয়েন, এমত কোন কোন গণ্য মান্য লোক বেদ পুরাণের নাম শুনিলেই চটিয়া লাল হইয়া সপ্তমে সুর তুলিয়া আমাদিগের অভিধানে অপ্রাপ্য অভিধায় আর্য্যঋষিগণের শ্রাদ্ধ করিতে থাকেন—গুপ্তকক্ষে নহে, মিত্র মণ্ডলীর মধ্যে নহে, প্রকাশ্য সভায়—প্রকাশ্য সংবাদ বা সাময়িকপত্রে বেদ পুরাণাদির বিরুদ্ধে বজ্রনিক্ষেপ করিতে থাকেন, ঘুসির চোটে টেবেল ফাটাইয়া বজ্র-গম্ভীরনির্ঘোষে সদর্পে সাহঙ্কারে বলেন, "বেদ চাষার গান মাত্র, পুরাণগুলা ব্রাহ্মণ দিগের গাঁজাখুরি বুলি মাত্র! আর মুনিঋষিরা নিতান্ত বন্যবর্ব্বর অসভ্য ছিল, বিজ্ঞানের সহিত তাহাদের কোন পুরুষের সম্বন্ধ ছিল না" প্রভৃতি বলিয়া এক চোট ঝাল ঝাড়িয়া মনের ক্ষোভ মিটান,—মাতৃভূমির পুত্রের উপযুক্ত কাজ করেন। অবশ্য হিন্দু মাত্রেই বলিবেন, সে সকল কথা চাষার মুখে—কেবল চাষার মুখেই শোভা পায়। সংস্কৃত ভাষায় যাহাদিগের অধিকার আছে, অগাধ সংস্কৃত শাস্ত্র যাঁহারা মন্থন করিয়াছেন, তাঁহারা বিজাতীয় বিধর্ম্মী হইলেও ওরূপ কথা মুখে আনেন না। যাঁহাদিগের সংস্কৃত বর্ণমালায়

অধিকার নাই, যাহারা মুনি ঋষিগণের রচিত কোন গ্রন্থ পাঠ করেন নাই, যাহারা কেবল বিজাতীয় গ্রন্থ পড়িয়াই পণ্ডিত, তাঁহাদের মুখদিয়া অবশ্য উক্তবিধ উক্তি নির্গত হওয়া সম্ভব পর। যাহা হউক, কেহ বেদ পুরাণ প্রভৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করুন বা না করুন, এস্থলে সেই বেদ পুরাণাদির আশ্রয়গ্রহণ ব্যতীত উপস্থিত প্রশ্নেরমীমাংসা করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই।

প্রথমেই ধর্ম্মের কথা উঠিতেছে। ধর্ম্মহীন মনুষ্য থাকিতে পারে, কিন্তু ধর্ম্মহীন জাতি জগতে নাই। ধর্ম্মই জাতিগত ঔৎকর্ষ সাধনের প্রথম মূল। ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জাতির মধ্যে একতা, পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি, নৈতিক বলবৃদ্ধি, পবিত্রতা এবং শান্তি সংগৃহীত হয়। ধর্ম্মের নামে জাতিকে যেমন উত্তেজিত করিতে পারা যায় ধর্ম্মের জন্য জাতিকে একজন মনুষ্যের ন্যায় দণ্ডায়মান করিতে পারা যায়, ধর্ম্মের জন্য যেমন জাতিকে জন্মভূমি এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগী এবং স্বদেশ ও স্বজাতির জন্য ত্যাগ স্বীকার করাইতে পারা যায়, অন্য উপায়ে সহজে সেরূপ পারা যায় না। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষদিগের হৃদয়ে ধর্ম্মভাব কিরূপ প্রবল ছিল, তাহার বিশেষ প্রমাণ বোধ হয় হাজির না করিলেও চলিবে। বেদের ন্যায় প্রাচীন ধর্ম্মগ্রন্থ এজগতে আর নাই, ইহা বিজাতীয়গণও স্বীকার করিয়াছেন। সেই বেদ সাক্ষ্য দিতেছে যে, আর্য্য জাতির আদিপুরুষেরা সর্ব্বাদৌ ধর্ম্মের দিকেই দৃষ্টি দান, ধর্ম্মসাধন জন্য জীবন সমর্পণ এবং ধর্ম্মভাব চিন্তার জন্য যথা সাধ্য চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। সেই বৈদিক ঋষিগণের সময় হইতেই আমাদিগের জন্ম হইতে—মাতৃগর্ভে অবস্থান সময় হইতে—মরণ পর্য্যন্ত—মরণের পরপর্য্যন্ত—প্রত্যেক কার্য্য—সাংসারিক নিত্যনৈমিত্তিক সকল বিষয়ে—স্নান, আহার, বিহার, ভ্রমণ, শয়ন, শিক্ষাগ্রহণ, শিক্ষাদান, ঋণগ্রহণ, ঋণদান, গৃহপ্রবেশ, নববস্ত্র পরিধান, ঔষধ সেবন, বাণিজ্য করণ, কৃষিকার্য্য করণ, রাজদর্শন, বিদেশ ভ্রমণ প্রভৃতি সকল বিষয়েই ধর্ম্মের সহস্র বন্ধনীতে আমাদিগকে কঠোর বন্ধনে বাঁধিয়া আসিতেছে। জগতের কোন জাতির মধ্যেই মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক বিষয় এরূপে ধর্ম্মবিধির বিষম বন্ধনে বাঁধা নাই। বেদকে বা আর্য্য শাস্ত্র সমূহকে এখন বার দিনে চাষার গান বলা হয়, কিন্তু বলদেখি, বেদ

পড়িলে কি ইহা বুঝা যায় না যে, পূতস্বভাব মুনিঋষিগণের হৃদয় ধর্ম্মভাবে পরিপ্লুত হওয়াতেই জগতের মঙ্গলজন্যই তাঁহারা বিভিন্ন নামে ভগবানের আরাধনা, উপাসনা এবং তাঁহার নিকট জগতের মঙ্গল ও শান্তি প্রার্থনা করিতেন? ধর্ম্মভাব প্রবল ছিল কিনা, তাহাই লক্ষ্য। বেদ তাহা দেখাইয়া দিতেছে; আবার পরে মুনিঋষিগণের দীর্ঘকালব্যাপী চিন্তা এবং মস্তিষ্কক্ষয়ের ফল স্বরূপ বেদান্তে একেশ্বরবাদের আবির্ভাব, প্রবল হইয়া উঠে—ভগবানের ভিন্ন ভিন্ন নাম একে পরিণত হইয়া যায়। ধর্ম্মভাব আরও প্রবল হইতে থাকে। ধর্ম্মসম্বন্ধীয় এত সারগর্ভ, এত জ্ঞানগর্ভ, এত উপদেশ পূর্ণ, চিন্তাশক্তির উচ্চ অঙ্গের পরিচায়ক ধর্ম্মগ্রন্থ হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত যে, অন্য কোন জাতির মধ্যে তত গ্রন্থ নাই। যে বিষয়ের চর্চ্চা অধিক থাকে, সেই বিষয়েরই অধিক গ্রন্থ অবশ্যই সভ্য জাতির মধ্যে দেখা যায়। সুতরাং আমাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ বাহুল্য দ্বারা বেশ জানা যাইতেছে যে, অন্যজাতির আদিম অবস্থা হইতেই ভারতে ধর্ম্মভাব অতীব প্রবল ছিল, এবং সেই ধর্ম্মই আর্য্য জাতিকে পবিত্র স্বভাব, নৈতিক বলশালী, ব্রতশৃঙ্খলে আবদ্ধ, জন্মভূমির প্রতি অনুরাগী, এবং জগতের মঙ্গল সাধনে তৎপর করিয়া রাখিয়াছিল, ইহা কে অস্বীকার করিবে?

কমলমণি।

(উপন্যাস)

প্রথম পরিচ্ছেদ।

ভাদ্রের শেষ, রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর অতীত, আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, যেন কি ঘোর বিষাদ আজি প্রকৃতি রাজ্য অধিকার করিয়াছে,—শ্যামা রজনীর হীরকোজ্জ্বল চক্ষুরাজি আজি বিমান ভালে নিমীলিত, থাকিয়া থাকিয়া যেন ভীষণা

প্রকৃতি বিজৃম্ভন করিতে ছিলেন, সেই বিজৃম্ভনে বিলোল রসনা লক্ লক্ করিয়া উঠিতেছিল, দীর্ঘ নিশ্বাস প্রভঞ্জন উধাও হইয়া ছুটিতেছিল, তাহাতে বুঝি প্রকৃতির শান্তি ভঙ্গ হয়, তাই মধ্যে মধ্যে হুঙ্কার ধ্বনিতে দিগন্ত প্রতি-ধ্বনিত হইয়া জগতীতলস্থ দেহী মাত্রকে বিকম্পিত করিতেছিল, সেই অসাময়িক প্রকোপে কম্পিত হইয়া চঞ্চলা চপল চরণে ছুটিয়া ছুটিয়া যেন প্রাণ ভয়ে অন্ধকারের সুপ্রশস্ত অঙ্ক মধ্যে লুকাইতেছিল।

প্রকৃতি রমণী, তাই বুঝি এ ভীষণ ভাবই অধিকক্ষণ ধারণে সক্ষম হলেন না; রমণী হৃদয় যতই ব্যথিত হয় ততই চক্ষে জল আইসে, বিরাট হৃদয়া প্রকৃতি ভালেও তাহাই ঘটিল, সেই রমণী-সুলভ নয়ন নীর প্রবাহিত হইল, অশ্রু সম্পাতে ধরণী বক্ষ ভাসিয়া গেল, তখন একের দুঃখে অপরের হৃদয় গলিল, দুই ভগিনীতে যেন দেহে দেহ মিলাইয়া প্রাণে প্রাণ ঢালিয়া তন্ময় চিত্তে বিভোর হইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। প্রকৃতির রোদন প্রকৃতি বুঝে, নর কখন বুঝে, কখন বুঝে না, কখন সুখী হয়, কখন রোষ কষায়িত নেত্র আকুঞ্চিত করিয়া ভ্রকুটী করে।

আমরা আবার বলি প্রকৃতি রমণী, পুরুষ হইলে সেই ঘোর ঘন ঘটার পর বিমল বারি ধারায় বসুধা সিক্ত হইত বা দিগন্তব্যাপী অগ্ন্যুদ্গমে হইয়া ধরা ধাম ধ্বংশ হইত, তাহা ঠিক বলিতে পারি না।

সেই ঘোরান্ধকার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলে দূরে অন্ধকার ব্যতীত আর কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না, অতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে স্থির ভাবে দেখিলে দূরে যেন একটী আঁধারাচ্ছাদিত ভৌগোলিক মানচিত্র দেখিতে পাওয়া যায়, কেমন ছায়া ছায়া, অথচ ধু ধু করিতেছে, কেমন ধোঁয়া ধোঁয়া, অথচ তাহাতে কিসের ছায়া আছে, সে ছায়া যেন সে ধোঁয়া অপেক্ষা কিছু গাঢ়, অতি দূরে সেই ছায়া আঁধারে মিশিয়াছে; একটী অন্ধকারময় অর্দ্ধ চন্দ্র ভাব অস্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইতেছে। পশ্চাৎ ফিরিয়া দেখি সেই ভাব, সেই আঁধারাবৃত অর্দ্ধ চন্দ্র ভাবের সম্মিলনে যেন প্রকৃতির কটিবন্ধ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। তবে কে বলে প্রকৃতি বিবসনা? তবে কি চন্দ্র সূর্য্য প্রকৃতি চক্ষু, তারাহার হীরকময় অলঙ্কার, প্রশস্ত আকাশ পট কম কলেবরম, পৃথিবী অঙ্গবাস;—আহা সে বসনের কি তুলনা আছে! তাহাতে কত গঙ্গা যমুনা

লহরী খেলিতেছে, কত মনোমুগ্ধকর অপূর্ব্ব গঠন বিভূষিত কুসুম দাম ফুটিয়া আছে। কি শ্যামল শষ্প শোভিত রচনা ঠাম, কি এলাইত কেশ দাম, কত মহাসাগরে তাহা পরিণত হইয়া তরঙ্গ সঞ্চালনে বেণী বিলম্বিত ভাবে শোভা পাইতেছে, সেই পীনস্তনীর পীন স্তনে কত ধবলা গিরির নয়ন বন্ধন দৃশ্য দেখা যাইতেছে। প্রকৃতি যুবতী অথচ লজ্জাবতী, তাই সে শোভা মানব চক্ষে অতি অল্পই পতিত হয়, তাহাও আকস্মিক অনবধানতায়!

আজি সংসার কি প্রাণীহীন? পৃথিবীতে আলো নাই, আকাশে তারা নাই। আকাশে অন্ধকার, পৃথিবীতে অন্ধকার, আজি আঁধারে আঁধার মিশিয়া গিয়াছে, শ্যামবরণা বিলাসিনীর অঙ্গে নীলাম্বরীর সমাবেশ হইয়াছে।

প্রকৃতি তোমার এ ভাব কি শোভা পায়? সাংসারিক নিয়মের ব্যভিচার কেন হয়? যে সংসারে রূপে তালি চলে, চাবচিবেয় বার্ণিশ লাগে; ভয়ঙ্করী দেহ-পতন-করী অন্নচিন্তা সত্বেও অহঙ্কার দেখাইতে হয়, অভাব গোপনে রাখিয়া দাম্ভিকভাব পরিচয় দিতে হয়; যে সংসারের অতি বড় অভাগিনী বারবনিতাকেও হাসির লহরী তুলিতে হয়, সে সংসারে তোমার এত সুখ, এত আধিপত্য, এত অবাধ ক্ষমতা সত্বেও তুমি কেন দিবানিশি শরদেন্দু জ্যোৎস্না বিভায় বিভাসিত হইয়া, চিরদিন বসন্ত সঙ্গে রঙ্গ করিয়া, কুসুম দামের বিস্ফুটনে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আমোদিত করিয়া অধর টিপিয়া মধুর হাসি হাস না? প্রকৃতি! তোমার হৃদয়েও কি হতাশ আছে? তোমার প্রাণেও কি আকাঙ্ক্ষার অঙ্কুশ তাড়ন আছে? না তুমিও সংসারী, তোমাকেও এক দিন হাসিতে হয়, এক দিন কাঁদিতে হয়? হাসি কান্নার ওতপ্রোত ভাব হইতে কাহারও পরিত্রাণ পাইবার অধিকার নাই, তাই তুমি এক দিন হাস, এক দিন কাঁদ?

প্রকৃতি! তুমি অনন্ত কাল অনন্ত উদ্দেশে অনন্ত ভাবে কাঁদিতে থাক, আমার এ ক্ষুদ্র দেহের ক্ষুদ্র প্রাণ সে অনন্ত ভাবের অণুমাত্র আভাস ত গ্রহণ করিতে পারে না, তবে তোমার কথা ভাবি কেন? তবে এই বুঝি, তোমার হৃদয়ের এই প্রশস্ত বিস্তারণে সমগ্র সংসার সুবিস্তৃত হয়, নদী সাগর বলিয়া বোধ হয়, মানবের ক্ষুদ্র আত্মা সেই নৈসর্গিক ভাবে বিভোর হইয়া

চকিত ও ভীত হয়। তাই আজি, তোমার এ দৃশ্য দেখিয়া আমি ভীত তোমার হৃদয় ভাব যেন স্বপ্ন সাহায্যে এই ক্ষুদ্র হৃদয় মধ্যে অঙ্কিত করিয়া কি এক অপূর্ব্ব ভাবে বিভোর! চল প্রকৃতি তোমার লক্ষ্য স্থানে। আমি শূন্য প্রাণে সেই অলক্ষিত স্থানের অনুসন্ধানে থাকিলাম।

ঈশ্বরের অগাধ সৌন্দর্য্য দর্শনেই শিল্পের উৎপত্তি, প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যে মাতোয়ারা হইয়া শিল্পী তাহার ছায়া অঙ্কিত করে, কখন সেই অপূর্ব্ব রচনা চাতুর্য্যের উপর চাতুরী করিতে চেষ্টা করে: ভাল করিতে চায় কিন্তু মন্দ হয়। আজি আমি প্রকৃতিকে বর্ণনা করিতে অপটু চিত্রকরের ন্যায়, তাঁহাকে মন্দই করিলাম, ভাল করিবার ক্ষমতা কোথায়?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূত নাকি?

জল থামিয়াছে, কিন্তু আকাশ বেশ পরিষ্কার হয় নাই; প্রকৃতির ভীষণ বন্ধন হইতে প্রগাঢ় মসিলেখা অপসৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু ছায়া যায় নাই; মানিনীর পরিম্লান বদনদ্যুতি ঈষৎ প্রভাময় হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে হাসিরেখা দেখা দেয় নাই,—এখন আকাশের ইতস্তত দুই একটী নক্ষত্র দেখা যাইতেছে, অর্দ্ধ চন্দ্রদেবের অর্দ্ধাঙ্গভাব মধ্যে মধ্যে দেখা দিয়া আবার তখনি কাল মেঘে ঢাকা পড়িতেছে, কখন কখন বা সেই কৃষ্ণবর্ণ ভেদ করিয়া স্বীয় রূপ-বিভার কিছুমাত্র আভাস না দিয়া আপন অস্তিত্ব গোপন করিতেছে।

পাঠক! এই সময়ে আমার সহিত একটী জনহীন প্রান্তরে আইস। সম্মুখে কি দেখিয়াছ কি? একটী পুষ্করিণী। তাহার চতুস্পার্শ নিবড়ি বন, ঈশান কোণে একটী প্রকাণ্ড অশ্বত্থ বৃক্ষ। সেই প্রবীণ মহীরুহের অসংখ্য পত্ররাজি বহিয়া টপ্ টপ্ করিয়া জল পড়িতেছিল। পুষ্করিণীর স্থানে স্থানে

ভগ্ন মৃণ্ময় কলস, অর্দ্ধ দগ্ধাবশিষ্ট বংশ খণ্ড প্রভৃতি পড়িয়া রহিয়াছে। মধ্যে মধ্যে শৃগালগণের কলহ জনিত কোলাহলে সেই ভীষণ স্থানের নিস্তব্ধতায় অশান্তি সম্পাদিত হইতেছিল।

এ স্থানটী কি তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না। বহু কালাবধি ইহা তন্নিকটস্থ কতিপয় গণ্ডগ্রামের শ্মশানের কার্য্য করিতেছে। যে শ্মশানে পিতা পুত্র, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী স্ত্রী একত্রে শয়ান থাকেন, ইহা সেই শ্মশান! যে শ্মশানে রূপের আদর নাই, জ্ঞানের গৌরব নাই, অর্থের মর্য্যাদা নাই, অহঙ্কারীর গরিমা নাই, তস্করের শাস্তি নাই, তপস্বীর পূজা নাই, ইহা সেই মহান্ সমাধি ক্ষেত্র। যেখানে রাজা হইতে সামান্য প্রজা, জগৎশেঠ হইতে পথের ভিখারী দ্রৌপদী হইতে পথের গণিকা, রাণা প্রতাপ সিংহ হইতে পাপিষ্ঠ উদয় সিংহ পর্য্যন্ত সমভাবে ভস্মীভূত হইয়াছেন, ইহা মানবের সেই আত্মগুরিতা ত্যাগের প্রধান সোপান। যে শ্মশান শোকে উচ্ছ্বসিত হয় না, কারুণ্যে বিচলিত হয় না, প্রিয়তমার ক্রন্দনে যাহার ভ্রূক্ষেপ নাই, মাতার রোদনে যাহার দয়া নাই, পিতার কাতরতায় যাহার জ্ঞান নাই, পুত্রের মমতায় যাহার দৃষ্টি নাই, ইহা সেই সর্ব্বনাশ ক্ষেত্র, নর-গরিমার প্রান্তসীমা, জীবলীলার নির্দ্দিষ্ট স্থান। সংসারের মহাশ্মশান!

সেই ভীষণ শ্মশান স্থানে, সেই ভীষণ রাত্রে একটী লোক আসিয়া দাঁড়াইল। একবার এদিক ওদিকে দৃষ্টি সঞ্চালন করিয়া স্কন্ধদেশ হইতে একটী শব নামাইল, শবটী একটী শিশুর!

আগন্তুকের বয়ক্রম ত্রিংশৎ বর্ষের কম কোন ক্রমেই নহে, দেখিতে দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ ও কৃষ্ণবর্ণ, মস্তকে অল্প কুঞ্চিত কেশ, চক্ষু দুটী ছোট ছোট কিন্তু লোহিত বিভা সম্পন্ন, ওষ্ঠদ্বয় পুরু পুরু। ভয়ঙ্কর রাত্রে এই ভয়ঙ্কর স্থানে শব বহন করিয়া যে একাকী আসিতে পারে, তাহাকে আমরা সাহসী না বলিয়া আর কি বলিব? কিন্তু লোকটীকে দেখিয়া তাহাকে অল্প শঙ্কান্বিত বলিয়া বোধ হইতেছিল।

লোকটী একটী গর্ত্ত খুঁড়িতে লাগিল। গর্ত্ত খনন সমাপ্ত হইলে সেই মৃত বালকটীর বস্ত্রাদি তন্মধ্যে স্থাপন পূর্ব্বক যেমন মৃত দেহটী রাখিবে, এমত সময় তাহার সম্মুখস্থ অশ্বত্থ বৃক্ষ পার্শ্ব হইতে কে খল খল করিয়া হাসিয়া

উঠিল ; লোকটীর বক্ষ মধ্যে যেন ভয়ঙ্কর শৈত্যানুভূত হইল, সর্ব্ব শরীর অবশ হইল, বক্ষের সশব্দ উত্থান ও পতন স্পষ্ট অনুভূত হইতে লাগিল। সে ইতি কর্ত্তব্য বিমূঢ় ভাবে বৃক্ষের দিকে চাহিল, যাহা দেখিল তাহাতে অশঙ্কা বাড়িল বই কমিল না।—দেখিল, একটী শীর্ণদেহ দীর্ঘকায় কৃষ্ণবর্ণ লোক, অতি ক্ষুদ্র অথচ ছিন্ন বসন পরিহিত হইয়া হাসিতে হাসিতে নাচিতে নাচিতে করতালি দিতে দিতে তাহার দিকে আসিতেছে, তাহার বিকট করতালির শব্দে শববাহকের অন্তরাত্মা শুকাইয়া গেল। সে শ্বাসশূন্য ভাবে, ভীতিবিহ্বল চিত্তে ভাবিল "একি, ভূত নাকি ?"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ভূতের ব্যবহার।

ভূত তখন লোকটীর সম্মুখীন হইয়া দুগ্ধ ফেননিভ দন্তশ্রেণী বাহির করিয়া একবার তাহার দিকে, আর একবার মৃত শিশুর দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া হাসিয়া আকুল হইল, উন্মত্ত ভাবে করতালি দিয়া নাচিতে লাগিল, আবার তখনি মুখ বাঁকাইয়া বঙ্কিম ঠামে দাঁড়াইয়া বলিল " তুই কেরে ?"

লোকটীর তখন ভয়ে আর রাম নামও মুখে আসিতেছিল না, কথা কহিতে চেষ্টা করিল, কিন্তু কথা ফুটিল না, গোঁ গোঁ করিয়া বলিল "অ— আ—"ভূত চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বলিল,—"আরে আ-আ কি, তুই কে তা বল্‌না ?"

"বাবা—আ—"

ভূত জিহ্বা বিস্তারণ করিয়া বলিল " আঃ "

" আমি রাম কনা ।"

" রাম কানাই—তবে আয় তোকে খাই।"

বলিয়া ভূত হা হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রামকানাই "বাবা গো" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল।

ভূত মৃতশিশুটীকে কোলে করিয়া সোহাগ করিতে লাগিল। রামকানাই তখন মনে মনে ভাবিতেছিল "কে বলে ভূতে রাম বলে না, এই যে জল জ্যন্ত আমার নাম কল্লে।" রাম কানাইএর রাম নামের যে প্রবল ভরসা ছিল তাহা তিরোহিত হইল, সুতরাং উপায়ান্তর নাথাকায় সে দোহাই দস্তুর পাড়িয়া বলিল "বাবা, আমি গরীবের ছেলে, আমার আর কেউ নাই বাপ, আমায় মেরো না, আমি কি শনি মঙ্গল বারে দুধ কলা দিয়ে তোমার পুজো দিয়ে যাব।"

ভূত। আর অমাবস্যায়?

রাম। যে দিন যা বল্‌বে।

ভূত। কচি ছেলে।

রাম। তাই দেব।

ভূত। কোথায় পাবি?

রাম। পাড়া থেকে খুঁজে আন্‌ব।

ভূত হাসিয়া বলিল "তবে তুই পার্‌বি?"

রাম। খুব পাব্‌ব।

ভূত। এ কাদের ছেলে?

রাম। জমীদারদের ছোট বাবুর।

ভূত। নাম কি?

রাম। কার বাবা?

ভূত ভ্রূকুটী করিয়া বলিল "ছোট বাবুর।

রাম। অন্নদা বাবু।

ভূত। তার কয় বেটা?

রাম। আর নেই, একটী মেয়ে আছে।

ভূত। ছেলেটী কিসে মলো?

রাম। হঠাৎ।

ভূত। হঠাৎ!

রাম। দোহাই তোমার সত্যি কথা।

তখন ভূত ছেলেটীর দিকে ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল। রাম কানাই বলিল "যদি বলেন ত এখন আসি।"

ভূত। তুই যাবি ?

রাম। হাঁ বাবা।

ভূত। তবে যা, পালা—পালা।

রাম কানাই আর দ্বিরুক্তি না করিয়া উর্দ্ধশ্বাসে ছুটিয়া পলাইল। শিশুটীর মৃত দেহ ভূতের হাতেই রহিল।

* * * * *

রাম কানাই পলাইলে ভূত একবার মৃত শিশুটীকে বেশ করিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া তাহার ত্যজ্য পরিচ্ছদাদি দেখিতে লাগিল, দেখিতে দেখিতে এক খানি কাগজ দেখিতে পাইল। তখন আকাশ বেশ পরিচ্ছন্ন হইয়াছে, সুতরাং চন্দ্রালোকের সাহায্যে তাহা পাঠ করিয়া দেখিল তাহা মৃত শিশুটীর জন্মপত্রী,—ভূত তখন কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া তাহা পাঠ করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল,—'শকাব্দা ১৭৮৬।৯।২২।১৮।৪৮।২০ সুতরাং ৭ মাসের। লগ্নে বৃহস্পতি, কিন্তু শুক্রস্য ক্ষেত্র, সূর্য্যস্য হোরা, কুম্ভরাশি, নরগণ।' পরে জাতাহ প্রবাহ, প্রভৃতি দেখিয়া ক্ষণেক স্থিরভাবে থাকিয়া বলিল "কই কোন রিষ্টি ত নাই, তবে এ অকাল মৃত্যু কেন ?" ভূত হা হা করিয়া হাসিয়া উঠিয়া, আবার ছেলেটীকে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিল। শেষে বলিল "কোষ্ঠী ভুল।" 'বন্ধু ভাবে কেতু বিদ্যতে, তৎফল সামান্য মিত্রং।' সেটা ঠিক নইলে আমার হাতে এল কেন ? 'রিপুভাবে গ্রহভাবে, জায়া ভাবে শুক্র বিদ্যতে' তার ফল যুবতী মন্দির, না হয় শ্মশান। হায় রে! ধর্ম্ম ভাবে বুধাদি ন বিদ্যতে, তৎফল আদৌ বুধাদি ন ফল। বুধাদি ন সমাযোগে চারু চক্ষুর্বিচক্ষণৈঃ গুণবান ধীমান পণ্ডিত সুধীত্যাদি. "তাত খুবই।" তখন ভূত "কোষ্ঠী ভুল"• আবার এই কথা বলিয়া ছেলেটীকে কোলে লইয়া আদর করিতে করিতে সেই অশ্বথ বৃক্ষের দিকে চলিল, ক্রমে তাহার সন্নিকটবর্ত্তী হইয়া সহসা যেন কোথায় অদৃশ্য হইল, অরণ্যের গাঢ়তায় যেন তাহার দেহ মিশাইয়া গেল।

অহঙ্কারের পরিণাম।

কমল ও শিমুল।

১

গহন কানন মাঝে সরসীর কম কোলে
হাসিছে সোহাগে গলি কমলের কলি।
সৌরভ মোদিত চিতে
মধু গুণ গুণ গীতে
আসিয়া জুটিছে তথা মধুলোভে অলি।

২

লইয়া ফুলের সাজি মুনিকুমারেরা আসি,
ছিঁড়িছে অমল মুখে কমলের নাল।
পসারি কোমল কর,
ভুলিল আপনা পর,
শুনিয়া অলির গান—অমৃত রসাল॥

৩

নিরখিয়া হেন ভাব 'যেন গরিমায় গলি'
মৃদুল অনিলে তনু দোলা'য়ে বিরল।
হে'সে হে'সে উপহাসে,
ঘৃণার কঠোর-ভাষে,
নেহারি শিমুল ফুলে, কহিল কমল—

৪

"রে শিমুল, কমলেরে দেখা'য়ে বিফল হাসি,
হাসিছিস্, কোন্ মুখে ওরে লাজহীন?
কে চাহে রে তোর পানে?
কাহার তৃষিত প্রাণে,
তুষিতে পারিস্ তুই বল, একদিন?

৫

"দেবতা চাহে না তোরে, তোর রাঙ্গা তনু কভু
ঘৃণায় ছোঁয়না অলি—ফুল-সহচর।
কুসুম ভূষণ শোভা
সদা যার মনোলোভা,
সেই বনদেবী তোরে করে না আদর॥

৬

"তবে তুই কার বলে, হাসিছিস্ এত হাসি,
মিশাইয়া কমলের নয়নে নয়ন?।
হাসির কারণ চাই,
তা' নহিলে হাসি নাই,
কারণ বিহনে কোথা কাজের ঘটন?

৭

"চাঁদেরে সকলে ভাল বাসে—তার গুণে মজি,
তাই সে মনের সুখে ল'য়ে তারা দলে,
হাসির জোঁছোনা ধার
ঝরিয়া অনিবার,
হাসায় ভুবন, বসি, আকাশের তলে॥

৮

"কে না ভালবাসে মোরে অখিল ভুবন মাঝে?
রাখে মোরে কোলে কোলে সরসী সতত,
মধু লইবার আশে,
গায় সদা মম পাশে,
মৃদুনাদে গুণ-গান মধুকর যত॥

৯

"অই দেখ চারুছবি— অলির ললিত গীতে,
মোহিত হইয়া আছে মৃগশিশুগণ!
কমল তুলিতে আসি,'
পাশরি কমল-রাশি,
মুনিঋষি কুমারেরা আছে অচেতন॥

১০

"যথা তথা রে শিমুল, নাহি মোরে পায় লোকে
তাই মম ভালবাসা দেখাবার তরে।
যত কুলবালা-কুল,
সোণার কমলফুল
পরে থাকে সযতনে বেণীর উপরে॥

১১

বনদেবী রাখে মোরে করিয়া গলার হার;
কমল-আসনে বসে কমলা, ভারতী।
সাবদারে পূজা করি,
কমলের দলে, অরি—
রাবণে বধিয়াছিলা রাম রঘুপতি॥

১২

"কমলে জনম ধরে জগৎ-বিধাতা, মম
কবির লেখনী-সহ পীরিতি নিয়ত।
দুরদম বিষধর—
থল নাই যার পর,
সে রহে কমলবনে মম পদানত॥

১৩

"কে না ভালবাসে মোরে তাই আমি মনসুখে,
সরসীর কোলে বসি' হাসি অনিবার।
ভাবহীন তোর হাসি
আমি কিরে ভালবাসি?
রে শিমুল হাসি মোরে দেখাস্ না আর॥

১৪

"হাসিস্ না, কাঁদ তুই অরে ফুলকুলাধম।
এ সংসারে দশা যার যখন যেমন।
সে যদি সে ভাবে চলে,
তবে কেবা তারে বলে
ঘৃণার কঠোর বাণী—মরম ঘাতন?"

১৫

"তাই বলি কেঁদে কেঁদে জানাও বিভুব পদে,
এ মিনতি,—'দযাময়, চবণে তোমাব।
লইও না পাপেব শোধ,
এই মম অনুবোধ—
গুণহীন করি' মোবে সৃজিও না আব'॥"

১৬

কাতবে কহিল তবে শিমুল— "হে ফুলবাজ!
উপহাস কেন মোবে কব অকাবণ?
নিজ ভাব-বসে ভাসি,
দিবা নিশি আমি হাসি,
তোমায় দেখাতে আমি হাসি না কখন॥

১৭

"যা দিয়াছে বিভু মোবে, অপাব করুণা গুণে,
তা'তেই পবম সুখে আছি আমি ভবে।
তাই, সদা হে'সে হেসে
সুখ-নীবে ভে'সে ভেসে,
সে কথা বিভুব পদে জানাই নীববে॥

১৮

"নিয়ত ছলনাময় অপাব সংসার মাঝে
কেহ যেন কভু মোবে নাহি ভালবাসে।—
এইটিই আমি চাই,
দয়াল বিধিও তাই,
রূপ গুণ বাখে নাই শিমুলের পাশে॥

১৯

"রূপ গুণ এ দু'য়ের সমাবেশ যে আধাবে,
তথায় বিপদ, দুঃখ, বাঁধা অবিবল।
যেইথানে গুণ যত,
দোষে তারে ধবে তত,
গুণরাশি মথি' খলে উঠায় গরল॥

২০

"রূপের অমৃত কূপে কামের বাড়ব-শিখা
অদেখায় ধক্ ধক্ করে অনিবার।
যে দেয় তাহাতে ঝাঁপ,
বাড়ব শিখার তাপ
পোড়াইয়া দগধ করে শরীর তাহার॥

২১

"দেবগণ হে কমল তোমায় বাসেন ভাল,
যবে ঋষিকুমারেরা দেবতাচরণে,
দিতে পুষ্প উপহার,
ছিঁড়িবে তোমার মাথা,
ভালবাসা কি যে সুখ, বুঝিবে তখনে॥

২২

"কেন হে কাঁদিব আমি? কাঁদ তুমি ফুলরাজ।
যদিও গরব ভরে না কাঁদ এখন,
চলিলে চরমাচলে
দিনমণি, আঁখি জলে
ভাসিবে—ভাসিবে তুমি বঁধুর বিহনে,
ভালবাসা কি যে সুখ, বুঝিবে তখনে॥

২৩

গরিমা ক'র না ও হে কুসুম রতন। তব
রূপের আলোক পাবে নিবিতে পলকে।
উদারতা ভূষা যার,
অপার সুষমা তার;
দেখ না, মেঘের কোলে দামিনী ঝলকে॥"

২৪

শুনি শিমুলের বাণী, রোষে অভিমানে মাতি,
আদেশিল অলিদলে কুসুম-কমল—
"থাকে যদি ভালবাসা—
কমলের মধু আশা,
সাজ রে মধুপ তোরা সাজ দলে দল॥

২৫

"সহে না সহে না আর অধমের উচ কথা,
এখনি লহ রে তোরা পরিশোধ তার।
বিষের দশন দিয়া,
কাটিয়া ফেল রে গিয়া
সমূলে শিমুলদলে—আদেশ আমার॥—"

২৬

মার মার করি তবে— আসিয়া এ হেন কালে
মদকল করি-দল, পশি' বাপী-নীরে।
হরিষে চরণ-তলে
দলিয়া কমল-দলে,
মূল সহ উপাড়িয়া ফেলিল অচিরে॥

ফুরাইল কমলের বৃথা অভিমান।
গরিমার পরিণামে পতন বিধান।

কাসাবাঙ্কা।

পিতৃভক্তি।

যে সময়, "নাইলের" জলযুদ্ধ বাজে,
'ওরিয়েণ্ট'-রণতরী-অধ্যক্ষ যে জন—
আপন তনয় সহ, ছিলেন জাহাজে,
"কাসাবাঙ্কা" নাম তার, শুন সুধীগণ।

অধ্যক্ষ সমর কালে, কোন প্রয়োজনে,—
তরী ত্যজি স্থানান্তরে, করিল গমন,
কাসাবাঙ্কা প্রতি কন, মধুর বচনে,
"থেকো বাপ! হেথায় না, ফিরি যতক্ষণ।"

পিতা প্রতি, কাসাবাঙ্কা, কহিল তখন,
"যথা ইচ্ছা গমন, করুন আপনার;—
তরী ছাড়ি কোথাও না, করিব গমন,"
বসিয়া রহিল শিশু, * গুণের আধার!

* বয়স ত্রয়োদশ বর্ষ মাত্র।

অধ্যক্ষ ত্যজিয়া তরী, গেলেন যেমন,
অচিরেই, পথে তাঁর, হলো প্রাণ-নাশ,—
এড়াইযা ভবদায, জন্মের মতন,
স্বর্গপুরে গিযা তিনি, করিলেন বাস !!

হেথায় আগুন লাগে, জাহাজ উপর,
জাহাজস্থ, লোক যত করে পলায়ন,—
কাসাবাঙ্কা মনে মনে, এই চিন্তা করে--
"জনকের হতেছে, বিলম্ব কি কারণ।"

"আগুন লেগেছে বটে, যদিও জাহাজে,—
পিতা না আসিলে আমি কেমনেতে যাই —
নাব'লে চলিয়া যাওয়া, এত নাহি সাজে,
ব্যাকুল হবেন বাবা, দেখে আমি নাই।"

এতেক ভাবিয়া শিশু, রহিল বসিয়া,
জানে না জনক তার, গেছে স্বর্গধাম .
প্রতিক্ষণ রহে পিতৃ-প্রতীক্ষা করিয়া,—
দারুণ বিধাতা তায হইলেন বাম।

মাস্তুল, নিশান, পুড়ি হলো ছারখার,
তবু নাহি কাসাবাঙ্কা, করে পলায়ন,—
'এখনই আসিবেন, জনক আমার,—'
মনে মনে কাসাবাঙ্কা ভাবিছে তখন।।

ক্রমে আসি হুতাশন বসনে ধরিল,
তবু সে পিতার বাক্য না করি হেলন .—
অবশেষে, কাসাবাঙ্কা পুড়িয়া মরিল,
কত দূর পিতৃভক্তি, কর দরশন ।।

জনকের হয় পাছে আদেশ লঙ্ঘন,
এই হেতু কাসাবাঙ্কা পুড়িয়া মরিল—
ধরাধামে সুদুর্লভ. হেন "পুত্রধন,"
বালক অক্ষয় কীর্ত্তি রাখিয়া যাইল।

যে কীর্ত্তি রাখিল শিশু অবনী ভিতর—
জ্ঞানবান পুত্রগণ পাবে না এমন—
সবারি সমান মায়া প্রাণের উপর ;
কে দেয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে প্রাণ বিসর্জ্জন।

পিতৃসত্য পালনার্থ রঘুকুলমণি,
রাজ্য ত্যজি, বনবাসে করিল গমন ;—
দেখায়ে গেছেন কত ভক্তি-ধনে ধনী,
আজিও তাঁহার কীর্ত্তি ঘোষিছে ভুবন।

পিতা পুত্র, দুইজনে অকালে মরিল,
হইযাছে এটী বড় আক্ষেপ-বিষয় ,—
হেন পুত্র-পিতা হায বেঁচে না রহিল,
পুত্রের মরণে পৃথ্বী রত্ন-শূন্য হয় !

চিরজীবী হইত সে, হেন কথা নয,
বাঁচিলে মহৎ কার্য্য করিত সে জন,—
শৈশবে এমন সুধী, গুণ যার হয,
না জানি বযসে গুণী হইত কেমন !

কাসাবাঙ্কা-খ্যাতি শুনে হিংসক যাহারা,
"বোকা" ছিল ব'লে গ্লানি করিবে তাহার ,
বুদ্ধিমান ! পিতৃ-আজ্ঞা শুনেন না তাঁরা—
কাসাবাঙ্কা "বোকা" বই কি হইবে আর !

পিতৃ-আজ্ঞা লঙ্ঘনেতে মহাপাপ হয়,
বারেক না ভাবে হৃদে কুলাঙ্গারগণ —
সহস্র জনম সেই নরকেতে রয়,
শাস্ত্রের বচন ইহা শুন সুধীগণ।

যা' বলে বলুক, খল নিন্দকের কুল—
ভব-পটে, চিত্র তার অঙ্কিত রহিল ;
প্রকৃতি-উদ্যানে, সেই 'পারিজাত-ফুল,'
যাহার সৌরভ সুধী-জগত পুরিল !

শ্রীরাধাজীবন রায়।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৬। | ১১ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্র।

১৯। বিশেষাবিশেষলিঙ্গমাত্রা লিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।

পদাচ্ছেদঃ। বিশেষ অবিশেষ লিঙ্গমাত্র অলিঙ্গানি গুণপর্ব্বাণি।

পদার্থঃ। বিশেষা মহা ভূতেন্দ্রিয়াণি অবিশেষা তন্মাত্রাণি, লিঙ্গমাত্রং বুদ্ধিঃ অলিঙ্গং অব্যক্তং প্রকৃতিঃ বিশেষাশ্চ অবিশেষাশ্চ, লিঙ্গমাত্রঞ্চ অলিঙ্গঞ্চ তানি বিশেষা বিশেষলিঙ্গ মাত্রা লিঙ্গানি গুণানাং পর্ব্বাণি অবস্থা বিশেষাঃ।

অন্বয়ঃ। গুণপর্ব্বাণি (চত্বারি) বিশেষা বিশেষ লিঙ্গমাত্রালিঙ্গানি ভবন্তী তিশেষঃ।

ভাবার্থ। গুণাত্মকো বংশস্তস্য অলিঙ্গাদি বিশেষান্ত পর্ব্বচতুষ্টয়ং অবস্থা ভেদাঃ নাত্যন্তং ভিন্নাঅতো গুণেম্বেব সর্ব্বদৃশ্যনামন্তর্ভাবঃ ইতি সূত্রকারাশয়ঃ। সর্ব্বত্র ত্রিগুণাত্মকস্যান্বয়িত্বেন প্রত্যভিজ্ঞানাদবশ্যং জ্ঞাতব্যত্বেন যোগকালে চত্বারি পর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি ইতি ভোজ রাজঃ।

অনুবাদ। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই তিন গুণের চারটি পর্ব্ব বা অবস্থা— (১) বিশেষ (পৃথিব্যাদি মহাভূত ও ইন্দ্রিয় সকল) (২) অবিশেষ (পঞ্চতন্মাত্র) (৩) লিঙ্গমাত্র (বুদ্ধি) (৪) অলিঙ্গ (অব্যক্ত প্রকৃতি)।

সমালোচনা। পূর্ব্ব সূত্রে দৃশ্য বলিয়া উক্ত হইয়া তাহারা যে সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই গুণত্রয়েরই বিকার বা পরিণাম বিশেষ, তাহাই এই সমালোচ্য সূত্র দ্বারা সমর্থিত হইতেছে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে যদ্যপি এই সূত্রে বিশেষ প্রথমে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং অলিঙ্গ পরে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে কিন্তু

বাস্তবিক উহাদের ক্রম সম্পূর্ণ বিপরীত, গুণের প্রথমপর্ব্ব অলিঙ্গ এবং চরম বিশেষ।

পর্ব্ব শব্দের আভিধানিক অর্থ পাব। যেমন একটি বাঁশ পাবে পাবে বর্দ্ধিত হইয়া অতি মহত্ত্ব প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ সত্ত্ব রজঃ তমঃ এই সমষ্টী-ভূত গুণত্রয় পাবে পাবে বিস্তৃত হইয়া এই বিশ্বরূপ অনন্ত দৃশ্যাকারে পরিণত হইয়াছে। যোগীদিগের জ্ঞানের সৌকর্য্যার্থ এই অনন্ত দৃশ্য নিচয়কে চারভাগে বা চারটি পাবে বিভক্ত করা হইয়াছে। এস্থলে এ কথাটিরও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য, সংস্কৃত দার্শনিকগণ বাহ্য জগতকে অতি তুচ্ছ হেয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন; সেই জন্য ইহাদিগের সমষ্টিভাবে নির্দ্দেশ করিয়াছেন মাত্র অর্থাৎ যতটুকু না বলিলে আসলে ন্যূনতা ঘটে, ইহাদের বিষয় ততটুকু বলিয়া গিয়াছেন মাত্র। এই জন্য তাঁহারা সমুদয় দৃশ্যকে চার পর্ব্বে বিভক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা যদি ইউরোপীয় দার্শনিক-দিগের ন্যায় বাহ্য জগতই সার এবং মনুষ্য জীবনের একমাত্র লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া উহাদের ব্যষ্টিভাবে নির্দ্দেশ করিতেন, তা হলে বোধ হয় আরও অনেক পর্ব্ব বাহির হইত। মহর্ষি পতঞ্জলির মুখ্য উদ্দেশ্য সমুদয় দৃশ্যকে ত্রিগুণের পরিণাম বলিয়া বুঝান এবং সেই সঙ্গে উহাদের পরস্পরের মোটামুটি ভেদ জ্ঞান করান; দৃশ্য মাত্রেই ত্রিগুণের পরিণাম, কেবল এই টুকু বলিলে সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। কারণ, তাহা হইলে সমুদয় দৃশ্য যে একরূপ, উহাদের পরস্পরের প্রকার ভেদ নাই, ইহাই ধারণা হইতে পারে। এই জন্য বলিতে হইবে দৃশ্য সকল গুণ ত্রয়ের পরিণাম বটে কিন্তু উহারা সকলে একরূপ নয়, উহাদের প্রকারভেদ আছে. সে প্রকার স্থূলত মোটামুটি চারটি। স্বভাবত সংক্ষেপ-বাদ-প্রিয় সংস্কৃত দার্শনিক এই অর্থই প্রকারান্তরে সংক্ষেপ করে বলিয়াছেন; গুণের পরিণামের চার অবস্থা—অলিঙ্গ, লিঙ্গমাত্র, অবিশেষ, বিশেষ। গুণের পরি-ণামের প্রথম পর্ব্ব অলিঙ্গ—অব্যক্ত সমুদয় জগতের উপাদান বা মূল কারণ এবং শেষ পর্ব্ব বিশেষ—যাবতীয় স্থূল কার্য্য এবং ইন্দ্রিয়। সূত্রকার সূত্রে মধ্যে গুণের পর্ব্বগুলিকে কেন যে বিপরীত ক্রমে বিন্যাস করিয়াছেন তাহা আমরা ঠিক বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না; তবে বোধ হয় প্রথমে অতি সূক্ষ্ম

অলিঙ্গের কথা পাঠকের হৃদয়ঙ্গম না হইতে পারে, এইজন্য স্থূলকার্য্য হইতে প্রথমে সূক্ষ্ম কার্য্যের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

ভাষ্যকার বলেন আকাশ বায়ু তেজঃ জল এবং ভূমি ইহারা যথাক্রমে শব্দ, স্পর্শ রূপ, রস, এবং গন্ধ এই অবিশেষ তন্মাত্রের বিশেষ; তন্মাত্র সকল অবিশেষ অর্থাৎ ইহারা একই রূপ। কিন্তু ইহাদের হইতে উৎপন্ন স্থূল ভূতেরা বিশেষ; তাহারা একরূপ নয়, নানা প্রকার অবস্থা যুক্ত। এই রূপ শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা এবং ঘ্রাণ এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্, পাণি পায়ু এবং উপস্থ এই পাঁচটি কর্ম্মেন্দ্রিয় এবং মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়; ইহারা অস্মিতারূপ অবিশেষের বিশেষ; অস্মিতা বলিতে কেবল অভিমান-ব্যক্তি-অহঙ্কার; উহা একরূপ; এইজন্য অবিশেষ এবং উহা হইতে উৎপন্ন ইন্দ্রিয়গণ ভিন্ন ভিন্ন রূপ; এইজন্য তাহারা বিশেষ। বিশেষের সংখ্যা ষোল, স্থূল ভূত ৫ + ১১ একাদশ ইন্দ্রিয় = ১৬ এবং অবিশেষের সংখ্যা ৬; তন্মাত্র ৫ + ১ অস্মিতা = ৬। পঞ্চতন্মাত্র এবং অস্মিতা এই ছয় অবিশেষ, মহত্ত্ব অর্থাৎ বুদ্ধি হইতে উৎপন্ন। এই মহত্তত্ব বা বুদ্ধি আদি কার্য্য অর্থাৎ সমুদয় উৎপন্ন বস্তুর প্রথমে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে; প্রথমে একমাত্র ইহাই ব্যক্ত হইয়া বিদ্যমান হয় এই নিমিত্ত ইহার একটি নাম সত্তামাত্র। ইহা সমুদয় কার্য্য বস্তুর পূর্ব্ববর্ত্তী এবং সমুদয় বস্তুর ব্যঞ্জক বলিয়া ইহাকে লিঙ্গ বলা হয়। অলিঙ্গ বলিতে প্রধান কারণ; ইহার স্বরূপের অভিব্যক্তি নাই। এবং ইহা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কাহারও প্রকাশক নয়।

২০। দ্রষ্টা দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধোপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ ॥

পদচ্ছেদঃ। দ্রষ্টা, দৃশিমাত্রঃ শুদ্ধঃ, অপি প্রত্যয় অনুপশ্যঃ।

পদার্থঃ। দ্রষ্টা পুরুষঃ, দৃশিমাত্রঃ চেতনামাত্রঃ চেতনাস্বরূপ এব মাত্র গ্রহণং ধর্ম্মিধর্ম্মনিরাসার্থং। শুদ্ধোপি পরিণামিত্বাদ্যভাবেন স্বপ্রতিষ্ঠোপি প্রত্যয়ানুপশ্যঃ প্রত্যয়াঃ বিষয়োপরক্তানি জ্ঞানোজ্ঞানানি তানি অনু অব্যবধানেন প্রতি সংক্রমাদ্যভাবেন পশ্যতি সঃ জাতবিষয়োপরাগায়ামেব বুদ্ধৌ সন্নিধানমাত্রেণ পুরুষস্য দ্রষ্টৃত্বম্।

অন্বয়ঃ। স্পষ্টং।

ভাবার্থঃ। দৃশিরত্র ন গুণঃ কিন্তু প্রকাশস্বরূপং তথাহি জ্ঞানং নৈবাত্মনো ধর্ম্মোনগুণো বা কথঞ্চন জ্ঞান স্বরূপ এবাত্মা নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ শিবঃ। ইতি স্মৃতেঃ। পুরুষশ্চৈতন্যস্বরূপো ন তু চৈতন্যং তস্য ধর্ম্ম ইতি প্রতীয়তে তাদৃশ আত্মাস্বয়ং শুদ্ধোপি পরিণামিত্বাদিদোষবহিতোঽপি বিষয়োপরক্তজ্ঞান সমানাকারতামাপন্নইব বুদ্ধিবৃত্তিসাক্ষীত্যর্থঃ। সূত্রোঽনেন বুদ্ধি পুরুষয়ো- 'বিবেকপ্রতিপাদনায় তয়োবভেদ ভ্রমনিরাসার্থা'য় চ তয়ো বৈরূপ্য সারূপ্যে প্রতিপাদিতে। প্রতিবিম্বগ্রহণেবুদ্ধ্যাত্মনোঃ স্বারূপ্য মেব পরং বুদ্ধিঃ পরি- পরিণামিনী আত্মা তু অপরিণামীতি ফলিতম্।

অনুবাদ। দ্রষ্টা অর্থাত্ পুরুষচৈতন্য স্বরূপ এবং স্বয়ং শুদ্ধ অর্থাৎ পরি- ণামিত্বাদিদোষ শূন্য এবং বুদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ।

সমালোচন। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল স্বতন্ত্র একটা পুরুষ মানিবার আবশ্যক কি? ইহাব উত্তরে মহর্ষি পতঞ্জলি এই সূত্রের অবতারণা করিয়া- ছেন। চৈতন্য বা জ্ঞান স্বয়ংই দ্রষ্টা; উহা কাহারও ধর্ম্ম নয়, উহা একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। কারণ উহা যদি বুদ্ধির ধর্ম্ম হইত, তাহা হইলে ইহাতে কেবলই বুদ্ধির সারূপ্য থাকিত, কিন্তু বাস্তবিক সেরূপ নহে। ইহাতে বুদ্ধির সারূপ্য এবং বৈরূপ্য উভয়ই আছে। বুদ্ধির যেমন প্রীতিবিম্ব-গ্রহণী শক্তি আছে চৈতন্যেরও সেইরূপ প্রতিবিম্ব-গ্রহণী শক্তি আছে সুতরাং এই অংশে উভয়ের সারূপ্য দৃষ্ট হয় মাত্র। কিন্তু সারূপ্য অপেক্ষা বৈরূপ্য অধিক(১) বুদ্ধি পরিণা- মিনী, আত্মা অপরিণামী, (২) বুদ্ধি,ত্রিগুণময়ী, আত্মা নির্গুণ (৩) বুদ্ধি পদার্থ সাধনে প্রবৃত্তা অর্থাৎ আত্মার ভোগ এবং মোক্ষের জন্য প্রবৃত্ত, আত্মা সে রূপ নহে; আত্মার প্রবৃত্তিই নাই। অতএব পুরুষ বা চৈতন্য বুদ্ধি হইতে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ।

২১। তদর্থএব দৃশ্যস্যাত্মা।

পদচ্ছেদঃ। তদর্থএব, দৃশ্যস্য আত্মা।

পদার্থঃ। তস্য পুরুষস্য অর্থএব ভোক্তৃত্বসম্পাদনপ্রয়োজনীয় এব দৃশ্যস্য উক্তরূপস্য আত্মা স্বরূপং।

অন্বয়ঃ। দৃশ্যস্য আত্মা তদর্থএব ভবতীতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। সর্ব্বং দৃশ্যং পুরুষস্য ভোক্তৃত্বসম্পাদন প্রয়োজনার্থেব প্রবৃত্তং পুরুষার্থমন্তরা তেষাং ন কিমপি স্বকীয়ং প্রয়োজন মস্তীতিভাবঃ।

অনুবাদ। পুরুষের প্রয়োজনের নিমিত্তই দৃশ্যের স্বরূপ।

সমালোচন। এই গুণত্রয়ের পরিণামী-ভূত অনন্ত বিশ্বমণ্ডলের বিকাশ কেন হইয়াছে? এই সূর্য্যের কিরণ, চন্দ্রের জ্যোৎস্না, পবনের হিল্লোল, নদীর কল্লোল, সরোবরের পদ্ম, গগনের গাঢ় নীলিমা, তাহাতে মুক্তা রাজীব মত উজ্জ্বল নক্ষত্রমালা, বসন্তের কোকিল, শরতের শস্য, বর্ষার দূর্ব্বা-শ্যামল মেঘমালা, তাহাতে আবার বিদ্যুতের খেলা ইত্যাদি সমুদয় পদার্থ কাহার জন্য বিরাজিত? ইহারা কি অকারণেই শোভাপায়? কোন প্রয়োজনই কি নাই? এই প্রশ্নের উত্তরে সূত্রকার বলিতেছেন, ইহারা বৃথা বিকাশ পায় না, সেই পুরুষের ভোগ এবং মোক্ষের নিমিত্তই ইহাদের বিকাশ। পুরুষের ভোগ এবং অপবর্গরূপ প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে পুরুষ আর তাহাদিগকে দেখেন না; কাজেই তৎকালে দৃশ্য সকল বস্তু গত্যা বিদ্যমান থাকিলেও, না থাকার মধ্যে গণ্য হয়। নির্ম্মল আকাশের মধ্যস্থলে পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্রের নির্ম্মল কৌমুদীর বিকাশ যদি কেহ না দেখে, তাহা হইলে উহা থাকিলেও না থাকার মধ্যে। যে অন্ধ তাহার নিকট সূর্য্যের আলো থাকিতেও নাই, চন্দ্রের জ্যোৎস্না থাকিতেও নাই, শরতের শস্য থাকিতেও নাই, বর্ষার কাদম্বিনীর কোলে বিদ্যুতের খেলা থাকিতেও নাই। তাঁহার কাছে আলো অন্ধকার দুই সমান, দিবারাত্রি দুই সমান, চন্দ্র সূর্য্য দুই সমান, চাঁদের জ্যোৎস্না ও মেঘের ছায়া দুই সমান অর্থাৎ থাকিতেও নাই। তাই সূত্রকার বলিতেছেন যে পুরুষের প্রয়োজনের নিমিত্তই দৃশ্য বস্তু নিচয়ের সত্বা বা অবস্থিতি।

২২॥ কৃতার্থং প্রতি নষ্টমপ্য নষ্টং তদন্য সাধারণত্বাৎ।

পদচ্ছেদঃ। কৃত-অর্থং প্রতি, নষ্টং, অপি, অনষ্টং তত্ অন্য সাধারণত্বাত্।

পদার্থঃ। কৃতঃ বুদ্ধ্যা সম্পাদিতোঽর্থোযস্য সতং ভূতার্থং মুক্ত পুরুষং প্রতি, নষ্টং বিরতব্যাপারং অপি তথাপি অনিষ্টং বিদ্যমানব্যাপারং তদন্য সাধারণত্বাত্ কৃতার্থ ভিন্ন পুরুষ সাধারণত্বাত্, তস্মিন্ অন্যস্মিন্ তদ্ভিন্নেচ পুরুষে সাধারণত্বাৎ।"

অন্বয়ঃ। কৃতার্থং প্রতিনষ্টমপি (দৃশ্যং) তদন্য সাধারণত্বাৎ অনষ্টং অবতিষ্ঠাত ইতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। নমু পুরুষপ্রয়োজন সিদ্ধার্থং দৃশ্যানাং বিদ্যমানতাচেত্ তদা কস্যাপ্যেকস্য পুরুষস্য ভোগোপবর্গরূপে প্রয়োজনে সিদ্ধে কথং ন দৃশ্য ব্যাপারাণাং তৎক্ষণ মেব বিরতি র্ভবতীতি শঙ্কায়া মাহ কৃতার্থমিতি। কৃতার্থং প্রতি যদ্যপি দৃশ্যং বিরতব্যাপারং ভবতি তথাপি পুরুষবাহুল্যাত্ সর্ব্বেষাং পুরুষাণাং যুগপত্ কৃতার্থতা ন ভবতি। দৃশ্য, চ সর্ব্ব পুরুষসাধারণং। ততশ্চ কৃতার্থং প্রতি দৃশ্যার্থ ব্যাপারে বিরতে হপি অকৃতার্থপুরুষং প্রতি তস্য ব্যাপোরো ন নিবর্ত্তত ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। কৃতার্থ পুরুষের নিকট যদিও দৃশ্যের কোন কার্য্য কারিতা থাকে না কিন্তু দৃশ্য যখন কৃতার্থ এবং অকৃতার্থ পুরুষের সাধারণ বস্তু, তখন উহার ব্যাপার একেবারে বিনষ্ট হয় না।

সমালোচন। দৃশ্য যখন পুরুষগণের সাধারণ বস্তু, তখন উহাদের মধ্যে কোন এক পুরুষ যদি কৃতার্থতা লাভ করে অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্তি হয়, তাহার নিকট দৃশ্য বস্তুর কোন কার্য্যকারিতা থাকে না তথাপি অনেক পুরুষ অকৃতার্থ থাকায় দৃশ্যের ব্যাপার একেবারে বিরত হয় না। অন্ধ দেখিতে পায় না বলিয়া কিছু সূর্য্যের আলোক বিলুপ্ত হয় না, চন্দ্রের জ্যোৎস্না অপ্রকাশ থাকে না। যে অন্ধ নয়, তাহার কাছে তাহাদের স্বরূপেই প্রকাশ হয়। কালা শব্দ শুনিতে পায় না বলিয়া জগতে গীত বাদ্যের একেবারে বিলোপ হয় না। তাই সূত্রকার বলিতেছেন যে মুক্ত পুরুষের নিকট দৃশ্যের কার্য্যকারিতা না থাকিলেও দৃশ্যের ব্যাপার একেবারে বিনষ্ট হয় না। কারণ অমুক্ত পুরুষের নিকট উহার কার্য্যকারিতা সমভাবেই থাকে।

এত বাড়াবাড়ি কেন ?

ভগবান নানা প্রকারে মানব মণ্ডলীর হিতসাধন করিয়া থাকেন। রাজরাজেশ্বরের মহা-অতিথিশালা হইতে অবিরামে দান ক্রিয়া চলিতেছে। বিশ্ব ভাণ্ডার ফুরাইবার নহে; যে যাহা চাহিতেছে, সে তাহা পাইতেছে।

মনুষ্য জন্মাইবার পূর্ব্ব হইতে এই অতিথিশালা প্রস্তুত হইয়া আসিতেছে। যে প্রকার আশ্চর্য্য কৌশলে তাঁহার অভিপ্রায় সম্পূর্ণ হইতেছে, তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। মনুষ্যের উপভোগের জন্য পূর্ব্ব হইতেই আবশ্যকীয় দ্রব্য সকলের আয়োজন হইয়াছে। পিপাসা নিবারণের জন্য সুধাসিক্ত জল এবং ক্ষুধা শান্তির জন্য বিবিধ উপাদেয় ফল ও শস্য পৃথিবীর চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। কোন্ কালে জীবের পান আহারের আবশ্যক হইবে, অমনি নদী সকল জল বহন করিতে লাগিল, উদ্ভিদ খাদ্য সামগ্রী উৎপাদন করিতে আরম্ভ করিল। কেমন সামান্য ব্যাপার হইতে এই প্রণালী চলিতেছে, ইহা ভাবিলে বিস্ময়াপন্ন হইতে হয়। বুদ্ধি বলে কোন মনুষ্য কোন প্রকার কল প্রস্তুত করিলে, লোকে তাহাকে কত সাধুবাদ দেয়, সে নিজেও অহঙ্কারে স্ফীত হইয়া ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এমন কি ঈশ্বরকে উড়াইয়া দিয়া তাঁহার স্থানে বসিতে সাহস পায়। কিন্তু সে একবারও ভাবিয়া দেখে না, যে তাঁহার নিজ দেহই ভগবানের ক্রীড়া ভূমি এবং সেযে বুদ্ধি খাটাইয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকে, সে বুদ্ধি তাঁহারই প্রদত্ত। বিশেষত মনুষ্যের প্রস্তুত করা কল কত অসম্পূর্ণ। ঈশ্বরের কৌশলের সহিত তাহার তুলনাই হইতে পারে না। তাঁহার জল যন্ত্রের বিষয় একবার আলোচনা কর। দেখ দেখি ইহার ভিতর কেমন অদ্ভুত ব্যাপার চিহ্নিত রহিয়াছে। সূর্য্যের উত্তাপে সাগর হইতে বাষ্প নির্গত হইয়া আকাশে উঠিতেছে, সেই বাষ্প মেঘে পরিণত হইতেছে। আবার সেই ঘনীভূত মেঘ জলরূপে পৃথিবীতে নিপতিত হইয়া নদী ও সরোবর সকল পূর্ণ করিতেছে। আবার রৌদ্রের উত্তাপে জল শুষ্ক হইয়া বাষ্পে পরিণত হইতেছে। কিয়দংশ জল হইয়া পড়িতেছে কিয়দংশ তুষার রূপে পর্ব্বতের উচ্চ শৃঙ্গে নিপতিত হইতেছে। আবার এই তুষার সূর্য্যের কিরণ প্রভাবে তরল হইয়া পর্ব্বত হইতে নির্ঝর রূপে নিসৃত হইতেছে এবং অবশেষে কএকটী নির্ঝর একত্রিত হইয়া নদী রূপে পরিণত হইতেছে। মনুষ্য! অহঙ্কারী মনুষ্য! এমন আশ্চর্য্য কৌশল দেখিয়াও কি তোমার অহঙ্কার চূর্ণ হইবে না? বিশ্বকর্ম্মার চরণে কি মস্তক অবনত করিবে না? তোমার আহারীয় দ্রব্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। সামান্য তৃণ যাহা দেখিলে

লোকে হেয় জ্ঞান করে, তাহারই শস্য ধারণ করিয়া তোমার ক্ষুধা শান্তি হইতেছে। কেবল শস্তের আয়োজন করিয়াই ভগবান ক্ষান্ত হয়েন নাই। তোমার তৃপ্তি সাধন জন্য তরু সকল কত উপাদেয় ফল ধারণ করিতেছে। বসনের দ্বারা লজ্জা নিবারণ করিবে এই জন্য কার্পাস বৃক্ষ তুলা ধারণ করিয়া তোমার অভাব পূর্ণ করিতেছে। কিন্তু মন! এ সকলে ত তুমি সন্তুষ্ট থাকিবে না! তোমার আড়ম্বর চাই, তোমার ধুমধাম চাই। সামান্য জলে তোমার তৃপ্তি হইবে না। তুমি বরফ প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করিবে। সামান্য শস্য ও ফলে তোমাব আহার চলিবে না, তুমি পলান্ন ভোজন করিয়া পবিতৃপ্ত হইবে। সামান্য তুলায় তোমাব দ্বারা প্রস্তুত করা বসন তোমার পরিবার যোগ্য নহে। এজন্য অগণ্য জীব ধ্বংস করিয়া তাহাদের প্রস্তুত করা তন্তুব দ্বারা বসন প্রস্তুত কবিবে এবং পশুদের গাত্র আবরণ ছেদন করিয়া তাহার দ্বারা শাল দোশলা প্রস্তুত কবত আপনার আধিপত্য দেখাইবে। মন! এত বাড়াবাড়ি কেন? এই বাড়াবাড়িই যে তোমার ধ্বংসের কাবণ হইয়াছে, তাহা কি বুঝিতেছ না? সৃষ্টি প্রবাহ সংরক্ষণ জন্য ভগবান তোমাকে রমণী দিলেন। তুমি কোথায় উঁহার সহিত সম্মিলিত হইয়া ঈশ্বরের ইচ্ছা সম্পাদন এবং তাঁহার মহিমা ঘোষণা করিয়া অপার আনন্দ অনুভব করিবে? না, বমণীকে বিলাসের দ্রব্যজ্ঞান করিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইয়া আত্মহাবা হইতেছ। বলিতে শরীর শিহরিয়া উঠে, ইহাকে নটী করিয়া, উহার কুৎসিত নৃত্য দেখাইতেছ,পাশব ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য ইহার সহিত সম্মিলিত হইতেছ। আমাদের পূজনীয় আর্য্য ঋষিগণ রমণীকে কি ভাবে দেখিতেন তাহা কি বিস্মৃত হইলে? তাঁহারা রমণীকে ধর্ম্মের সহায় রূপে জ্ঞান কবিতেন। একত্রে ধর্ম্ম কর্ম্ম সকল সম্পাদন করিতেন। এই জন্যই স্ত্রীর নাম সহধর্ম্মিণী। মন! রমণীর সৌন্দর্য্য দেখিয়া তাহাতে মুগ্ধ হইও না। সেই সৌন্দর্য্যের মধ্যে পরম সুন্দর পুরুষ ভগবানকে দেখিয়া কৃতকৃতার্থ হও। একদা উচ্চমনা হাফেজ পথি মধ্যে কোন পরমা সুন্দরী রমণীকে দেখিয়া রোদন করিয়াছিলেন। রমণী ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে হাফেজ বলিলেন, "রমণি! তোমাব সৌন্দর্য্যের মধ্যে আমার নয়ন সেই পরম সুন্দর পুরুষকে দেখিয়া আনন্দ অশ্রু নির্গত করিতেছে।" যে পুরুষ

তোমার ন্যায় সুন্দরীকে সৃজন করিয়াছেন, না জানি তিনি কতই সুন্দর!” মন! নারী সম্বন্ধে এ প্রকার ভাব পোষণ করিতে না পারিলে, তুমি এ পৃথিবীতে সুখের আশা করিতে পার না। তুমি স্থির জানিও যে মিতাচারে সুখ, অত্যাচারে দুঃখ।

পান ভোজন সম্বন্ধেও তোমার বাড়াবাড়ী কম নহে। সরিৎ, সরোবর তোমার জন্য সুস্বাদু জল রাখিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তুমি পরিতৃপ্ত হইবে না, তোমার বরফের প্রয়োজন। ক্রমে অভ্যস্ত হইয়া এই বরফ তোমার একটী আবশ্যকীয় দ্রব্য রূপে পরিণত হইয়াছে। জল পান করিবার সময়ে তাহাতে একটু বরফ না দিলে তোমার তৃপ্তি হয় না। তরু সকল কোমল সুস্বাদু ফল ধারণ করিয়া তোমার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। তৃণ সকল তোমার জন্য নানা প্রকার শস্য ধারণ করিয়া রহিয়াছে। কিন্তু এ সমস্তে তোমার তৃপ্তি হয় না। তোমার জীব হত্যা না করিলে চলে না। পশুমাংসের যোগে পলান্ন প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ না করিলে তোমার তৃপ্তি সাধন হয় না। মন! আপনার তৃপ্তির জন্য তুমি জীব হত্যা করিতে কুণ্ঠিত নহ। ভাল, জিজ্ঞাসা করি—মাংস আহার করিলে কি যথার্থই তৃপ্তি লাভ করা যায়? উহা সেবনে ক্ষণিক সুখ হইতে পারে। কিন্তু ইহার পরিণাম ভয়ানক। মাংস উত্তেজক। উহা আহার করিলে মন নানা প্রকার কুপ্রবৃত্তির আধার হয়। ক্রোধ হিংসা প্রবল হয়। মাংস আহারে অনেক প্রকার রোগ জন্মে। ভারতবাসী এত দিন ইহা বুঝিয়াছিল; এবং সে জন্য সুখেও ছিল। নিরোগী থাকিয়া ও প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া তাহারা পরম সুখে জীবন যাত্রা যাপন করিতেছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য গুরুদিগের উপদেশ তাহাদিগকে এ সুখ ভোগ করিতে দিল না। ইংরাজেরা যাহা ভাল বলিবে, তাহাই ভাল, এই যে একটী সংক্রামক রোগ আমাদিগকে আক্রমণ করিয়াছে, ইহা হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া কঠিন। এখন সেই ইংরাজেরা তাঁহাদের মত পরিবর্ত্তন না করিলে আর আমাদের দেশের লোকের পরিত্রাণ পাইবার উপায় নাই। মন! এসো একবার দেখি এখন ইউরোপে কি হইতেছে। তথাকার পণ্ডিত লোক স্থির করিয়াছেন যে মাংস অনিষ্ট জনক এবং এই জন্য

সভা সমিতি করিয়া মাংস আহার নিবারণের চেষ্টা হইতেছে। ইংলণ্ডে একটী মাংস আহার নিবারণী সভা আছে, তাহার সভ্য সংখ্যা তিন হাজারের অধিক; এক জন বিজ্ঞ ব্যক্তি ডায়েটেটিক রিফরমার (Dietetic Reformer) নামক পত্রে লিখিয়াছেন যে, বাত যকৃৎ এবং অন্যান্য পীড়ায় বহু কাল ক্লেশ ভোগ করিয়া কোন প্রকার চিকিৎসায় উপকার না হওয়ায়, তিনি মদ্যপান ও মাংস আহার ত্যাগ করেন। যখন তাঁহার বয়স ৫০ বৎসর, তখন তিনি এই ব্রত অবলম্বন করেন। পাঁচবৎসর নিরামিষ ভোজন করিয়া তিনি বিশেষ উপকার লাভ করেন। তিনি সকল পীড়া হইতে অব্যাহতি লাভ করেন এবং তাঁহার শরীর সবল হয়। তিনি লিখিয়াছেন যে এই পাঁচ বৎসরের পর যাঁহারা তাঁহাকে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আশ্চর্য্য হইয়াছেন। তাঁহার পত্রখানি তিনি এইরূপে উপসংহার করিয়াছেন;—"যখন আমি চিন্তা করি এই পাঁচ বৎসর নিরামিষ আহার আমার কত উপকার সাধন করিয়াছে, তখন আমি সাধারণকে এই মাত্র বলি, যাঁহার শুনিবার জন্য কাণ আছে, তিনি শুনুন।"

মন! তোমার গুণের কথা আর কত বলিব। তোমার ভোজনের জন্য উৎকৃষ্ট ফল ও শস্য সম্ভার বিধাতা সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন, কিন্তু তাহাতে তুমি সন্তুষ্ট নহ। এমন যে সুস্বাদু দ্রাক্ষাফল, তাহাকে বিকৃত করিয়া তুমি তাহা হইতে সুরা প্রস্তুত করিবে; তণ্ডুল যাহা ভারতবর্ষের প্রধান খাদ্যদ্রব্য, তাহা হইতেও এই বিষ নিঃসৃত করিয়া পান করত, আপনাকে পশুরূপে পরিণত করিবে। যে সভ্য দেশের লোকের অনুকরণ করিয়া তুমি মাংস ও সুরা সেবন করিয়া থাক, তাহারা যখন ইহা ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আর কেন? এই দুই দ্রব্যের অনিষ্টকারিতা তুমিও দেখিতেছ। এসম্বন্ধে আর অধিক কি বলিব? এই অমিতাচারে আমাদের কত বড় বড় লোক অকালে কাল-কবলে পতিত হইয়াছেন। অনরেবল দ্বারকা নাথ মিত্র তাঁহার মৃত্যুর কিছু পূর্ব্বে কি বলিয়াছিলেন শ্রবণ কর—"আমাদের ব্যবস্থা শাস্ত্র প্রণেতা মনু যে সকল নিয়ম বিধিবদ্ধ করিয়াছেন, সেই সকল অনুসারে কার্য্য করিলে লোকের শারীরিক মানসিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতি হইয়া থাকে। এই সকল নিয়ম

অবহেলা করাতেই আমি এরূপ যন্ত্রণা সহ্য করিতেছি। যদি আমি এ যাত্রা রক্ষা পাই, আমার চাল চলন একেবারে পরিবর্জ্জিত হইবে।"—মন! এ সকল শুনিয়াও কি তোমার জ্ঞানোদয় হইবে না? আর কেন! যথেষ্ট হইয়াছে। অমিতাচারের ফল তোমার কৃতবিদ্য ভাইদের মধ্যে দেখিলে। আবার যাঁহারা তোমার নেতা, তাঁহারাও দেখিয়া শুনিয়া নিরামিষ ভোজী হইতেছেন।

মন! খাদ্য দ্রব্য লইয়া তোমার সহিত অনেকক্ষণ আলোচনা করিলাম। এখন পরিধেয় ও সাজ সজ্জা সম্বন্ধে তোমাকে কিছু বলিব। তুলা হইতে যে বস্ত্র প্রস্তুত হয়, তাহার দ্বারা কি অঙ্গ আবরণ করা যায় না? তুলা-ভরা বেজাই কি শীত নিবারণ করিতে পারে না? তবে কেন লক্ষ লক্ষ পোকা নষ্ট করিয়া রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত করিতেছ? মেষ ও ছাগলের গাত্র আবরণ ছেদন করিয়া কম্বল গালিচা প্রস্তুত করিতেছ? পৃথিবীর অভ্যন্তরে কত স্বর্ণ রৌপ্য ও হীরকাদি রত্ন নিহিত আছে। তাহার দ্বারা অট্টালিকা সুশোভিত করিয়া এবং নানা প্রকার ভূষণ প্রস্তুত করত অঙ্গে ধারণ করিয়া তোমার তৃপ্তি বোধ হয় না। শুক্তি মুক্তা ধারণ করে। ইহা আর তোমায় ভাল লাগিল না। অমনি তুমি অসংখ্য শুক্তির জীবন নাশ করিয়া মুক্তা সকল গ্রহণ করত, আপনার অঙ্গের শোভা সম্পাদন করিতে লাগিলে। গ্রীষ্ম কালে তোমাকে শীতল করিবার জন্য তাল বৃন্ত রহিয়াছে। কিন্তু তাহাতে তোমার হাওয়া খাওয়া হইবে না। কোথায় ময়ূর! মনের আনন্দে মাঠে বিচরণ করিতেছে। তুমি তাহাকে বধ করত, তাহার শোভান্বিত পাখার দ্বারা বৃন্ত প্রস্তুত করত তাহার দ্বারা বায়ু সেবন করিবে! এইরূপে তুমি যে কত অত্যাচার করিতেছ, তাহা বলা যায় না। তুমি শ্রেষ্ঠ জীব, তুমি পৃথিবীর রাজা ইত্যাকার বচন প্রয়োগ করিয়া তুমি অহঙ্কার করিয়া থাক। কিন্তু জীবের প্রাণনাশ করিবার জন্য তুমি উচ্চ পদবী প্রাপ্ত হও নাই। তোমার জ্ঞান আছে। এই জ্ঞানই তোমাকে উচ্চ আসনে বসাইয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, ইহা কি জ্ঞানের কাজ, যে অত্যাচার দ্বারা তুমি তোমার শ্রেষ্ঠত্ব দেখাইবে? মন! যেমন পদ পাইয়াছ, সেই মত কার্য্য কর। জীবের প্রতি দয়া প্রকাশ কর। উদ্ভিদ ও জড় রাজ্য অতি বিস্তীর্ণ, ইহার মধ্যে তোমার আবশ্যকীয় দ্রব্য সমস্তই আছে। সেই সমস্ত আহরণ করিয়া মনের আনন্দে

উপভোগ কর। তোমার কি ক্ষমতা, যে তুমি ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের প্রতি অত্যাচার কর। তুমি কিপ্রকারে জানিতে পারিলে, যে নিকৃষ্ট জীব সকল তোমার সেবার জন্য সৃজিত হইয়াছে? বিধাতা যে কি উদ্দেশ্যে উহাদের সৃজন করিয়াছেন, তাহা জানিবার তোমার সাধ্য নাই। তাহারা মনের আনন্দে বিচরণ করে, তাহাদের উপভোগের বস্তু আছে, যাহার দ্বারা তাহারা তৃপ্তি লাভ করে। তোমার এ অনধিকার চর্চ্চা কেন? তাহাদের প্রতি অত্যাচার কেন? মন! এই পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া এমন উত্তম আর্য্য জীবন লাভ করিয়া তুমি কেন পাশ্চাত্য সভ্যতার চাকচিক্যে মোহিত হইতেছ! উত্তম বেশ ভূষায় সভ্যতা হয় না। সাজ সজ্জা সভ্যতার পরিচায়ক নহে। কোট পেণ্টুলন ধারী মাংসাশী ব্যক্তি যে সভ্য বলিয়া গণ্য হইবে, তাহা নহে, আর চীর বল্কল-পরিধায়ী ফল মূল-আহারী ব্যক্তি যে অসভ্য, তাহা নহে। বাহ্যিক ব্যাপারের সহিত সভ্যতার কোন সম্বন্ধ নাই। অন্তরকে সভ্য করা চাই। যাহার অন্তঃকরণ ধর্ম্মে শোভিত, সেই প্রকৃত সভ্য। মনকে সভ্য করা চাই। দেহকে সভ্য করিলে কি হইবে, কোট-পেণ্টুলন ধারী ব্যক্তি যে নানা গুণ সমন্বিত হইতে পারেন না তাহা নহে। আবার বল্কল-পরিধায়ী ব্যক্তি যে নানা দোষের আকর হইতে পারেন না, এমনও নহে। তবে এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, যে আসবাব বাড়ান ভাল নহে। আবশ্যকীয় দ্রব্য যত অধিক হইবে, ততই কষ্ট। যত অধিক দ্রব্যাদির আয়োজন করিবে, ততই বিষয়ে জড়াইয়া পড়িবে, ততই ঈশ্বর হইতে বিচ্যুত হইবে। আধুনিক সভ্যতা এই জন্যই অনিষ্টজনক; ইহা মনুষ্যের অভাব বাড়াইতেছে। যদ্যপি ধূম ধাম সাজ সজ্জা লইয়াই সময় কাটাইব, তবে আর ঈশ্বর চিন্তা কখন করিব? আপনার মুখ খানি দেখিব, বস্ত্রখানি দেখিতে ভাল হইল কিনা তাহার দিকে একবার তাকাইব, অন্যের কাপড়ের সহিত নিজের কাপড়ের তুলনা করিব, কোন নূতন ধরণের পরিধেয় উঠিল, তাহা ক্রয় করিব, ঝাড় লণ্ঠনে গৃহ সাজাইব, যেখানে যাহা ভাল দেখিব, তাহা লইয়া আসিব,—এই সকল ব্যাপারেই যদি সময় অতিবাহিত হইবে, তবে আর ঈশ্বরকে চিন্তা করিবার অবকাশ কখন পাইব? আবার দেখ, এই সমস্ত

আয়োজন করিবার জন্য কত অর্থের প্রয়োজন। লোকে ধন ধন করিয়া অস্থির হইতেছে। অর্থ উপার্জ্জন জন্য কত অন্যায় কার্য্য করিতেছে। অনাবশ্যক দ্রব্যকে আবশ্যক করিয়া তুলিলে এইরূপ ফল ফলিয়া থাকে। চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সমাজের যে অবস্থা ছিল, তাহার সহিত বর্ত্তমান সময়ের লোকের অবস্থা তারতম্য করিলে কত প্রভেদ দেখা যায়। তখন স্ত্রীলোকেরা সূতা কাটিয়া যুগিদের বাড়ী দিত, যুগিরা তাহার দ্বারা মোটাগোচের কাপড় প্রস্তুত করিত। মজুরী মাত্র পাইত। এই কাপড় কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি পুরুষ, কি স্ত্রী, আনন্দের সহিত পরিধান করিত। শীতকালে, কোন রকমের মোটা চাদর হইলেই চলিত। আমাদের মনে হয়, এক সময়ে ডিমটীর চাদর উঠে। তাহা পাইয়া বালকদের আনন্দই বা কত। এখন বোধ হয় ছোটলোকের ছেলেরাও তাহা অগ্রাহ্য করে। তখন সচরাচর শীতকালেও কেহ মোজা পায়ে দিত না, এখন সভ্যতার অনুরোধে গ্রীষ্মকালেও তাহা ব্যবহৃত হইতেছে। তখন জামা জোড়ার হাঙ্গাম ছিল না। শীতকালে একটী মেরজাই কিম্বা বেনিযান হইলেই যথেষ্ট হইত। তখন বালকগণ পূজার সময়ে এক জোড়া করিয়া অতি অল্প দামের জুতা পাইত, তাহা যত দিন না ছিঁড়িত, তত দিন পায়ে দিত, তাহার পর শুদ্ধ পায়ে বেড়াইত এবং পূজার প্রতীক্ষায় থাকিত। বর্ত্তমান সময়ে সভ্য সাজিতে হইলে অনেক আয়োজন চাই। ইংরাজি পেণ্টুলন, পারসি কোট, মোগলাই টুপি চিনেম্যানের জুতা, কফওয়ালা পিরাণ প্রভৃতি ধারণ করিয়া তবে সভ্য সমাজে দেখা দিতে হইবে। ধুতি পরিলে গায়ে পাড়-ওয়ালা চাদর চাই। পদ্মলোচন হইলেও, চসমা লইতে হইবে। হাতে টাকা না থাকিলেও একটী কুরিয়ার ব্যাগ চাই এবং ঘড়ি না থাকিলেও, চেন ঝোলাইতে হইবে। আবার সাহেবী চুল কাটা ও মোসলমানি দাড়ি রাখা আবশ্যক। ছাতি হাতে করা অসভ্যতার চিহ্ন। প্রচণ্ড রৌদ্রে বাহিরে গমন করিলেও এক গাছি ছড়ি হাতে করা চাই। ছাতি সম্বন্ধে আমার একটী কথা মনে পড়িল। কোন বাটীর বারাণ্ডায় কএক জন ভদ্রলোক বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তাঁহাদের সম্মুখস্থ পথ দিয়া একটী নব্য বাবু গমন করিতেছেন। তখন গ্রীষ্মকাল বেলা দ্বিপ্রহর, সূর্য্যের উত্তাপে চারিদিক যেন দগ্ধ হইতেছে।

বাবাজির হাতে একগাছি ছড়ি, ছাতি সঙ্গে নাই। ইহা দেখিয়া তাঁহাদের মধ্যে একজন প্রবীণ জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাপু রৌদ্র অতি প্রবল, ছাতি সঙ্গে নাই, বড় ক্লেশ হইতেছে, একটী ছাতি লইবে কি?" বাবুজী উত্তর করিলেন "No, thanks! it is not the fashion of the day না আপনাকে ধন্যবাদ দিই আজ কালকের চালই এই।" ভদ্রলোক গুলি শুনিয়া অবাক।

তখনকার স্ত্রীলোকদের বসন ভূষণও মোটামুটি ছিল। গ্রামস্থ যুগিদের দ্বারা প্রস্তুত করা মোটা সাটীই তাঁহারা ব্যবহার করিতেন। হাতে শাঁখা ও দু এক খানি রূপার গহনা হইলেই, তাঁহাদের যথেষ্ট হইত। তাঁহারা গৃহকার্য্যে নিপুণা ছিলেন। ব্রত নিয়ম অতিথি সেবা প্রভৃতি সৎকার্য্যে তাঁহারা সময় ব্যয় করিতেন। অবস্থা উপযোগী কাঁথা বেনিয়ান প্রভৃতি তাঁহারা প্রস্তুত করিতেন। কিন্তু এখানকার স্ত্রীলোকদের চাল চলন দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। নূতন ধরণের বসন, নূতন ধরণের ভূষণ, দিন দিন প্রকাশ হইতেছে, তাহা তাঁহাদের ব্যবহার করা চাই। কেহ কাহার নিকট ছোট হইবার নহে। পাড়ায় কেহ কোন নূতন রকমের বস্ত্র কিম্বা অলঙ্কার পরিলে, তাহার প্রতি অপর স্ত্রীলোকের শুভ দৃষ্টি পড়ে। তাহারাও তাহা পাইবার জন্য ব্যগ্র হয়। পতি সম্পন্ন কিনা, সে দিকে কাহারো লক্ষ্য থাকে না। রোজগারে পতির স্ত্রীও সংসারের কাজ কিছুই করিবেন না। সাজ সজ্জাতেই তাঁহার দিন কাটিবে। সংসারের অন্যান্য স্ত্রীলোক গৃহ কাজ করিবে, আর তিনি তাঁহার স্বামীর বন্ধুদিগকে নিজগুণপণা দেখাইবার জন্য পশমের একটী টুপি কিম্বা একজোড়া মোজা প্রস্তুত করিবেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ, উভয়েরই মধ্যে বসন ও ভূষণ সম্বন্ধে পরিবর্ত্তন হইয়াছে; আহারের বিষয়েও তদ্রূপ। পূর্ব্বে ছেলে মেয়েদের মুড়ি মুড়কি হইলেই জলপান করা হইত। এখন তাহা একেবারেই পরিত্যক্ত হইয়াছে। খুঞ্চিওয়ালা লেডিক্যাণিং প্রভৃতি উত্তম উত্তম মিষ্টান্ন সামগ্রী লইয়া প্রত্যেক গৃহস্থের বাটীতে গমন করিতেছে। বালকগণ তাহা দেখিয়া লোলুপ হইতেছে। বাটীর কর্ত্তাকে তাহাই কিনিয়া দিতে হইতেছে। ইহার উপর আবার রুটিওয়ালা আসিয়া দেখা দিতেছে। বালকদের জন্য পাঁউরুটি বিসকুটও খরিদ হইতেছে। এত গেল, বালকদিগের কথা। বৃদ্ধদের মধ্যেও আহা-

য়ের পরিপাট্য দেখা যাইতেছে। সাহেব বাবুদের কথা উল্লেখ করিবার প্রয়োজন নাই। তাঁহাদের মধ্যে ত বিজাতীয় নানাপ্রকার আহার্য্য ও পানীয় দ্রব্য প্রচলিত হইবারই কথা। সাধারণ লোকের মধ্যেও ভোজনের পরিপাট্য লক্ষিত হইতেছে। পূর্ব্বে মধ্যবিৎ গৃহস্থেরা মোটা চাল আহার করিয়া সন্তুষ্ট হইত। এখন সে চাল পরিবর্ত্তন হইয়াছে। উৎকৃষ্ট তণ্ডুল না হলে আর এখন চলে না। তণ্ডুলের সহিত ব্যঞ্জনাদিরও পরিবর্ত্তন দেখা যায়। কোন সমারোহে দশ জনকে ভোজন করাইতে হইলে গৃহস্থকে অস্থির হইতে হয়। অন্ন ব্যঞ্জনাদি ত এক প্রকার প্রস্তুত হইল তাহার উপর আবার নানা প্রকার মিষ্টান্নের প্রয়োজন। অন্নাহারের উপর ফলাহারের যোগ। পূর্ব্বে ভোজনের পর, কোন এক প্রকার মিষ্টান্ন দিলেই চলিত। এখন আর তাহাতে চলে না। নানাপ্রকার মিষ্টান্ন দিতে হইবে। যিনি যত বেশী রকমের মিষ্টান্নের আয়োজন করিবেন, তিনি তত অধিক প্রতিষ্ঠা লাভ করিবেন। শেষ রক্ষাই প্রকৃত রক্ষা। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এই সকল মিষ্টান্ন লোকের উপভোগ হয় না। কারণ উত্তম অন্ন ও ব্যঞ্জনাদি আহার করিয়া সকলেই তৃপ্তিলাভ করেন; শেষে আর তাঁহারা মিষ্টান্ন আহার করিতে পারেন না। কিন্তু কেমন যে এক চাল হইয়া পড়িয়াছে যে, বিবিধ প্রকার মিষ্টান্নের আয়োজন করিতেই হইবে। যে হেতু লোকের কাছে সুখ্যাতি চাই। এই ভোজনের ব্যাপারটী বিশেষ বাড়াবাড়িতে দাঁড়াইয়াছে। আমাদের অনুরোধ এই যে, সকলে একত্রিত হইয়া এই মিষ্টান্নের চালটী পরিবর্ত্ত করুন।

উপরে যাহা বলা হইল, তাহার দ্বারা সকলের সহজেই উপলব্ধি হইবে যে আমরা অনেকগুলি দ্রব্যকে অনর্থক আবশ্যকীয় করিয়া তুলিয়াছি। আধুনিক সভ্যতা আমাদের প্রকৃতিকে বিকৃত করিয়া তুলিয়াছে। অনেকে বলিয়া থাকেন, যে এ সকল সুখ সমৃদ্ধির চিহ্ন, সভ্যতার চিহ্ন। এ পৃথিবীতে ভোগের জন্য এখানকার যাহা কিছু উপাদেয়, তাহা উপভোগ করত পরম সুখে জীবন যাপন করিব। ভগবানের উদ্দেশ্যই এই যে, আমরা সুখে কালযাপন করি। এ সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য এই যে, প্রকৃত পক্ষে আমরা সুখী হইতেছি না। অভাব রূপ রাক্ষস মুখ ব্যাদান করিয়া আমাদের

প্রতি ধাবিত হইতেছে। আমাদের অনাটন কিছুতেই ঘুচিতেছে না, আমরা কিছুতেই সুখী হইতে পারিতেছি না। যিনি যত কেন উপার্জ্জন করুন না, তাঁহার অভাব ঘুচিবার নহে। কি ধনী কি দীন কাহাকেও সচ্ছল দেখা যায় না। প্রায় সকলেই ঋণ জালে জড়িত। উপর উপর দেখিলে সকলকে সুখী বোধ হইতে পারে। কিন্তু তাঁহাদের আভ্যন্তরিক অবস্থা জানিতে পারিলে অবাক হইতে হয়। আর একটী কথা এই যে ভোগ্য দ্রব্যের প্রতি মন যত বহুল রূপে প্রধাবিত হইবে, তত আমরা ঈশ্বর হইতে দূরে গমন করিব। সমস্ত দিন যদি এই সকল দ্রব্য আহরণ করিতে সময় অতিবাহিত করি, তাহা হইলে আর কখন ঈশ্বরকে চিন্তা করিব। খ্রীষ্ট বলিযাছিলেন, একটী সূচের ছিদ্র মধ্যে একটী উটের প্রবেশ করা সম্ভব নহে। এ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ধনী গণের নানাপ্রকার ভোগ্য দ্রব্যের প্রতি অধিক আসক্তি। পার্থিব সুখ উপভোগের জন্যই তাঁহারা সর্ব্বদা ব্যতিব্যস্ত। ঈশ্বরকে চিন্তা করিবার সময় তাঁহাদের থাকে না। তাঁহারা বিষয় সুখে মুগ্ধ হইয়া পড়েন, ঈশ্বরকে ভুলিয়া যান।

ঈশ্বর যাহা দিয়াছেন, সহজ উপায়ের দ্বারা তাহা উপভোগ কর। শস্য ফল, মূল ইত্যাদি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হইতেছে। মনের আনন্দে সেই সকল উপভোগ কর। কিন্তু উপাদেয় দ্রব্যকে বিকৃত করিয়া, নানা অভাব বাড়াইয়া আপনার কৃত জালে আপনি কেন আবদ্ধ হও?

বাঙ্গালীর রথযাত্রা।

হিন্দুশাস্ত্র পাঠে জানা যায়, রথযাত্রা হিন্দুর অধ্যাত্ম তত্ত্বের রাসায়নিক চিত্র (ফটোগ্রাফ) স্বরূপ। আত্ম-তত্ত্ব-দর্শিগণ তজ্জন্যই বলিয়াছেন,—"রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুন র্জন্ম ন বিদ্যতে"। প্রাগুক্ত শ্লোকার্দ্ধ, দাশরথিরায় প্রভৃতি সঙ্গীতাচার্য্যগণের গান, নাড়াবাউলের তুক্‌কা শ্রবণে যাঁহাদের রথতত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম হয় নাই, হিন্দুর রথ যাত্রা একটী আমোদ উৎসবের সামগ্রী বলিয়া যাঁহাদের ধারণা ছিল, কয়েক বৎসর হইল 'দৈনিকে' রথতত্ত্ব নামক একটী

যুক্তি যুক্ত উপাদেয় প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তাঁহাদের অনেকের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ৪।৫ বৎসর হইতে বাঙ্গালির দুর্গোৎসব, রাস, দোল, রথ, ঝুলন যাত্রাকে আর কেহ বড় একটা টিটকারি দেন না। তাই ভরসা হয়, হিন্দু শাস্ত্রের মর্ম্ম বুঝিতে পারিলে, বাঙ্গালী হিন্দু (শিক্ষিত হিন্দু) ক্রমেই শাস্ত্রোক্ত ক্রিয়া কলাপে, পূজা পার্ব্বণে আস্থাবান হইবেন। যাঁহারা হিন্দুশাস্ত্রের (পুরাণাদির) আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা শুনিয়া কেবল উপহাস করেন, তাঁহারা কাল পাত্রানুসারে লোকের মতিগতি বুঝিতে আদৌ অক্ষম। তবে ঐতিহাসিক বিষয়কেও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যায় অনৈতিহাসিক রূপে প্রতিপন্ন করা, বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পক্ষান্তরে বিদ্যাসুন্দরের গ্রন্থের ন্যায় গ্রন্থের আধ্যাত্মিকতা প্রতিপাদনের চেষ্টাও একরূপ অতিবুদ্ধির কার্য্য।

সকলেরই বিশ্বাস, আমাদের দেশের বিখ্যাত ভূম্যধিকারীবগণই হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দু সমাজের স্তম্ভ স্বরূপ। এখনও বাঙ্গালায় হিন্দু শাস্ত্র সম্মত ক্রিয়া কলাপ, পূজা পার্ব্বণাদি যাহা কিছু অনুষ্ঠিত হয়, তাহা এই সম্প্রদায়ের মধ্যে। পক্ষান্তরে ইহাও সকলের জানা আছে, এইশ্রেণীর হিন্দুর মধ্যে অনেকে পূজার দালানকে বৈঠকখানা, এবং সমাজ মন্দিরে পরিণত করিয়াছেন। যাঁহারা এতদূর গড়ান নাই, তাঁহারাও পূজা পার্ব্বণ, যাত্রা মহোৎসবাদি করেন, গৃহিণী, উপগৃহিণী এবং ইয়ারবগণের অনুরোধে। প্রকৃত ভক্তিভাবে হিন্দুর ক্রিয়া কলাপ পূজা পার্ব্বণাদি যাঁহারা করিতেন, সেই শ্রেণীর হিন্দুর সংখ্যা দিন দিন হ্রাস হইতেছে।

আমরা বলিয়াছি, হিন্দুর রথ অধ্যাত্মতত্ত্বের একটী রাসায়নিক চিত্র (ফটোগ্রাফ)। আরও বলিয়াছি হিন্দুশাস্ত্র সম্মত ক্রিয়া কলাপ পূজা পার্ব্বণাদি যাহা কিছু বাঙ্গালায় (এখনও) অনুষ্ঠিত হয়, তাহা বাঙ্গলার বিখ্যাত ভূম্যধিকারীগণের মধ্যে; এখন আমরা দেখাইব মানব দেহের প্রতিকৃতি স্বরূপ এই রথ যাত্রা (যাহা বঙ্গের প্রধান প্রধান ভূম্যধিকারী গণ অতি সমারোহের সহিত করিয়া থাকেন) তাহা হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের কত দূর অনুকূল এবং এই রথ বা রথযাত্রা দর্শনে সাধারণ হিন্দুর হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রে কতদূর আস্থা জন্মিতে পারে।

রথ যাত্রা উপলক্ষে কোন একজন বিখ্যাত ভূম্যধিকারী এত অর্থব্যয়

করেন, যে হঠাৎ দেখিলে রাজসূয় যজ্ঞের উৎসবামোদের আভাস মনে পড়ে, কাশীরাম দাসের মহাভারতের রাজসূয়ে সেই "খাও খাও লও লও এই মাত্র শুনি, কারও মুখে না শুনিলাম, না পাইলাম বাণী;" এরূপ অন্নাদি বিতরণের প্রথা যে বাঙ্গালায় এখনও আছে, তাহা অবশ্য গৌরবের বিষয়; এবং এই প্রথা প্রত্যেক রাজা মহারাজগণ অনুকরণ করেন, তাহাও প্রার্থনীয়, কিন্তু রথ যাত্রার এটী সদর পৃষ্ঠা; মফস্বল পৃষ্ঠা এখনও প্রদর্শিত হয় নাই। বাঙ্গালার যে সকল রথে নরকাভিনয় দর্শন করিয়াছি, এই রাজা বাহাদুরের রথেও সে দৃশ্য দর্শনে কেহ বঞ্চিত হন না, সুতরাং আমরাও বঞ্চিত হই নাই। বাঙ্গালার সাধারণ হিন্দুগণের রথযাত্রা হইতে, এই রথ যাত্রার যেমন অন্নাদি বিতরণে বিশেষত্ব আছে, সেইরূপ রথ ও তাহাতে চিত্রিত চিত্রাবলীরও কিছু বিশেষত্ব আছে। সাধারণ হিন্দু কেন, অনেক রাজা মহারাজার রথ কাষ্ঠ নির্ম্মিত। বর্ষে বর্ষে তাহা নিয়মিত রূপে সংস্কৃত হয়। কিন্তু প্রোক্ত রাজা বাহাদুরের রথ পীতল নির্ম্মিত সুতরাং তাহাই আমাদের প্রবন্ধের আলোচ্য বিষয়। এইরথ যাত্রায় হিন্দুর অন্নাদি দানের উপযুক্ত ব্যবস্থা দেখিয়া হিন্দুয়ানির একপৃষ্ঠা আমরা যেরূপ বুঝিয়াছি, তাহা প্রথমেই বলিয়াছি। মফস্বল পৃষ্ঠায় (রথ দর্শনে) যে জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহা সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়া প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

যাঁহারা সৌভাগ্যবান এবং তত্ত্বদর্শী তাঁহাদের আত্মতত্ত্বজ্ঞান সহজে হয়। আর যাহারা বাহ্যচিত্র বা দৃশ্য দর্শন না করিলে হৃদয়ের চিত্র নিচয়কে জ্ঞানচক্ষু দ্বারা দর্শন করিতে অক্ষম, তাহাদের জন্যই রথ যাত্রার সৃষ্টি। কিন্তু আমরা জানিতে চাই, প্রোক্ত রাজা বাহাদুরের পীতল নির্ম্মিত রথের চারিপার্শ্বে অশ্লীল ভাব ব্যঞ্জকতার আদর্শস্বরূপ যে চারিটী স্ত্রীমূর্ত্তি নির্ম্মিত (খোদিত) হইয়াছে, তদ্দর্শনে কোন্ শ্রেণীর আত্ম তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হইবে? বোধ হয় এক বৎসরে একরূপ চিত্র আর এক বৎসরে অন্যরূপ চিত্র দর্শনে লোকের হৃদয়ে চিত্র দর্শন জনিত ভাবের স্থায়িত্ব হইবে না বলিয়াই উক্ত রথ পীতল দ্বারা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে। এ কীর্ত্তি রাজা মহারাজারই শোভা পায়; সাধারণ হিন্দু এত উচ্চে উঠিতে পারে না! এরূপ পীতল নির্ম্মিত রথ বাঙ্গালায় আর কত আছে জানি না; যদি এই ভাবের রথ যাত্রা বাঙ্গালায়

বর্ষে বর্ষে হয়, এবং এই ভাবের চিত্রাবলীর দিন দিন উন্নতি হয়, তবে বাঙ্গালী হিন্দুর আত্মতত্ত্ব জ্ঞান যে বিনা গুরূপদেশে সংসাধিত হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। "রথেচ বামনং দৃষ্ট্বা পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে," এবচনেরও আর বড় প্রয়োজন হইবে না। "রথে চ নরকং দৃষ্ট্বা আত্মজ্ঞান লভেন্নরঃ" এই রূপ ফলই হাতে হাতে ফলিতেছে।।

কেহ বলিতে পারেন, যাহারা আত্মতত্ত্ব জ্ঞান লাভ প্রত্যাশায় রথ দর্শন করিতে যায়, তাহারা রথে বিগ্রহই দর্শন করে; যাহারা কেবল আমোদ করিতে পাপবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া রথ দর্শনে যায়, তাহারা নরকরূপ অশ্লীলতা ব্যঞ্জক চিত্রাবলী দেখিবে, তাহাতে আর বিচিত্র কি? আমরা বলি, এইরূপ তর্কের কোন প্রকার সারবত্তা নাই। যেহেতু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি (প্রকৃত কথাও তাই) যাঁহারা সৌভাগ্যবান এবং আত্মদতত্ত্বদর্শী তাঁহাদের আত্মতত্ত্ব জ্ঞান সহজ হয় অর্থাৎ আত্মতত্ত্বের প্রতিকৃতি স্বরূপ রথ দর্শন অথবা রথেতে বিগ্রহ (বসান) দর্শন, তাঁহাদের পক্ষে অনাবশ্যক। যাহারা অজ্ঞান অর্থাৎ আত্মতত্ত্বদর্শী নহে, তাঁহাদের মানব দেহ তত্ত্বের রাসায়নিক চিত্র (ফটোগ্রাফ) স্বরূপ এই রথ যাত্রার সৃষ্টি। অজ্ঞানীর যে নরকের দিকে দৃষ্টি অগ্রে পড়িবে, সে ত জানা কথা। পাপীত নরক দর্শন করিতেই যে কোন যাত্রা মহোৎসবে যায়, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, দৈনিকে রথ তত্ত্ব নামক প্রবন্ধ প্রকাশিত হওয়ায় পূর্ব্বে কয়জন এই রথযাত্রার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব অবগত ছিল? আমরা জানি "পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে" এই শ্লোকার্দ্ধের এতটুকু অর্থ লোকে বুঝিত যে, রথে যে বিগ্রহ উঠান হয়, তাহা দর্শন করিলে পুনরায় জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। এদেশের সাধারণ রথ যাত্রার ত কথাই নাই, জগন্নাথ দেবের রথ যাত্রা দর্শনার্থ যে লক্ষ লক্ষ যাত্রী বর্ষে বর্ষে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে যায়, তাহার কয় জন রথতত্ত্ব অবগত আছে? অনেক যাত্রী যে অগ্রেই জগন্নাথদেবের লাট মন্দিরস্থ অশ্লীলতা-ব্যঞ্জক চিত্রাবলী দর্শনে জগন্নাথ দেবের মাহাত্ম্যানুভব করিয়া আসে, সে বিষয় বোধ হয় কাহারও অবিদিত নাই। এখন বলুন দেখি, যে সকল হিন্দু পুরুষোত্তমে যাইয়া অগ্রে নরক দর্শনই করে, জগন্নাথ দর্শন করে কি না সন্দেহ, সেই শ্রেণীর হিন্দুর পক্ষে রথস্থ চিত্রা-

বলীব প্রতি দৃষ্টি পডিবার সম্ভাবনা? না, বথস্থিত বিগ্রহের প্রতি তাহাদেব ভক্তিপূর্ণ দৃষ্টি পতিত হওয়াব সম্ভাবনা? বোধ হয় স্বীকার করিতে হইবে এই শ্রেণীর হিন্দুব দৃষ্টি প্রথমত বাহ্য বিষয়েই পড়িবে। এখন আমরা পুনরায় জিজ্ঞাসা করিতে পাবি, তবে এই ভাবের রথ দর্শনে বাঙ্গালী হিন্দুব আত্মতত্ত্ব জ্ঞান কিরূপ হইতেছে, কেহ বলিতে পারেন কি?

দৈনিকের প্রবন্ধ লেখক কোন্ দেশের রথদর্শনে রথতত্ত্ব লিখিয়াছেন জানি না। তিনি যদি কেবল কল্পনার সাহায্যে বথতত্ত্ব লিখিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে অনুবোধ কবি তিনি উত্তর বাঙ্গালার রাজা বাহাদুরের পীতল নির্ম্মিত রথটী স্বচক্ষে দেখিয়া তদনুরূপ একটী আধ্যাত্মিক বর্ণনা করিয়া রথতত্ত্ব আমাদিগকে বুঝাইয়া দিউন। তাঁহাদের ন্যায় পণ্ডিতেব রথযাত্রার সদর মফস্বল বর্ণনা কবিবার শক্তিও আমাদেব অপেক্ষা বেশী। তাই ভরসা কবি পণ্ডিতেব লেখনী হইতে প্রোক্ত রথেব আধ্যাত্মিক বর্ণনা প্রসূত হইলে রাজাবাহাদুবেবও চৈতন্যোদয় হইবে এবং সাধাবণেরও প্রকৃত জ্ঞান জন্মিবে।

আমরা বাঙ্গালীর রথযাত্রাব বাহ্যিক চিত্র যেমন অঙ্কন কবিলাম সেইরূপ "মঞ্চে মধুসূদনঞ্চ গোবিন্দ দোলবাধৃতম্" বাক্যেরও বিপরীত ফলপ্রদ ক্রিয়াই অনেক হিন্দু সমাজ রক্ষকগণ করিয়া থাকেন। প্রয়োজন হইলে সে সমস্ত প্রদর্শন কবিতে পাবি। এখন সাধারণ পাঠকবর্গকে জিজ্ঞাসা কবি, শেষোক্ত হিন্দুগণ কোন্ শ্রেণীব হিন্দু তাঁহাবাই সে বিচার করুন। এই শ্রেণীব হিন্দুগণকেও বলি, তাঁহাবা হিন্দু-ধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ রক্ষক হইয়া যদি ভক্ষক হন, তবে ইহাকে রক্ষা করিবে কে? কেবল বিরুদ্ধবাদীগণেব বাক্যবাণে জর্জ্জবিত হইয়া দলাদলির ঘোঁট করিলেই কি ধর্ম্মের উন্নতি চবম সীমায় দাঁড়াইবে? আমাদের বিবেচনায় আত্মদোষ ক্ষালন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। যাঁহাবা সমাজেব আদর্শ, তাঁহাদেব কার্য্যে গলদ্ থাকিলে, সে সমাজেব ইতর শ্রেণী ভাল হইবে কিরূপে?

———

জব-চার্ণক।

কোন সাম্রাজ্য, রাজ্য অথবা নগরের ইতিহাস পাঠ করিতে হইলে ঐ সকলের স্থাপয়িতার বিষয় অবগত হওয়া আবশ্যক। যে হেতু সময়ে সময়ে উঁহাদিগের জীবনের ইতিহাস, এক একটি সাম্রাজ্য রাজ্য অথবা নগরের ইতিহাস হইয়া থাকে। কলিকাতার সংস্থাপয়িতার জীবনের সহিত কলিকাতার উন্নতির বিশেষ সংস্রব না থাকিলেও তদীয় জীবনের এরূপ অনেক ঘটনা আছে যাহার বর্ণনা অতীব প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়। ইহা ব্যতীত বঙ্গদেশে ইঙ্গরেজের বাণিজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে তাঁহার জীবনে অনেক প্রকার ঝটিকা বহিয়া গিয়াছিল, এবং উহার জন্য তিনি যে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতে ইঙ্গরেজ জাতির তাঁহার নিকট চির কালের জন্য কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকা উচিত। যে কোন পুস্তকে কলিকাতার বিষয় লিপি বদ্ধ হইয়াছে, তাহাতেই জব-চার্ণককে কলিকাতা নগরের পিতা বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, এই ঐতিহাসিক সত্যটি ইতিহাস পাঠকদিগের অবিদিত নাই। জব-চার্ণক সম্বন্ধে অনেক ঘটনা অনেকে বিদিত নহেন। এতাবৎ কাল যাঁহারা কলিকাতার ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাঁহারা উক্ত সাহেবের এতদ্দেশীয় জীবনের ঘটনাবলী সংগ্রহ করিয়া সম্যক্‌রূপে বর্ণনা করিবার প্রয়াস পান নাই। সেই হেতু আমরা চার্ণকের বিষয়, যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, সেই সমস্ত অদ্য পাঠকদিগের জন্য নিম্নে সন্নিবেশিত করিতেছি।

"ট্রিবিউনার" (১) বলেন যে "পূর্ব্ব ভারত বণিক সমিতির ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য সূত্রে বদ্ধ হইবার প্রারম্ভ কালে যে সকল ইঙ্গরেজ পৃথিবীর প্রাচ্য প্রদেশে আগমন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে জব চার্ণকেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ছিলেন"। ক্রুম সাহেব বলেন যে "জব চার্ণকের আত্মগত

(১) Colonel Ironside writes in the Asiatic Miscellany,

যোগ্যতা বিশেষ কিছুই ছিল না। তাঁহার কার্য্যপ্রণালী সমালোচনা করিয়া দেখিলে বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মে, যে তাঁহার নৈতিক অপেক্ষা পাশব সাহসই অধিক পরিমাণে ছিল। ইহা ব্যতীত তিনি অলস প্রকৃতি ও অনিশ্চিত চিত্তের লোক ছিলেন। তাঁহার প্রত্যেক রাজনৈতিক কার্য্যে তিনি প্রথমত হঠকারিতা প্রকাশ করিতেন, কিন্তু পরক্ষণেই উহা ভীরুতায় পরিণত হইত। এইরূপ আচরণে তিনি কোর্ট অব ডিরেক্টর নিকট হইতে বিশেষরূপে অনুযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সাধু প্রকৃতির লোক ছিলেন বলিয়া অনুমিত হইত বটে, কিন্তু তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিদিগের অসাধুতা দমন করিবার ক্ষমতা বা চিত্তের দৃঢ়তা ছিল না। (২)

অর্ম্মি সাহেব বলেন (৩) জবচার্ণক যুদ্ধবিদ্যায় অনভিজ্ঞ হইলেও তিনি অসাধারণ সাহসী পুরুষ ছিলেন। মুসলমান শাসন কর্ত্তারা (বঙ্গের মোগল প্রতিনিধি শাসন কর্ত্তা) তাঁহার প্রতি অত্যন্ত কুব্যবহার করিয়াছিলেন। নবাব সায়েস্তা খাঁর আজ্ঞামত তিনি কারারুদ্ধ ও কশা প্রহারিতও হইয়াছিলেন। অধিক কি, সময়ে সময়ে মুসলমান নাগরিকগণ পর্য্যন্ত অশ্রাব্য গালাগালি দিতে ও গাত্রে নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ পর্য্যন্ত করিতে ত্রুটি করিত না। এবম্প্রকার অবমাননা ও অসম্মানকর ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছিল। তিনি প্রতিহিংসার বশবর্ত্তী হইয়া ভোজন কক্ষের সন্নিকটে দেশীয় অপরাধীদিগের দণ্ডবিধান করিতেন। উক্ত প্রহরিত অপরাধীদিগের ব্যথিত হৃদয়োত্থিত ক্রন্দন ধ্বনিতে তাঁহার পূর্ব্ব অবমাননা প্রসূত গাত্রদাহ নিবারিত ও প্রতি হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইত। কাপ্তেন আলেকজাণ্ডার হ্যামিলটন সাহেব তাঁহার পুস্তকে (৪) জবচার্ণক সাহেবকে অত্যন্ত দুশ্চরিত্রের লোক বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। উক্ত সাহেব যাহাই বলুন জবচার্ণক মুসলমানদিগের নিকটে যেরূপ কুৎসিৎ ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেরূপ অবস্থায় কাহার না হৃদয়ে প্রতিহিংসা-

(২) Vide "History of the Rise and Progress of the Bengal Army"-*by Captain Arthur Broome* Vol: I, P 25

(৩) Vide Orme vol II p 12

(৪) Vide "New Account of the East, Indies" by Captain, Alexander Hamilton, published in 1744.

বৃত্তি জাগরিত হয় ? উহা অস্বাভাবিক নহে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রতি-হিংসার পাত্রদিগকে কিছু করিতে না পারিয়া গরিব অপরাধীদিগের উপর উহার প্রতিশোধ লওয়াটা যে অত্যন্ত সংকীর্ণ হৃদয়তার ও নীচ অন্তঃ-করণের পরিচায়ক হইয়াছিল, সে বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই।

কথিত আছে যে, কলিকাতায় ইংরেজ উপনিবেশ সংস্থাপন করিবার বিষয় স্থিরীকৃত হইবার পূর্ব্বে কলিকাতার সাত ক্রোশ উত্তরে বারাকপুরে (এক্ষণে যেখানে বৃটিস সৈনিক নিবাস সন্নিবেশিত) জব চার্ণক সাহেব এক খানি আটচালা (Bunglow) তুলিয়াছিলেন। (৫) এবং তাঁহার যত্নে উক্ত স্থানে একটি বাজারও সংস্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত স্থানটি অদ্যাবধিও তাঁহার নামে অভিহিত হইতেছে। এতদ্দেশীয় ব্যক্তিগণ "চার্ণক" না বলিয়া র বর্ণের লোপ করিয়া উক্ত স্থানকে "চানক" নামে অভিহিত করিয়া থাকে। পশ্চিমাঞ্চলের লোকেরা উহাকে "আচানক" বলিয়া থাকে। কথিত আছে যে ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট দিবসে জব-চার্ণক কলি-কাতায় আগমনের পর একটি প্রাচীন বৃক্ষের ছায়াতলে বসিয়া ধূমপান করিয়াছিলেন। এইরূপ কিম্বদন্তি আছে যে, তিনি নাকি এই বৃক্ষ ছায়ায় বসিয়া ধূমপান করিয়া অত্যন্ত সুখ ও স্বচ্ছন্দতা উপভোগ করেন এবং সেই কারণ বশতই তিনি কলিকাতায় নগরের ভিত্তিমূল সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। লংসাহেব প্রভৃতি বলেন যে উপরোক্ত বৃক্ষটি সম্ভবত সেই সুবিখ্যাত ঐতিহাসিক "বৈটকখানা বৃক্ষ"। বৈটক খানায় ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত একটি বৃহৎ প্রাচীন বৃক্ষ দণ্ডায়মান ছিল; কেহ কেহ অনুমান করেন সম্ভবত এইটিই সেই প্রাচীন বৃক্ষ হইবে। (৬)

চার্ণকের জীবনের একটি ঘটনা সম্বন্ধে একটি সুন্দর উপাখ্যান আছে, উহা এস্থলে বর্ণনা করা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। জনৈক ভারতবর্ষস্থ ইংরাজী

---

(৫) Vide W Newman & Co's "*Hand-Book of Calcutta*" P 3, "*A Historical and Topographical Sketch of Calcutta*" by H James Rainy P. 16

(৬) Vide Selections from the Calcutta Review—Article Calcutta in the Olden Times—its Localities P. 168 & 207 and W Newman & Co's Hand-Book of Calcutta' P. 55.

সাময়িক পত্রলেখক এই ঘটনাটিকে "কলিকাতার বাল্য ইতিহাসান্তর্গত" নামে অভিহিত করিয়াছেন। একদা জব চার্ণক দেখিতে পাইলেন যে নানালঙ্কার ভূষিতা সুন্দর মূল্যবান বসনাবৃতা পতিসহ গমনোদ্যতা অথচ চিতারোহণে অর্দ্ধ অসম্মতা একটি পঞ্চদশবর্ষীয়া বঙ্গীয় সুন্দর যুবতী তদীয় বৃদ্ধমৃত স্বামীর চিতাভিমুখে অতীব ধীর পদবিক্ষেপে অগ্রসর হইতেছেন। তিনি যুবতীকে চিতারোহণে অসম্মতা বুঝিতে পারিয়া ও তদীয় রূপমাধুরী সন্দর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া, নিজ রক্ষী সৈনিকদিগের দ্বারায় সুন্দরীকে সহমরণ হইতে নিবস্ত করিলেন। তৎপরে রমণীকে নিজালয়ে লইয়া গেলেন এবং তাঁহাকে নিজ প্রণয় সূত্রে আবদ্ধ করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। জবচার্ণক যুবতীর প্রণয় পাশে আবদ্ধ হইয়া বহুকাল সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। জবচার্ণকের নূতন নগরী সংস্থাপিত হইবার কিয়ৎকাল পরে কতকগুলি সন্তান সন্ততি রাখিয়া তাঁহার প্রণয়িনী তাঁহাকে দুঃখসাগরে নিমগ্ন করিয়া লোকান্তর গমন করিলেন। সেণ্ট-জনস্ (St. Johns) গির্জ্জার সংলগ্ন গোরস্থান সমূহের মধ্যস্থিত জবচার্ণকের পারিবারিক সমাধি স্থানে সুন্দরীর মৃতদেহের সমাধি হইয়াছিল। (৭)

কাপ্তেন হ্যামিল্টন সাহেব বলেন যে সংস্থাপয়িতা জব-চার্ণক তাঁহার স্ত্রীর বিচ্ছেদে কাতর হইয়া স্বীয় স্বভাবকে কলঙ্কিত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি প্রতি বৎসর পত্নীর মৃত্যু দিবসে তাঁহার সমাধিমন্দিরে একটি করিয়া কুক্কুট বলি দিতেন। কি অভিপ্রায়ে যে তিনি এরূপ করিতেন, তাহা কোন পুস্তকে নির্দ্দিষ্ট হয় নাই এবং সময়ের গাঢ়তম আবরণ ভেদ করিয়া তাঁহার ঐ উদ্দেশ্য অনুভব করা সম্ভবপর নহে।

উপরোক্ত ঘটনাটি সত্যমূলক বলিয়া প্রতীত হইতেছে। উহার সত্যতা সমর্থনের জন্য আমরা এস্থলে উক্ত ঘটনা সংক্রান্ত আর একটি ঘটনার উল্লেখ করিতেছি। জবচার্ণকের সমাধিমন্দিরের নিকটে জোসেফ টাউনস্এণ্ড (Joseph Townsend) নামক জনৈক জাহাজের পথদর্শকের (Pilot)

(৭) Vide "A compendious Eclesiastical, Chronological and Historical Sketch of Bengal Since the Foundation of Calcutta." P 3 & 4 and "A Historical and Topographical Sketch of Calcutta" by James Rainey" P 17.

গোর স্থানে সংলগ্ন প্রস্তরে একটি পদ্য খোদিত ছিল তাহাতে উপরোক্ত বিষয়ের উল্লেখ আছে, সেই স্থলটি আমরা উদ্ধৃত করিয়া এই স্থানে সন্নিবেশিত করিলাম :—

Cries Charnock—Scatter the faggots! Double the Brahmin in two.
The tall pale widow is mine, Joe! the little brown girl's for you.

উপরোক্ত শ্লোকটি পাঠে সহমরণগমনোদ্যতা সুন্দরী যুবতীকে জব-চার্ণক কর্ত্তৃক লইয়া যাওয়া বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ থাকিতেছে না। অধিকন্তু উক্ত ঘটনা সংক্রান্ত আরও কয়েকটি বিষয় অবগত হওয়া যাইতেছে। জবচার্ণকের প্রণয়িনী ব্রাহ্মণ কন্যা ছিলেন এবং তাহা ব্যতীত তাঁহার স্বামীর অন্যান্য পত্নীও সহমরণোদ্দেশে চিতারোহণ করিতে গিয়াছিলেন। তন্মধ্যে পূর্ব্বোল্লিখিত জাহাজের পথ প্রদর্শক (pilot) জোসেফ টাউন্সএণ্ড জবচার্ণকের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া সহমরণোদ্যতা ব্রাহ্মণ পত্নীগণের মধ্য হইতে জনৈক অর্দ্ধবয়স্কা উজ্জ্বল শ্যামাঙ্গীকে নিজ স্ত্রীপদাভিষিক্ত করিয়াছিলেন।

জব চার্ণক সাহেব কলিকাতা নগর (তৎকালে সুতানুটী নামে অভিহিত হইত) সংস্থাপিত করিবার পর অধিক দিবস জীবিত ছিলেন না। পূর্ব্বভারত সমিতি সংক্রান্ত বাঙ্গলার ইঙ্গরেজ গবর্ণর, আডমিরাল এবং সেনাধ্যক্ষ এবং "প্রাসাদমণ্ডিতা মহানগরীর" প্রতিষ্ঠাতা জব চার্ণক সাহেব ১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দিবসে ইহ লোক পরিত্যাগ করেন। প্রাচীন ইঙ্গরেজ

---

(৮) The poetic effusion in doggrel verse runs thus ——
I've slipped my cable mess-mates, I am dropping down with tide,
I have my sailing orders while ye at anchor ride,
And never on fair June morning, have I put out to sea,
With clearer conscience or better hope or heart more light and free,
An Ashburnham! A fanfan! hark how the corslets ring!
Why are the blacksmiths out today, beating those men at the spring?
Ho Willie Hobb & Cuddie!—Bring out your boats amain,
There's a great red pool to swim them o'er, yonder in Deadman's Lane.
Nay do not cry sweet Katie—only a month afloat,
And then the ring and the parson at Fairlight Church my doat!
The flower-strewn path—the press-gang! no I shall never see,

বণিক উপনিবেশের সেণ্টজন (৯) নামক প্রাচীন গির্জ্জাস্থিত প্রাচীন সমাধিভূমে তাঁহার সমাধি দেওয়া হয়। অদ্যাবধি ও ঐ সমাধি মন্দির উক্ত গির্জ্জাভূমের সীমা মধ্যে দণ্ডায়মান রহিয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কথিত গির্জ্জা নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বে এই স্থানটি কেবল মাত্র ইংরেজদিগের সমাধি স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। যৎকালে এই গির্জ্জা নির্ম্মাণ করা হয়, তৎকালে প্রায় সমস্ত সমাধি মন্দির স্থানান্তরিত করা হয়, কেবল মাত্র কয়েকটি অবশিষ্ট ছিল, তন্মধ্যে উপরোক্তটি সর্ব্ব প্রধান। কথিত আছে যে, এই সমাধি মন্দিরই কলিকাতা নগরের সর্ব্ব প্রাচীন ইষ্টকালয়। (১০)

জব চার্ণকের সমাধি সংলগ্ন প্রস্তর খণ্ডে ল্যাটিন ভাষায় যাহা লিখিত আছে, তাহার অবিকল বাঙ্গালা অনুবাদ আমরা নিম্নে সন্নিবেশিত করিতেছি।

জব চার্ণক যোদ্ধা, একজন ইংরেজ জাতীয়
এবং বঙ্গদেশে বিবাহ স্থত্রে আবদ্ধ হইয়া ছিলেন

Her little grave where the daisies wave in the breeze on Fairlight Lee
"Shoulder to Shoulder, Joe my boy, into the crowd like a wedge !
Out with your hangers, mess-mates, but do not strike with the edge !"
Cries Charnock "Scatter the faggots ! Double that Brahmin in two !
The tall pale widow is mine, Joe ! the little brown girl's for you."
Young Joe (you're nearing sixty), why is your hide so dark ?
Katie was fair with soft blue eyes—who blackened your's ? why hark !
The morning gun ! Ho ! steady the arquebase to me —
I've sounded the Dutch High Admiral's heart as my head doth sound the sea.
Sounding, sounding the Ganges floating down with the tide,
Moor me close by Charnock next to my nut brown bride,
My blessing to Kate at Fairlight, Holwel ! & my thanks to you,
Steady ! we steer for Heaven through scud drifts cold and blue

Vide "A Historical & Topographical Sketch of Calcutta" by H J Ramey p p 18-19.

(৯) "St Johns Cathedral Church-yard" এই গির্জ্জাটি হেষ্টিংস ষ্ট্রীটের (Hastings Street) উত্তর গায় সংলগ্ন। ইহাকে এতদ্দেশীয় জন সাধারণে "পাথুরিয়া গির্জ্জা" বলিয়া থাকে। কলিকাতার মধ্যে এইটিই সর্ব্ব প্রাচীন গির্জ্জা

(১০) Vide "Rise & Progress of the Bengal Army by Captain Arthur Broome p p, 14-25, and "A Historical & Topographical Sketch of Calcutta" by F James Ramey p p. 15-16.

ইঙ্গরেজ জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ, মনুষ্য জাতির মধ্যে ক্ষমতাশালী
তিনি তাঁহার নিজ অস্ত্র শস্ত্র সহ এই মার্ব্বেল প্রস্তর নিম্নে শায়িত,
খ্রীষ্টের আগমন কাল পর্য্যন্ত সমাধি হইতে সুখকর পুনরুত্থানের
আশায় তিনি এস্থানে নিদ্রিত থাকিলেন,
যিনি বহুকাল হইতে নিজ মাতৃভূমিতে পরিভ্রমণ করেন নাই
কিন্তু অনন্ত কালের জন্য নিজআবাসে প্রত্যাগমন করিয়াছেন,
১৬৯২ খৃষ্টাব্দের ১০ই জানুয়ারি দিবসে মানবলীলা সম্বরণ করেন। (১১)

---

(১১) LATIN INSCRIPTION

D.O M

Jobus Charnock, Armiger,
Anglus et nuss, in hoc,
Regno Bengalensi
Dignession ' Anglorum,
Ageus
Mortalitatis suæ exuvias,
Sub hoc marmore deposuit, ut
in spe beatæ resurrectionis ad
Christi Judicis adventum
obdormirent,
Que postquam in solo non
suo perigrinatus essit diu,
reversus est domun sue æter-
nitatis decimo die Januarie,
1692

Vide A Historical and Topographical Sketch of Calcutta by H James Ramey p 16 and History of the Rise and progress of the Bengal Army by Captain A Broome p 25

উপরোক্ত লাটিনের ইংরাজি অনুবাদ।

Job Charnock, warrior, an Englishman and married in the country of Bengal. Noble among Englishmen, powerful among men He is placed under this marble stone with his own arms, that he might sleep in the hope of happy resurrection till the advent of Christ. Who for long time did not wander in his own country, but returned his own home eternally on the 10th day of January 1692.

তাঁহার দুই কন্যা মিসেস হোয়াইট এবং মিসেস টায়ারও তাঁহার সহিত সমাহিত হইয়াছিলেন। উপরোক্ত বিষয় ব্যতীত উক্ত প্রস্তরখণ্ডে আর কয়েক পংক্তি ল্যাটিন ভাষায় লিখিত আছে; তাহার অনুবাদ,—

এই স্থানে ক্যারোলিনা টায়ার ও শায়িত আছেন ইনি তাঁহার সুবিখ্যাত সুন্দরী স্ত্রীর যাহার ১৬৯৬। ৯৭ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি দিবসে মৃত্যু হয় তাঁহার গর্ভে জন্মিয়া ছিলেন (১২)

সর জন গোল্ডসবরো Sir John (Goldsborogh) ১৬৯৪ খৃষ্টাব্দে কমিসারি জেনারেল (Commissary General) নিযুক্ত হইয়া এদেশে আগমন করেন। তিনি বলেন যে "জব চার্ণক সাহেব অস্থির চিত্ত ও অলস প্রকৃতির লোক ছিলেন।" কিন্তু ব্রুস সাহেব (১৩) বলেন যে "তিনি সকলের নিকট মাননীয় ছিলেন এবং সম্ভ্রমের সহিত কাটাইয়াছিলেন।" যাহাই হউক, জব চার্ণক সম্বন্ধে এরূপ মত ভেদ থাকিলেও, যতদিন ভারতবর্ষ ব্রিটিস সাম্রাজ্যগত থাকিবে, অন্তত তত দিন জব চার্ণকের নাম লোকের স্মৃতি পথারূঢ় থাকিবার সম্ভাবনা।

জব চার্ণক তাঁহার সম-সাময়িকগণের মধ্যে অধিকতর পরিণামদর্শী ছিলেন। সম্ভবত তিনি ভাবী সাময়িক সুবিধা অনুধাবন করিয়াই ভাগীরথীর উচ্চতর প্রদেশে যে সকল সমকক্ষ য়ুরোপীয় বণিক সমিতির কুঠী সংস্থাপিত ছিল, তাঁহাদিগের অপেক্ষা তাঁহা কর্তৃক স্থাপিত ইঙ্গরেজ বণিক সমিতির কুঠী প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্বন্ধে সমধিক উন্নতি লাভ করিবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

---

(১২) LATIN INSCRIPTION

Pariter Jacet
Maria Jobi Primsgenita Carole Tyre Anglorum
Inceri Præfacti conjua charissima
Quæ Obiit 19 die Februarie A D 1696—97
Vide "A Historical & Topographical Sketch of Calcutta" by H. J Ramey

উপরোক্ত ল্যাটিনের ইঙ্গরেজি অনুবাদ।

Here also lies Mary the first issue of Job Charnock, Caroline Tyre by his above mentioned celebrated wife, who died on the 19 day of February 1696-7

(১৩) Vide Bruses Annals of the East India Company

ভবিষ্যতে তাহাই কার্য্যে পরিণত হইয়াছিল। কেবল মাত্র এই স্থানে অবস্থিতি হেতুই ফরাশী ভিন্ন ভাগীরথী-তীর-বাসী অন্যান্য যুরোপীয জাতিকে পরাভব করিতে এবং পরিণামে বিতাড়িত করিতে ইংরেজ সমর্থ হইয়াছিলেন। ডেনমার্ক, হল্যাণ্ড, এবং পোর্ত্তুগ্যালের ন্যায় ফরাশীদিগের অপেক্ষা তাঁহারা, কলিকাতায অবস্থান হেতুই, দেশীয়দিগের সহিত রাজনৈতিক এবং ব্যবসায়িক উন্নতির সুবিধা লাভ করিয়াছিলেন।

আমরা আর দুই একটি কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব। যে নগর জব চার্ণক কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠাপিত হইযাছে, সেই নগরে সমাধি মন্দির ব্যতিরেকে তাঁহার স্মরণার্থ চিহ্ন আর কিছু মাত্রই নাই। ইহা অপেক্ষা ইঙ্গরেজ জাতির পক্ষে অধিক লজ্জাকর ও দুরপনেয় কলঙ্কের বিষয় কি হইতে পারে? অদ্য এই মহা নগরীর প্রতি দৃষ্টি করিলে, অতি সামান্য লোকের স্মরণার্থ চিহ্ন, পথ, গলি, পুষ্করিণী এবং স্থান বিশেষে নাম জাজ্বল্যমান রহিযাছে, দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই রাজধানীতে ইহার পিতার স্মরণার্থ কোন নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না। অতএব হে ইঙ্গরেজ জাতি! যত শীঘ্র এই লজ্জাকর বিষয়ের অবসান করিয়া নিজ জাতিত্বের দুরপনেয় কলঙ্ক হইতে মুক্ত হইতে পার, ততই তোমাদের গৌরবের পক্ষে মঙ্গলকর। হে ইঙ্গরেজ! যে দেশীয জাতি তোমাদের চির ঘৃণ্য ও চক্ষুশূল, যাহার কিঞ্চিৎমাত্র দোষ পাইলে ভর্ৎসনা দূরে থাকুক কুৎসিৎ রূপে গালি দিতেও ক্রটি কর না, জব চার্ণক মুসলমান শাসনকর্ত্তা ও নাগরিকদিগের কর্ত্তৃক অপমানিত ও নিপীড়িত হইযা, তাহার প্রতিশোধ স্বরূপ, যে নিরীহ বাঙ্গালী অপরাধীদিগের প্রতি মমতা ও মনুষ্যত্ব শূন্য হইয়া যথোচিৎ কুব্যবহার ও পাশবাচরণ করিতে অনুমাত্র কুণ্ঠিত হয়েন নাই, একবার বারাকপুরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কর দেখিতে পাইবে যে, যে স্থানে জব চার্ণকের একখানি বাঙ্গলা মাত্র ছিল এবং যে থান তাঁহার যত্নে একটি সামান্য বিপণি সংস্থাপিত হইয়াছিল, সেই স্থানকে সেই চির ঘৃণ্য বাঙ্গালী জাতি জব চার্ণকের নামে অভিহিত করিয়া, তাঁহাকে চির স্মরণীয় করিযাছে।

অঘোরনাথ দত্ত।

বোম্বাই পরিদর্শন।

২।

আমার সমভিব্যাহারী,এল্ফিন্ষ্টোন চক্রের পূর্ব্বকথিত অট্টালিকার উপর হইতে সন্ধান করিয়া আসিয়া কহিলেন, যে আমাদের বোম্বাই প্রবাসী বন্ধুর আফিস উহাই বটে, কিন্তু তিনি তখনো আফিসে আইসেন নাই, সে দিবস আসিবেন কিনা তাহাও সন্দেহ স্থল, কারণ, সে দিবস রবিবার। তিনি সহরের ভিতর থাকেন না, বোম্বাই হইতে ৮ মাইল দূরে বান্দোরা নামক স্থানে সমুদ্রতীরে বাসা ভাড়া করিয়া থাকেন। তখন বেলা ১১ টা বাজিয়া গিয়াছে, পূর্ব্ব রাত্রে ভাল নিদ্রা হয় নাই। আমরা বোম্বাই যাইবার পূর্ব্বে এখান হইতে শুনিয়া গিয়াছিলাম যে কল্‌ভাদেবী রোডে আর একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক থাকেন। ইঁহার সহিত আমাদের পরিচয় ছিল না, কিন্তু অগত্যা সেই খানেই গেলাম। ইনি আমাদের দেখিয়া যারপর নাই সন্তুষ্ট হইয়া আমাদের অভ্যর্থনা ও আতিথ্য করিয়াছিলেন। এইখানে গাড়িয়ান বিদায় করিতে বড় হাঙ্গামা হইল। গাড়িয়ান বিস্তর অনুচিত ভাড়া দাবী করিতে লাগিল, কিছুতেই একটি পয়সা কম লইবে না। আমাদের নব পরিচিত বোম্বাই প্রবাসী,ও অন্যান্য মহারাষ্ট্রীয় ভদ্রলোকেরা, যাঁহারা তথায় উপস্থিত ছিলেন, সকলেই পুলিসের সহায়তা লইবার কথা উত্থাপিত করিলেন, আমরা তাঁহাদের সে কার্য্যে নিরস্ত করিয়া, গাড়িয়ান যাহা দাবী করিতে ছিল, তাহার আনা দুই কম্ দিয়া, অনেক কষ্টে তাহাকে বিদায় করিলাম। পরে শুনিলাম, যে ওখানকার গাড়িয়ানদের মধ্যে অনেকে গুণ্ডার দলে থাকে, এবং সুবিধা পাইলেই অত্যাচারও করিয়া থাকে।

সে যাহা হউক বিধাতা যে কখন কি মাপান, কাহার সাধ্য নির্ণয় করে? এই বোম্বাই প্রবাসী বাঙ্গালী ভদ্রলোকটীর বাটীতে সেই দিন একটি ছোট খাট ভোজ ছিল। সৌভাগ্যক্রমে সেই দিবসেই তাঁহার একটি পুত্রের অন্নপ্রাশন। আহারাদির ব্যবস্থাও উত্তম ছিল এবং ব্রাহ্মণেরো অভাব ছিল। আমি ও আমার বন্ধু উভয়েই ব্রাহ্মণ; গৃহস্থও সন্তুষ্ট চিত্তে পুত্রের মঙ্গল লক্ষণ মনে

করিয়া, আমাদের আতিথ্য করিলেন, আমরাও পরিপাটি রূপে আহারাদি করিয়া আমাদের পূর্ব্ব কথিত বোম্বাই প্রবাসী বন্ধুর আফিসে আসিয়া, তাঁহার সহিত মিলিত হইলাম। বেলা ৫ টার সময় সকলে একত্র সহর দেখিতে বাহির হইলাম। বাল্যকাল হইতে সমুদ্র দর্শন আমার একটি প্রধান সাধ ছিল, পূর্ব্বে কখন সমুদ্র দেখি নাই, এই দিবস সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আপলো বন্দর ঘাটে দাঁড়াইয়া প্রথম সমুদ্র দেখিলাম।

কিন্তু আপলো বন্দর হইতে সমুদ্র দেখিয়া আমার তৃপ্তি হইল না কারণ এই বন্দরের সম্মুখে, অদূরে সাগরগর্ভ হইতে গিরিশ্রেণী উত্থিত হইয়াছে, তাহাতে সমুদ্রের সে বিশাল দৃশ্যের প্রতিবন্ধক হইতে লাগিল, তবে আমি যে খানে দাঁড়াইয়াছিলাম, তাহার নিম্নতর সোপানের উপর হস্তীশুণ্ডের আস্ফালনের ন্যায়, নীলাম্বুর নানা প্রকার উচ্ছাস ভঙ্গি দেখিয়া মনে আনন্দ সঞ্চার হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে কানূটের সেই প্রাচীন কথা "Thus far thou shalt come and no farther" মনে হইয়া আমার হাসি আসিল। তাহার পরে সমুদ্রগর্ভে সূর্য্যাস্ত দেখিলাম কিন্তু কিছুতেই তৃপ্তি হইল না। এত সাধের সমুদ্র প্রথম দেখিবার সময়েই, সম্মুখে সেই পর্ব্বত শ্রেণীর আবরণ দেখিয়া মনের ভিতরে যেন কেমন একটা আবরণ হইয়া পড়িল; আমি আমার বোম্বাই প্রবাসী বন্ধুকে কহিলাম "ভাই এ আবরণ না সরাইলে সমুদ্র দেখিয়া সাধ মেটে না।" আমার বন্ধু কহিলেন যে তাঁহাদের বাসা সমুদ্রের ধারেই সেখানে এরূপ আবরণ নাই, সেখান হইতে ভাল করিয়া দেখিতে পাওয়া যাইবে। আমি বাসায় যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম! পূর্ব্বেই বলিয়াছি বোম্বায়ের ৮ মাইল উত্তরে বন্দোরা নামক এক পল্লীতে আমার প্রবাসী বন্ধুর বাসা। তথায় যাইতে হইলে বম্বে বরোদা রেল দিয়া যাইতে হয়। এই রেলের প্রথম এষ্টেসন বোম্বাই সহরের ভিতর কোলাবা নামক স্থান। এই লাইন সহরে ভিতর বরাবর সমুদ্রের ধার দিয়া গিয়াছে।

রেলের রাস্তা ও সমুদ্রের তীর এতদুভয়ের মধ্যে বায়ু সেবনের জন্য একটু তৃণাচ্ছাদিত ভূমি ও তাহার মধ্যে এক প্রশস্ত পথ আছে। আমরা প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময় এই ভূমি খণ্ডের উপর সমুদ্রবায়ু সেবন করিবার

জন্য দুই এক এষ্টেসন ছাড়াইয়া ট্রেনে উঠিতাম। বোম্বায়ের ভিতর পাড়ায় পাড়ায় এষ্টেশন এবং বোম্বাই হইতে বান্দোরা এষ্টেশন পর্য্যন্ত, প্রতিদিন ২৫ খানি ট্রেন যাওয়া আসা করিয়া থাকে, এবং সেইরূপ জি, আই, পি লাইনেও ১৯ খানি ট্রেন বোম্বাই পর্য্যন্ত প্রতিদিন যাতায়াত করে। উভয় লাইনেই ১ মাইল কোথাও ১॥০ মাইল, অন্তর এষ্টেসন। সর্ব্বশুদ্ধ ৪৪খানি ট্রেণ প্রতিদিন বোম্বাই সহরের ভিতর চলিতেছে। সে দিবস ৭॥০ টার সময় আমরা বান্দোরার বাসায় পৌঁছিলাম। আমরা যে বাসায় ছিলাম তাহার কথা একটু বিশেষ করিয়া বলিব। সমুদ্রের জল যতদূর ওঠে তথা হইতে হাত দশ বার পরেই আমাদের বাসা। সমুদ্র গর্ভ হইতেই একটি পাহাড় তীরের উপর উঠিয়াছে এই পাহাড়ের পদমূলেই আমাদের বাসা। অর্থাৎ একধারে সমুদ্র, একধারে পর্ব্বত, মধ্যে বাগান বেষ্টিত ফ্লোরওয়ালা, ছবির মত একটি বাঙ্গালা; পূর্ব্বে যেরূপ বলিয়াছি ফ্রেমে আঁটা কাঁচের ভিত্তি এবং খোলার চাল—এ বাঙ্গালারও) ছিল। সম্মুখে সমুদ্রের দিকে একটি গাড়ী বারাণ্ডা ছিল। আমাদের বাগানের নাম Homes Villa এই স্থানে পৌঁছিবার পূর্ব্বেই দূর হইতে সমুদ্র-গর্জ্জনের হুহু শব্দ কাণে প্রবেশ করিল। সে রাত্রি আবার জ্যোৎস্নাময়ী। বাসায় পৌঁছিয়াই আমি ও আমার সম-ভিব্যহারী বন্ধু ছুটিয়া গিয়া গাড়ী বারাণ্ডার ছাদে উঠিলাম; উঠিয়াই আমি এক দিন কল্পনা করিয়া সমুদ্রের বিষয় যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাই দেখিলাম :—

"চন্দ্র করে বিভাসিত অকূল জলধি,
ধূ—ধূ করিতেছে শুধু স্বপনের মত।"

আমি বাল্যকালে সমুদ্র না দেখিয়াই সমুদ্র নামক একটি কবিতা লিখিয়াছিলাম, আজ এই খানে দাঁড়াইয়া তাহা স্মরণ হইল :—

জলধি! কি মনোহর আকৃতি তোমার।
অসীম—অতল—শুধু অনন্ত বিস্তার॥
সীমা হতে সীমা শূন্যে সলিল কেবল,
বিরাম—বিশ্রাম নাই—সতত চঞ্চল॥

মনে করিলাম সমুদ্রকে লইয়া কি বাল্য খেলাই করিয়া ছিলাম। যাহা ভাবিয়াছিলাম তাহার কোন কথাই অধিক নহে; সেই।—

উপরে অনন্ত নীল বিশাল আকাশ,
নিম্নে চতুর্দ্দিকে শুধু সলিল উচ্ছ্বাস।
উন্নত তরঙ্গ শ্রেণী তুলি উচ্চ শির।
ছুটিতেছে অবিরত হইয়া অধীর॥

* * * *

অবিরত হুহুরব শ্রবণে পশিত।
কি আনন্দে বারিধি রে হৃদয় পূরিত।

এ সকলি ঠিক্ বটে, কিন্তু আমি বাল্য খেলাই করিযাছিলাম মাত্র। অনেকে মনে করেন যে বাইবন্ বা আর্বিং এর লেখা পড়িয়াই বুঝিয়াছেন, যে সমুদ্র জিনষটে কি। কিন্তু আমার বিশ্বাস যে যিনি না দেখিয়া সমুদ্রের ঠিক ধারণা করিতে চাহেন, তাঁহার সে ইচ্ছা বাতুলতা এবং যিনি বর্ণনা করিয়া সমুদ্র বুঝাইতে চাহেন, তাঁহারো সে প্রযাস অমানুষিক! অকূল অতল তরঙ্গময় জলরাশি নিরন্তর মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে, বলিলে ঠিক্ কথা বলা হইল বটে কিন্তু সমুদ্র যে কি বস্তু তাহার কিছুই বুঝান হইল না। অতল বলিলে সে গভীরতা বুঝায় না; তরঙ্গ বলিলে সে উচ্ছ্বাস বুঝায় না; মেঘ গর্জ্জনের শব্দ বলিলে সে গম্ভীর হুঙ্কার বুঝায় না। সমুদ্র বর্ণনা করিবার কথা ভাষায় নাই সমুদ্রের ধারণা করিবার স্থান মনুষ্য হৃদয়ে নাই।

সেই জ্যোৎস্নাবিভাসিত সমুদ্রের প্রতি চাহিয়া মন কেমন অভূত পূর্ব্ব আনন্দে অভিভূত হইল, বহুক্ষণ মুগ্ধচিত্তে নীরবে শ্বেতাম্বু হৃদয়ে চাহিয়া রহিলাম। পরে আহারাদি করিয়া শয়ন করিলাম। কিন্তু সে রাত্রে ভাল নিদ্রা হইল না। নীলাম্বুর সে অশ্রান্ত গম্ভীর রব শুনিয়া প্রাণের ভিতর "হুহু" করিতে লাগিল। সে হুহুতে এক বড় সুখ আছে। সুখের আধিক্যে সে রাত্রে ভাল করিয়া নিদ্রা হইল না। পরদিন প্রাতে উঠিযা দরজা খুলিয়া সমুদ্র দেখিতে বারাণ্ডায় আসিলাম, কিন্তু দেখিয়া এত সাধের সমুদ্র দর্শন সাধ, ভাল করিয়া মিটিল না। এখানে বসিয়া মনে করিতাম যে সমুদ্রের সীমা নাই কিন্তু দেখিলাম বহুদূরে, আকাশ ও সমুদ্রে মিশিয়া একটা

বন্ধনীর মত হইয়া পড়িয়াছে। সে বন্ধনীবেষ্টিত সমুদ্র দেখিয়া প্রাণের তৃপ্তি হইল না। শেষে শুনিলাম যে যেখান হইতেই সমুদ্র দেখ সর্ব্বত্রই ঐ রূপ বন্ধনী দৃষ্টি বোধ করিয়া থাকে। আমার বাল্য কালের সমুদ্র-দর্শন-সাধ মিটিলনা।

আমরা প্রতিদিন প্রাতে নয়টার কি দশটার গাড়ীতে Bandora হইতে বোম্বাই আসিতাম এবং বেলা ২॥ টা পর্য্যন্ত সহর দেখিয়া আমাদের বোম্বাই প্রবাসী বন্ধুর আফিসে আসিয়া জলযোগ করিয়া আবার সহর বেড়াইতে যাইতাম। অবশেষে ছয়টার সময়ে সকলে মিলিয়া সমুদ্রতীরে পদচারণ করিতে করিতে, দুই এক ষ্টেসন ছাড়াইয়া ট্রেনে উঠিয়া Bandora য় যাইতাম। বাসায় রাত্রি ৭॥ টার সময় পৌঁছিতাম। যে কয় দিন বোম্বায়ে ছিলাম, সে কয় দিন ক্ষুধা এত হইত, যে বোধ করি আমার জীবনে তত ক্ষুধা কখনই হয় নাই। আমি চিরকাল অধিক আহার করাকে, মহাপেটুকের কাজ ভাবিতাম, কিন্তু বোম্বাই গিয়া রাক্ষসের মত আহার করিতাম, তথাপি এক দিনের জন্য উদরের কিছু মাত্র অসুখ হয় নাই। আর Homee villa-সে সুখের কথা কি বলিব। সেখানে যতক্ষণ থাকিতাম, অশনে বসনে, জাগ্রতে স্বপনে, আলস্যে, পরিশ্রমে, ভ্রমণে, অধ্যয়নে, যখন তখন নিরন্তর সমুদ্র গর্জ্জন কর্ণ কুহর পবিত্র করিতেছে। লঘু আশা, লঘু তৃষ্ণা, হৃদয়ে স্থানই পাইত না। সে সুখ অপার্থিব। বোম্বায়ে যে কয় দিন ছিলাম, এত পরিশ্রম করিতে পারিতাম, যে তাহা মনে হইলে নিজেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পড়ি। বেলা ১০ টা হইতে সন্ধ্যা পর্য্যন্ত রৌদ্রে অনবরত "টো" "টো" করিয়া ঘুরিতাম, কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যও কোন দিন মাথা ধরে নাই, এক দিনের জন্য ক্লান্তি বোধ করি নাই।

সমুদ্রে স্নান।—বঙ্গোপসাগরে অনেকেই স্নান করিয়াছেন, আমি বঙ্গোপসাগর দেখি নাই, আমি Bandora উপকূলে স্নানের কথা বলিতেছি। আমার এক দিন সমুদ্রে স্নান করিবার সাধ হইল। Homee villa হইতে উপকূলের দিকে চাহিয়া দেখিলে কোন ভয়ের কারণ নাই বলিয়া বোধ হইত। আমি ও আমার সমভিব্যাহারী বন্ধু উভয়ে সমুদ্র উপকূলে স্নান করিতে গেলাম। Bandora উপকূল কৃষ্ণবর্ণ স্তূপ স্তূপ প্রস্তরে

আবৃত, তাহার কারণ পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের বাসার পশ্চাতেই যে পর্ব্বত তাহা সমুদ্র গর্ভ হইতেই উত্থিত হইয়াছে, আমরা দুই জনে দুইটি প্রস্তর স্তূপে বসিলাম। আমার বোম্বাই প্রবাসী বন্ধু তাঁহার ভৃত্যবর্গকে আমাদের সঙ্গে পাঠাইলেন। পুষ্করিণী বা নদীতে স্নান আর সমুদ্রে স্নান সমান নহে। পুষ্করিণী বা নদীতে অবগাহন করিয়া স্নান করিয়া থাকি, কিন্তু সমুদ্রে ডাঙ্গায় বসিয়া স্নান করিতে হয়। আমার ইচ্ছা ছিল অধিক জলে নামিয়া স্নান করি, এবং আমি নামিয়া যাইতে ছিলাম, কিন্তু পশ্চাৎ হইতে আমার বন্ধু ও তাহার ভৃত্যবর্গ চীৎকার করিয়া আমায় অধিক জলে যাইতে নিষেধ করিল। আমার সে বাহাদুরি করিবার দর্পও অচিরে চূর্ণ হইল। দূর হইতে যে উচ্ছ্বাসটি ক্ষুদ্র দেখাইতেছিল, তাহা যত নিকটতর হইতে লাগিল, ততই ভীষণতর মূর্ত্তি হইয়া উঠিল। সে উচ্ছ্বাস গঙ্গার ৩। ৪ হাত প্রশস্ত ঢেউ নহে, তাহার একটি উচ্ছ্বাস সমস্ত গঙ্গার বিস্তারের ন্যায় দীর্ঘ, এবং ৪।৫ হাত উচ্চ, ভীষণ হুঙ্কার শব্দ করিতে করিতে শিরোভাগে তুলারাশির ন্যায় ফেণ রাশি মণ্ডিত হইয়া ছুটিয়া আসিতেছে, আমি সেই মূর্ত্তি দেখিয়াই দুই পা করিয়া দাঁড়াইলাম। আমার বন্ধু একটি প্রস্তর স্তূপ ধরিয়া বসিয়াছিলেন, তথাপি সে তেজ সম্বরণ করে কাহার সাধ্য, প্রস্তর স্তূপে পড়িয়া তাঁহার হস্ত পদ ও অঙ্গ স্থানে স্থানে বিক্ষত হইল, কিন্তু তাহাতেই তাঁহার ভরসা হইল। দ্বিতীয় বার আমিও ভরসা করিয়া প্রস্তর স্তূপ ধরিয়া বসিয়া রহিলাম, এইবার উচ্ছ্বাসের পর উচ্ছ্বাস আসিয়া আমার মস্তকের উপর দিয়া নিমেষের মধ্যে চলিয়া গেল। এইরূপে কয়েক উচ্ছ্বাসে স্নান করিয়া উঠিয়া আসিলাম, আসিতে আসিতে পশ্চাৎ হইতে দুই একটি উচ্ছ্বাস আসিয়া পৃষ্ঠে পড়িল, অতি সাবধানে উঠিয়া আসিলাম, কারণ Bandora উপকূল সামুদ্রিক ঝিনুক শামুক প্রভৃতিতে আবৃত, পদস্খলন হইলে পদতল ক্ষত হইবার সম্ভাবনা। সকলেই জানেন যে সমুদ্রের জল বড় লবণাক্ত, এমন কি একবার মুখে করিলে সমস্ত দিন মুখ বিস্বাদ হইয়া থাকে। স্নানের পর কোয়ার জলে গাত্র ধৌত করিতে আমায় আমার বন্ধু পরামর্শ দিয়া ছিলেন, কিন্তু আমি তাহা করি নাই, আমার বিশ্বাস

ছিল যে সমুদ্রের জলে স্নান করিলে সকল প্রকার চর্ম্ম রোগ আরোগ্য হয়, এবং দেখিলাম বস্তুত তাহাই হইল। বোম্বাই যাইবার সময় আমার অঙ্গে ঘামাচি চুলকোণি বিস্তর হইয়াছিল, কিন্তু দুই এক দিনে শরীর পরিষ্কার হইয়া উঠিল। সমুদ্রের জল খুব ঠাণ্ডা নহে, এবং সমুদ্র বায়ুও খুব শীতল নহে; তবে সে বায়ুর সঙ্গে জলীয় বাষ্প অধিক পরিমাণে থাকে। খালি গায়ে সে বায়ু অধিকক্ষণ সেবন করিলে সর্দ্দি হইতে পারে।

হোমী ভিলার অদূরে পূর্ব্ব কথিত শৈলের এক শাখা সমুদ্রগর্ভে অন্তর্দ্বীপের ন্যায় হইয়া আছে, এই স্থানে সমুদ্রের উপরেই বাইরামজি পয়েণ্ট নামক একটি সমুদ্রবায়ু সেবনের চমৎকার স্থান আছে। বসিবার জন্য বেঞ্চ গাঁথা আছে। বাইরামজি নামক জনৈক সম্ভ্রান্ত পার্শী এই স্থানটি বায়ু সেবনের উপযোগী করিয়া দিয়াছেন। আমি চাঁদনি রাত্রে এই স্থানে বসিয়াছিলাম, ইহার চতুঃপার্শ্বস্থিত দৃশ্য এত সৌন্দর্য্য পূর্ণ, যে তাহার বর্ণনা করা মানব শক্তির অতীত বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সম্মুখে অদূরে জলধি-গর্ভ হইতে একটি Light house উঠিয়াছে, তাহার শিরোভাগে দপ্ দপ্ করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া উজ্জ্বল আলোক জ্বলিতেছে, দক্ষিণে শ্বেতাম্বু, বামে শ্বেতাম্বু, (শ্বেতাম্বু বলিতেছি তাহার কারণ জ্যোৎস্নায় সমুদ্রের জল শ্বেতবর্ণ হইয়া পড়ে), পশ্চাতে গিরিশৃঙ্গে প্রাচীন পর্টুগীজ দুর্গের ভগ্নাবশেষ, তাহার উপর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মহীরুহরাজী শূন্যে শাখা প্রশাখা ছড়াইয়া গম্ভীরভাবে দাঁড়াইয়া আছে. মস্তকের উপর অনন্ত আকাশ, পদতলে অকূল জলধির অশ্রান্ত উচ্ছ্বাস, আর জগৎ সেই উচ্ছ্বাস কল্লোলে পরিপূর্ণ। এখানে জ্যোৎস্না রাত্রে দাঁড়াইয়া মনে যাহা উদয় হয়, তাহা কবিতার সামগ্রী; গদ্যের অধিকার তাহাতে নাই। সে কবিতা মনুষ্যের হৃদয়েই থাকে; কবি কখন তাহা প্রকাশ করিতে পারেন কি না জানিনা।

এক দিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গে উঠিয়া দেখি, সম্মুখে দূরে সমুদ্রবক্ষে গগন-স্পর্শী এক পর্ব্বতমালার ন্যায় প্রাচীর শ্রেণী ভাসিতেছে, আমি বিস্মিত হইলাম, পূর্ব্ব দিন এ প্রাচীর ছিল না, রাতারাতি এ পর্ব্বতমালা কি করিয়া আসিল! শেষে লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম যে সে পর্ব্বতমালা নহে, মেঘ উঠিতেছে মাত্র। ক্রমশঃ মেঘ যত ঊর্দ্ধে উঠিতে লাগিল, তাহার কৃষ্ণবর্ণ,

পাত্‌লা হইতে লাগিল, এবং তাহার অধোদেশে আবার সেইরূপ এক পর্ব্বত প্রাচীর উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বায়ু প্রবল হইয়া উঠিল, নীলাম্বুহৃদয়ে ঘন ঘন উচ্ছ্বাস উঠিতে লাগিল, সেই উচ্ছ্বাসের মুর্ত্তি উচ্চতর ও ভীষণতর হুঙ্কার শব্দে মগ্ন হইয়া পড়িল; আমার এত কালের সমুদ্র দর্শন সাধ কতকটা মিটিয়া গেল।

অনেকের মনে হয়, আকাশের শোভা অপেক্ষা কি সমুদ্রের শোভা অধিক? কিন্তু আমি বলি, যে এ অনন্ত আকাশতলে সে অকূল সমুদ্র না থাকিলে, আকাশের এ অনন্ত শূন্যের শোভা নাই, এবং এ আকাশ ও সে নীলাম্বুর মধ্যে, ঝটিকা না উঠিলে আকাশের ও শোভা নাই, নীলাম্বুরও শোভা নাই, এবং বোধ হয় ঝটিকারও শোভা বড় থাকে না।

নিয়তি।

(১)

ভবিষ্যত-গর্ভে লুকাইত,
সুখ দুঃখ—হাসি অশ্রু জল।
নির্ভয় হৃদয়ে অগ্রসর
হইতেছি—তবু অবিরল।

(২)

সম্মুখেতে প্রচ্ছন্ন গম্ভীর,
নিয়তির দ্বার অন্ধকার;
উপরে নীরব তারাগণ,
নীরব সমাধি নিম্নে আর।

(৩)

স্থির নেত্রে দেখ যদি তুমি
আসি ছায়ারূপী ভ্রান্তি ভয়,
করিতেছে দৃঢ়তম মনে
সন্দেহ ও আশঙ্কা উদয়।

(৪)

কিন্তু শুনা যাইতেছে স্বর
জ্ঞানীদের কণ্ঠে অতীতের,—
"বেছে নেও! নিয়তি তোমার,
—ক্ষুদ্র, কিন্তু নাহি অন্ত এর।

(৫)

অনন্তের নীরব নয়ন
রহিয়াছে তোমার উপর
কর কর্ম্ম, পাবে পুরস্কার
হইও না নিরাশ অন্তর।

রূপসনাতন। (১)

রূপ ও সনাতন গোস্বামীর নাম অনেকেই জানেন এবং ইহাঁরা যে ভগবান চৈতন্য দেবের প্রিয় শিষ্য ও পরম ভক্ত ছিলেন, ইহাও অনেকেই জানেন, কিন্তু ইহাঁদিগের জাতি কুল সম্বন্ধে অনেকেরই ভ্রম আছে, অনেকেই রূপ-সনাতনকে যবন জাতীয় বলিয়া জানেন। চৈতন্য চরিতামৃত গ্রন্থই যে, উক্তরূপ ভ্রম জন্মাইবার কারণ, ইহা স্পষ্ট বোধ হয়। উক্ত পুস্তকের মধ্যখণ্ডে প্রথম পরিচ্ছেদে লিখিত আছে, চৈতন্যদেব সন্ন্যাস গ্রহণপূর্ব্বক বৃন্দাবন গমনোদ্দেশ্যে যখন গৌড় নগরের নিকটবর্ত্তী রামকেলী নামক স্থানে উপনীত হন, তখন রূপ সনাতন গৌড়াধিপতি যবন রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। ইহাঁরা পূর্ব্বেই চৈতন্য দেবের মহামহিমার বিষয় অবগত ছিলেন, এক্ষণে সেই চৈতন্য দেব গৌড়ের অতি নিকটে আগমন করিয়াছিলেন, জানিতে পারিয়া গভীর রাত্রে চৈতন্য দেবের সহিত সাক্ষাৎ

(১) সনাতন জ্যেষ্ঠ, রূপ কনিষ্ঠ; কিন্তু রূপ গোস্বামী, জ্যেষ্ঠ সনাতনের পূর্ব্বে গৃহাশ্রম ত্যাগ করিয়া চৈতন্যের আশ্রয় গ্রহণ করাতে ধর্ম্ম সম্বন্ধে রূপেরই জ্যেষ্ঠত্ব স্বীকৃত হইয়াছে, সনাতনই এই নিয়ম প্রবর্ত্তিত করেন, সুতরাং সনাতনের পূর্ব্বে রূপের নাম ব্যবহার করা শিষ্টাচার স্বরূপ হইয়াছে।

করিতে রামকেলী গ্রামে গমন করিয়া তাঁহার বশীভূত হইয়া পড়েন। এই সময়ে রূপ সনাতন আপনাদিগের অধঃপাতের দুঃখ কাহিনী চৈতন্য দেবকে যাহা বলেন, তাহাতেই ইহাঁরা যে, যবন জাতির সংসর্গে ম্লেচ্ছত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন, একথা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে। যথা—

দৈন্য রোদন করে হইয়া বিহ্বল।
প্রভু কহে উঠ উঠ হইল মঙ্গল॥
উঠে দুই ভাই তবে দন্তে তৃণ ধরি।
দৈন্য করি স্তুতি করে কর যোড় করি॥
জয় জয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য দয়াময়।
পতিতপাবন জয় জয় মহাশয়॥
নীচ জাতি, নীচ সঙ্গী, করি নীচ কাজ।
তোমার অগ্রেতে প্রভু কহিতে পায় লাজ॥
ম্লেচ্ছ জাতি, ম্লেচ্ছ সঙ্গী, করি ম্লেচ্ছ কর্ম্ম।
গো ব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম। ইত্যাদি।

চৈতন্য চরিতামৃতের উল্লিখিত লিপি দৃষ্টে অনেকেরই বিশ্বাস হইতে পারে যে, রূপ সনাতন প্রকৃতই ম্লেচ্ছ জাতীয় ছিলেন, বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাঁরা দৈন্য করিয়া যে আপনাদিগকে ম্লেচ্ছ জাতীয় বলিয়াছেন তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। আরও বলিয়াছেন যে, "গো ব্রাহ্মণ দ্রোহী সঙ্গে আমার সঙ্গম।" ইহাতে কি স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে না যে, ইহাঁরা নিজে গো ব্রাহ্মণ দ্রোহী ছিলেন না! বাস্তবিক ম্লেচ্ছ-কুল-জাত হইলে কেনই বা গো হত্যা করিবেন না? যবন রাজের কৃত-কার্য্যে অনুমোদন করিয়াছিলেন, বলিয়া ইহারা দৈন্য ও অনু-তাপ সহকারে আপনাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন, বাস্তবিক ইহাঁরা যে ম্লেচ্ছ জাতীয় নহেন তাহার সুদৃঢ় প্রমাণ আছে। রূপ সনাতনের ভ্রাতুষ্পুত্র বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রবর্ত্তক সুবিখ্যাত "জীব গোস্বামী" নিজ কৃত লঘুবোধিনী নামক দশম টীপ্পনীর শেষ ভাগে নিজ বংশের যে পরিচয় লিখিয়াছেন তাহাতেই স্পষ্ট জানা যায় যে, রূপ সনাতন, ভরদ্বাজ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ এবং কর্ণাট রাজবংশজাত ছিলেন। আমরা এস্থলে জীব

গোস্বামীর লিখিত নিজ বংশাবলীর অবিকল অনুবাদ প্রকাশ করিতেছি আশা করি এতদ্দ্বারা অনেকেরই পূর্ব্ব সংস্কারের অন্যথা হইবে। যথা ;--

"শ্রীসর্ব্বজ্ঞ নামে কোন যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণ, দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশে রাজত্ব করিতেন, কেবল রাজা নহেন, ধার্ম্মিকতা ও জ্ঞানবত্তা নিমিত্ত দেশের বিস্তর লোক ইঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। অনিরুদ্ধ নামে ইঁহার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন ; অনেক রাজাকে বশীভূত করিয়া ইনি সর্ব্বত্র বিখ্যাত হইয়াছিলেন। এই অনিরুদ্ধ দেবের রূপেশ্বর ও হরিহর নামে দুইটী পুত্র সমুৎপন্ন হয়েন। অনিরুদ্ধ দেব তীর্থ যাত্রাকালে নিজরাজ্য দুই অংশে বিভক্ত করিয়া দুই পুত্রকে প্রদান করিয়া যান। কিয়ৎকাল পরে কনিষ্ঠ হরিহর দেব, জ্যেষ্ঠ রূপেশ্বরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া স্বয়ং সমস্ত কর্ণাট রাজ্যের অধিপতি হয়েন। রূপেশ্বর দেব, কনিষ্ঠ কর্ত্তৃক রাজ্যচ্যুত হইয়া পত্নীর সহিত আটটি মাত্র অশ্ব লইয়া পৌলস্ত দেশে প্রিয় মিত্র শেখরেশ্বর রাজার রাজ্যে গমন করিয়া তথায় অবস্থিতি করেন। এই স্থানে ইঁহার একপুত্র জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার নাম পদ্মনাভ। এই পদ্মনাভ বেদ বেদাঙ্গ ও সমুদয় উপনিষৎশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া অতি বিখ্যাত হইয়াছিলেন। জগন্নাথ দেবের প্রতি ইঁহার অবিচলিত ভক্তি ছিল, কিয়ৎ কাল পরে ঐ মহাত্মা, গঙ্গাবাস করিবার নিমিত্ত শেখরেশ্বরের রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া গঙ্গাতীরস্থ নবহট্ট নামক স্থানে বাস করেন। ক্রমে ইঁহার আঠারটি কন্যা ও পাঁচটি পুত্র জাত হয়। প্রথম পুরুষোত্তম, দ্বিতীয় জগন্নাথ, তৃতীয় নারায়ণ, চতুর্থ মুরারি, এবং পঞ্চম মুকুন্দ। এই মুকুন্দের পুত্র কুমার দেব, কোন অশান্তি প্রযুক্ত পূর্ব্ব নিবাস পরিত্যাগ করিয়া গৌড়দেশবাসী হয়েন। এই কুমার দেবের পরম-ভাগবত তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহাদিগের জন্ম নিমিত্ত পিতৃকুল, ইহ লোক ও পরলোকে পবিত্রীকৃত হইয়াছে। সেই তিন পুত্রের জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম শ্রীরূপ এবং কনিষ্ঠ বল্লভ নামে অভিহিত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সনাতনও রূপ ভগবান চৈতন্য দেবের কৃপা পাত্র হইয়া ঐশ্বর্য্য ও রাজপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরা তীর্থে গমন এবং তত্রত্য লুপ্ত তীর্থ সকল ব্যক্ত করেন। আমার পিতা বল্লভ দেব গঙ্গাতীরে থাকিয়া কিছুকাল ভগবান রামচন্দ্রের

ভাগবত তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহাদিগের নিমিত্ত পিতৃকুল, ইহলোক ও পরলোক পবিত্রীকৃত হইয়াছে। সেই তিন পুত্রের জ্যেষ্ঠ সনাতন, মধ্যম শ্রীরূপ এবং কনিষ্ঠ বল্লভ নামে অভিহিত ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে সনাতন ও রূপ, ভগবান চৈতন্য দেবের কৃপা পাত্র হইয়া ঐশ্বর্য্য ও রাজপদ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মথুরা তীর্থে গমন এবং তত্রত্য লুপ্ত তীর্থ সকল ব্যক্ত করেন। আমার পিতা বল্লভদেব, গঙ্গাতীরে থাকিয়া কিছুকাল ভগবান রামচন্দ্রের ভজন করেন, পরিশেষে বৃন্দাবনে যাইয়া জ্যেষ্ঠদ্বয়ের সহিত মিলিত হয়েন। বৃন্দাবন বাসকালে জ্যেষ্ঠভ্রাত সনাতন ও শ্রীরূপ, অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন, তন্মধ্যে রূপকৃত হংসদূত, উদ্ধব-সন্দেশ, ছন্দোঽষ্টাদশ, উৎকলিকাবল্লী, গোবিন্দ-বিরুদাবলী, প্রেমেন্দু-সাগর, বিদগ্ধমাধব, ললিত-মাধব, দান কেলী কৌমুদী, রসামৃত সিন্ধু, উজ্জ্বল-নীলমণি, মথুরা মহিমা, পদ্যাবলী, নাটক চন্দ্রিকা, ও সংক্ষিপ্ত ভাগবতামৃত গ্রন্থ—অতি বিখ্যাত। পরন্তু সনাতন কর্তৃক বৃহৎ ভাগবতামৃত, হরিভক্তিবিলাস (২), তট্টীকা দিগ্দর্শনী, লীলাস্তব টিপ্পনী, বৃহৎ বৈষ্ণব তোষিণী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রস্তুত হইয়াছে।" ইত্যাদি।

জীবের বংশাবলী, ও চৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি পুস্তকানুসারে জানা যায়, যৎকালে রূপ সনাতন, গৌড় রাজের রাজকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে ইঁহাদিগের কনিষ্ঠ বল্লভদেব, (যিনি মহাত্মা জীব গোস্বামীর পিতা) কোন প্রকার রাজ কার্য্যে লিপ্ত ছিলেন। ইনি যে রামমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন, তাহা অনেক গ্রন্থে প্রকাশ আছে। ইনি বাটীতে থাকিয়া শাস্ত্রানুসারে ক্রিয়া কলাপ ও ভজন সাধন করিতেন। ইঁহার ধর্ম্ম-বিশ্বাসের দৃঢ়তা পক্ষে চরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থে লিখিত আছে যে, ভগবান চৈতন্যদেব, ইঁহাকে রামমন্ত্র ত্যাগ করিয়া কৃষ্ণমন্ত্র গ্রহণ করিতে বলিলে, ইনি বহু চিন্তা করিয়া চৈতন্য দেবকে বলিয়াছিলেন যে "আমি রামচন্দ্রের পাদপদ্মে মস্তক বিক্রয় করিয়াছি অর্থাৎ আত্ম সমর্পণ করিয়াছি, সে মস্তক প্রত্যাহরণ করিতে প্রাণে বড় ব্যথা পাই।" চৈতন্যদেব এই কথা শুনিয়া বল্লভের একান্ত নিষ্ঠার পরিচয় পাইয়া তাঁহার

(২) হরিভক্তিবিলাস পুস্তক সনাতন গোস্বামী প্রণীত বলিয়া লিখিত হইয়াছে, কিন্তু আমরা যে হরিভক্তিবিলাস গ্রন্থ দেখিতে পাই, তাহা গোপাল ভট্ট গোস্বামী প্রণীত বোধ হয়; এই গ্রন্থও বৃহৎ ও লঘু ভেদে দুই প্রকার আছে।

ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক এস্থলে বিবেচনা করা উচিত যে, রূপ সনাতনের কনিষ্ঠ বল্লভদেব, রামমন্ত্রে দীক্ষিত থাকাতেই কি স্পষ্ট জানা যাইতেছে না যে, জ্যেষ্ঠ রূপ-সনাতন হিন্দু ছিলেন? তিন ভ্রাতার এক-জন হিন্দু এবং অপর দুইজন ম্লেচ্ছজাতীয় হইতে পারেন না। তবে ম্লেচ্ছ রাজার কার্য্য-সচিব থাকা হেতু নানা কারণে তাঁহাদিগের আংশিক ম্লেচ্ছতা আমরাও স্বীকার করিতেছি। পরম পণ্ডিত রূপ-সনাতনও এই কারণ বশ-তই আপনাদিগকে অপবিত্র মনে করিতেন এবং নিবারিত না হইলেও ইঁহারা জগন্নাথ দেবের মন্দিরের নিকটে যাইতেন না, দূরে থাকিতেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্র প্রকাশক ছয় গোস্বামীর মধ্যে রূপ সনাতন প্রধান। গোপাল ভট্ট ও রঘুনাথ ভট্ট দাক্ষিণাত্য ব্রাহ্মণ, জীব গোস্বামী, রূপ-সনাতনের ভ্রাতৃ-ষ্পুত্র, রঘুনাথ দাস বঙ্গীয় কায়স্থ, ইনি দাস গোস্বামী নামে বিখ্যাত। ইঁহার বৈরাগ্য অসাধারণ। ইনি নয় লক্ষ টাকার ভূসম্পত্তি পরিত্যাগ করিয়া চৈতন্য দেবের আশ্রিত হইয়াছিলেন।

শ্রুত হওয়া যায়, শ্রীরূপ গোস্বামী এক লক্ষ গ্রন্থের প্রণেতা। আমরা বহু বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছি, এই এক লক্ষ গ্রন্থের অর্থ লক্ষ সংখ্যক পুস্তক নহে, লক্ষ সংখ্যক শ্লোক মাত্র। শ্লোকের নামও গ্রন্থ, ইহার প্রমাণ গোস্বামী শাস্ত্রেই প্রাপ্ত হওয়া যায়। অন্যত্র ইহার প্রমাণ নাই এরূপ নহে। ভাস্করা-চার্য্য প্রভৃতির গ্রন্থেও এই রীতির প্রচলন দৃষ্ট হয়। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, রূপ গোস্বামী যে সকল পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন, তাহার শ্লোক সংখ্যা এক লক্ষ। বাস্তবিক লক্ষ শ্লোক রচনা করাও সামান্য শক্তির কার্য্য নহে। গোস্বামি শাস্ত্র-সাগরে ব্যাকরণ, সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, ও দর্শনরূপ সমুদায় রত্নই আছে। এই সকল গ্রন্থের কোন একখানি পাঠ করিয়া দেখিলেই মোহিত হইতে হয়। গোস্বামি গ্রন্থের এরূপ একখানিও নাই যাহাতে হরি-নাম কীর্ত্তিত হয় নাই। বলা বাহুল্য যে এই সকল গ্রন্থ ঐহিক পারত্রিক উভ-য়ত্র মঙ্গলপ্রদ। নিতান্ত দুঃখের বিষয় যে, অধিকাংশ পুস্তক মুদ্রাঙ্কণাভাবে বিলুপ্ত প্রায় হইয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজে গোস্বামি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অধ্যাপনা নাই। বৈষ্ণব সমাজে সংস্কৃতজ্ঞ ব্যক্তির সংখ্যা অতি অল্প; সুতরাং এসমাজে গোস্বামি-শাস্ত্রের অধ্যয়ন অতি অল্পই হইয়া থাকে। এই

কারণ বশত অতি উপাদেয় গোস্বামি শাস্ত্র ভস্মাচ্ছাদিত অগ্নি অথবা অপরিজ্ঞাত খনিজ রত্নরাজির ন্যায় হইয়া রহিয়াছে। কেহ কেহ বলেন, গোস্বামিগ্রন্থ আদিরসপূর্ণ। আমরা বলি, সকল গ্রন্থ সেরূপ নহে। রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, সনাতনের ভাগবতামৃত ও বৃহত্তোষিণী, গোপাল ভট্টের হরিভক্তিবিলাস ও জীব গোস্বামীর ষট্‌সন্দর্ভ প্রভৃতি গ্রন্থ,অসাধারণ পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এসকল গ্রন্থ পাঠ করিলে সকলেই জ্ঞান ও ভক্তি তত্ত্বের সমধিক অভিজ্ঞ হইতে পারেন, সন্দেহ নাই। উপসংহারে বক্তব্য এই যে যাহারা আদিরসের ভয়ানক বিরুদ্ধবাদী, তাঁহারা কি কালিদাসের মেঘদূত, মাঘের শিশুপালবধ এবং অন্যান্য কাব্য গ্রন্থ পাঠ করেন না? "কাব্যং রসাত্মকং বাক্যং" আদিরস কি রসরাজ নয়?

শ্রীগোবিন্দমোহন রায়।

দেবগিরি।

অপরাহ্ণে আমরা নান্দগাঁও ষ্টেশনে পৌঁছিয়া মেল কণ্ট্রাক্টরের কার্যালয়ে অবস্থিতি করিলাম। তিনি পারসী। আমরা জলযোগের উদ্যোগ করিলে অংশুমৎফল উপহার পাইলাম। ঔরঙ্গাবাদ এখান হইতে ২৮ ক্রোশ। একখানি ডাকের টাঙ্গায় যাতায়াতের ভাড়া ৫০৲ টাকা। আমরা রাত্রি ৮টার সময় "টপালে" উঠিলাম। শকটচালক স্থানে স্থানে অশ্ব পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল ও বিউগল ধ্বনিত করিয়া "ভূমনি" পরিচালকের ত্রাস উৎপাদন করত অর্দ্ধনিদ্রিত অবস্থায় আমাদিগকে গন্তব্য স্থানে লইয়া চলিল। পর্ব্বতসন্নিহিত স্থানে শীতের জন্য কষ্ট বোধ হইতে লাগিল। মুখাবরণ মুক্ত করিয়া চক্ষুরুন্মীলন করত দুই এক বার দেখিলাম, ধরা জ্যোৎস্নাময়ী, 'ছুটিছে চন্দ্র ঘনদলে দলি'। ৫ ক্রোশ পরে কাসরি গ্রাম অতিক্রম করিয়া নিজাম রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে। উভয় রাজ্যের সীমা গোলাকার প্রস্তরের স্তূপ দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছে। বেলা ৯ টার সময় ঔরঙ্গাবাদের পরপারে গণ্ডানালা তীরে উপস্থিত হইলাম ও তথায় বৃটিশ সেনানিবাসে বালাজীর মন্দিরে অবস্থান হইল। ইংরাজ মিত্ররাজ্য রক্ষার জন্য একটু স্থান অধিকার করিয়া, তবে

আপন অনুচর স্থাপন করেন। সে স্থান দেশীয় রাজার হইলেও শাসন ভার ইংরাজের হস্তে থাকে। বিবি মকবরা অর্থাৎ সম্রাট ঔরঙ্গজেবের তনয়া রবিয়া দুরাণীর গোরস্থান ও পনচক্কি দর্শন করিয়া, ঔরঙ্গাবাদে তালুকদার দোয়েম মহাশয়ের নিকট দৌলতাবাদের দুর্গ প্রবেশার্থ অনুমতি পত্র গ্রহণ করিলাম। রজনীর শেষযামে প্রত্যাবর্ত্তনের পথ অনুসরণ করিয়া যাত্রা করা হইল।

কিছু বেলা হইতে প্রাচীর বেষ্টিত দৌলতাবাদের বিধ্বস্ত পুরীমধ্যে প্রবেশ করা গেল। এই না সেই স্থান, যে খানে মহম্মদ তোগলক শা (যিনি রৌপ্য মূল্যে তাম্রমুদ্রা চলিত করেন) দিল্লির অধিবাসীদিগকে বলপূর্ব্বক উদ্‌বাস্ত করিয়া আনয়ন করত রাজধানী স্থাপন করিয়া দেবগড়ের দৌলতাবাদ নামকরণ করিয়াছিলেন? ঔরঙ্গাবাদ প্রদেশে আগমন করিয়া আমি এই অদ্ভুত দেখিতেছি, যেন মরাঠী ভূমিতে হিন্দুস্থানী জনপদ তুলিয়া আনা হইয়াছে। সর্ব্বত্র টুপি ও পায়জামা পরিহিত মুসলমান নয়ন গোচর হওয়ায়, বিশেষত তাহারা হিন্দি ভাষা ব্যবহার করায়, ঐ ভাব মনে উঠিয়াছে। পূর্ব্ব দিন ঔরঙ্গাবাদ যাইবার সময় ও অদ্য বহুদূর হইতে প্রাসাদশোভিত কর্ত্তিতবপু বৃত্তাকার উত্তুঙ্গ দেবগিরি দর্শন করিয়া, কৌতূহলী হইয়া রহিয়াছি, এক্ষণে তাহার সমীপে উপস্থিত হইতে পারিয়াছি। দুর্গের প্রথম ভিত্তির মধ্যে প্রবেশ করিয়া শুনিলাম, ঔরঙ্গাবাদের তালুকদার পরিদর্শনে আসিয়াছেন। অদ্য তিনি এখানে মোকাম করিয়া, দুর্গরক্ষী সেনাগণের শিক্ষা চালনা দেখিবেন। নিজাম-উল-মুলকের সৈন্যদিগের পরিচ্ছদ ও অস্ত্র ইংরাজদিগের সিপাহির ন্যায়। প্রবেশ পথে কয়েকটি ক্ষুদ্র তোপ দেখিলাম। তালুকদার এক জন পারসী। আমরা কোথা হইতে আসিয়াছি, জিজ্ঞাসা করিলেন। দারোগা দুর্গ দেখাইবার জন্য এক জন অনুচর ও মশালচি সঙ্গে দিলেন। কিয়ৎদূর যাইয়া একটী জয়স্তম্ভ অর্থাৎ মিনার নয়ন গোচর হইল। প্রথম মুসলমান অধিকার কালে ঐ চিহ্ন স্থাপিত হয়। তাহার পর আর একটি প্রাকার। দ্বার রুদ্ধ, কাটা কপাটমধ্য দিয়া প্রবেশ করিতে হয়। দ্বার রক্ষক সান্ত্রী কহিল,—"তোমাদের নিকট যদি বিলাত দিয়াসলাই বা কোন প্রকার শস্ত্র থাকে, বাহিরে রাখিয়া যাও।"

পথ ক্রমশ উচ্চ হওয়াতে এখন সোপান দ্বারা অবতরণ করিতে হইল। তৎপরে পরিখা। খাতের উপর সেতু আছে। প্রকৃত দেবগড় এখন আরম্ভ হইল। পর্ব্বতখানি একখণ্ড প্রস্তরে নির্ম্মিত। পিণ্ডাকার শিবের মত। অগ্রভাগ সঙ্কীর্ণ। মূল হইতে ১২০ ফিট উর্দ্ধে চতুর্দ্দিকে প্রস্তর কর্ত্তিত করিয়া সম্পূর্ণ সরল করা হইয়াছে। সেতু রক্ষার জন্য পরপারে অস্ত্র প্রক্ষেপার্থ ছিদ্র সমন্বিত গৃহ অতিক্রমণ করিয়া কয়েকটি সোপানযোগে উপরে উঠা গেল। তাহার পর গিরির অন্তরে প্রবেশ করিয়া উপরে যাইতে হইবে। দ্বারদেশে শিলায় খোদিত কার্য্য দেখিলেই, হিন্দু শিল্প বলিয়া চিনিতে পারা যায়। মশালের আলোক সাহায্যে সুড়ঙ্গ পথে দুই একটি গৃহ পার হইয়া উপরে উঠা হইল। এই পথ ও গৃহ শৈলতলে পাষাণ খুদিয়া প্রস্তুত। এতদ্ভিন্ন কেল্লায় উঠিবার দ্বিতীয় পথ নাই। রিপু যদি এ পর্য্যন্ত তমসাচ্ছন্ন পথে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয়, তাহার প্রতিবিধানের জন্য সুড়ঙ্গ মুখে উপর হইতে লৌহ খর্পর রক্ষা করিয়া অগ্নি স্থাপনের ব্যবস্থা ছিল। উপরে সোপানের সংখ্যা এত অধিক যে মধ্যে আমাকে বিশ্রাম করিতে হইল। দুর্গ নাম অন্বর্থ হইয়াছে বটে। ক্রমশ বারদ্বারিতে পৌঁছিলাম। ইহার মধ্য স্থলে প্রাঙ্গণ, চতুর্দ্দিকে আলয়। দুর্গ মধ্যে এইটি কেবল আশ্রয় স্থান। অন্য সমতল ভূমি বিরল। এখানে জীবন ধারণ জন্য একটি উৎস আছে। আরও কিছু উঠিয়া গিরিরাজের শিখরদেশে সমুপস্থিত হইলাম। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তিনটি প্রাচীন শতঘ্নী পূর্ব্ব মহিমা প্রকাশ করিতেছে। একটির নাম কালাপাহাড়। দ্বিতীয়টির নাম মেড়া। তোপের যে দিকে ঔর্ব্বাস্ত্র প্রয়োগ করিতে হয়, তাহার বিপরীত ভাগে মেষের মুখ নির্ম্মিত আছে বলিয়া ঐ নাম প্রদত্ত হইয়াছে। তৃতীয় শতঘ্নীটি সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ স্থানে নিজামের ধ্বজতলে রক্ষিত। নাম, বালাহিশার, কিন্তু মহারাষ্ট্রী মুণ্ডা অক্ষরে শ্রীদুর্গা অভিহিত হইয়াছে। পারস্য লিপি তিন তোপেই আছে। শ্রীদুর্গা বা বালাহিশার হিন্দু ও যবন উভয় রাজ্য দেখিয়াছে। কত লোক ইহাকে আপন বলিয়াছে, ইনি বসিয়া রহস্য দেখিতেছেন। এত বড় তোপ এরূপ দুর্গম স্থানে আনয়ন অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। অনুমান হয়, পর্ব্বতের উপরেই ঢালাই হইয়া থাকিবে। আমি বন্ধু-দুর্গ হইতে বহির্গত হইতে পারিয়া,

যে গিবিদুর্গেব এ সকল ব্যাপাব প্রত্যক্ষ কবিতে সমর্থ হইয়াছি, ইহা সৌভাগ্যেব কথা। আমি এইটি লইযা তিনটি পার্ব্বত্য দুর্গ উপবে উঠিযা দেখিলাম,—তাবাগড, সিংহগড ও দেবগড। বলা বাহুল্য যে, দেবগড সর্ব্ব প্রধান। দেবগিবিব ন্যায় স্থান পবাজয় কবিবাব, পূর্ব্বকালেব একমাত্র উপায়, দুর্গ অববোধ কবিযা ভক্ষ্য দ্রব্যেব আগমন বহিত কবা; তাহা হইলে অধিবাসীগণকে আত্ম সমর্পণ কবিতে হইত। নতুবা তখন আক্রমণ কবিযা কেহ দুর্গ জয কবিতে পাবিতেন না। পূর্ব্বে যখন কেবল ধনুর্ব্বাণ ও তববাবি সাহায্যে যুদ্ধ হইত, তখন দুর্গ নিতান্ত প্রযোজনীয ছিল। অধুনা মাউনটেন ব্যাটাবি সৃষ্ট হইযা দুর্গ অকিঞ্চিৎকব হইযাছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীব শেষভাগে আলাউদ্দিন খিলজি অষ্ট সহস্র সামন্ত সহ উপনীত হইলে, বাজা বামদেব বাও যদু নগবী বক্ষণে অপাবগ হইযা এই দেবগিবিতে আশ্রয লইযা ছিলেন। নবপুঙ্গব হবপাল দেব প্রভৃতি যবন হস্ত হইতে এই দুর্গ উদ্ধাব মানসে অববোধ কবিযাছিলেন। দিল্লীশ্বব জীবিত অবস্থায হবপালের সম্পূর্ণ চর্ম্মোত্তোলন কবিযা বধ কবেন। তাহাব পব ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে, শাহজি বিজযপুবেব সুলতান মহম্মদ আদিল সার পক্ষ হইয়া এই দুর্গ আক্রমণ কবেন।

*বোজা একটি বিনষ্ট নগব। ঔবঙ্গজেব পাদসাহেব এই স্থানে সমাধি আছে। বোজায তাঁহাব গুরুব কযেকটি প্রস্তবময় শৃঙ্খল দেখিলাম। আশ্চর্য্যেব বিষয়, উহা অখণ্ড প্রস্তরে কাটিয়া প্রস্তুত কবা হইযাছে। যে পর্ব্বতে ইলোবাব গুহা খোদিত হইযাছে, তাহাব মস্তকমার্গে অবতবণ কবিয়া বিরুল গ্রামে স্নান আহাবেব জন্য যাওযা হইল। গ্রামেব বাহিবেই স্থান প্রাপ্ত হইলাম। বিটপীযুক্ত বাপীতটে অহল্যা বাই নির্ম্মিত খণ্ডবাদেবেব মন্দিবে আশ্রয় লইযা ভৃত্যকে গ্রাম মধ্যে ভক্ষ্য আহবণে পাঠাইলাম। অগ্নিহোত্র নিবত গজানন শাস্ত্রী আসিযা ঘুস্মেশ্বব দর্শন ও সেখানে রুদ্রী পাঠ কবাইবার জন্য প্রবৃত্তি লওয়াইতে লাগিলেন। তিনি কহিলেন, নিজামেব শাসন প্রণালী উদাব। হিন্দুব দেব সেবাব জন্য বৃত্তি দিযা থাকেন। এই গ্রামে ১৫৯৪ খৃষ্টীয শকে সাহজী জন্ম গ্রহণ কবেন। মন্দিবে বসিয়া শুনিলাম, একজন গুরু জলাশয়ের বিভিন্ন প্রদেশে পৃথক তীর্থেব

নাম করিয়া যাত্রীদিগকে স্নান করাইতেছেন। ধন্য বিশ্বাস! সুপান্নদ্বারা উদরের পূজা করিয়া উঠিতে বেলা প্রায় দুইটা হইল। এক্ষণে চির প্রার্থিত ইলোরার গুহা দর্শন করিতে চলিলাম।

প্রকৃত দেবগিরি অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি। পূর্ব্ব পশ্চিমে ব্যাযত, কিন্তু উচ্চ নহে। মধ্যভাগ অপেক্ষা ভুজদ্বয় অধিক উচ্চ। ইহার অধিকাংশ ক্রমশ অবনত। বিস্তার অর্দ্ধ ক্রোশ। ভারতের আশ্চর্য্য স্থানের মধ্যে এ শৈল অবশ্য গণনীয়। এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ৩৪টি বাটি পর্ব্বতের অঙ্গ খোদিত করিয়া প্রস্তুত করা হইয়াছে। ইহার কোনও অংশ গ্রথিত নহে। প্রাচীর, স্তম্ভ, ছাদ ও মেজিয়া সকলই একখণ্ড প্রস্তরে প্রস্তুত। প্রিন্স অব ওয়েলসের দেখিবার কথা ছিল বলিয়া, তদবধি সার সালারজঙ্গ এই স্থান পরিষ্কার করিয়া রক্ষক নিযুক্ত করিয়া রাখিয়াছেন। ৩৪টি দেবায়তনের মধ্যে ১২টি বৌদ্ধ ১৭ শৈব ও ৫টি জৈন। বর্জেস্ সাহেব দর্শকবর্গের সুবিধার জন্য যে পুস্তিকা প্রচার করিয়াছেন, তাহাতে ঐ সকল গুহা কাহা কর্তৃক কোন সময়ে নির্ম্মিত তাহার কোন উল্লেখ করেন নাই। এ বিষয়ে কেবল ইলু নামক রাজার উপাখ্যানই ইতিহাস। নির্ম্মাতারা অবশ্য ভাবিয়াছিলেন, আমাদের কীর্ত্তি চিরস্থায়ী হইয়া চিরদিন সংসারে খ্যাতি রাখিবে। খ্যাতি অবশ্য আছেই, কিন্তু কাহার, একথা বলিবার উপায় নাই। এক স্থানে ধর্ম্মের স্তর অনুসারে কেমন পূর্ব্বাপর ভাবে বৌদ্ধ, শৈব ও জৈন ভজনালয়গুলি রচিত হইয়া উঠিয়াছে। এক মতের পর কালসহকারে অন্য মত উদ্ভব হইল, ইলোরার গিরি তাহার নিদর্শন রাখিতে লাগিলেন। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে একস্থানে কার্য্য কিছু বিচিত্র। শাক্যমুনি ৬২৩ পূর্ব্ব খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিয়া, ৮০ বৎসর বয়সে অর্থাৎ ৫৪৩ পূঃ খৃঃ অব্দে নির্ব্বাণ লাভ করেন। খৃঃ সপ্তম শতাব্দীতে তাঁহার ধর্ম্ম অবনত হইতে আরম্ভ হয়। অষ্টম শতাব্দীতে ক্রমে তিরোহিত হইতে আরম্ভ হইয়া নবমে ভারতবর্ষ হইতে লুপ্ত হইল। তবে বারাণসী প্রভৃতি স্থানে একাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম্ম দেখা দিয়াছে। চট্টগ্রামে বাঙ্গালী বৌদ্ধ আছে। তাহাদের ধর্ম্মভাষা তুরানীয়া বা মগ। নেপালে ১৪০০ ঘর বৌদ্ধের বাস। তাহারা আর্য্যবংশীয়। বৌদ্ধভাব রক্ষা ও মূল-ভাষায় ধর্ম্মশাস্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু নেপালিরা তুরানীয় জাতি।

বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে কখনও সর্ব্বব্যাপী হয় নাই। যে সময় ঐ ধর্ম্ম উন্নত হইতেছিল, তখন শৈব সম্প্রদায় বর্দ্ধিত হইতেছিলেন।

মায়াদেবিসুতের এক জরাগ্রস্ত ব্যক্তিকে দেখিয়া সংসারের প্রতি বীতরাগ হয়। সেই ভাবটি তাঁহার হৃদয়ে আঘাত করিয়া, এমন স্থায়ী হইল, যে উহার প্রভাবে তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন এবং চির জীবন তাহা দ্বারা পরিচালিত হইলেন। উপদেশ প্রচার করিলেন; সংসারের সকল বস্তুই ক্ষণভঙ্গুর, অতএব তোমরা নির্ব্বাণ কামনায় যত্নশীল হও। অতি ভয়ানক উপদেশ। ইহাতে উন্নতি চেষ্টা একেবারে নিবৃত্তি পায়। মায়াবাদের মূল ঐ উপদেশের উপর জন্ম লাভ করিয়াছে। বৈরাগ্য, মুক্তি প্রভৃতি অজ্ঞাত পূর্ব্ব-বিষয় যাহা হিন্দুযতির সেবনীয়, তাহা বুদ্ধ কর্তৃকই শিক্ষিত। সিদ্ধার্থ বুদ্ধ হইয়া কহিয়াছেন, বীজ যে অঙ্কুরকে জন্মায় তাহাতে বীজের এমন জ্ঞান হয় না, যে, অঙ্কুরকে জন্মাইতেছি। অঙ্কুরের এমন জ্ঞান হয় না যে, আমি বীজ হইতে জন্মলাভ করিয়াছি। অতএব বীজাদিতে চৈতন্য ও চেতনান্তরের অধিষ্ঠান না থাকিলেও তাহাদের মধ্যে কার্য্য কারণ ভাবের ব্যাঘাত নাই। যেমন বাহ্য কার্য্যের জ্ঞান পূর্ব্বক উৎপত্তি নাই, তেমনি আধ্যাত্মিক কার্য্যেরও নাই। অর্থাৎ বলা হইল যে, জগতের কোনও চৈতন্যবান স্বতন্ত্র কর্ত্তা নাই। পূর্ব্বজন্ম ও পরজন্মে অতিদৃঢ় বিশ্বাস থাকায় জীব নিজ কর্ম্মদ্বারা সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে বুঝিয়া বুদ্ধ, তাহার মূল যে জন্ম, যাহাতে তাহা আর না হয়, তজ্জন্য নির্ব্বাণ কামনা করা একান্ত কর্ত্তব্য জ্ঞান করিলেন। নিঃশ্রেয়স্ লাভের জন্য ধ্যান যোগ আবশ্যক বিবেচিত হওয়ায়, নিভৃত স্থানে গিরিকন্দরে বৌদ্ধ ধনিকেরা যতিদিগের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করিতে লাগিলেন। তাহাতেই আমরা উপস্থিত স্থানের অতি চমৎকার নৈপুণ্য দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছি। যদি ঐ সকল ও অন্যবিধ সংস্কার না থাকিত, তাহা হইলে দিলয়াড়া ও দেবগিরির মন্দির কোথায় পাইতাম!

আমাদের সহিত একজন প্রদর্শক সঙ্গ লইলেন। স্থানীয় লোকে প্রধান দেবালয় গুলির বিবিধ নাম রাখিয়াছে। আমরা ধেড়ওয়াড়া পরিত্যাগ করিয়া মহারয়াড়া, বিশ্বকর্ম্মা বা সুতার কা ঝোপড়া এবং দোথাল প্রভৃতি দর্শন করিয়া তিন থাল নামক বৌদ্ধ মঠে প্রবেশ করিলাম। এই গুহা তিন

তলা। প্রথম তলার নাম পাতাল। দ্বিতীয় তলার নাম মর্ত্ত্য লোক এবং তৃতীয় তলার নাম স্বর্গ। এই জন্য নাম হইয়াছে তিন থাল অর্থাৎ তিন লোক। ইহার গর্ভগৃহে বুদ্ধদেবের দিগম্বর মূর্ত্তি ধ্যান মুদ্রা ধারণ করিয়া যোগাসনে উপবিষ্ট। প্রাচীরের সর্ব্বত্র পদ্মাসনোপবিষ্ট স্ত্রী মূর্ত্তি, তাহাদের মস্তকে বুদ্ধ দেবের অবয়ব খোদিত রহিয়াছে। বিরুল গ্রামের ব্রাহ্মণেরা বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিকে রামচন্দ্র বলিয়া সিন্দূর দ্বারা তাঁহার হস্ত পদ ও গলদেশ রঞ্জিত করিয়া দিয়াছেন। প্রবেশ-দ্বারে দুই প্রকাণ্ড দ্বারপাল স্থাপিত আছে। মর্ত্ত্যলোক স্বর্গের তুল্য। গর্ভ স্থানে বুদ্ধমূর্ত্তি। প্রাচীরে স্ত্রী পুরুষ দ্বারা উপাসিত হস্ত্যাদি বাহন বিশিষ্ট বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি। প্রধান প্রতিমা স্বর্গলোকে স্থাপিত মূর্ত্তির তুল্য, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে লক্ষ্মীদেবী কহেন; পাতাল লোকে নিবিষ্ট তদ্রূপ বিগ্রহকে নাগরাজ কহে। মন্দিরে যাইয়া ছত্র বন্ধ করিলে অদ্ভুত শব্দ হয়। তৎপরে রাবণকা কর ও দশঅবতার দেখিয়া কৈলাশ রঙ্গ মহলে পৌঁছিলাম। দেবগিরিস্থ দেবালয় সকলের মধ্যে এইটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। উড়িষ্যার খণ্ডগিরি, বোম্বাইয়ের ঘারাপুরি বা নাসিকের পাণ্ডুলেনা, আমি যে কয়টি পর্ব্বতখোদিত বিমান দেখিয়াছি, এখানকার মত এমন বিস্ময়জনক স্থাপত্য দ্বিতীয় দর্শন করি নাই। কৈলাস, শৈলতলে খোদিত হইয়া মস্তকের পাষাণ ভাগ হইতে নিষ্কাশিত হইয়াছে। যেন শূন্য স্থানে, আনীত প্রস্তর দ্বারা গ্রথিত মন্দির। একটি বৃহৎ চতুঃশাল ভবন মধ্যস্থলে, প্রাঙ্গন মধ্যে শিখর চূড়া-সম্বলিত অত্যুচ্চ মন্দির দিবাকর প্রভায় বিরাজ করিতেছে। উঠান ৩৬৭ হস্ত দীর্ঘ। ইহার সম্মুখে এক অপূর্ব্ব তোরণ, বাদ্যশালা ও মন্দির গৃহ আছে। উঠানের অপর তিন দিকে অতি সুরম্য স্তম্ভ দ্বারা নির্ম্মিত অলিন্দ। উহার প্রাচীরে অর্দ্ধস্তম্ভ আকারে বহু ছড় থাকাতে তাহা অসংখ্য চতুষ্কোণাকার স্থানে বিভক্ত হইয়াছে। উহার মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু মহেশ্বরাদি মূর্ত্তি আছে। কোন স্থানে রাবণ আপন মুণ্ডচ্ছেদ করত মহাদেবের পূজা করিতেছেন। কোনও স্থানে পার্ব্বতীর শিবলিঙ্গ পূজা। কোথাও বা হরপার্ব্বতী একাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাশ ক্রীড়া করিতেছেন, সম্মুখে নাগ ও নন্দী উপস্থিত। ঐরূপ অন্যত্র ক্ষীরোদশায়ী, বরাহ অবতার, নৃসিংহ, কৃষ্ণ কর্ত্তৃক কালীয় দমন, বটুক ভৈরব, কপাল ভৈরব, নবযোগিনী ভৈরব ইত্যাদি বহুল মূর্ত্তি এবং

রাবণ কর্ত্তৃক কৈলাস উত্তোলন প্রভৃতি। এখানে রামায়ণ ও মহাভারতের নানা পৌরাণিক ব্যাপার খোদিত হইয়াছে, ইহাতে কি পর্য্যন্ত শ্রম ও ব্যয় হইয়াছে, তাহা অনুমান করিতে হইলে মন ভ্রান্ত হইয়া পড়ে! যে রাজার আজ্ঞায় এই অদ্বিতীয় কীর্ত্তি নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাঁহার সম্পত্তি অনুভব করিতে গেলে স্বপ্নের ন্যায় বোধ হয়। বাদ্যশালার সেতু অতিক্রম করিয়া (নিম্নদেশে) নন্দিগৃহের তলভাগে, যেখানে মন্দিরের উপর উঠিবার সোপান, সেই স্থানটি গাড়িবারান্দার ন্যায়। তাহার সম্মুখে অর্থাৎ প্রবেশ দ্বারের পার্শ্বে দিগ হস্তী কর্ত্তৃক স্নানীয় জলপূর্ণ উত্তোলিত কুম্ভতলে, কমল বনে, নলিনী-দলযুক্ত জলোপরি মহালক্ষ্মী উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। ভাস্কর্য্য বিদ্যার অতুল ক্ষমতায় জল পর্য্যন্ত পাষাণে খোদিত হইয়াছে। কমলদলে কয়েকটি অক্ষর দেখিতে পাওয়া যায়। তৎপশ্চাতে কৈলাস প্রাসাদ। ঐ প্রাসাদ-মন্দির পঙ্কজের মধ্যগত একশত হস্ত উচ্চ এক অপূর্ব্ব মন্দির, এবং তচ্চতুষ্কোণে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র কিন্তু তত্তুল্য সুচারু রচিত মন্দির চতুষ্টয়, হস্তী ও ব্যাঘ্র পৃষ্ঠে স্থাপিত। প্রধান মন্দির ৪৪ হস্ত দীর্ঘ ও ৩৭ হস্ত প্রশস্ত। গর্ভস্থানে প্রকাণ্ড শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। দীপ জ্বলিতেছে। নিত্য পূজা হয়। পূজারি দীপের জন্য ঘৃত ক্রয় করিতে হইবে বলিয়া আমাদের নিকট কিছু অর্থ যাচ্ঞা করিলেন। গৌরী-পট্ট পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, কাশীস্থ প্রাচীন আকারের বটে। প্রাচীর ও ছাদের সর্ব্বত্র অপর্য্যাপ্ত দেবমূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ। ছাদ ষোড়শ স্তম্ভ ও দ্বাবিংশতি অর্দ্ধ স্তম্ভোপরি স্থাপিত। ছাদের মধ্যভাগে লক্ষ্মী নারায়ণের মূর্ত্তি বিরাজমান আছে। কৈলাসের দক্ষিণপার্শ্বস্থ ভবন দুই তলা। দ্বিতীয়তল ৬৮ হস্ত দীর্ঘ ও ৬৫ হস্ত প্রশস্ত। গর্ভস্থানে শিবলিঙ্গ আছে। প্রাচীর নানাবিধ দেবমূর্ত্তিতে পূর্ণ, তাহাতে দশাবতার আছেন। স্তম্ভগুলি এত উচ্চ, স্থূল ও সংখ্যায় অধিক যে সাদৃশ্য স্মরণ করিতে গিয়া কলিকাতার টাউন হল ভিন্ন আর কিছু মনে আসিল না। হিন্দু স্থাপত্যের এক দোষ আছে যে তাহা আলোক-হীন হয়, এই কথা ইংরাজ কহেন। এখানে সে কথা প্রযুক্ত হইবার নহে। দ্বারগুলি অতিশয় উচ্চ ও প্রশস্ত এবং অসংখ্য। স্তম্ভ সকল অতি মনোহর। অগ্রভাগে চমৎকার কারু কার্য্য নিবেশিত হইয়াছে। অধুনা এই প্রকার প্রস্তরের স্তম্ভ কোন স্থানে রচিত হইতে দেখা যায় না। এক্ষণ-

কার স্তম্ভের প্রণালী অন্যরূপ হইয়াছে। রামেশ্বর, নীলকণ্ঠ, তেলিকাগান, কুম্ভারবাড়া ও জনবাসা প্রভৃতি গুহা দর্শন করিয়া দুমার লেনায় প্রবেশ করিলাম। দুমারলেনা একটি প্রশস্ত দেবায়তন। ইহার মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ। ঘারপুরির সহিত তুলনীয়। ভিত্তিতে এক স্থানে হরপার্ব্বতীর বিবাহ অতি সুন্দর খোদিত হইয়াছে। পার্ব্বতীর পিতা মহাদেবের হস্তে কন্যার পাণি সংলগ্ন করিয়া দিতেছেন। পুরোহিত বাক্য পড়াইতেছেন। উমা শিবের দিকে চাহিতেছেন। মূর্ত্তিগুলি অত্যন্ত বৃহৎ বলিয়া অবিবাহিতা উমাকে বাঙ্গালীর চক্ষে ডাগর বোধ হইল। তবে, পর্ব্বতের কন্যা, এই জন্য বাডন্ত গঠন। দিনমণি অস্ত যাইতেছেন, দেখিয়া আমরা ব্যস্ত হইলাম। ছোট কৈলাস, ইন্দ্রসভা ও জগন্নাথ সভা দেখা হইল না। ইহাতে পারশনাথ অধিষ্ঠিত।

"দুকূল বাসাঃ স বধূ সমীপং
নিন্যে বিনীতৈ ররাবাধ দক্ষৈঃ।
বেলা সমীপং স্ফুট ফেন রাজি-
নবৈ রুদন্বানিব চন্দ্র পাদৈঃ॥
তয়া প্রবৃদ্ধানন চন্দ্র কান্ত্যা
প্রফুল্ল চক্ষুঃ কুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্ন চেতঃ সলিলঃ শিবোভূৎ
সংসৃজ্যমানঃ শরদেব লোকঃ॥
তযো সমাপত্তিষুঃ কাতরাণি
কিঞ্চিদ্ ব্যবস্থাপিত সংহৃতাণি।
হ্রী যন্ত্রণাং তৎক্ষণ মন্বভূব-
ন্ন্যোন্য লোলানি বিলোচনানি॥
তস্যা করং শৈল গুরূপনীতং
জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলি মষ্ট মূর্ত্তিঃ।"

কমলমণি ।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ ।

রমণীটী কে ?

বর্দ্ধমান জেলার একটী গ্রাম, যাহার প্রকৃত নাম আমরা গোপন করিয়া ভ পুর বলিয়া উল্লেখ করিলাম,—তথাকার জমীদার এক ঘর বর্দ্ধিষ্ণু লোক। পল্লিগ্রামের ক্ষেত্রমোহন রাইমোহন প্রভৃতির ন্যায় তাঁহার বিষয় সম্পত্তি নহে। বার্ষিক প্রায় লক্ষ টাকা আয়ের সম্পত্তি ছিল। গ্রামের মধ্য স্থলেই জমিদারদিগের প্রকাণ্ড অট্টালিকা বিরাজ মান। বাটীটীর চতুর্দ্দিকে প্রাচীর শ্রেণী, সম্মুখে বৈটকখানা ও পূজার দালান, তাহার পশ্চাতে অন্দর মহল, তৎপশ্চাতে খিড়্‌কির পুষ্করিণী পুষ্করিণীর চতুর্দ্দিকে মনোহর লতা-মণ্ডপ-সংযুক্ত রম্যমোদ্যান। বহু অর্থ ব্যয়ে কোন উদ্যান প্রিয় ব্যক্তির আয়াস জনিত বুদ্ধিমত্তার পরিচয়ের পরিণাম স্বরূপ যে উদ্যানটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বাটীটী জন কোলাহলে পরিপূর্ণ; সদর দরজার সম্মুখে রাম সিং, লছ্‌মন সিং, গোপীনাথ চোবে, রামদীন দোবে প্রভৃতিরা মিলিয়া সন্ধ্যা কালিক আমোদ আহ্লাদের পূর্ব্বসূত্র করিয়া, পাদদ্বয়ে পাত্র চাপিয়া, নিমের ডালে সিদ্ধি ঘুঁটিতেছে, কেহ ঢোলকের কড়া টানিতেছে, কেহ গালে দোক্তা ফেলিয়া সূত্রধারে শ্মশ্রুরাজি ঊর্দ্ধে উত্তোলিত করিতে করিতে ছেপ্ ফেলিতেছে, কেহবা এক জন নিরীহ্ নাতোয়ান প্রজাকে যষ্টির গুঁতা প্রহার করিতে করিতে ধরিয়া আনিয়া, কি পুরুষত্ব প্রকাশ করিয়াছে তাহাই বলিতেছে, কেহবা সে কথায় বিরক্তি প্রকাশ করিয়া "আরে ভাইয়া তোম কা কিয়া" বলিয়া সে খাজনার জন্য হারাণী বেওয়াকে তাহার দোকান হইতে ধরিয়া আনিয়া তাহার দুগ্ধবতী গাভিটী বাজেযাপ্ত করিয়াছিল তাহারই পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেছে। এবং হারাণী বা তাহার মুদিখানার দোকান হইতে যে সকল লোক দ্রব্যাদি কিনিতে আসিয়াছিল, তাহারা তাহার ভয়ে কথাটী কহিতে পারে নাই বলিয়া কতই বিক্রম করিতেছে। বহির্ব্বাটীতে সদরের কাছারি, সেখানে লোক ধরে না, কেহ গোমাস্তার

হিসাব লইতেছে, বাকি জায়েব দোষ দেখাইয়া দক্ষিণ হস্তের উচিত বন্দোবস্তেৰ চেষ্টায় আছে; কেহবা প্রজা শাসন কবিতেছে, নায়েব মহাশয় প্রজাব অভিযোগেব বিচাব কবিতে বসিয়া উভয় পক্ষ হইতে উৎকোচ লইয়া উচ্চ মূল্যে নিবপেক্ষ বিচাব বিক্রয় কবিযাছেন। পার্শ্বেব ঘব চাকর-দেব; সেখানে কোন দাসী হযত কোন দাসকে তিবস্কাব কবিতেছে, কেহবা খোঁপা নাডিযা তামাক টানিতে টানিতে, কেহবা কোন বসিক চাকবেব সহিত বজনীতে কোথায মিলন হইবে তাহাবই মীমাংসাব জন্য পার্লিযা মেণ্টেব বৈঠক বসাইযাছে। বামীব বযেস কম, সব চাকবে, তাহাব আদব কবে, এমন কি নাযেব গোমাস্তা প্রভৃতিদেবও এক গ্লাশ জল দুটা পানেব আবশ্যক হইলে তাহাকেই আদব কবিযা সে সকল দিতে বলে; শ্যামীব কিন্তু আধা বযেস, গালে মেছেতা পডিযাছে, চর্ম্ম লোল হইযাছে, সুতবাং তাহাব আব আদর নাই,—কিন্তু শ্যামী এখনও পূর্ব্ব যৌবনেব স্মৃতিতে গববিনী, সুতবাং বামীব উপব হাডে চটা,—একটু দোষ দেখিলেই বড় গিন্নীব আম দাসী সুন্দবীব দুটা খোবামোদ কবিযা সকল কথা বসান সংযোগে বলিয়া দেয়। কেহ তিবস্কৃতা হইলে, আব আহ্লাদ ধবে না।

এতদ্ব্যতীত বাটীতে বাবুব মামাব শালাব খুলতাতেব ভগিনীব দৌহিত্র, ভগ্নীপতিব বৈবাহিকেব ভাগিনেয প্রভৃতি অনেকগুলি পোষ্য ছিল, অন্ত-পুবেও একৃপ আত্মীযাব অভাব ছিল না।

পাঠক এই সন্ধ্যাব সময়ে একবাব আমাব সহিত অন্তঃপুব মধ্যস্থ সেই কুসুম কানন মধ্যে আইস, আমি তোমাকে একটী অভিনব দৃশ্য দেখাইব; তবে সন্তুষ্ট বা অসন্তুষ্ট হওয়া তোমাব হাতে।

সেই কুসুমোদ্যানস্থ বাঁধা ঘাটেব দক্ষিণ পার্শ্বস্থ একটী লতা মণ্ডপেব মর্ম্মর নির্ম্মিত বেদীব উপবে একটী পঞ্চবিংশতি বর্ষীযা যুবতী উপবিষ্টা,—পাঠক হয়ত হাসিযা বলিবেন পঞ্চবিংশতি বর্ষে কি আবাব স্ত্রীলোকের যৌবন থাকে, যে তাহাকে যুবতী বলিব? স্কটেব মুখে সেই সুদূব প্রদেশস্থ শৈত্য প্রধান দেশেব কোন পঞ্চবিংশতি বর্ষীযা যুবতীব কথা ভাল লাগে, কিন্তু বাঙ্গালি লেখকেব মুখে এ অধম বঙ্গদেশের রমণীতে তাহা অসম্ভব। এ তিরস্কাব সহ্য কবিতে আজি আমি প্রস্তুত।

যুবতীর বর্ণ স্বর্ণোজ্জ্বল নহে ; যেরূপ চাঁদের আলোয় মিশিয়া যায়, যে রূপ দুগ্ধ অলক্তকের সমাবেশের সহিত তুলনা হয়, যে রূপ সৃজিতে শরৎচন্দ্র হইতে উপাদান গ্রহণ করিতে হয়, এ রূপ সে রূপ নহে। ইহা উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যুক্ত, সৌন্দর্য্য বসন ভেদ করিয়া বাহির না হইলেও, বসনাভ্যন্তর হইতে কালোর আভা যাবে না। যে সকল পাঠক, কেবল গোলাপ ভিন্ন পুষ্প স্পর্শ করেন না, মল্লিকা, যূঁই ভিন্ন অপর পুষ্পের মালা পরেন না, তাঁহাকে অপরাজিতার সৌন্দর্য্য বুঝাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা, কিন্তু আবার বলি অপরাজিতার কি কোন সৌন্দর্য্য নাই, ভাল করিয়া সৌন্দর্য্য দেখিব মনে করিলে কি অপরাজিতার কোন প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না? জহুরী হীরা মুক্তা চুনির আদর করে বলিয়া কি পান্নার আদর করে না? বনশষ্প বিশোভিত শ্যামল নেত্রের শোভা কি মন্দ। নীরদ শূন্য নীলাম্বরের সেই অন্তহীন বর্ণ প্রভাব মনোহর দৃশ্য কি মন্দ? মধ্যাহ্ন তপন-কর-প্রদীপ্ত জাহ্নবী বক্ষের রজত বিমণ্ডিত শোভা ব্যতীত সন্ধ্যা কালের সেই আভাহীন শোভা কি ভাল লাগে না? যাঁহার না লাগে তাঁহাকে আমরা নয়ন ভরিয়া আমাদের এই যুবতীটীকে আবার দেখিতে বলি, আমাদের বিশ্বাস যে তাহা হইলে তিনি আবার নূতন সৌন্দর্য্য দেখিতে শিখিবেন। আর যদি কেহ কোন শ্যামাঙ্গিনীর রূপে মজিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকে আর বলিবার কিছুই নাই, তিনি আসুন, আমাদের এই স্বেচ্ছাচারিতাকে একবার প্রশংসা করুন, আমরা আহ্লাদে তাঁহার করমর্দ্দন করি। যদি কোন সুন্দরী গ্রন্থকারের মুখ পোড়াইবার ব্যবস্থা করিয়া সোনা ফেলিয়া ইস্পাতকে বাহবা দেওয়ায় চটিয়া থাকেন, তাহা হইলে বলি সোনা সোনাই আছে, ইস্পাতে যদি কেহ ভাল গড়ন দেখায় তাহা কি দেখিতে নাই, আর ঠাকুর মার ফুল ঝুমকাও সোনার, আর শ্রীকৃষ্ণদাসের গঠিত দুল ইয়ারিংটিও সোনার, বলি সোনা হইলেই কি হয়, গঠনের কি কোন সৌন্দর্য্য নাই? আর আমার বিশ্বাস যাহা ভাল, তাহা কাল ; তাই তোমার ভ্রম কৃষ্ণ কেশ দাম কাল, চক্ষের তারা কাল,—তাই বলি কালকে কি ঘৃণা করিতে আছে, হরি। হরি! তা কি তুমি জান না তোমার রাই কিশোরীর বংশীধারী চিকণ কালা যে কাল, তার কি আদর কর না?

পাঠিকা! রূপ বুঝিতে তুমিই পার, বিনা নাসিকা সঙ্কোচনে, একবার দেখদেখি কি গঠন পরিপাঠ্য! কি সুললিত ভুজ যুগল, কি সুন্দর কেশ দাম, কি প্রশস্ত অথচ জ্যোতি-সম্পন্ন চক্ষু যুগল! পাঠক! এ চক্ষু আর তোমার দেখিয়া কাজ নাই; ভোলা নাথ পুরুষ আর তাঁহার চাহনিতেই মদন ভস্ম হইয়াছিলেন, জানি না এই রমণী চক্ষু দেখিতে তোমার দশা কি হইবে? গ্রীষ্মাতিশয্যে কন্দর্প বুঝি তাঁহার ফুল ধনু ফেলিয়া দিয়া ঐ সুলোচনার নয়নরূপী শান্তি ধামে আপন অঙ্গ মিশাইয়া পড়িয়া আছে, তাই বুঝি সে চক্ষের চঞ্চল কটাক্ষ সহ্য করা অসাধ্য। দাড়িম ত রসে ফাটে, যুবতীর পীনোন্নত পযোধরের সেই নিথর নধর ভাব দেখিলে আর তাহাকে ফাটিতে হইত না, আপন মনোদুঃখে মরমে মজিয়া হিংসার শোকে ম্রিয়মান হইয়া অকালে গাছ হইতে খসিয়া পড়িত। বিদ্যার নিতম্ব ভার দেখিয়া ভারত মেদিনীকে মাটী করিয়াছেন কিন্তু আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছি, আমাদের এই নিতম্বিনীর নিতম্ব শোভায় মজিয়া দুই একটী সজীব প্রাণী নাকি মাটী হইয়াছেন। যুবতী অন্তঃপুরবর্ত্তিনী নতুবা বঙ্গের আরও কি শোচনীয় অবস্থা ঘটিত তাহা বলিতে পারি না। লোকে কি সেই দুঃখে পেশোয়াজ গাউন পরে? ভাবে বোঝার শক্ত নাই। উরুদেশ কি সুললিত, কেমন ক্রমিক সূক্ষ্ম হইয়া জানুতে মিশিয়াছে, আবার কেমন ঈষৎ মধ্য স্ফীত ভাবে ক্রমিক সূক্ষ্মত্বে পরিণত হইয়া চরণ স্পর্শ করিয়াছে, পাদদ্বয়ই বা কি মনোহর, বঙ্গীয় মহিলাদের পদযুগলে যদি বুট শোভা পাইত তাহা হইলে এই সুন্দর চম্পক কলিকা সম অঙ্গুলি শোভা দেখিতে নয়ন বঞ্চিত থাকিত। যুবতী একাকিনী নহেন, তাঁহার পার্শ্বে আর একটী পুরুষ উপবিষ্ট। পুরুষটী সুরূপ নহে,—বরং কুৎসিত, কেমন চোয়াড় চোয়াড়,—যুবতী পুরুষটীর স্কন্ধে স্বীয় মস্তক ভার ন্যস্ত করিয়া উপবিষ্টা আছেন। হায় বিধাত তোমার কি বিচার! তুমি এমন স্বর্গীয় অপরাজিতা কাহার করে সমর্পণ করিয়াছ? যে রমণী কোন ধনাঢ্যের গৃহিণী হইলে শোভা পাইত তাহাকে কাহার স্ত্রী করিয়াছ? পুরুষটী আমাদের পূর্ব্ব পরিচিত রামকানাই, একজন অশিক্ষিত সামান্য পরিচারক। কিন্তু হায় রামকানাই তুমিই ভাগ্যধর! যাহার জন্য এমন দুষ্প্রাপ্য নয়নাভিরাম কুসুম প্রস্ফুটিত হয়, তাহাকে

ভাগ্যধর না বলিয়া আর কি বলিব? কিন্তু রামকাই ত সামান্য বেতন ভোগী দাস, তাহার স্ত্রীর অঙ্গে এত মহামূল্য অলঙ্কার!—তবে বুঝি বাবুরা দিয়া থাকিবেন?

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

যুবতীর প্রেম।

যুবতী ধীরে ধীরে রামকানায়ের স্কন্ধদেশ হইতে আপন সুগঠিত মনোহর মস্তক উত্তোলন করিলেন. কঠিন পাষাণ খণ্ডে বৃন্তচ্যুত মৃণালিনী সংস্থাপিত ছিল, সহসা সমীরণ স্পর্শে যেন তাহা সরিয়া গেল। তখন যুবতী সেই সুটানা নয়নের যেন কি এক অপূর্ব্ব ভঙ্গিমা করিয়া, সেই পাষাণ খণ্ডের প্রতি যেন কি এক অপূর্ব্ব চাহনি চাহিয়া, সেই বিলোল কটাক্ষে যেন কত সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করিয়া, যেন আবার কত সোহাগে মাতিয়া, কত আহ্লাদে গলিয়া, কত প্রেম রসে মজিয়া বলিলেন "কথা কবে না?"

"না।"

"কেন ভাই?"

"তুমি প্রভু আমি দাস, তোমায় আমায় কিসের কথা?"

"এ কথা পূর্ব্বে ভাব নাই কেন?"

"বোকামি।"

যুবতী ক্ষণেক নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া আবার বলিলেন "আমি কি কোন দোষ কর্ব্বোছি?"

"কিছু না।"

"তবে কেন কথা কবে না?"

"আমার ইচ্ছে।"

"রামকানাই. তবে ভাব দেখি, কে প্রভু কে দাস?"

"তুমি প্রভু আমি দাস, একথা সংসার বলে—জগৎ বলে।"

"সত্য, কিন্তু আমি ত বলি না।"

"আমার মন ভাল নাই।"

"কেন,—টাকার আবশ্যক আছে।"

"টাকাতে কার না আবশ্যক।"

"যা চাও তাই দি'বো।"

"সুধু তাই নয়।"

'তবে কি?"

তখন রামকানাই একবার যুবতীর বদন প্রতি চাহিয়া বলিল "দেখ, যখন জন্মেছি তখন মরতেই হবে, মরবার ভয় করি না, মরবার ভয় থাকলে তোমার সঙ্গে আমার সংঘটন হত না। প্রাণ ত হাতে হাতে। কিন্তু এত করেও তুমি আমার কি করেছ?"

যুবতী। কি বাকি রেখেছি।

রাম। সব।

যুবতী ভ্রূকুটী করিয়া বলিলেন "তুমি নিমক হারাম।"

রাম। আমার মত নফরের তাহা সম্ভবে, কিন্তু তোমার?'

যুবতী। আমার কি?

রাম। তুমি বল্‌তে, 'আমি তোমা বই আর জানি না।'

যুবতী। বল্‌তাম নয়, এখনও বলি।

রাম। কিন্তু তার কি করেছ।

যুবতী। কি না করেছি, একজন পথের ভিখারীকে সম্পদশালী করেছি।

রাম। তোমার আমি উপকার করিনি—তোমার জন্যে ভূতের হাতে—

রমণী আর থাকিতে পারিলেন না, অঝোরে কান্দিয়া ফেলিলেন।

রাম। রাগ করিলে?

যুবতী কথা কহিলেন না।

তখন রামকানাই যুবতীর সেই মনোহর পদ-যুগল স্পর্শ করিয়া বলিল "সরলা, রাগ করিয়াছ, আমায় মার্জ্জনা কর।"

যুবতী তখন রামকানাইয়ের প্রতি একটী সস্নেহ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। রামকানাই অতি ধূর্ত্ত—সুযোগ বুঝিয়া রাম রবে যুবতীর গলদেশ পরিবেষ্টন করিয়া আলিঙ্গন করিলেন, যুবতী আবার তাহার অঙ্গে ঢলিয়া পড়িলেন। রামকানাই তখন সেই সুন্দর, মনোহর, সুগঠিত, অল্প শিক্ত অথচ স্ফুরিত,

অতি পরিপাটী অথচ ঈষৎ কুঞ্চিত সেই মনোমঙ্গকর ওষ্ঠদ্বয়ে স্বীয় কদর্য্য অধর সংযোজনা করিল। হায়! সেই স্বর্গীয় ললাম ভূতা রমণীর সেই স্বর্গীয় শোভা সম্পন্ন ওষ্ঠদ্বয়ে পিশাচের ওষ্ঠদ্বয়ের সম্মিলন হইল,—যুবতী অঙ্গ প্রেম-মাতোয়ারা হইয়া অবশ হইয়া উঠিল, শচীনাথের কোমল কর হইতে কে হেন সুন্দর পারিজাত কাড়িয়া লইয়া চণ্ডালের হস্তে সমর্পণ করিল রে। যে হার দেব কণ্ঠে শোভা পায়, কে হেন পাষাণ তাহা আজি শূকরের গলে ঝুলাইল! সংসার তুমি রসাতলে যাও এ পাপ দৃশ্য আর দেখিতে পারি না।

বাঙ্গালা অভিধান।

"রাম না হইতে ষাটি হাজার বৎসর,
অনাগত বাল্মীকি রচিল কবিবর।"

পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত রামগতি ন্যায়রত্ন মহাশয় স্বরচিত "বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থে" কৃত্তিবাস পণ্ডিতের ঐ প্রসিদ্ধ শ্লোকের প্রতিবাদে বলেন, যে বাল্মীকি দেখিলেই ঐ কথার অসারতা উপলব্ধি হয়, মহর্ষি যে একজন সমসাময়িক রাজার বিবরণ লিখিয়াছেন, তাহাই বোধ হয়। ন্যায়রত্নের গ্রন্থের এই স্থল পাঠ করিয়া আমাদের একজন ব্যাঙ্গ প্রিয় বন্ধু বলেন, "ঐ কথার প্রতিবাদ করা ন্যায়রত্নের পক্ষে ভাল হয় নাই" তাঁন বাঙ্গলা সাহিত্য না হইতেই যখন তাহার ইতিহাস লিখিতেছেন, তখন সেই ইতিহাসে আবার ও কথার প্রতিবাদ কেন? আমরা কি বলিতে পারি না?

"না হইতে বঙ্গদেশে সাহিত্য আভাস,
অনায়াসে ন্যায়রত্ন লিখেন্ ইতিহাস।"

বঙ্গ সাহিত্যের দরিদ্রতার উপর এই শ্লেষ পূর্ণ কটাক্ষ পাতের পর, আজি আঠার উনিশ বৎসর গত হইয়াছে, এখন সেই 'অনাগত' সাহিত্য আগত প্রায় বলিলে চলে। এখন বিদ্যাপতি প্রভৃতির প্রাচীন কাব্য সকল, বঙ্কিম বাবু প্রভৃতির নব্য নবেল সকল ইংরাজিতে অনুবাদিত হইয়া বৈদেশিক

জগতের সম্মুখে নীত হইয়াছে, বৈদেশিক কোন কোন শিক্ষালয়ে এখন বঙ্গ সাহিত্যের অধ্যাপনা হয়, বিদেশী কেহ এখন ভারতীয় ভাষা শিখিতে চাহিলে, বঙ্গ ভাষা শিক্ষা করেন, অনেক বিদেশী বিচারক আপনার বঙ্গ ভাষিত্বের গৌরবে আপনাকে স্পর্দ্ধান্বিত মনে করেন। এই সময়ে ভাষার অবস্থোচিত একখানি অভিধান হইলে, বড় ভাল হয়। বঙ্গ ভাষা সংস্কৃতের সহিত যেরূপ ঘনিষ্ঠ সম্পর্কিত, তাহাতে বঙ্গভাষার অভিধানে সংস্কৃত বহুতর শব্দের সন্নিবেশ নিতান্ত আবশ্যক। ফলত, বঙ্গাভিধান অংশত সংস্কৃতা-ভিধান হওয়া চাই। সংস্কৃতের গৌরব এই যে, ইহাতে অধিকাংশ শব্দই প্রকৃতি প্রত্যয়যোগে সার্থক ভাবে নিষ্পন্ন। সুতরাং বঙ্গাভিধানে সংস্কৃত শব্দের ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন আবশ্যক; প্রাকৃত এবং যাবনিক বা ম্লেচ্ছ শব্দে-রও সেই রূপ করিতে পারিলে ভাল হয়।

বলিতে আহ্লাদ হয় পণ্ডিতবর ৺ রামকমল বিদ্যালঙ্কার প্রণীত প্রকৃতি-বাদ অভিধানের সচিত্র চতুর্থ সংস্করণ, আমাদের বঙ্গভাষার অভিধানা-ভাব অনেক পরিমাণে পূরণ করিয়াছে। "সচিত্র প্রকৃতিবাদ অভিধান" বৃহৎ আকারের (সুপর রয়াল আটপেজি ফর্ম্মার) সতের-শ পৃষ্ঠা-পরিমিত, দশ টাকা দামের ওয়েবষ্টরের ইংরাজি অভিধানের মত। দেখিলেই আহ্লাদ হয়। মনে একটু আত্মগৌরবের উদয় হয়। যিনি ন্যায়রত্ন মহাশয়ের ইতিহাস দেখিয়া উপহাসে ভ্রুকুটি করিয়াছিলেন, এই বৃহদভিধান দেখিয়া তাঁহাকেই আহ্লাদে হাসিতে হইয়াছে।

এত বড় বৃহৎ ব্যাপারে বিস্তর ত্রুটি অবশ্যই আছে; কিন্তু প্রতি সংস্ক-রণে যে এই অভিধানের ক্রমিক উন্নতি হইবে, এই চতুর্থ সংস্করণ দেখিয়া, এরূপ ভরসা করা এবং সাধারণকে দেওয়া বিশেষ অন্যায় হইবে না। একটি বিশেষ ত্রুটির কথা বলিব। পারিভাষিক শব্দ সকলের যেরূপ ভাবে সাধারণত ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহাতে শব্দার্থ অনেক স্থলে বিশদ হয় নাই। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে,—

"নাড়ী বলয়, সং,ক্লীং; ঘটিকা জ্ঞানার্থ রচয়া কাব যন্ত্র, দণ্ডাদি জ্ঞানার্থ নাড়ী রূপ কাল জ্ঞানোপায় যন্ত্র বিশেষ।"

যন্ত্রটা যে কিরূপ তাহার ত কিছুই বুঝিলাম না কিন্তু অভিধানকার

কিছু বুঝাইয়া দিলে ভাল হইত। আসল কথা, পারিভাষিক শব্দের এবং দ্রব্যবাচক শব্দের অধিকতর বিশদ ব্যাখ্যা আবশ্যক।

যেমন ত্রুটি বিস্তর, তেমনই গুণও বিস্তর। একরূপ ত্রুটির কথা বলা হইল, এক রূপ গুণের কথা বলি।

চৈতন্যচরিতাদি বাঙ্গালা বৈষ্ণব গ্রন্থে অনেক শব্দ এরূপ অর্থে ব্যবহার আছে, যে এখন আর সেই সকল শব্দের সেরূপ ব্যবহার হয় না। সুতরাং সেই সকল স্থলে ভাবার্থ পরিগ্রহ করা কঠিন হয়। এই অভিধানে সেই সকল প্রাচীন অর্থ দেওয়া আছে।

একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

"অঙ্গীকার; (অঙ্গ কার [কৃ করা + অ(ঘঞ্) ভাবে] করণ। যাহা অঙ্গে ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গ করা। ঈ(চ্বি)-অভূত তদ্ভাবার্থে) সং, পু,

১। পূর্ব্বে যাহা অঙ্গে ছিল না তাহা স্বীয় অঙ্গ করণ ; যথা—

"পিতা মাতা গুরুগণ আগে অবতরি
রাধিকার ভাবরণ অঙ্গীকার করি।
* * *
নবদ্বীপে শচীগর্ভে শুদ্ধ দুগ্ধ সিন্ধু।
তাহাতে প্রকট ছিলা কৃষ্ণ পূর্ণ ইন্দু।

(চৈতন্য চরিতামৃত)

২। দিব, করিব, যাইব, উল্লেখ করিয়া প্রতিজ্ঞা করা, স্বীকার, স্বীকরণ, অঙ্গীকরণ, প্রতিশ্রুতি, প্রতি শ্রবণ।

চৈতন্যচরিতামৃত, অন্নদামঙ্গলাদি গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা, এই অভিধানের নানা গুণের মধ্যে একটী গুণ।

ফল কথা ইহাতে গুণ দোষ যতই থাকুক বাঙ্গালার একখানি বিশিষ্টরূপ অভিধানের বিশেষ অভাব হইয়াছিল, সেই অভাব প্রকৃতিবাদ অভিধানে অনেক পরিমাণে পূরিত হইয়াছে, এই জন্য বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের পুত্র আমাদের ধন্যবাদের পাত্র। এরূপ অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থের অচিরকাল মধ্যে বহুল প্রচার হইলেই আমাদের এই ধন্যবাদ সার্থক হইবে।

———

ভক্তের ভগবান্।

যে যত মা বাপের আদুরে ছেলে হয়, তাহার নামের সংখ্যাও তত অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। আদুরে ছেলেকে মা বাপেরা যতই আদরের যতই সোহাগের নাম দিয়া ডাকুক না কেন, কিছুতেই তাহাদের আশ মিটে না; এজন্য আদুরে ছেলের নাম নিত্য নিত্য নূতন। ভগবান্, অনন্ত ভক্ত-মণ্ডলীর আদুরে গোপাল, তাই তাঁহার নামেরও অন্ত নাই। যে ভক্ত যখন যে ভাবে তাঁহাকে ভাবনা করে, ভগবান্ সেই ভাবে তাহার নিকট উপস্থিত হন। যে ভক্ত যখন যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভগবান্ সেই নামে তাহার নিকট উপস্থিত হন। এই জন্যই, যিনি—

"সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো ব্যাপ্য অত্যতিষ্ঠদ্ দশাঙ্গুলম্॥"

সেই অনন্তদেব শ্রীকৃষ্ণের সহস্র নাম। সহস্রপ্রকার ভক্তের একই ভগবদ্ভক্তির সহস্রপ্রকার রূপভেদে একই ভগবানের সহস্রপ্রকার রূপ ও সহস্রপ্রকার নাম। তাঁহার সেই সহস্রপ্রকার রূপ ও সহস্রপ্রকার নাম একই ভক্তিসাগরের বিভিন্নপ্রকার বিবর্ত্ত মাত্র (১)। যে ভক্ত যে রূপে তাঁহাকে ধ্যান করে ও যে নামে তাঁহাকে আহ্বান করে, ভক্তবৎসল সিদ্ধিদাতা নারায়ণ সেই রূপেই ও সেই নামেই তাহাকে সিদ্ধিদান করিয়া থাকেন (২)। কালীই বল আর দুর্গাই বল, কেশবই বল আর শঙ্করই বল, রামই বল আর গঙ্গাই বল, যে নামেই ডাক না কেন, তোমার ডাক প্রকৃত ভক্তির ডাক হইলে অবশ্যই তাহা তাঁহার নিকট পঁহুছিবে, এবং সেই ভক্তের ভগবান্ অবশ্যই তোমার প্রার্থনা পূর্ণ করিবেন। তিনি ভক্তেরই

---

(১) 'বিবর্ত্ত,'—অর্থাৎ রূপভেদ বা উপাধিভেদ। যেমন একই সলিলের কখনও আবর্ত্ত (পাক), কখনও বুদ্বুদ, কখনও বা তরঙ্গ।

(২) এই জন্যই ভগবদ্ভক্ত মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন,—

"বহুধাপ্যাগমৈর্ভিন্নাঃ পন্থানঃ সিদ্ধিহেতবঃ।
ত্বয্যেব নিপতন্ত্যোঘা জাহ্নবীয়া ইবার্ণবে॥"

যেরূপ গঙ্গার প্রবাহ সকল বিভিন্ন পথে প্রবাহিত হইয়াও সেই মহার্ণবে গিয়া পতিত হয়, সেইরূপ পুরুষার্থসিদ্ধির উপায়সকল শাস্ত্রভেদে ভিন্নরূপ হইলেও একমাত্র তোমাতেই গিয়া পর্য্যবসিত হয়।

ভগবান্, আর কাহারও নহেন, তাঁহার অধিষ্ঠান ভক্তের হৃদয় পীঠে, ভক্তের হৃদয়-পীঠই তাঁহার বৈকুণ্ঠধাম।

ভক্তহৃন্মন্দিরং তস্য বৈকুণ্ঠভবনং হরেঃ।
যত্রৈব ভগবদ্ভক্তিস্তত্রৈব ভগবান্ হরিঃ॥ ১॥

ভক্তের হৃদয় তাঁর বৈকুণ্ঠভবন,
নিত্য বিরাজেন যথা দেব নারায়ণ;
সেই ভগবানে ভক্তি যেখানেই রন,
সেখানেই ভগবান হরিও নিশ্চয়॥ ১॥

অনন্তভক্তহৃদয়ানন্তশয্যাতলে সদা।
যোগনিদ্রাং স ভজতে সহ লক্ষ্ম্যা জনার্দ্দনঃ॥ ২॥

অনন্ত ভক্তের হৃদে অনন্ত-শয্যায়;
লক্ষ্মী সহ জনার্দ্দন যোগনিদ্রা যায়॥ ২॥

আভাসতে শক্তিভেদাদেকঃ কৃষ্ণোঽপ্যনেকধা।
একোঽপ্যনেকধা সূর্য্যো যথা বীচিষু দৃশ্যতে॥ ৩॥

প্রতিবিম্ব পড়ে যদি তরঙ্গমালায়,
যেমন একই সূর্য্য অসংখ্য দেখায়;
ভক্তের হৃদয়ে এক কৃষ্ণও তেমন,
শক্তিভেদে নানা মূর্ত্তি করেন ধারণ। ৩।

সৌরতেজো যথা মেঘে নানাবর্ণৈর্বিভাব্যতে।
ভক্তচিত্তে তথৈকোঽপি নানারূপধরো হরিঃ॥ ৪॥

যেমন সূর্য্যের রশ্মি মেঘের উপরে,
শ্বেত পীত লোহিতাদি কত বর্ণ ধরে;
ভক্তগণ নিজ নিজ হৃদয়ে তেমন,
এক কৃষ্ণ নানা ভাবে করে দরশন। ৪।

অনন্তশক্তের্যঃ শক্তীর্ভিন্নাঃ বেত্তি স মূঢ়ধীঃ।
অভিন্নাঃ খলু তাঃ সর্ব্বা যো জানাতি স পণ্ডিতঃ॥ ৫॥

একাই অনন্তশক্তি সেই নারায়ণ,
শক্তিভেদে ভিন্ন তাঁরে ভাবে মূঢ়জন;
অনন্ত শক্তির মধ্যে একই ঈশ্বর,
অভেদ-নয়নে জ্ঞানী হেরে নিরন্তর। ৫।

আভোগং পূর্ণচন্দ্রস্য প্রতিপৎকলয়া যথা।
পূর্ণং ব্রহ্ম বিজানীয়াদংশমাত্রেণ বৈ তথা॥ ৬॥

প্রতিপদে কলামাত্র করি দরশন,
পূর্ণ চন্দ্রমার মূর্ত্তি বুঝিবে যেমন;
অংশমাত্র নিরখিয়া বুঝিবে তেমন,
অনন্ত-শকতি পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ। ৬।

ত্বং কালী করুণাময়ী ত্বমসি বৈ ব্রহ্মা হরিঃ শঙ্করঃ
দুর্গা দুর্গতিহারিণী ত্বমসি বাগ্দেবী চ লক্ষ্মীঃ স্বয়ম্।
ত্বং লোকত্রয়পাবনী সুরধুনী ত্বং জানকীবল্লভঃ।
কিং বাচ্যস্তব কৃষ্ণ! রূপমহিমাঽনন্তস্তু মেকোঽপি যৎ॥ ৭॥

কালী তুমি কালভয় কর নিবারণ,
তুমি শিব, তুমি ব্রহ্মা, তুমি নারায়ণ;
জগদম্বা তুমি দুর্গা দুর্গতিহারিণী,
তুমি লক্ষ্মী, তুমি বাণী বিজ্ঞানদায়িনী;
তুমি গঙ্গা সনাতনী, তুমি সীতাপতি,
শক্তিভেদে কৃষ্ণ! তব অনন্ত মূরতি। ৭।

ইন্দ্রস্ত্বং বরুণস্ত্বমেব ধনদঃ সোমস্ত্বমর্কো মরুৎ
দ্যৌর্ভূমির্জ্বলনো গ্রহাশ্চ বসবস্ত্বং ধর্ম্মরাজোঽশ্বিনৌ।
ত্বং রুদ্রাস্ত্বমহস্ত্বমেব রজনী সন্ধ্যে চ বেদাঃ ক্রতুঃ
কিং বাচ্যস্তব বিশ্বরূপ! মহিমা ত্বং বাসুদেবো বিরাট্॥ ৮॥

তুমি ইন্দ্র, তুমি চন্দ্র, তুমি দিবাকর,
কুবের, বরুণ, যম, তুমি বৈশ্বানর :
তুমি বায়ু, বসু, রুদ্র, অশ্বিনীকুমার,
স্বর্গ, মর্ত্ত্য, গ্রহ, তারা, তুমি বিশ্বাধার ;
দিবা, রাত্রি, সন্ধ্যা, বেদ, তুমি যজ্ঞেশ্বর,
অনন্ত বিরাট তুমি ব্যাপ্ত চরাচর ,
বিশ্বরূপ। বাসুদেব ! তোমার মহিমা,
কে পারে বর্ণিতে যার নাহি আছে সীমা। ৮।

অনন্তচরণোপান্তং নিতান্তং যদি বাঞ্ছসি।
ধ্রুবপ্রহ্লাদচরিতাং পদবীং ভজ রে মনঃ। ॥ ৯ ॥

যদি সে অনন্ত-পদে মিশিবারে চাও,
তবে কেন ভ্রান্ত হয়ে অন্য পথে যাও ,
যে পথে প্রহ্লাদ ধ্রুব করেছে গমন,
তুমিও সে ভক্তিপথে চল ওরে মন ! । ৯।

জয় জগদীশ্বর দেব দিগম্বর বিশ্বম্ভর হর শঙ্কর হে
জয় দামোদর ভক্তমনোহর মুরহর করুণাসাগর হে।
জয় ভয়বারিণি নির্বৃতিকারিণি দুর্গতিহারিণি তারিণি হে
জয় নারায়ণি দেবি সনাতনি জননি ত্রিভুবনপালিনি হে ॥১০॥

জয় মুরমর্দ্দন কৃষ্ণ জনার্দ্দন নারায়ণ মধুসূদন হে
ত্রিতাপনাশন বিভূতিভূষণ দুষ্টদনুজকুলভীষণ হে।
শ্মশানবাসিনি রুদ্রবিলাসিনি কালি কলুষকুলনাশিনি হে
জয় জয় শঙ্করি ভক্তশুভঙ্করি বিশ্বেশ্বরি পরমেশ্বরি হে॥ ১১ ॥

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। } আষাঢ় ১২৯৬ সাল। { ১০ম সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগ-সূত্র।

স্বস্বামিশক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ সংযোগঃ ॥ ২৩।

পদচ্ছেদঃ। স্ব-স্বামি-শক্ত্যোঃ স্ব-রূপ-উপলব্ধি-হেতুঃ সংযোগঃ।

পদার্থঃ। স্ব-শক্তিঃ দৃশ্যস্য স্বভাবঃ, স্বামিশক্তিঃ দ্রষ্টুঃ স্বরূপং, তয়োঃ স্বরূপস্যজ্ঞানং, তস্য হেতুঃ কারণং যঃ সএব সংযোগঃ।

অন্বয়ঃ। যঃ স্ব-স্বামি শক্ত্যোঃ স্বরূপোপলব্ধিহেতুঃ স এব সংযোগঃ। কথ্যত ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। স্বং দৃশ্যং তস্য শক্তি জড়ত্বেন যোগ্যত্বং, স্বামী পুরুষ স্তস্য শক্তিশ্চেতনত্বেন দ্রষ্টৃত্ব-যোগ্যতা, তয়োঃ স্ব স্বামি-স্বরূপয়োঃ, শক্ত্যোর্বিবিধশব্দাদ্যকার দৃশ্যবুদ্ধিস্বরূপস্য উপলব্ধি-র্ভোগঃ স্বামিস্বরূপোপলব্ধিরপবর্গঃ, তদ্ধেতুঃ সংযোগঃ স্ব-স্বামিভাবাখ্যঃ সম্বন্ধঃ সএব দ্রষ্টৃ দৃশ্যভাবো ভোক্তৃ ভোগ্যভাব ইত্যাখ্যায়তে। যস্যাভাবে দৃগ্দৃশ্যয়োঃ স্বরূপোপলব্ধির্নভবতি, সদ্ভাবে সা ভবতি স সংযোগঃ। এতদুক্তং ভবতি স্বশক্তিঃ দৃশ্যং প্রাকৃতং বস্তুজাতং ভোগ্যত্বাৎ, স্বামিশক্তিঃ দ্রষ্টা পুরুষঃ ভোক্তৃযোগ্যত্বাৎ, তয়োঃ স্বরূপোপলব্ধৌ স্বরূপ জ্ঞানে যেহেতুঃ সংযোগ বিশেষঃ সএব দ্রষ্টৃ দৃশ্যয়োঃ সংযোগোঽত্র হেয়হেতুঃ। নাহি তয়ো নিত্যয়োর্ব্যাপকয়োশ্চ স্বস্বরূপাদতিরিক্তঃ কশ্চিৎ সংযোগোঽস্তি, যদ্বের

ভোগ্যস্য ভোগ্যত্বং ভোক্তুশ্চ ভোক্তৃত্বমনাদিসিদ্ধং সএব সংযোগঃ। স চ সংযোগোবুদ্ধি দ্বারকঃ, দৃশ্যবুদ্ধিসত্ত্বোপাধিরূপাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা ইতি দৃশ্য বত্যা বুদ্ধ্যা সংযোগ এবাহত্র সংযোগ বিশেষঃ। তথাহি—"আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত" ভোক্তেত্যাহুর্মনীষিণঃ।" ইত্যাদি শ্রুত্যাদিভ্যো লিঙ্গ দেহাত্মসযোগাদেবাত্মনো বিষয়দর্শনাহবগমাত্।

অনুবাদ। স্ব অর্থাৎ দৃশ্য, স্বামী অর্থাৎ দ্রষ্টা এই উভয় বিধ শক্তির স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি সংযোগই কারণ।

সমালোচন। স্ব শব্দের মুখ্য অর্থ আত্মীয় অর্থাৎ অধিকৃত বা ভোগ্য বস্তু। এখানে স্ব শব্দের অর্থ প্রাকৃত বস্তু সমূহ; কারণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুই পুরুষের ভোগ্য বলিয়া, নির্দিষ্ট হইয়াছে। স্বামী শব্দের মুখ্য অর্থ অধিকারী বা ভোক্তা। এখানে স্বামী শব্দের অর্থ চৈতন্য, যাহা সাংখ্য শাস্ত্রে পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ সাংখ্যমতে একমাত্র চৈতন্যই সমুদয় প্রাকৃত বস্তুর ভোক্তা। ইহাদের শক্তি বলিতে স্বরূপ; পূর্ব্বে বলা হই-য়াছে। এক্ষণে তাহাদের জ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাই বলা হইতেছে। প্রাকৃত বস্তু সমূহের জ্ঞানের নাম ভোগ এবং পুরুষ জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়। এই উভয়ের স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর সংযোগই কারণ, প্রাকৃত বস্তু মাত্র জড় রূপ উহারা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে অক্ষম এবং চৈতন্যরূপী পুরুষও স্বভাবত উদাসীন তাঁহার আত্মস্বরূপ জ্ঞানের নিমিত্ত প্রবৃত্তি নাই। বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ বশতই উভয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত এই উভয়ের সংযোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত চৈতন্য সর্ব্ব জ্ঞান সমর্থ হইয়াও প্রবৃত্তি না থাকায় কিছু দর্শন করেন না। কাজেই তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব এবং প্রাকৃত বস্তুর দৃশ্যত্ব কিছুই থাকে না। বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগে যে আমাদের সমুদয় জ্ঞান হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪।

পদচ্ছেদঃ। তস্য, হেতুঃ, অবিদ্যা।

পদার্থঃ। তস্য পূর্ব্বোক্তস্য সংযোগস্য হেতুঃ কারণং, অবিদ্যা পূর্ব্ব মুক্তা আত্মা-দাবনাত্মাদিবুদ্ধিরূপা।

অন্বয়ঃ। অবিদ্যা (এব) তস্য হেতুঃ (অস্তি কথ্যতে বা ইতিশেষঃ)।

ভাবার্থঃ। যা পূর্ব্বং বিপর্য্যয়াত্মিকা মোহরূপা অবিদ্যা উক্তা সা এব ভ্রান্তিবাসনা তস্য দ্রষ্টৃদৃশ্যজ্ঞানহেতুভূতস্য বুদ্ধিপুরুষসংযোগস্য হেতুঃ কারণং। তথাপি অহমিতি দৃগদৃশ্যয়োরভেদ ভ্রান্তিঃ তদ্বাসনাধ্যবসিতং চিত্তং প্রলয়ে লীনং প্রধানভাবমুপগতং সর্গকালে পুরুষং প্রতি সত্ত্বেনৈব জায়তে, তেন সংযোগেনাবিবেকিনো বন্ধো বিবেকিনো মোক্ষশ্চ ভবতি। অনয়া হ্যনাদিবাসনাচিত্রয়া চিত্তবর্ত্তিন্যা অবিদ্যয়া সমন্ততোঽনুবিদ্ধং পুরুষং পশুং স্বকর্ম্মোপহৃতং দুঃখমুপাত্তং ত্যক্তত্যক্তং ত্যক্তমুপাদদানং হাতব্যে এবাত্মহঙ্কারমমকারানুপাতিনং, জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিকাভয়নিমিত্তা স্ত্রিপর্ব্বাণ স্তাপা অনুপ্লবন্তে।

অনুবাদ। অবিদ্যাই পূর্ব্বকথিত সংযোগের কারণ।

সমালোচন। পূর্ব্বে যে সমুদয় প্রাকৃত বস্তু এবং চৈতন্য বলা হইয়াছে, এই উভয়ের জ্ঞানের কারণ বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ সেই সংযোগের প্রতি আবার অবিদ্যা কারণ। অবিদ্যা হইতেই সেইরূপ সংযোগ উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান যাহা যাহা নয় তাহাকে তাহা বলিয়া ভ্রান্তি, যাহা আত্মা নয় তাহাকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা হয়,—এইরূপ ভ্রম। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই অবিদ্যা নিবন্ধন বন্ধন তাহার উপর আধিপত্য করে। প্রলয়কালে ঐ অবিদ্যাজনিত বাসনা বা এক প্রকার সংস্কার প্রধানে লীন হইয়া থাকে। পুনরায় সৃষ্টিকালে প্রকৃতি সেই সংস্কাররূপে লীন অবিদ্যার প্রভাবে পূর্ব্বসর্গে যে পুরুষের যেরূপ বুদ্ধি ছিল, সেই পুরুষের সেইরূপ বুদ্ধির সহিত যোগ করিয়া দেন। এইরূপ যতকাল অবিদ্যার কার্য্য শেষ না হয়, ততকাল পুরুষের মুক্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত ইহ সংসারে জীব মাত্রেই বারম্বার গতায়াত করে। এবং প্রত্যেক নূতন জন্মে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অনুসারেই বুদ্ধি আসিয়া পুরুষের সহিত মিলিত হয়। এই নিমিত্ত আমরা কাহাকে সৎ, শান্ত, ধর্ম্মিষ্ঠ, বিদ্যানুরক্ত ইত্যাদি নানা সদ্‌গুণে সুভূষিত দেখিতে পাই, আর কাহাকে বা ঠিক তাহার বিপরীত দেখিতে পাই। কেহ বা জন্মাবধিই হিরণ্যকশিপু, বৃদ্ধকাল অবধি সম্পূর্ণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন,

ভোগ্যস্য ভোগ্যত্বং ভোক্তুশ্চ ভোক্তৃত্বমনাদিসিদ্ধং সএব সংযোগঃ। স চ সংযোগোবুদ্ধি দ্বারকঃ, দৃশ্যবুদ্ধিসত্ত্বোপাধিরূপাঃ সর্ব্বে ধর্ম্মা ইতি দৃশ্য বত্যা বুদ্ধ্যা সংযোগ এবাত্র সংযোগ বিশেষঃ। তথাহি—"আত্মেন্দ্রিয় মনোযুক্ত" ভোক্তৃত্যাহুর্মনীষিণঃ।" ইত্যাদি শ্রুত্যাদিভ্যো লিঙ্গ দেহাত্মসংযোগাদেবাত্মনো বিষয়দর্শনাহবগমাত্।

অনুবাদ। স্ব অর্থাৎ দৃশ্য, স্বামী অর্থাৎ দ্রষ্টা এই উভয় বিধ শক্তির স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি সংযোগই কারণ।

সমালোচন। স্ব শব্দের মুখ্য অর্থ আত্মীয় অর্থাৎ অধিকৃত বা ভোগ্য বস্তু। এখানে স্ব শব্দের অর্থ প্রাকৃত বস্তু সমুহ, কারণ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সমুদয় বস্তুই পুরুষের ভোগ্য বলিয়া, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। স্বামী শব্দের মুখ্য অর্থ অধিকারী বা ভোক্তা। এখানে স্বামী শব্দের অর্থ চৈতন্য, যাহা সাংখ্য শাস্ত্রে পুরুষ বলিয়া প্রসিদ্ধ, কারণ সাংখ্যমতে একমাত্র চৈতন্যই সমুদয় প্রাকৃত বস্তুর ভোক্তা। ইহাদের শক্তি বলিতে স্বরূপ; পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এক্ষণে তাহাদের জ্ঞান কিরূপে হয়, তাহাই বলা হইতেছে। প্রাকৃত বস্তু সমূহের জ্ঞানের নাম ভোগ এবং পুরুষ জ্ঞান হইতেই মোক্ষ হয়। এই উভয়ের স্বরূপ জ্ঞানের প্রতি বুদ্ধি ও পুরুষের পরস্পর সংযোগই কারণ, প্রাকৃত বস্তু মাত্র জড় রূপ উহারা আপনাকে আপনি প্রকাশ করিতে অক্ষম এবং চৈতন্যরূপী পুরুষও স্বভাবত উদাসীন তাঁহারও আত্মস্বরূপ জ্ঞানের নিমিত্ত প্রবৃত্তি নাই। বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ বশতই উভয়ের জ্ঞান হইয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত এই উভয়ের সংযোগ না হয়, সে পর্য্যন্ত চৈতন্য সর্ব্ব জ্ঞান সমর্থ হইয়াও প্রবৃত্তি না থাকায় কিছু দর্শন করেন না। কাজেই তাঁহার দ্রষ্টৃত্ব এবং প্রাকৃত বস্তুর দৃশ্যত্ব কিছুই থাকে না। বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগে যে আমাদের সমুদয় জ্ঞান হইতেছে, ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

তস্য হেতুরবিদ্যা ॥ ২৪।

পদচ্ছেদঃ। তস্য, হেতুঃ, অবিদ্যা।

পদার্থঃ। তস্য পূর্ব্বোক্তস্য সংযোগস্য হেতুঃ কারণং, অবিদ্যা পূর্ব্ব মুক্তা আত্মা-দ্বাবনাত্মাভিবুদ্ধিরূপা।

অন্বয়ঃ। অবিদ্যা (এব) তস্য হেতুঃ (অস্তি কথ্যতে বা ইতি শেষঃ)।

ভাবার্থঃ। যা পূর্ব্বং বিপর্য্যয়াত্মিকা মোহরূপা অবিদ্যা উক্তা সা এব ভ্রান্তিবাসনা তস্য দ্রষ্টৃদৃশ্যজ্ঞানহেতুভূতস্য বুদ্ধিপুরুষসংযোগস্য হেতুঃ কারণং। তথাপি অহমিতি দৃগ্‌দৃশ্যয়োরভেদ ভ্রান্তিঃ তদ্বাসনাধ্যবসিতং চিত্তং প্রলয়ে লীনং প্রধানভাবমুপগতং সর্গকালে পুরুষং প্রতি সত্ত্বেনৈব জায়তে, তেন সংযোগেনাবিবেকিনো বন্ধো বিবেকিনো মোক্ষশ্চ ভবতি। অনয়া হ্যনাদিবাসনাচিত্রয়া চিত্তবর্ত্তিন্যা অবিদ্যয়া সমংততোনুবিদ্ধং পুরুষং পতং স্বকর্ম্মোপহতং দুঃখমুপাত্তং ত্যক্তন্তং তাক্ত মুপাদধানং হ্যাত্যব্যে এবাত্ম অহঙ্কারমমকারানুপাতিনং, জাতং বাহ্যাধ্যাত্মিচকাভয়নিমিত্তা স্ত্রিপর্ব্বাণ স্তাপা অনুপ্লবন্তে।

অনুবাদ। অবিদ্যাই পূর্ব্বকথিত সংযোগের কারণ।

সমালোচন। পূর্ব্বে যে সমুদয় প্রাকৃত বস্তু এবং চৈতন্য বলা হইয়াছে, এই উভয়ের জ্ঞানের কারণ বুদ্ধি ও পুরুষের সংযোগ সেই সংযোগের প্রতি আবার অবিদ্যা কারণ। অবিদ্যা হইতেই সেইরূপ সংযোগ উৎপন্ন হয়। অবিদ্যা শব্দের অর্থ বিপর্য্যয় জ্ঞান বা মিথ্যা জ্ঞান যাহা যাহা নয় তাহাকে তাহা বলিয়া ভ্রান্তি, যাহা আত্মা নয় তাহাকে আত্মা বলিয়া বিবেচনা হয়,—এইরূপ ভ্রম। মনুষ্য যে পর্য্যন্ত মুক্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত এই অবিদ্যা নিবন্ধন বন্ধন তাহার উপর আধিপত্য করে। প্রলয়-কালে ঐ অবিদ্যাজনিত বাসনা বা এক প্রকার সংস্কার প্রধানে লীন হইয়া থাকে। পুনরায় সৃষ্টিকালে প্রকৃতি সেই সংস্কাররূপে লীন অবিদ্যার প্রভাবে পূর্ব্বসর্গে যে পুরুষের যেরূপ বুদ্ধি ছিল, সেই পুরুষের সেইরূপ বুদ্ধির সহিত যোগ করিয়া দেন। এইরূপ যতকাল অবিদ্যার কার্য্য শেষ না হয়, ততকাল পুরুষের মুক্তি হয় না। যে পর্য্যন্ত মুক্তি না হয় সে পর্য্যন্ত ইহ সংসারে জীব মাত্রেই বারম্বার গতায়াত করে। এবং প্রত্যেক নূতন জন্মে পূর্ব্ব জন্মের সংস্কার অনুসারেই বুদ্ধি আসিয়া পুরুষের সহিত মিলিত হয়। এই নিমিত্ত আমরা কাহাকে সৎ, শান্ত, ধর্ম্মিষ্ঠ, বিদ্যানুরক্ত ইত্যাদি নানা সদ্‌গুণে সুভূষিত দেখিতে পাই, আর কাহাকে বা ঠিক তাহার বিপরীত দেখিতে পাই। কেহ বা জন্মাবধিই হিরণ্যকশিপু, বৃদ্ধকাল অবধি সম্পূর্ণ অজ্ঞানে আচ্ছন্ন,

মহাগর্ব্বে গর্ব্বিত, ইচ্ছাপূর্ব্বক জগতের ঈশ্বরের সহিত বিবদমান, আর কেহ বা জন্মাবধিই প্রহ্লাদ, ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি হরি গানে উন্মত্ত। পূর্ব্ব জন্মের বুদ্ধি সংযোগই এইরূপ বিচিত্রতার কারণ। তাহা না হইলে প্রতি সর্গে সমুদয় মনুষ্যের একরূপই বুদ্ধি হইত, সকলেই হিরণ্যকশিপু বা প্রহ্লাদ হইত। প্রহ্লাদ, হিরণ্যকশিপু ইত্যাদি বহুবিধ লোকের উৎপত্তি হইত না, এই নিমিত্ত মহা কবি মাঘ বলিয়াছেন,

"সতী চ যোষিৎ প্রকৃতিশ্চ নিশ্চলা
পুমাংস মভ্যেতি ভবান্তরেষ্বপি।"

আমাদের দেশে সাধ্বী স্ত্রীর সতীত্ব সম্বন্ধে লোকের মনের ভাব অতি চমৎকার। কেবল ইহ জন্মে পতির প্রতি অনুরক্ত হইয়া অপর পুরুষের প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিলেই সতী হয় না। যে জন্ম জন্মান্তরেও এক পতির সঙ্গ ত্যাগ না করে, সেই সতী। এই নিমিত্ত রাম কর্ত্তৃক নির্ব্বাসিতা সীতা বাল্মীকির আশ্রমে যখন গঙ্গাস্রোতে পতিত হন, তখন এই বলিয়া পতিত হইলেন যে সেই রামচন্দ্রই যেন আবার আমার পুনর্জ্জন্মে পতি হয়েন। এই সংস্কার বশেই মহাকবি মাঘ বলিতেছেন যেমন সতী স্ত্রী প্রতি জন্মেই আপনার নির্দ্দিষ্ট পতিকে প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ লোকের স্বভাব বা বুদ্ধিবৃত্তিও জন্মান্তরে পূর্ব্বে যে পুরুষের ছিল, সেই পুরুষকেই প্রাপ্ত হয়।

তদভাবাৎ সংযোগাভাবো হানং তদ্দৃশেঃ কৈবল্যম্ ॥ ২৫।

পদচ্ছেদঃ। তৎ-অভাবাৎ, সংযোগ-অভাবঃ, হানং, তৎ, দৃশেঃ, কৈবল্যম্।

পদার্থঃ। তস্যা অবিদ্যায়া অভাবঃ, উন্মূলনং তস্মাৎ, সংযোগস্য উক্তরূপস্য অভাবঃ, স এব হানং বন্ধাভাবরূপং তৎ হানং দৃশেঃ পুরুষস্য কৈবল্যং কেবলস্য ভাবঃ, মোক্ষ ইতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। তদভাবাৎ যঃ সংযোগাভাবঃ (তদেব) হানং (ইত্যুচ্যতে), তচ্চ দৃশেঃ কৈবল্যং (ইত্যুচ্যতে)।

ভাবার্থঃ। দ্রষ্টৃ দৃশ্য স্বরূপ জ্ঞানরূপেণ তত্ত্বজ্ঞানেন অবিদ্যায়া বিনাশাত্ উন্মূলনাদিতি যাবত্, তৎকার্য্যস্য, বুদ্ধিপুরুষসংযোগস্য নিবৃত্তির্ভবতি,

তস্মাচ সংযোগনিবৃত্ত্যা দৃগ্‌দৃশ্যয়োঃ, স্ব স্বামিভাবোজ্ঞাতৃজ্ঞেয়ভাবো. নিবর্ত্ততে জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবোহি বন্ধঃ,ততশ্চ জ্ঞাতৃজ্ঞেয় ভাবনিবৃত্তিরেব বন্ধাভাবঃ হানং ইত্যুচ্যতে এতদেব নিত্যমুক্তায়া দৃশেঃ পুরুষস্য কৈবল্যং স্ব স্বরূপ তাধিগমঃ মোক্ষ ইতি যাবৎ।

অনুবাদ। সেই অবিদ্যার উন্মূলন হইলে বুদ্ধির সহিত পুরুষের সংযোগেরও অভাব হয়। বুদ্ধি পুরুষের সংযোগের অভাবই বন্ধনাভাব এবং সেই বন্ধনের অভাবই কৈবল্য বা মোক্ষ।

সমালোচন। অবিদ্যাই এই সংসারের মূল। অবিদ্যাবশেই বিশুদ্ধচৈতন্য স্বরূপ পুরুষের অহঙ্কার "আমি আমার" ইত্যাদি ভ্রম হয়। যত দিন পর্য্যন্ত এই ভ্রমের নিবৃত্তি না হয়, তত দিন অবধি পুরুষ এই সংসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকেন, আপনার স্বাভাবিক বিশুদ্ধ স্বরূপ লাভ করিতে সমর্থ হন না। এই অবিদ্যার নিবৃত্তি এক জন্মে হয় না। যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান না হয়, সে পর্য্যন্ত অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে অবিদ্যার নিবৃত্তি হয়, অবিদ্যার নিবৃত্তি হইলে বন্ধনেরও আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়, আর কখনও বন্ধন হয় না। বন্ধনের নিবৃত্তি হইলে পুরুষ আপনার স্বাভাবিক নির্ম্মল চৈতন্য স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তখন "আমি, আমার" এরূপ বুদ্ধি থাকে না পুরুষের বিশুদ্ধ চৈতন্য ভাবই কেবল অবস্থিত হয়। কৈবল্য শব্দের অর্থ কেবল ভাব, অমিশ্রভাব বিশুদ্ধ চৈতন্যরূপতা। ইহার নামই মোক্ষ।

বন্ধনাভাব কাহাকে বলে তাহা বলা হইল। কি উপায়ে সেই বন্ধনাভাব হয় তাহা বলিবার নিমিত্ত সূত্রকার পরসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন।

বিবেকখ্যাতি রবিপ্লবা হানোপায়ঃ॥ ২৬।

পদচ্ছেদঃ। বিবেক খ্যাতিঃ, অ-বিপ্লবা, হান-উপায়ঃ।

পদার্থঃ। অন্যে প্রাকৃতা গুণাঃ, অন্যশ্চ পুরুষঃ, ইত্যেবং রূপস্য বিবেকস্য তত্ত্বজ্ঞানস্য খ্যাতিঃ প্রখ্যা, ন বিদ্যতে বিপ্লবোবিচ্ছেদাইস্থরায়ো বা যস্যাঃ সা অবিপ্লবা ইতি, হানস্য দুঃখ মূলক বন্ধনাভাবস্য উপায়ঃ কারণং সাধন মিতি যাবৎ।

অন্বয়ঃ। অবিপ্লবা বিবেক খ্যাতিঃ হানস্য উপায়ো ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। দৃগ্দৃশ্যয়োর্ভেদো বিবেক স্তস্য খ্যাতির্জ্ঞানং, অথবা দৃগ্দৃশ্যয়োর্ভেদ জ্ঞানং বিবেকঃ তস্য খ্যাতিঃ প্রকাশঃ। প্লবতে মিথ্যা-জ্ঞান সংস্কার বশাৎ চ্যবতে, মিথ্যা জ্ঞানেনাঽন্তরাঽন্তরাঽভিভূয়তে ইতি বিপ্লবায়া ন তথা ভবতি সা অবিপ্লবা। যদাতু নির্ম্মলো বিবেকখ্যাতি প্রবাহো মিথ্যা জ্ঞানাঽকলুষিতো ভবতি তদা সা বিবেক-খ্যাতিরবিপ্লবো-চ্যতে, ইদমুক্তং ভবতি আদৌ খল্বাগমাত্ সামান্যতো বিবেকখ্যাতিক দেতি সা নাঽ বিদ্যাং হন্তি পরোক্ষত্বাৎ, যদা সা মননে স্থাপিতা সতী সর্ব্বতো বিবক্তেন পুরুষাভিমুখেন চিত্তেনাভ্যস্যতে, তদাধ্যান-প্রকর্ষ-পর্য্যন্ত জা চিৎপ্রতিবিম্বিতা সাক্ষাৎকার রূপা বাসনা মিথ্যা জ্ঞানং নিহত্যাবিপ্লবা সতী পরবৈরাগ্য পূর্ব্বকনিরোধে চ সংস্কার শেষস্য-কৃত কৃতস্য প্রারব্ধাবসানে আত্যন্তিক নিবৃত্তি দ্বারা ভাবি দুঃখ হানস্য মোক্ষস্য উপায় ইত্যর্থঃ।

অনুবাদ। অবিচ্ছিন্ন বিবেক খ্যাতিই বন্ধনাভাব বা মোক্ষের উপায়।

সমালোচন। বন্ধনের অভাবই মোক্ষ ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ঐ বন্ধনের কারণ অবিদ্যা, অবিদ্যা উন্মূলিত হইলে বন্ধনও উন্মূলিত হয়; একমাত্র তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা অবিদ্যা উন্মূলিত হয়। এ সকল কথাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। সেই তত্ত্বজ্ঞান কিরূপ হইলে এককালে চিরদিনের নিমিত্ত অবিদ্যাকে উন্মূলিত করে সুতরাং স্থায়ী বন্ধনাভাব উৎপাদন করে, এক্ষণে তাহাই বলা হইতেছে। তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেক খ্যাতি বলিতে প্রকৃতি এবং তদুৎপন্ন বস্তু সমূহের সহিত পুরুষের ভেদজ্ঞান। প্রাকৃত বস্তুমাত্রই সত্ত্ব, রজঃ, ও তমোগুণাত্মক সুতরাং সুখ, দুঃখ ও মোহস্বভাব; পুরুষ স্বভাবত বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। তিনি স্বভাবত নির্লিপ্ত, নির্গুণ এবং ক্রিয়াহীন। প্রকৃত বস্তুমাত্রই পরিণামী; প্রতিক্ষণেই রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, পুরুষ অপরিণামী; শত-সহস্র যুগ যুগান্তেও একই রূপে অবস্থান করে। এইরূপ বোধের নাম তত্ত্ব-জ্ঞান বা বিবেক খ্যাতি। এই বোধ আমাদের শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন বা শ্রবণ দ্বারা কিছু কালের জন্য হয় বটে, কেবল শাস্ত্র অধ্যয়ন কেন ইচ্ছার ব্যাঘাত বা প্রিয় বস্তুর বিনাশাদি দর্শনেও আমাদের মনে সংসারের অসা-রতা এবং সাংসারিক বস্তুমাত্রেরই দুঃখদায়িতা বোধ হয়; উহাকে সচরাচর লোকে শ্মশানবৈরাগ্য বলে; কিন্তু প্রবল অবিদ্যা প্রভাবে উহা অতি

অল্পক্ষণের মধ্যেই অন্তর্হিত হয়। বর্ষাকালে ঘোরঘনঘটাচ্ছন্ন নভোমণ্ডলে ক্ষণপ্রভার প্রকাশ যেমন ক্ষণস্থায়ী, ঘোর অবিদ্যাদ্বারা অভিভূত সাংসারিক ব্যক্তির হৃদয়ে তত্ত্ব জ্ঞানের প্রকাশ ও সেইরূপ ক্ষণস্থায়ী। এই জন্য সূত্রকার বলিতেছেন, অবিপ্লবা বিবেক খ্যাতিই বন্ধনাভাবের উপায়। বিপ্লব শব্দের অর্থ মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যা যখন ঐ বিবেকখ্যাতি অবিদ্যার সম্পর্ক শূন্য হয় তখনই উহা বন্ধনকে উন্মূলিত করে। শাস্ত্রাদি হইতে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়া দীর্ঘকাল, নিরন্তর শ্রদ্ধার সহিত উহার অনুশীলন করিতে করিতে উহা যখন হৃদয়ে দৃঢ়তাপ্রাপ্ত হইয়া পুরুষের প্রাকৃত বস্তু হইতে ভিন্নভাব এবং বিশুদ্ধ চৈতন্য রূপতার সাক্ষাৎকার লাভ করে, তখনই উহাদ্বারা চির বদ্ধমূল সংস্কার সমূহের সহিত মিথ্যাজ্ঞান বা অবিদ্যার উন্মূলন হয়। তখনই "আমি বা আমার" জ্ঞান অন্তর্হিত হয়। অর্থাৎ তখনই জানিতে পারা যায়, এই যে চিরদিন আমি আমার বলিয়া জ্ঞান করিয়া আসিতেছিলাম উহা সম্পূর্ণ ভ্রমমূলক। বস্তুগত্যা "আমি" বলিয়া কোন একটা পদার্থ নাই আর "আমিই" যদি না থাকি, তবে "আমারও" কিছুই নাই। কেবল জড় ও চৈতন্যের একবার অনির্ব্বচনীয় সন্নিকর্ষ বশতই "আমি" ও "আমার" এইরূপ জ্ঞান হইয়াছিল। যখন জড় ও চৈতন্য পরস্পর নিঃসম্পর্ক, সম্পূর্ণ বিভিন্ন, একের সহিত অন্যের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নাই, একের বিনাশে বা বৃদ্ধিতে অপরের কিছুমাত্র ক্ষয় বা বৃদ্ধি নাই ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল তখন সকল ভুলই ভেঙ্গে গেল। সংসার বন্ধন ছুটিয়া গেল। চৈতন্য জড় হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। জড় হইতে চৈতন্যের পৃথকভাবে অবস্থিতির নামই মোক্ষ। এবং ঐ রূপ পৃথকভাবের একমাত্র উপায় সুদৃঢ় তত্ত্বজ্ঞান। কারণ যে পর্য্যন্ত তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ়তা লাভ না করে, সে পর্য্যন্ত মিথ্যাজ্ঞান প্রবল থাকে, তত্ত্বজ্ঞান দৃঢ় হইলে মিথ্যাজ্ঞান বিলুপ্ত হয় এবং সেই সঙ্গে মিথ্যাজ্ঞানসম্ভূত সংসারবন্ধনও বিনষ্ট হয়।

তস্য সপ্তধা প্রান্ত ভূমিঃ প্রজ্ঞা। ২৭।

পদচ্ছেদঃ। তস্য, সপ্তধা, প্রান্ত-ভূমিঃ, প্রজ্ঞা।

পদার্থঃ। তস্য প্রত্যুদিতখ্যাতেঃ জীবিনঃ, সপ্তধা সপ্ত প্রকারা,প্রান্তভূমি প্রকৃষ্টোঽন্তো যাসাংতাঃ প্রান্তাঃ প্রান্তা ভূমযোঽবস্থা যস্যাঃ সা প্রান্তভূমিঃ, প্রজ্ঞা বিবেকখ্যাতিঃ।*

অন্বয়ঃ। তস্য প্রান্তভূমিঃ প্রজ্ঞা সপ্তধা ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। প্রত্যুৎপন্ন বিবেকজ্ঞানস্য অবিদ্যা কার্য্য পাপাদিরূপচিত্তা-চ্ছাদকানাং মলানাং অপগমাৎ নাশাৎ হেতোবিবেক-খ্যাতিভিন্নানাং প্রত্যয়ানাং অনুৎপত্তৌ সত্যাং পরবৈরাগ্যজান্নিরোধযোগাদুত্থান দশায়াং প্রজ্ঞা জ্ঞানং বিবেক খ্যাতি রিতিযাবৎ সপ্ত প্রকারাভবতি। তদ্যথা—

(১) জ্ঞাতং মে জ্ঞেয়ং ন জ্ঞাতব্যং কিঞ্চিদস্তি। (২) ক্ষীণা মে হেয হেতবঃ ক্লেশাঃ ন পুনর্মে কিঞ্চিতৎ ক্ষেতব্য মস্তি। (৩) অধিগতং ময়া নিরোধসমাধিনা হানং। (৪) অধিগতো ময়া বিবেক খ্যাতিরূপো হানো পায়ঃ এষা চতুষ্টয়ী কার্য্য বিমুক্তিরূপা। (৫) চরিতার্থা মে বুদ্ধিঃ। (৬) গুণাশ্চ মে কৃতাধিকারাঃ গিরিশিখরনিপতিতা ইব গ্রাবাণো ন পুনঃ স্থিতিং যাস্যন্তি, স্বকারণে প্রলয়াঽভিমুখানাং মোহাভিধান মূল কারণাভাবান্নিষ্প্রয়ো-জনতা চামীষাং কুতঃ প্ররোহঃ? (৭) স্বাত্মীভূতশ্চ মে সমাধি স্তস্মিন্ সতিস্বরূপ প্রতিষ্ঠোঽহ মিতি। ঈদৃশী ত্রিঃ প্রকারা চিত্ত বিমুক্তি রূপা।

অনুবাদ। পূর্ব্বোক্তরূপ বিপ্লবশূন্য অর্থাৎ নিরবচ্ছিন্ন বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হইলে সাত প্রকার জ্ঞান হইয়া থাকে।

সমালোচন। পূর্ব্ব সূত্রে বলা হইল যে বিবেক খ্যাতি নিরবচ্ছিন্ন হইলে মিথ্যা জ্ঞান বা ভ্রান্তির দগ্ধবীজের ন্যায় কার্য্যকারিণী শক্তি নষ্ট হওয়ায় আর তাহার কোন প্রকার কার্য্য দৃষ্ট হয না। মিথ্যা জ্ঞানের কার্য্য বিলোপই মোক্ষের পথ ও বন্ধনাভাবের উপায়। এক্ষণে সেই বিবেক খ্যাতি উৎপন্ন হইলে মনের অবস্থা কিরূপ হয অর্থাৎ সেই বিবেক খ্যাতির স্বরূপ কি তাহাই বলা হইতেছে। ভাষ্যকার বলেন সূত্রে যে 'তস্য' আছে ইহা

---

* আসিয়াটিকসোসাইটির মুদ্রিত ভোজবৃত্তির সহিত পাতঞ্জল সূত্রে "তস্য সপ্তধা প্রান্তভূমৌ প্রজ্ঞা" এই রূপ পাঠ আছে। ভোজরাজ তাহার অর্থ এইরূপ করিয়াছেন। 'তস্য উৎপন্ন বিবেক জ্ঞানস্য জ্ঞাতব্য বিবেক রূপা প্রজ্ঞা প্রান্ত ভূমৌ সকল সাবলম্বন সমাধি পর্য্যন্তং সপ্তপ্রকারা ভবতি।'

দ্বারা যাহার অবিপ্লব বিবেক খ্যাতির উদয় হইয়াছে এইরূপ ব্যক্তিকে বুঝিতে হইবে, নতুবা সূত্রের অর্থ হয় না।

যে ব্যক্তির বিবেক খ্যাতি নিরবচ্ছিন্ন অর্থাৎ মিথ্যাজ্ঞানের সম্পর্ক শূন্য হওয়ায় ধারাবাহিকরূপে দৃঢ় হইয়াছে অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ কি ও শক্তি কত দূর এবং পুরুষের স্বরূপ কি, আর সামর্থ্যই বা কি, ইহা ভালরূপে বুঝিয়াছে, যে ব্যক্তি জড় ও চৈতন্যের পৃথক্ নিশ্চয় করিয়া তাহাদিগকে আর মিশ্রিত না করিয়া পরস্পরের অমিশ্র ভাবের দৃঢ়রূপে ধারণা করিতে সক্ষম হইয়াছে, এইরূপ ব্যক্তির চিত্তের আবরক মিথ্যা জ্ঞানের অপগম অর্থাৎ উন্মূলন হয়। যে পর্য্যন্ত মনুষ্য জড় ও চৈতন্য এই উভয়ের তত্ত্ব না বুঝে, সেই পর্য্যন্ত ঐ উভয়কে অভিন্ন ভাবিয়া জড়ে চৈতন্যের আরোপ করিয়া "আমি অমুক, আমার নিজের গৌরব, আমার কুলের গৌরব, আমার দেশের গৌরব, আমার জাতির গৌরব—রক্ষা করিবার নিমিত্ত এই সকল কার্য্য আমার অবশ্য কর্ত্তব্য, আমার নিজের সুখ, আমার সন্তান সন্ততির সুখ, আমার পরিবারবর্গের সুখের জন্য ছলে, বলে, কৌশলে যেরূপে হউক কিছু ধন উপার্জ্জন না করিলে নয়। আমার অবর্ত্তমানে আমার স্ত্রী পুত্র যে দ্বারে দ্বারে উদরান্নের জন্য লালায়িত হইবে, ইহা বড়ই অসহ্য অতএব কেবল উপার্জ্জন করিলে কি হইবে কিছু কিছু সঞ্চয়েরও আবশ্যক, এইরূপ নানা প্রকার চিন্তার তরঙ্গে আকুলিত হইয়া সর্ব্বদা অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করিয়া কালযাপন করে ক্ষণকালের জন্য স্থিরতা লাভ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু জড় ও চৈতন্য পরস্পর সম্পূর্ণ বিভিন্ন পরস্পরের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই জল ও তৈলাদি স্নেহ পদার্থ যেমন ঘটনাক্রমে একত্রিত হইলেও যেমন পরস্পর মিশ খায় না পরস্পর পার্থক্য রক্ষা করে জড় ও চৈতন্যও সেইরূপ। এই, তত্ত্বজ্ঞান যখন মনে দৃঢ়রূপে বদ্ধমূল হয়, তখন আর উভয়ের অভেদরূপ মিথ্যা-জ্ঞান থাকে না। সুতরাং সেই মিথ্যাজ্ঞান নিবন্ধন "আমি" "আমার" প্রভৃতি যে অসংখ্য জ্ঞান তরঙ্গ উত্থিত হইয়াছিল সে সকল এককালে নিবৃত্ত হয় তখন একমাত্র বিবেক খ্যাতি বা তত্ত্বজ্ঞান চিত্তকে অধিকার করে। ঐ তত্ত্বজ্ঞান অবস্থাভেদে সাত প্রকার হয়। যথা (১) আমি যাহা জানিবার তাহা জানিয়াছি আর আমার জানিবার কিছুই নাই। (২) এই তত্ত্বজ্ঞান

লাভ করায় আমার দুঃখের হেতু অবিদ্যা আদি ক্লেশসকল ক্ষীণ হইয়াছে আর তাহারা আমার উপর প্রভুত্ব করিতে পারিবে না, যখন তাহাদের পরিত্যাগ করিয়াছি তখন আর আমার পরিত্যাগ করিবার কিছু নাই। (৩) অবিদ্যাদি ক্লেশের উন্মূলন করায় আমি বন্ধনাভাবও প্রাপ্ত হইয়াছি, কারণ এই ক্লেশেরাই বন্ধনের কারণ; যখন ইহাদের আর কার্য্যকারিণী শক্তি নাই তখন পুনরায় আমার বন্ধন হইবারও সম্ভাবনা নাই। (৪) আমি বন্ধনাভাব বা মোক্ষের উপায় তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিয়াছি। এই চার প্রকার অবস্থাপন্ন বিবেক খ্যাতি বা তত্ত্বজ্ঞান হইতে জীবের কার্য্য হইতে বিমুক্তি লাভ হয়। কোন কর্ত্তব্যে প্রবৃত্তি না হওয়ায় কর্ম্মজন্য বন্ধন হইবার সম্ভাবনা থাকে না, ইহাকেই জীবন্মুক্তি বলা যায়। (৫) আমার বুদ্ধি চরিতার্থ হইয়াছে, আপনার কর্ত্তব্য শেষ করিয়াছে, ভোগ এবং অপবর্গ উভয়ই প্রাপ্ত হইয়াছে। (৬) বুদ্ধির গুণ বা ধর্ম্ম সাংসারিক সুখ, দুঃখ, মোহ আদি ইহারাও আপনার আপনার কার্য্য শেষ করিয়া স্বীয় কারণ সত্ত্ব, রজস্তমোময় প্রকৃতিতে লীন হইয়াছে; যেমন পর্ব্বতের শিখরদেশ হইতে প্রচ্যুত উপলখণ্ড পুনর্ব্বার স্বস্থানে থাকিতে সমর্থ হয় না, সেইরূপ ঐ গুণসকল আপন আপন কার্য্য করিয়া হীনশক্তি হইয়াছে আর উহারা পুনরায় কার্য্য করিতে সক্ষম হইবে না, আর যে উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য ইহাদের সৃষ্টি হইয়াছিল সেই উদ্দেশ্যের যখন সিদ্ধি হইল অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানরূপ পুরুষার্থ লাভ হইল তখন প্রয়োজন না থাকায় ইহাদের পুনরুদ্ভবেরও সম্ভাবনা নাই। (৭) এক্ষণে সমাধি আমার আয়ত্ত হইয়াছে আমি মনে করিলেই চিত্তকে সম্পূর্ণ স্থির করিয়া বিশুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপে অবস্থান করিতে পারি। এই শেষোক্ত তিন অবস্থাকে চিত্ত বিমুক্তি বলে। ইহারা ক্রমে ক্রমে চিত্তকে বৃত্তিশূন্য করিয়া একেবারে অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় লইয়া যায়। চিত্ত নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপের মত স্থিরভাব ধারণ করে এবং চৈতন্য আপনার স্বাভাবিক নির্ম্মল জ্যোতিঃস্বরূপে অবস্থান করে। সে অবস্থা অতি চমৎকার; অতি গভীর ভাব-পূর্ণ, কল্পনার অতীত, স্মরণ করিলেও লোমাঞ্চ হয়। জড় আপনার জড়ত্ব বুঝিতে পারিয়া যেন ভয়ঙ্কর আত্মগ্লানিতে নিস্তব্ধ হইয়া আপনার স্বাভাবিক ধর্ম্ম স্থিরতা অবলম্বন করিয়া গম্ভীরভাবে অবস্থান করিতেছে এবং চৈতন্যও আপনার স্বাভাবিক নির্ম্মল

জ্যোতিঃ স্বরূপতা জানিতে পারিয়া পুনরায় আবার জড় সম্পর্কে মলিন হইবার ভয়ে যেন উহা হইতে পৃথক্ হইয়া ঔদাসীন্য অবলম্বন করিয়াছে; দম্পতির প্রণয় মানের অবস্থা যদি কাহারও প্রত্যক্ষ থাকে তিনিই সেই অসম্প্রজ্ঞাত সমাধির গূঢ় রহস্যের কিঞ্চিৎ ছায়া অনুভব করিতে পারিবেন।

কলিকাতার বাল্য-দৃশ্য।

কলিকাতা সম্বন্ধীয় যাহা কিছু প্রাচীন, যতদূর সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছি, তাহা আমরা পাঠকদিগকে জ্ঞাত করিয়াছি। এক্ষণে, যে সময়ে মোগল সাম্রাজ্যান্তর্গত বাঙ্গালার মুসলমান বাণিজ্য কেন্দ্র হুগলী নগর হইতে অন্তরিত হইয়া সুতানুটী, হিজলী, উলুবেড়িয়া প্রভৃতি স্থান সমূহে পর্য্যায়ক্রমে বাণিজ্যাগার (কুঠি) সংক্রান্ত উপনিবেশ সংস্থাপনে অকৃতকার্য্য হয়, অবশেষে, ঘটনাচক্রে জব চার্ণক ইংরেজের পূর্ব্ব-ভারত বণিক-সমিতি সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম্মচারী ও দ্রব্যাদি সহকারে পুনর্ব্বার ১৬৯০ খ্রীষ্টাব্দে সুতানুটী গ্রামে প্রত্যাবর্তন করিয়া উক্ত সমিতির উপনিবেশ ও বাণিজ্য-কুঠি সংস্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, সেই সময়ে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্ব বা পরবর্ত্তী সময়ে কলিকাতার সাধারণ দৃশ্য কিরূপ ছিল, পাঠকদিগের কৌতূহল পরিতৃপ্তির জন্য, তাহারই একটি চিত্র অঙ্কিত করাই বর্ত্তমান প্রবন্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত যে সময়ের চিত্র অঙ্কিত করিতে আমরা প্রবৃত্ত হইতেছি, সে সময়ের কলিকাতা সম্বন্ধে লিখিত বিষয় কোন পুস্তক বা দলিলে এরূপ অল্প ও অসম্পূর্ণ ভাবে লিখিত আছে যে, কয়েকটি সাধারণ বিষয় ব্যতীত কিছু অধিক অবগত হওয়া অতীব সুকঠিন। সে যাহাই হউক, এবম্প্রকার অসুবিধা থাকিলে ও যাহাতে বিবিধ সূত্র হইতে চয়ন করিয়া অদ্যকার এই সম্পূর্ণ বিকশিত মহানগরীর ন্যূনাধিক দুই শতাব্দী পূর্ব্বের চিত্র পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতে সমর্থ হই, সেই বিষয়ে আমরা সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটি করিব না।

ইঙ্গরেজগণের কলিকাতায় প্রথম আগমনকালে অথবা প্রায় দুই শতাব্দী কাল (১) পূর্ব্বে আধুনিক কলিকাতা যে পরিমাণ স্থান অধিকার করিয়াছিল, তাহা সামান্য মাত্র। নিম্ন বঙ্গের যে সকল পল্লীগ্রামে অদ্যাপিও ইঙ্গরেজী সভ্যতার কোন প্রকার সংস্পর্শ মাত্র উপনীত হয় নাই, অধিক কি, যে সকল স্থানে একটি মাত্র ইষ্টকালয় পর্য্যন্ত পরিলক্ষিত হয় না, কেবলমাত্র প্রশস্ত ধান্যক্ষেত্রের প্রান্তে কয়েকখানি তৃণাচ্ছাদিত মৃণ্ময় কুটীর সমষ্টি মাত্র পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে, প্রাচীন কলিকাতার বাল্য-দৃশ্যও সেইরূপ ছিল। পাঠকগণ যাঁহারা এ শ্রেণীর পল্লীগ্রামের দৃশ্য দেখিয়াছেন, তাঁহারা সহজেই কথিত সময়ের কলিকাতার দৃশ্য হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। উপরোক্ত বর্ণিত গ্রাম্যদৃশ্য হইতে তাৎকালিক কলিকাতার দুই একটী বিষয়ে মাত্র প্রভেদ পরিলক্ষিত হইত। আধুনিক কলিকাতা যে সমগ্র স্থান অধিকার করিয়াছে, উহার স্থানে স্থানে ধান্যক্ষেত্র, কোথাও বা জলাভূমি এবং মধ্যে মধ্যে বন জঙ্গল ও বাঁশঝাড় পরিলক্ষিত হইত। অধিকন্তু ঐ সকলের মধ্যে মধ্যে চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত বিন্দু সদৃশ তৃণপত্রাচ্ছাদিত মৃণ্ময় কুটীর সমষ্টির কয়েকখানি মাত্র পল্লিগ্রাম ছিল। ঈদৃশ অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নগণ্য পল্লীগ্রামের মধ্যে দুই তিন খানি গ্রামই সর্ব্বাপেক্ষা বর্দ্ধিষ্ণু ছিল। সময়ান্তরে ঐ গ্রামগুলির প্রত্যেকের পৃথক পৃথক ইতিহাস পাঠকদিগের জ্ঞাত করিতে চেষ্টা করিব।

আমরা নিয়ে যে কয়েকটি বিষয়ের বর্ণনা করিতেছি, তৎপাঠে পাঠকগণ কলিকাতার বাল্যাবস্থার দৃশ্য সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। ক্ষিতীশ-বংশাবলি চরিতে (২) এইরূপ মর্ম্মে লিখিত আছে;—

রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নবাব আলিবর্দ্দি খাঁর অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। উক্ত

---

(১) "Our earliest connection with these places, according to Orme, was in 1686, when Job Charnock withdrew the English Foctory from Hugli to Sootanooty; but it was not till' August 1690 that he succeeded in establishing a firm footing in that village" *Vide report of the Census of the Town of Calcutta taken on the 6th April 1576—by H. Beverley Esq., C. S. p.* 31.

(২) কার্ত্তিকের চন্দ্র রায় প্রণীত ক্ষিতীশ-বংশাবলী চরিত—১০৩ হইতে ১০৬ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত দেখ।

রাজার নিকট তাঁহার পিতৃপিতামহের সময়ের দেয় রাজস্বের মধ্যে দশ লক্ষ টাকা নবাবের প্রাপ্য ছিল। কৃষ্ণচন্দ্র ঐ টাকা রেহাই পাইবার জন্য নবাবের নিকট পুনঃ পুন আবেদন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোনরূপেই সফল-প্রযত্ন হইতে পারেন নাই। একদা নবাব জলপথে কলিকাতাভিমুখে যাত্রা করিলেন। ভাগীরথীর তীরস্থ অন্যান্য গ্রাম অতিক্রম করিয়া নবাবের তরণী কলিকাতার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। ঐ নগর সে সময়ে একখানি সামান্য গ্রাম ছিল। কেবল ইহার উত্তরাংশে গঙ্গার ধারে কতকগুলি লোকের বসতি ছিল। পূর্ব্ব ও দক্ষিণাংশ এককালে বাদা বনে আচ্ছন্ন ছিল। তৎকালে মুরশিদাবাদ ও কলিকাতার মধ্যে ভাগীরথীর পূর্ব্ব তটস্থ কোন গ্রাম বা নগরের নিকট এতাদৃশ বন ছিল না। একারণ সুচতুর কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার জমীদারীর দুরবস্থা নবাবের হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিবার নিমিত্ত ঐ প্রদেশ দেখাইতে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন। আলিবর্দ্দি রাজার প্রগাঢ় নির্ব্বন্ধ উল্লঙ্ঘনে অসমর্থ হইয়া জমীদারীর অবস্থা সন্দর্শনার্থে নির্গত হইলেন। জন স্থান অতিক্রম করিয়া যতদূর গমন করিলেন, কেবলই অরণ্যময় দর্শন করিতে লাগিলেন। এই সময়ে রাজার শিক্ষানুসারে নবাবের সঙ্গিগণ 'এখানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্রক জন্তুর ভয় আছে' প্রভৃতি নানা প্রকার ভীতিপ্রদায়ক বাক্য পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিলেন।

রাজা সজল নয়নে ও কাতর বচনে নিবেদন করিলেন, "ধর্ম্মাবতার! যদি সৌভাগ্যক্রমে কৃপা-পরবশ হইয়া বিশেষ ক্লেশ স্বীকারপূর্ব্বক এতদূর আসিয়াছেন, তবে আর কিছু দূর গমন করুন, তাহা হইলে সেবকের অভীষ্টসিদ্ধির আর কোন সন্দেহ থাকিবে না।" নবাব উত্তর করিলেন, "কৃষ্ণচন্দ্র, আর অধিক যাইবার প্রয়োজন নাই, অদ্য হইতে তোমাকে তোমার পিতৃদায় হইতে মুক্ত করা গেল।"

পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে, পাঠকদিগের মনে কলিকাতার বাল্যাবস্থার দৃশ্যের একটি ধারণা করিয়া দেওয়া আমাদিগের এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উদ্দেশ্য; উপরে যে বর্ণনা দেওয়া গিয়াছে, উহা ব্যতীত আরও যে কয়েকটি বিবরণ নিম্নে সন্নিবেশিত হইতেছে, তাহাতে পাঠকগণ সহজেই একটি সাধারণ সংস্কার করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন।

ব্লকম্যান সাহেব বলেন যে, ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে—এক্ষণে যে স্থলে চাঁদপাল ঘাট সন্নিবেশিত—উহার দক্ষিণ দিকে সমস্ত অরণ্যময় ছিল। (৩) হ্যামিল্টন সাহেব বলেন যে, "১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতার দৃশ্য আধুনিক দৃশ্য হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। ইহার স্থানে স্থানে একত্রে দশ বারখানি করিয়া তৃণাচ্ছাদিত মৃন্ময় কুটীর মাত্র দৃষ্ট হইত। উহাতে কৃষকগণ বাস করিত, এবং ঐ সকল কুটীরের চতুর্দ্দিকে খানা ও ডোবায় পরিপূর্ণ ছিল। (৪) বেলেঘাটা এবং কলিকাতার মধ্যে প্রায় এক ক্রোশ পথ ব্যবধান নিবিড় জঙ্গল; ঐ জঙ্গলে ব্যাঘ্র এবং অন্যান্য হিংস্রক জন্তুর আবাস-স্থল ছিল। (৫) ভারতবর্ষে ইঙ্গরেজ ও ফরাসিদিগের মধ্যে শত্রুতা বশত সময়ে সময়ে বিলক্ষণ বাক্‌বিতণ্ডা চলিত, উহা ভারতেতিহাস পাঠকদিগের অবিদিত নাই। অনেক স্থলে এই বিষয় সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে, তন্মধ্যে এক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ডিউপ্লে ইঙ্গরেজদিগকে ভীতি প্রদর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন যে, "ইঙ্গরেজদিগের উপনিবেশ কলিকাতা ও মান্দ্রাজ নগরদ্বয়কে পুনর্ব্বার উহাদিগের পূর্ব্বের ন্যায় মৎস্যজীবিগণের বাসোপযোগী নদীতীরস্থ সামান্য গ্রামে পরিণত করিব।" (৬) লং সাহেব বলেন যে, "মহান্ পিটর কর্ত্তৃক সেণ্টপিটার্সবর্গ মহানগরীর ভিত্তিমূল প্রোথিত করিবার সময় উক্ত স্থানের যেরূপ অবস্থা ছিল, সার্দ্ধশত শতাব্দী পূর্ব্বে কলিকাতা সেইরূপ কুজ্‌ঝটিকাপূর্ণ এবং কুম্ভীর ও বন্য-বরাহের

---

(৩) "In 1707 a forest existed to the south of Chandpal ghat.' *Vide Lecture on Calcutta During The Last Century—by H. Blockman M. A.*

(৪) In 1717 Calcutta exhibited a very different appearance .....the House, which were scattered about in clusters of ten or twelve each and the inhabitants chiefly husbandmen.....the houses were surround by puddles of water". *Vide Hamiltons East-India Gazetteer, vol. I. p.* 316.

(৫) Vide W. Newman & Co's. Hand Book of Calcutta, p. 8.

(৬) "Duplex was known often to say that he would reduce the English Settlement of Calcutta or Madras to their original state of fishing towns." *Vide Orm's History of Industan*, vol. I. P. 378.

আবাসভূমি ছিল,,। (৭) মেকলে সাহেব বলেন যে, "যে স্থানে এক্ষণে ইন্দ্রপুরীতুল্য চৌরঙ্গীর প্রাসাদমালায় সুশোভিত, ঐ স্থানে পূর্ব্বে অতি দীন-ভাবাপন্ন কতকগুলি তৃণাচ্ছাদিত কুটীর মাত্র ছিল; এবং শষ্পাবৃত বিস্তৃত প্রান্তরে—ঘোড়দৌড়ের মাঠে—সূর্য্যাস্তে যথায় এক্ষণে বিবিধ বর্ণের সুসজ্জিত শকটে পরিপূর্ণ থাকে, উহা তৎকালে কেবল জলচর পক্ষী, কুম্ভীর ও বন্যবরাহদিগের একমাত্র বাসস্থানের মধ্যে পরিগণিত ছিল।" অধিক কি, লং সাহেব এক স্থলে তাৎকালিক কলিকাতাকে "জলাময়ী নগরী" নামে অভিহিত করিয়াছেন। উপরে আমরা যে বর্ণনা সমূহ সন্নিবেশিত করিলাম, উহা দ্বারা পাঠকবৃন্দ সহজেই কলিকাতার বাল্যাবস্থার একটী সাধারণ সংস্কার করিয়া লইতে সক্ষম হইবেন। পরিশেষে আমরা কলিকাতার উপরোক্ত সময়ের দৃশ্য সম্বন্ধে আর একটী বিষয়ের উল্লেখ করিয়া এই প্রবন্ধের শেষ করিব।

পূর্ব্বোক্ত সময়ে কলিকাতার মধ্য দিয়া একটি খাড়ী (Creek) প্রবাহিত ছিল, এক্ষণে কলিকাতার কায়ার পরিবর্ত্তনের সহিত উহা বিলুপ্ত হইয়াছে। এই খাড়িটি অধুনা যে স্থান চাঁদপাল ঘাট নামে পরিচিত, ঐ স্থানে ভাগীরথী হইতে আরম্ভ করিয়া ধর্ম্মতলা রাস্তার ঠিক উত্তর দিয়া গোলদীঘির (Wellington Square) এবং ডিঙ্গাভাঙ্গা (Creek Row) হইয়া বেলিয়াঘাটার নিকট যে লবণ হ্রদ (Salt Lake) আছে, উহার সহিত মিলিত হইয়াছিল।

শ্রীঅঘোরনাথ দত্ত।

---

(৭) "A hundred and fifty years ago, Calcutta was like St. Petersburgh, when Peter the great laid his master hand on it—the new Orleans of the East—a place of mists, aligators and of wild boars." *Vide Selections from the Calcutta Review —Article—Calcutta in the Olden Times—its Localities. P. 169 by Reverend James Long.*

(৮) Vide W. Newman & Co's. "*Hand Book to Calcutta*" P. 39. and "*Selection from the Calcutto Review, vol. VI.* Article—"Calcutta in the Olden Times—its Localities," p. 181—by Revo J. Long.

আমাদিগের জাতীয় চরিত্র।

২।

তাহার পর, সত্যপ্রিয়তা। যে জাতি যতই উন্নত হয়, যে জাতির লোক যত পরিমাণে মনুষ্যত্ব লাভ করে, সেই জাতি সেই পরিমাণে সত্যপ্রিয় বা সত্যপালনে তৎপর হয়। অশিক্ষিত বন্য বর্ব্বর জাতিগুলি 'মিথ্যার' মূল্য জানে না বলিয়া, সত্যপালন করে বটে, কিন্তু তাহাদিগকে আমরা সেই সত্যপালন জন্য যত না প্রশংসা করিতে পারি, শিক্ষিত সভ্যজাতি মিথ্যার মূল্য জানিয়া, সেই মিথ্যার বলে ক্ষণিক বিশেষ উপকার পাওয়া যায় জানিয়া, যদি সেই মিথ্যার বক্ষে পদাঘাত করিয়া সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে যত্নবান্ হয়, তাহা হইলে আমরা সেই জাতিকেই অধিক প্রশংসা করিতে পারি। আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সত্যপ্রিয় ছিলেন কি না, সত্য পালন জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিতেন কি না, এখন তাহাই, দেখিতে হইবে।

ঋগ্বেদের সপ্তম অষ্টক, অষ্টম অধ্যায়, ১০ম মণ্ডল, ৩৭ সূক্তে লিখিত আছে, 'সেই যে সত্যবাক্য আকাশ এবং দিবা যাহাকে অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান আছে, বিশ্বভুবন এবং প্রাণীবর্গ যাঁহার আশ্রিত, যাঁহার প্রভাবে প্রতিদিন জল প্রবাহিত হইতেছে এবং সূর্য্যদেব উদয় হইতেছেন, সেই সত্যবাক্য যেন আমাকে সকল বিষয়ে রক্ষা করেন।' সত্যটা কি? বেদের এই কথায় তাহা জানিতে বাকী রহিল কি

শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে, "মনুষ্য মিথ্যা কথা কহিলেই অপবিত্র হয়।"

মহাভারতের রাজধর্ম্মে সত্যের নিম্নলিখিত ত্রয়োদশটী আকার নির্দ্দেশ হইয়াছে,—শম, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, হ্রী, তিতিক্ষা, অনসূয়তা, ত্যাগ, ধ্যান, ধৃতি, দয়া এবং অহিংসা।

কূর্ম্ম পুরাণের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে দেখা যায়, "সত্যেন লোকং জয়তি সত্যন্ত পরমং তপঃ, যথাভূত প্রসাদস্ত সত্যমাহুর্মনীষিণঃ।"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণের জন্মখণ্ডে ১৫ অধ্যায়ে বিবৃত আছে, "নহি সত্যাৎ পরোধর্ম্মো নানৃতাৎ পাতকং পরং।"

বরাহ পুরাণের কথা—"সমগ্র জগতের মূল সত্য, সমস্তই সত্যে প্রতিষ্ঠিত।"

সত্য সম্বন্ধে আর্য্যশাস্ত্র সমূহে অনেক কথা আছে, আমি এখানে কেবল দুই চারিটী কথা উদ্ধৃত করিলাম মাত্র। যে জাতি সত্যের এমন ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কে বলিবে, সে জাতি সত্যপ্রিয় ছিলেন না?

এখন দেখিতে হইবে, আর্য্যগণ সত্যপাশে বদ্ধ হইয়া, তাহা পালন করিতেন কি না? কাহারও নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতেন কি না?

ব্রহ্ম পুরাণের উক্তি—"কৃত্বা শপথ কপঞ্চ সত্যং হন্তি ন পালয়েৎ। স কৃতঘ্ন কাল সূত্রে বসেদেব চতুর্দ্দশং।"

কঠোপনিষদ অতি প্রাচীন গ্রন্থ। তাহাতে লিখিত আছে, একদা এক ব্রাহ্মণ যজ্ঞকালে সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন। তাঁহার পুত্রটী নিকটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি পিতাকে ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, 'আপনি এখনও আপনার প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতেছেন না কেন? আমি যখন জীবিত রহিয়াছি,—আমি যখন আপনার সর্ব্বস্বের মধ্যে একটি, তখন আমাকে এই যজ্ঞে উৎসর্গ না করিলে, আপনার প্রতিজ্ঞাপালন কিরূপে হইল?' এই কথায় পিতা রাগিয়া উঠিলেন বটে, কিন্তু প্রতিজ্ঞা পালন জন্য আপনার অনিচ্ছায় সেই পুত্রটীকে উৎসর্গ করিতে বাধ্য হইলেন। তাহার পর পুত্রটী যখন যমলোকে উপনীত হইলেন, যম তখন তাঁহার প্রতি তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "তোমাকে আমি তিনটী বর দিতে পারি; তুমি কি কি বর চাও বল? পুত্র বলিলেন, "প্রথম বর—আমি পুনর্জীবন পাই, দ্বিতীয় বর—আমি কতকগুলি যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি শিখিতে চাই, এবং তৃতীয় বর—মৃত্যুর পর মানুষের কি গতি হয়, তাহা জানিতে চাই, আপনি আমাকে এই তিনটী বরই দিউন।" যম প্রথম দুইটী বর দিয়া, তৃতীয় বর দান করিতে ইতস্তত করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনিও নাকি বরদান করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়াছিলেন, সুতরাং অগত্যাই সেই প্রতিজ্ঞা পূরণ করিতে বাধ্য হইলেন।

রামায়ণে যে শত শত প্রতিজ্ঞা পালনের কথা ও সত্যপালনের কথা আছে, তাহা কে না জানেন? দশরথ কেবলমাত্র প্রতিজ্ঞাপালন জন্য

প্রাণোপম পুত্রকে বনবাস দেন এবং কেবল মাত্র পিতৃ সত্যপালন জন্য রামচন্দ্র রাজসুখ ত্যাগ করিয়া বনবাসী হন, ইহা বালকেও জানে। কিন্তু আমি বলি, এই প্রতিজ্ঞা পালন করাইতে কেকয়ী বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা প্রশংসার পাত্রী। কেকয়ীর উপব আমাদিগের একটা বিজাতীয় ঘৃণা আছে, বটে, যে, কৈকেয়ী সপত্নীপুত্রকে বনে প্রেরণ করেন। কিন্তু তিনি দশরথের সেই আর্ত্তনাদে সেই মৃত্যু যন্ত্রণা দেখিয়াও যখন প্রতিজ্ঞা পালন করাইবার জন্য জিদ্ করিয়াছিলেন, তখন অপরে যাহা বলে বলুক, আমি বলি, পতিকে সত্যপালন করাইবাব জন্যই—পতি যাহাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পাপে পাপী না হয়েন, সেই জন্যই তিনি বীরাঙ্গনার ন্যায়—প্রকৃত ক্ষত্রিয় রমণীর ন্যায় সে অবস্থায় সেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন। অপরেব কথায়—মন্থরাব পরামর্শে কৈকেয়ী যে, রামের বনবাস জন্য দশরথকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইয়াছিলেন, পরিণাম না বুঝিয়া ক্ষণিক চৈতন্যহীন অবস্থায পতিকে যে সত্যপাশে বদ্ধ কবিয়া লইয়াছিলেন, তজ্জন্য তিনি অবশ্যই নিন্দাব পাত্রী। কিন্তু প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইবার পর কৈকেয়ী অবশ্যই বুঝিযাছিলেন, ক্ষত্রিয় রাজার পক্ষে প্রতিজ্ঞা পালন না করা মহাপাপ—মহা কলঙ্ক, সুতবাং যাহাতে জগতে পতিব কলঙ্ক না হয, সেই জন্যই তিনি নিজে কলঙ্কিনী হইতে প্রস্তুত ছিলেন। রামেব প্রতি তাঁহাব বিজাতীয বিরাগ থাকিলে, তিনি কখনই রামকে চতুর্দ্দশ বর্ষের পর অযোধ্যার সিংহাসনে বসিতে দিতেন না। ভরত মাতুলালয় হইতে আসিলে, কৈকেয়ী কি বলেন নাই যে, "মহারাজ "প্রতিজ্ঞাপালন" জন্য রামকে বনে পাঠাইয়াছেন এবং রাম "পিতৃসত্য পালন" জন্য বনে গিয়াছেন"। আমবা এই "প্রতিজ্ঞা পালন" শব্দটার প্রতি লক্ষ্য রাখি না।

তাহার পর রাবণের প্রতিজ্ঞা। রাবণেব উপর আমাদিগের একটা বিষম জাতিক্রোধ আজিও আছে। কিন্তু আমি বলি, রাবণের সহস্র দোষ থাকিলেও সত্যপালন জন্য বিশেষ প্রশংসার পাত্র। ভগিনী সূর্পনখার কাতব ক্রন্দনে রাবণ ক্রুদ্ধভাবে রামের স্ত্রীকে হরণ করিরা আনিতে যে, প্রতিশ্রুত হন এবং পরে প্রাণ থাকিতে সীতাকে প্রত্যর্পণ করিবেন না বলিয়া যে, প্রতিজ্ঞা করেন, তিনি আমরণ সেই প্রতিজ্ঞা পালন কবিয়া গিয়াছেন।

সোণার লঙ্কা ছারখার হইয়া গিয়াছে, তাঁহার চক্ষের উপর শত শত পুত্র পৌত্র রণশয্যায় শয়ন করিয়াছে, তথাপি তিনি প্রতিজ্ঞা পালনে ক্ষান্ত হন নাই। কেবলমাত্র কুপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া সীতাকে হরণ করাই যদি তাঁহার উদ্দেশ্য হইত, তাহা হইলে অবলা সীতা কখনই ত্রিভুবন বিজয়ী রাবণ রাজার হস্ত হইতে সতীত্ব রক্ষা করিতে পারিতেন না। সেই জন্যই বলি যে, রাবণ ধনে প্রাণে হত হইয়াও সত্যপালন করিয়া গিয়াছেন—সীতাকে প্রত্যর্পণ করেন নাই।

তাহার পর মহাভারতে অগণিত প্রতিজ্ঞা পালনের কথা আছে। এস্থলে সেগুলির পুনরুল্লেখ করিবার কোন প্রয়োজন নাই। তবে দুই একটীর উল্লেখ করা আবশ্যক। ভীষ্মের মৃত্যু; প্রতিজ্ঞা পালনের অতি চমৎকার অদৃষ্টপূর্ব্ব নিদর্শন। ভীষ্ম প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, ইহ জীবনে কোন রমণীকে বিবাহ করিবেন না, কোন রমণীর গাত্র স্পর্শ করিবেন না, কোন রমণীর দেহে আঘাত করিবেন না। শিখণ্ডী স্ত্রীবেশে ভীষ্মের প্রতি বাণক্ষেপ করিতে লাগিলেন, ভীষ্ম তাঁহাকে স্ত্রী ভ্রমে তাঁহার বিরুদ্ধে একটীও বাণক্ষেপ না করিয়া, শরশয্যায় জীবন বিসর্জ্জন দিলেন! জগতে এমত প্রতিজ্ঞা পালনকারী কোন মহাবীরের নাম শুনা গিয়াছে কি?

প্রতিজ্ঞাপালন জন্য ভীম খুব প্রশংসা পাইয়া থাকেন, কিন্তু আমি বলি, দুর্য্যোধনের প্রতিজ্ঞা পালনটা কি কম প্রশংসার কথা? দুর্য্যোধন প্রতিজ্ঞা করিলেন, "আমি সূচ্যগ্রবিদ্ধ ভূমি পাণ্ডবদিগকে দিব না।" শেষ তিনি রাজ্যভ্রষ্ট, সর্ব্বস্বান্ত এবং হত হইলেন, কুরুবংশ ধ্বংস হইল, তথাপি তিনি সত্যের অসম্মান করিলেন না! তুমি বলিবে যে, এ প্রতিজ্ঞাটা রাবণের প্রতিজ্ঞার মত নিতান্ত মূর্খতা প্রকাশক, কিন্তু যাঁহারা সত্যের মান জানেন, তাঁহারা ঘটনাক্রমে এরূপ সত্যপাশে বদ্ধ হইলেও প্রাণ দিয়া তাহা পালন করেন।

বৈদিক এবং পৌরাণিক কালের পর আমরা যদি আবার ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দান করি, তাহা হইলেও পরবর্ত্তী সময়ে হিন্দুর প্রতিজ্ঞা পালনের জ্বলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাই। কর্ণেল টড, রাজস্থানের ইতিবৃত্ত মধ্যে হিন্দুজাতির প্রতিজ্ঞা পালনের অগণিত দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। আমি বাহুল্য

ভয়ে সেই সমস্ত দৃষ্টান্ত এস্থলে উদ্ধৃত না করিয়া, হিন্দুজাতির মধ্যে সত্যের আদর বরাবর কিরূপ চলিয়া আসিতেছে, তাহার প্রমাণ স্বরূপ কয়েকটি বিষম প্রতিজ্ঞার কথা এস্থলে বিবৃত করিতে চাই।

টড লেখেন, মিবারের অধীশ্বর মহারাণা রাজসিংহ বাল্যাবস্থায় পিতৃহীন হইয়া রাজপদে অভিষিক্ত হন। মিবারের অধীনস্থ কোয়ারিয়ো নামক স্থানের সামন্ত সরদার সিংহ, মহারাণা রাজসিংহের সমবয়স্ক এবং প্রিয় মিত্র ছিলেন। একদা মহারাণা কোন বিষয়ে সরদার সিংহের প্রতি প্রীত হইয়া বলিলেন, "আপনি কি পুরস্কার চাহেন বলুন, আমি দিতে প্রতিশ্রুত হইলাম।" সামন্ত এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "আমি কোয়ারিয়ো প্রদেশ সংলগ্ন লাবা প্রদেশটী প্রার্থনা করিতেছি।" মহারাণা তৎকালে অপ্রাপ্ত ব্যবহার ছিলেন, তাঁহার জননী প্রতিনিধিরূপে রাজ্য শাসন করিতেন। সুতরাং বালক মহারাণা বাক্যবদ্ধ হইয়া, সত্যপালন জন্য মাতার নিকট গিয়া সমস্ত বিদিত করিলেন। দুর্ভাগ্য বশত উক্ত লাবা প্রদেশ তৎকালে মহারাণীর নিজের খাসভূমি স্বরূপ ছিল। সুতরাং তিনি কিছু দুঃখিত হইয়া বলিলেন, "সরদার সিংহ, আমার নিজের ভূমি প্রার্থনা না করিয়া, অবশ্যই অন্য ভূমি প্রার্থনা করিতে পারিতেন। তোমার ইচ্ছা হয়, সমগ্র মিবার রাজ্য তাঁহাকে দেও গিয়া।" জননীর এই উত্তরে মহারাণা নিতান্ত অসন্তুষ্ট হইয়া, তদ্দণ্ডেই প্রতিজ্ঞা করিলেন, "ভাল, আমি তাঁহাকে মিবার রাজ্য দিলাম।" মহারাণা রাজসিংহ, বালক হইলেও প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবার নহে। তিনি অবিলম্বে সরদার সিংহকে আহ্বান করিয়া বলিলেন, "আমি তিন দিবসের জন্য সমস্ত মিবার রাজ্য আপনাকে প্রদান করিলাম, সেই তিন দিন আপনার যাহা ইচ্ছা করুন। আমার সেলেখানা, আমার অশ্বশালা, আমার সিংহাসন, আমার ধনাগার এবং মন্ত্রীগণ তিন দিবসের জন্য আপনার ইচ্ছাধীন হইল।" মহারাণার প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য সরদার সিংহ অগত্যা তাহাতে সম্মত হইলেন। তিন দিনের জন্য রাণা পদে অভিষিক্ত হইয়া, সরদার সিংহ নিজ মনোমত সমস্ত দ্রব্য স্বীয় প্রদেশ কোয়ারিয়োতে পাঠাইয়া দিলেন। সেই তিন দিন সরদার সিংহ প্রকৃত রাণার ন্যায় সিংহাসনের এক পার্শ্বে বসিয়া সমস্ত

অমাত্য এবং সামন্ত পরিবৃত হইয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। তৃতীয় দিবসে রাণার মাতা লাবা প্রদেশের শাসন সনন্দ স্বীয় পুত্রের নিকট পাঠাইয়া দিলে, চতুর্থ দিবসে সরদার সিংহ রাজ শক্তি পুনরায় মহারাণার হস্তে অর্পণ করিলেন। জগতের কোন জাতীয় বালক রাজাকে একপে সত্যের সম্মান রক্ষা করিতে দেখা গিয়াছে কি? এই প্রতিজ্ঞা পালন অধিক দিন নহে, ইংবাজি ১৬৫৩ খৃষ্টাব্দে ঘটে।

রাজপুত বান্ধব টড, আর একটী বিষম প্রতিজ্ঞা পালনের কথা লিখিয়া গিয়াছেন। জয়শলমীর রাজ্যের অন্তর্গত দেববাউল প্রদেশের সিংহাসনে যে সময়ে বীরবর দেবরাজ অধিষ্ঠিত ছিলেন, সেই সময়ে যশোকর্ণ নামক তাঁহার একজন বলবান বণিক প্রজা ধারবাজ্যে বাণিজ্য জন্য গমন করেন। ধারপতি ব্রজভানু পুঁয়ার, যশোকর্ণকে বলহীন জানিয়া, তাঁহাকে বন্দী করিয়া, সর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইয়া শেষে মুক্তি দেন। যশোকর্ণ দেবরাউলে ফিরিয়া আসিয়া, দেবরাজের নিকট সমস্ত বিবৃত করিয়া বলেন যে, "ধারপতি আমাকে বিনা কারণে বন্দী করিয়া অশেষ কষ্ট দিয়াছেন। তিনি আমাকে যে দারুণ নিগ্রহ ভোগ করাইয়াছেন, এই দেখুন, তাহার প্রমাণ স্বরূপ আমার গলদেশে বন্ধনী শৃঙ্খলের চিহ্ন বিরাজমান।" দেবরাজ স্বীয় প্রজা যশোকর্ণের অবমাননায় এতদূর ক্রুদ্ধ হইলেন যে, তদ্দণ্ডেই প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিলেন যে, "আমি এই অবমাননার প্রতিশোধ দান জন্য ধারনগরী জয় না করিয়া জল গ্রহণ করিব না।" এ প্রতিজ্ঞাটী বড় সহজ নহে। ধারনগরী বহু দূরবর্ত্তী, এক দিনে তথায় গমন করিয়া নগর জয় করা অসম্ভব, অথচ যখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে, ধার নগরী জয় না করিয়া জল গ্রহণ করিব না, তখন উপায় কি? উপর্য্যুপরি কয়েক দিন নিরম্বু উপবাস অসম্ভব, অথচ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিতে পারিবেন না। মন্ত্রীগণ শেষে পরামর্শ দিলেন যে, "ধার নগরীর অধিকাংশ অধিবাসীই পুঁয়ার-জাতীয়। আপনার সৈন্য দলের মধ্যে অনেক পুঁয়ার বা প্রমার জাতীয় আছে। আপনি মৃত্তিকা নির্ম্মিত একটী কৃত্রিম ধার নগরী প্রস্তুত করুন। এবং আপনার অধীনস্থ পুঁয়ার সৈন্যদল অস্ত্র হস্তে সেই ধার নগরী রক্ষায় নিযুক্ত হউক এবং আপনিও সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিয়া সেই ধার নগরী জয়

করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করুন।” অবিলম্বেই সেই মন্ত্রণা মত কার্য্যারম্ভ হইল। দেবরাজের অধীনস্থ পুঁয়ার সৈন্যদল নিজ নিজ অসি ভল্ল হস্তে বীরসাজে সেই কৃত্রিম ধার নগরী রক্ষায় নিযুক্ত হইল। বীরবর দেবরাজ সসৈন্যে তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পক্ষ ঘোরতর যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। পুঁয়ার সৈন্যদল আপনাদিগের নেতা তেজসিংহ এবং সারঙ্গের অধীনে বিপুল বিক্রমের সহিত সেই কৃত্রিম ধার নগরী রক্ষা করিতে লাগিল। সেই সময়ে একশত বিংশতি জন পুঁয়ার নিহত হইলে, দেবরাজ সেই কৃত্রিম ধারনগরী জয় করিয়া লইলেন। কিন্তু পুঁয়ার সৈন্যদলের পুত্র কন্যাদিগের জন্য বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিতে বিস্মৃত হইলেন না।

আপনারা মনে করিতে পারেন, এইখানেই প্রতিজ্ঞা পালন শেষ হইয়া গেল, না, তাহা নহে। কয়েকদিন পরেই দেবরাজ সসৈন্যে গমন পূর্ব্বক ভয়ানক সমরে ধারপতি ব্রজভানুকে নিহত করিয়া, ধারনগরীর দুর্গচূড়ে স্বীয় বিজয় পতাকা উড্ডীন করিয়া প্রকৃতরূপে প্রতিজ্ঞা পালন করেন।

টড, হিন্দুজাতির দৃঢ় প্রতিজ্ঞতার আর একটী নিদর্শন লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দুর্দ্দান্ত আরঙ্গজেবের শাসনকালে শিরোহী নামক স্থানের সিংহাসনে সুরতান সিংহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুরতান এরূপ প্রবল প্রতাপান্বিত মহাবীর ছিলেন যে, আরঙ্গজেব বারম্বার চেষ্টা করিয়াও তাঁহার রাজ্য জয় করিতে পারেন নাই, শেষ রাজা যশোমন্ত সিংহের কল্যাণে নাহর খাঁ নামক এক যবন সেনানী গভীর রজনীতে ছদ্মবেশে শিরোহীর দুর্গে প্রবেশ করিয়া নিদ্রিত সুরতানকে ধৃত করিয়া যবন রাজধানীতে আনয়ন করে। রাজ পারিষদগণ, সুরতানকে সম্রাটের সমক্ষে উপনীত করিবার পূর্ব্বে তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন যে, “আপনি সম্রাটকে সমুচিত বিনয় নম্রভাবে অবনত মস্তকে অভিবাদন করিবেন, কারণ সম্রাটসমক্ষে যে কেহই উপনীত হউন না, তাঁহাকে ঐ রূপে অভিবাদন করিতে হয়।” কিন্তু বীরতেজা সুরতান কহিলেন, “আমি জানি যে, আমার জীবন সম্রাটের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতেছে, কিন্তু আপনারা জানিবেন যে, আমার সম্মান আমার নিজের হাতে, আমি এ জীবনে কখনও কোন মনুষ্যের নিকট মস্তক নত করি

নাই এবং করিবও না।" এই উক্তিতে পারিষদগণ স্তম্ভিত হইলেন। শেষ তাঁহারা কৌশলে সুরতানকে সম্রাট সমক্ষে অবনত মস্তকে উপস্থিত করাইতে উদ্যোগী হইলেন। তাঁহারা সকলে সুরতানকে লইয়া সভাকক্ষের এক পার্শ্বস্থ জানু সমান উচ্চ একটী ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া তাঁহাকে সম্রাট সমীপে উপনীত করিতে মনন করিয়া, ভাবিলেন যে, সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া প্রবেশ কালে অবশ্যই সুরতানকে অতীব নত মস্তকে সম্রাট সমক্ষে উপস্থিত হইতে হইবে। সুরতান যেমন সাহসী এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেইমত চতুর ছিলেন। তিনি পারিষদগণের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া সেই ক্ষুদ্র দ্বার দিয়া সর্ব্বাগ্রে দুইটী পদ প্রবেশ করাইয়া শেষে উন্নত মস্তকে সম্রাট সমক্ষে দণ্ডায়মান হইলেন।

আর্য্যগণের সত্যপ্রিয়তা এবং সেই সত্যপালন সম্বন্ধে এ স্থলে বহুল উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু আমি বলি আর প্রয়োজন নাই। কিন্তু কতকগুলি ব্যক্তি বিজাতীয় আর্য্যগণকে একটী বিষয়ে সত্যপালন সম্বন্ধে দোষ দিয়া থাকেন। শাস্ত্রকারগণ সত্যের সম্মান রক্ষার জন্য বিশেষ উপদেশ এবং কঠোর বিধি সৃষ্টি করিয়া যাইলেও কয়েক স্থলে তাঁহারা আবার সত্যের অপলাপ করিলেও পাপ হয় না, এমত বিধি দিয়াছেন। গৌতম বলেন, "মহা ক্রোধের সময়, সমধিক আনন্দ, ভয়, ক্লেশ এবং দুঃখের সময়, মিথ্যা কথা কহিলে, এবং বালক, অতি বৃদ্ধ, ভ্রান্তলোক, মাতাল, উন্মাদ, মিথ্যাকথা কহিলে তাহার মহাপাপ ঘটে না।" বিজাতীয়দিগের মধ্যে কেহ কেহ এই বিধিটী ধরিয়া ঋষিগণকে মিথ্যাকথার প্রশ্রয়দাতা বলিতে ক্ষান্ত নহেন। কিন্তু কেন যে, এ বিধির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহার অনুসন্ধান করেন না!

জাতীয় চরিত্রের অন্যান্য যে সকল গুণের প্রয়োজন, আমাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের তাহা ছিল কি না, তাহার বাহুল্য বর্ণনায় আর বিশেষ আবশ্যক দেখা যায় না। জননী জন্মভূমির দায়িত্ব পালনে যে, তাঁহারা প্রাণপণে নিযুক্ত ছিলেন, তাহা "জননী জন্ম ভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই কয়টী কথাতেই প্রকাশমান। আর শৌর্য্য, বীর্য্য, বিক্রম, প্রতাপ, সাহস, বীরত্ব উদ্যম, একতার কথা কে না জানে?

এখন দেখা যাউক, আমাদিগের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে বিজাতীয়গণ কি

বলিয়া গিয়াছেন। অবশ্য, সমস্ত বিজাতীয়ের উক্তি উদ্ধৃত করা এ স্থলে অসম্ভব, তবে দুই চারি জনের কথার উল্লেখ করা গেল।

বিদেশীয়দিগের মধ্যে গ্রীকদিগের সহিতই আমাদিগের প্রথম দেখা শুনা হয়। পাটলীপুত্র বা পাটনার রাজা চন্দ্র গুপ্তের সভায় গ্রীকরাজ সিলিউকস নিকটারের দূত মেগাস্থিনিস আসিয়াছিলেন। তিনি ভারত-ভ্রমণ করিয়া লিখিয়া গিয়াছেন, "ভারতে চুরি প্রায় ঘটে না এবং ভারতবাসী-গণ সদ্‌গুণ ও সত্যের বিশেষ সম্মান করে।"

এরিয়ান, ভারতের বিভাগীয় রাজ পুরুষদিগের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলেন, "তাঁহারা অধীনস্থ প্রদেশের যে সকল বিষয় রাজাকে জ্ঞাত করেন, তন্মধ্যে একটীও মিথ্যা লেখেন না। বাস্তবিক কোন ভারতবাসীই মিথ্যা-বাদীরূপে অভিযুক্ত হন না।"

ইহার পর চীন পর্য্যটকদিগের সহিত আমাদিগের সাক্ষাৎ। বিখ্যাত পর্য্যটক হিয়োঙ্গসাং বলেন, 'ভারতবাসিগণ সততা এবং সরলতার জন্য প্রসিদ্ধ। তাঁহারা অন্যায়রূপে ধন গ্রহণ করেন না। বিচারকালে বরং সমধিক দয়া প্রদর্শন করেন। সততাই তাঁহাদিগের শাসনের উজ্জ্বল নিদর্শন।"

অপর চীন পর্য্যটক ফাহিয়ানও এইমত সুমন্তব্য প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা ইতিহাস পাঠকগণের অবিদিত নাই।

তাহার পর মুসলমানদিগের সহিত আমাদিগের দেখা শুনা হয়। তাঁহারাই বা আমাদিগের জাতীয় চরিত্র সম্বন্ধে কি বলিয়া গিয়াছেন, দেখা যাউক। একাদশ শতাব্দীতে ইদ্রিশি স্বীয় ভূবৃত্তান্ত মধ্যে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, ইলিয়ট, তাঁহার ভারতীয় ইতিহাস মধ্যে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইদ্রিসি লেখেন, "সাধারণ্যে ভারতীয়গণ ন্যায়াধিকারপ্রিয়, এবং তাঁহারা কখনও অন্যায় মূলক কার্য্য করেন না। তাঁহাদিগের বিশ্বস্ততা, সততা, এবং সত্যপালন বিখ্যাত এবং তাঁহারা এই সকল গুণের জন্য এমন প্রসিদ্ধ যে নানাস্থানের লোক আসিয়া তথায় (ভারতে) বাস করিতেছে।"

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মার্কোপলো বলিয়া গিয়াছেন, "ইহারা (হিন্দু) জগতের মধ্যে উৎকৃষ্ট বণিক এবং অতীব সত্যবাদী, পৃথিবীর যে কোন দ্রব্য দাও না কেন, ইহারা কোনমতেই মিথ্যা কথা কহিবে না।"

চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে পাদরী জর্ডানস বলিয়া গিয়াছেন, "উত্তর এবং দক্ষিণ ভারতের লোকেরা সত্যবাদী এবং ন্যায় বিচারের জন্য প্রসিদ্ধ।"

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কামালউদ্দীন দূতরূপে কালিকট এবং বিজয়-নগরের রাজসভায় উপনীত হয়েন। ভারতে বিদেশীয়গণ যে নিরাপদে ও নির্ভয়ে যাতায়াত করিতে পারে, তাহা তিনি ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

১৭শ শতাব্দীতে সম্রাট আকবরের মন্ত্রী বিখ্যাত আবুলফজল বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুগণ জ্ঞান, নিঃস্বার্থতা, মিত্রতা, প্রভুভক্তি এবং অন্যান্য অনেক গুণে বিভূষিত বলিয়াই প্রসিদ্ধ।" আর একস্থলে তিনি বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দু জাতি ধার্ম্মিক, মিষ্টভাষী, অপরিচিতের প্রতি সদয়, আনন্দ প্রকৃতি, সুশিক্ষিত, ন্যায়বিচার প্রিয়, কার্য্যদক্ষ, কৃতজ্ঞ, সত্যপ্রিয় এবং সকল কার্য্যেই অসীম বিশ্বাসভাজন। বিপদে পতিত হইলে, তাঁহাদিগের চরিত্র সমুজ্জ্বলরূপে প্রকাশ পায়। তাঁহাদিগের সৈন্যদল, সমরক্ষেত্র হইতে পলায়ন কাহাকে বলে, তাহা জ্ঞাত নহে; কিন্তু সংগ্রামের ফল যেখানে সন্দেহ-যুক্ত হয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সে স্থলে তাহারা অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া তাহাদের ঋণ পরিশোধ স্বরূপ রণক্ষেত্রে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।" আইন আকবরীতে এরূপ অনেক কথা আছে।

তাহার পর ইংরাজদিগের সহিত আমাদিগের আলাপ পরিচয়। বিশপ্ হেবার বলেন, "হিন্দুগণ সাহসী, ভদ্র, বুদ্ধিমান, শিক্ষা এবং উন্নতির জন্য চেষ্টিত, ধীর, শ্রমশীল, পিতা মাতার প্রতি কর্ত্তব্যপরায়ণ, পুত্র-বৎসল, নম্র-স্বভাব, অনুগত, এবং তাঁহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে, বা তাঁহাদিগের অভাব মোচন করিলে, তাঁহারা যতদূর কৃতজ্ঞ হন, আমি জগতের কোন জাতিকেই সেরূপ কৃতজ্ঞ হইতে দেখিতে পাই না।"

বিখ্যাত ওয়ারেণ হেষ্টিংস, একস্থলে বলিয়া গিয়াছেন, "হিন্দুগণ নম্র-প্রকৃতি, সদয়স্বভাব, দয়া প্রাপ্ত হইলে সমধিক কৃতজ্ঞ হয়, এবং তাহাদিগের প্রতি অত্যাচার অনিষ্ট করিলে, তাহারা প্রতিহিংসা দানে এত অনগ্রসর যে জগতের কোন জাতিকে সেরূপ দেখা যায় না। তাহারা বিশ্বাসী এবং আইন পালনে তৎপর।"

সার টমাস মনরো বলিয়া গিয়াছেন, "উৎকৃষ্ট কৃষিপ্রণালী, সুবিধা

এবং বিলাসিতার জন্য প্রয়োজনীয় যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের ক্ষমতা, লেখা পড়া এবং গণিত শিক্ষার জন্য প্রত্যেক গ্রামে পাঠালয় স্থাপন, সাধারণ্যে অতিথি সৎকার, পরস্পরের মধ্যে দানশীলতা, এবং সর্ব্বোপরি স্ত্রীজাতির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন যদি সভ্যজাতির পরিচায়ক হয়, তাহা হইলে হিন্দুজাতি য়ুরোপের জাতি সমূহ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে, এবং যদি সভ্যতা ইংলণ্ড এবং ভারতের মধ্যে বাণিজ্যদ্রব্য স্বরূপ হয়, তাহা হইলে, আমার বিশ্বাস যে, ইংলণ্ড আমদানীর দ্বারা অধিক লাভবান হইবে।"

'কর্ণেল টড বলেন "প্রবল সাহস, দেশ হিতেচ্ছা, রাজভক্তি, সসম্মান আচরণ, আতিথেয়তা, এবং সরলব্যবহার,—এই কয়টী মণ্ডনে তাঁহারা বিভূষিত, ইহা বিনা বিরুক্তিতেই স্বীকার করিতে হইবে। জাতীয় চরিত্রের অবনতি জ্ঞাপক যে প্রবঞ্চনা, এবং মিথ্যা-প্রিয়তা অভেদে আসিয়িক জাতির মধ্যে সচ্ছলরূপে দেখিতে পাওয়া যায়, সেই প্রবঞ্চনা, এবং মিথ্যা-প্রিয়তা রাজপুত জাতির মধ্যে সাধারণ্যে যে প্রবলরূপে প্রচলিত, আমি তাহা স্বীকার করি না।"

বোম্বাই পরিদর্শন।

৩।

বাণ্ডোরা,—কালিঘাট, ভবানীপুর, বরাহনগর প্রভৃতির ন্যায় বোম্বায়ের একটি উপনগর। অনেক পার্শী কর্ম্মচারী ও সওদাগর এইখানে বাস করেন এবং এইখান হইতেই বোম্বায়ে বিষয় কর্ম্ম করিতে প্রতিদিন যাতায়াত করিয়া থাকেন। আমরা Bandora এষ্টেসন হইতে হোমী ভিলা যাইবার সময় প্রতিদিন সন্ধ্যার পরে দেখিতাম, যে পার্শী ভদ্র লোকেরা নিজ নিজ বাটীর সম্মুখের উদ্যানে, স্থানে স্থানে টেবিল চেয়ার পাতিয়া, চার পাঁচজন বন্ধুবান্ধবে মিলিয়া, বিশুদ্ধ আমোদ প্রমোদে কাল অতিবাহিত করিতেছেন। কোন দল দাবা খেলিতেছেন, কোন দল তাশ খেলিতেছেন, কোন দল আহারাদি করিতেছেন, কোন দল সংবাদ পত্র বা সাময়িক পত্রাদি পাঠ

করিতেছেন। সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর এইরূপ সথা সমিতিতে মিলিত হইয়া আহার, বিহার, অধ্যাপনা প্রভৃতি করা, অতি উত্তম নিয়ম। আমাদের দেশে ভদ্র লোকেরা কার্য্য স্থান হইতে গৃহে আসিয়া এরূপ সমিতির নাম শুনিলেই চটিয়া উঠেন, একবার বিছানায় না গড়াইলে, তাঁহাদের চলে না। আমি বলি বৃথা বক্তৃতা বা বৃথা গালগল্প না করিয়া কিছু কিছু আহারাদিও চলে, এরূপ কোন স্থানে মিলিত হওয়া কি বাঞ্ছনীয় নহে? আলস্য বাঙ্গালীর একটি প্রধান দোষ। সে আলস্য যাহাতে তিরোহিত হয়, সমাজ সংস্কারকদিগের তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই প্রথম কার্য্য।

এইবার বোম্বাই সহরের কথা বলিতেছি। বোম্বাই সহর আর কলিকাতা সহরের প্রভেদ কি? বোম্বাই অপেক্ষা কলিকাতার রাজ অট্টালিকাগুলি জাঁকাল, কেল্লা জাঁকাল, চৌরঙ্গী জাঁকাল, গঙ্গায় জাহাজের শোভা জাঁকাল, সন্ধ্যার সময় Strand এ গাড়ী ঘোড়ার বাহার জাঁকাল, আনন্দ উদ্যান গুলি জাঁকাল, বোধ হয় বোম্বায়ের নীলাম্বুর মহিমা এবং পার্শী রমণী ও ভাটিয়া রমণীর সৌন্দর্য্য ব্যতীত, কলিকাতার সকল বস্তুই জাঁকাল। কিন্তু এই দুই শোভা দেখিবার জন্য কি বোম্বাই যাওয়া? কলিকাতার কিয়দ্দূর দক্ষিণে যাইলেত সমুদ্র দেখিতে পাওয়া যায় এবং রমণী সৌন্দর্য্যও যে বাঙ্গালায় নাই, তাহাও বলিতে পারি না। তবে বোম্বাই যাইবার প্রলোভন কি? আমি বলি, ভারতবাসীর পক্ষে মহানগরী কলিকাতা দেখিবার যে প্রলোভন নাই, বোম্বাই দেখিবার সে প্রলোভন আছে। কলিকাতায় ভারতবাসীর জাতীয় জীবন দেখিতে পাই না, কিন্তু বোম্বাই গিয়া ভারতবাসীর জাতীয় জীবনের অভ্যুদয় দেখি। ভারতবাসীর পক্ষে ইহা অপেক্ষা আনন্দকর দৃশ্য আর কি আছে? কলিকাতায় গিয়া বাঙ্গালীর দাসত্ব ব্রত দেখিবে, বোম্বাই গিয়া অধিবাসীদের স্বাধীন ব্রত দেখিবে। কলিকাতায় গিয়া ভারতের অবনতি দেখিবে, বোম্বাই গিয়া ভারতের উন্নতির সোপান দেখিয়া আসিবে। কলিকাতায় গিয়া দেখ, ধনী ধনের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, জ্ঞানী জ্ঞানের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, মানী মানের অসদ্ব্যবহার করিতেছেন, বোম্বাই গিয়া দেখ, ধনী জ্ঞানী ও মানী সকলেই শিক্ষা দীক্ষা, ধন মানের সদ্ব্যবহার করিতেছেন। বঙ্গবাসী! তুমিও ইংরাজকে অনুকরণ কর, বোম্বাইবাসীও

ইংরাজকে অনুকবেন। কিন্তু তুমি অনুকরণ করিতে গিয়া আপন অস্তিত্ব লোপ করিয়া ফেল, আর বোম্বাইবাসী অনুকরণ করিয়া আপন অস্তিত্বের গুরুত্ব লাভ করিতেছেন। বাঙ্গালি! আজ শতবর্ষের অধিক তুমি ইংরাজের অনুকরণ করিতেছ। ইংরাজ তোমায় যথেষ্ট শিক্ষা দিয়াছেন; বিশেষত বিগত কয়েক বৎসরের মধ্যে এতই জীবন্ত শিক্ষা পাইয়াছ, যে তাহা তোমার হৃদয় পঞ্জর ক্ষত করিয়া বসিয়া গিয়াছে! তবু তুমি যাহাকে অনুকরণ করিতেছ, তাহার আসল কায একটিও শিখিলে না। তুমি বামন হইয়া একেবারে চন্দ্র ধরিতে প্রয়াস পাও, তুমি তুচ্ছ হইয়া একেবারে মহত্ত্ব লাভ করিতে চাও, তুমি দুইটা বক্তৃতা শুনিয়া, দুই খানা ইতিহাস পড়িয়া, ইউরোপীয় প্রদেশের দুই একটা দলাদলির কথা শুনিয়া, বাঙ্গালাকে সদ্য সদ্য রোমীয় রাজ্য করিয়া তুলিতে চাহ, দাসত্বের শৃঙ্খল গলায় না পরিলে তোমার উদরে অন্ন যোটে না, অন্য জাতির বল না লইলে তোমার বাহুতে বল হয় না, অন্যে তোমার ধন না রাখিলে, তোমার ধন রক্ষা হয় না, তবে তুমি এতদিন ইংরাজের অনুকরণ করিয়া কি শিখিলে? তোমার আকিঞ্চনে ধিক্। তুমি কথায় কথায় বল, উদ্যম না করিলে উন্নতি হইবে কিরূপে? আমি বলি তোমার উদ্যমে ধিক্। তোমার হৃদয়ে যদি উদ্যম থাকিত, তাহা হইলে ইলবর্ট বিলের হাঙ্গাম শেষ হইতে না হইতেই, বাঙ্গালার পাড়ায় পাড়ায় দোকান পাট বসিত, পল্লীতে পল্লীতে জয়েণ্ট ষ্টক্ (Joint stock farm) ফারম খোলা হইত, নগরে নগরে মিল্ খোলা হইত, বাঙ্গালী দেশ বিদেশ বাণিজ্যে বহির্গত হইত, মাতৃভূমি শস্যশালিনী হইতেন, বাঙ্গালীর অর্দ্ধেক দুঃখ ঘুচিত, বাঙ্গালীর জাতীয় জীবনের ভিত্তি রোপিত হইত। যে জাতিকে সূচ্ সূতা ছুরি কাঁচি কাগজ কলম দেশেলাই প্রভৃতি, অতি সামান্য সামান্য বস্তুর জন্যও ভিন্ন জাতির মুখ প্রতীক্ষা করিতে হয়, পাদুকা পরিধেয় গাত্র বস্ত্র প্রভৃতি নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর জন্যও, যে জাতিকে ভিন্ন জাতির উপর নির্ভর করিতে হয়, পাড়ায় পাড়ায় পল্লীতে পল্লীতে নগরে নগরে, সভা সংস্থাপন করিয়া দিবারাত্র বক্তৃতা করিতে করিতে, ইংরাজের দ্বারে দ্বারে কাঁদিয়া বেড়াইলেও, সে জাতির উন্নতি হইবে না, যে জাতি স্বাতন্ত্র্য বুঝে না, অথচ স্বাধীনচেতা ইংরাজের সমকক্ষ হইতে চাহে, সে জাতির মঙ্গল

নাই। বাঙ্গালি। তুমি নিজের প্রতি চাহিয়া দেখ,—তোমার মত দরিদ্র জগতে নাই, তুমি আগে নিজের দারিদ্র্য মোচন কর; দাসত্বে অতি অল্প ধন উপার্জ্জন হইয়া থাকে; বাণিজ্য ব্যতীত দেশের ধন বৃদ্ধি হয় না। গ্রীসের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; ফিনিসিয়দিগের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; পর্টুগীজদিগের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; ইজিপ্টের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; ফ্রান্সের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; ইংলণ্ডের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল, আমেরিকার উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; আরব্যের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; পারশ্যের উন্নতি বাণিজ্যে হইয়াছিল; চীনের উন্নতি বাণিজ্যে, জাপানের উন্নতি বাণিজ্যে। বাঙ্গালীর বাণিজ্য নাই বাঙ্গালীর উন্নতির প্রত্যাশা কোথা? বাঙ্গালীর ক্ষিপ্রকারিতা, উৎসাহ নাই, বাঙ্গালীর উন্নতির প্রত্যাশা কোথায়? বোম্বাই গিয়া দেখ ক্ষিপ্রকারিতা বোম্বাইবাসীর অঙ্গে অঙ্গে ছুটিয়া বেড়াইতেছে, উৎসাহ বোম্বাইবাসীর বদনে ও ললাটে উছলিয়া পড়িতেছে। এ পার্থক্যের কারণ অনুসন্ধান করিয়া দেখ, বোম্বাইবাসী জাতীয় স্বাতন্ত্র্য বুঝিয়াছে, তাই আজ তাহাদের এ মূর্ত্তি। যাঁহারা সাম্যবাদী তাঁহাদের স্বাতন্ত্র্য কথাটি ভাল লাগিবে না, কিন্তু আমি বলি, যে, বর্ত্তমান হিন্দুর পক্ষে সাম্যবাদী হওয়া যুক্তিসিদ্ধ কিনা তাহা তর্কের বিষয়। কিন্তু সে তর্ক করিতে আমি এখন প্রস্তুত নহি।

কেহ কেহ বলেন যে বোম্বায়ের এত উন্নতির প্রধান কারণ, যে পশ্চিম ভারতের লোকেরা মুসলমানগণ কর্ত্তৃক ভারতে অন্যান্য জাতির ন্যায় বশীকৃত হয় নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালী ইংরাজের কেবল হাঁচিটি, মুচকে হাস্য করাটি, এবং সঙ্কুচিতে মস্তক চুলকানটি অনুকরণ করিতেছেন, কিন্তু ইংরাজের সারত্বটুক অনুকরণ করেন না, করিতে জানেন না; সেই জন্যই বাঙ্গালীর দুর্দ্দশা ঘোচে না। বাঙ্গালীর প্রথম উদ্যম সাহেবী পোসাক। ইংরাজি ভাল করিয়া শিখুন আর না শিখুন, পোসাকটা যতদূর ঘটিয়া উঠে, সাহেবি করিতেই হইবে। দ্বিতীয় সাহেবী ভাষায়; পিতা পুত্রকে পত্র লিখিতেছেন "My dear son" পুত্র পিতাকে পত্র লিখিতেছেন, "My dear father", এবং আমি শুনিয়াছি, যে আজকাল কোন কোন বাঙ্গালী তাঁহাদের স্ত্রীর নিকট হইতে "My dear

হনুমান” প্রভৃতি সম্বোধনে লিখিত, পত্রাদি পাইলে চরিতার্থ হইয়া থাকেন। ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালীর রীতিমত শিক্ষা প্রয়োজন, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি বলি, পড়িবার সময় ইংরাজী পড়, কিন্তু লিখিবার সময় বাঙ্গালায় লেখ। তাই বলিয়া আমি ইংরাজি লেখা অভ্যাস করিতে নিষেধ করিব না। কিন্তু তাহার সময় আছে। আপনার পিতা মাতা, ভাই ভগিনী, পত্নী ও বন্ধুবর্গের নিকট, বিজাতীয় ভাষা কেন? বাঙ্গালীর তৃতীয় সাহেবি “মিটীং ও বক্তৃতা”। মিটীং ও বক্তৃতার উদ্দেশ্য ভাল তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু মিটিং করিয়া, বক্তৃতা করিয়া, কাহাকে বুঝাইতে চাও? যদি স্বদেশীয়কে বুঝাইতে চাও, তবে ইংরাজি কেন? যদি গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে চাও, তবে বক্তৃতা কেন? যাহা গবর্ণমেণ্টকে বুঝাইতে চাও, তাহা ইংরাজীতে লিখিয়া গবর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন কর, কিন্তু মনে স্থির জানিও, যে, যে স্থানে গবর্ণমেণ্টের স্বার্থ আছে, সে স্থলে আবেদন “রদ্দি কাগজ জাৎ” হইবে। তবে কি মিটিং বা বক্তৃতার প্রয়োজন নাই? আমি বলি, আবেদন করা অপেক্ষা মিটিং ও বক্তৃতার প্রয়োজন আছে। কিন্তু সে প্রয়োজন কি? সে প্রয়োজন প্রথমে বাঙ্গালীর জাতীয় ভাব প্রতিষ্ঠা। “জাতীয়ভাব” কাহাকে বলি? বাঙ্গালীর প্রথমে বুঝিতে হইবে, বাঙ্গালী কোন্ জাতি, তাহার পর বুঝিতে হইবে, কি করিলে পূর্ব্বের মত হইব। যাঁহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস পড়িয়া বুঝেন না, যে প্রাচীন হিন্দু জাতি বুদ্ধি, বিদ্যা, বীর্য্যে ও ধর্ম্মে আধুনিক পৃথিবীর কোন জাতি অপেক্ষা ন্যূন ছিলেন না, তাঁহারা যেন শিক্ষিত বলিয়া ভাণ না করেন। আর যাঁহারা একথা স্বীকার করেন, তাঁহাদের বলি যে, ইংরাজের বুদ্ধি বিদ্যা, উৎসাহ, সাহস, বীর্য্য, ক্ষিপ্রকারিতা প্রভৃতি দেখিলে কি মনে করিব? সাহেব হইতে ইচ্ছা করিব? না, সেই জ্বলন্ত শিখার ন্যায় প্রাচীন হিন্দু হইতে ইচ্ছা করিব।

যদি হিন্দু হইতে ইচ্ছা করি, তবে তাঁহাদের মত প্রবল উৎসাহ চাই, গভীর বিশ্বাস চাই, দৃঢ় অধ্যবসায় চাই। কিন্তু আধুনিক বঙ্গবাসীর তাহা কই? উদ্যম আছে প্রকৃত উৎসাহ কই? অধ্যবসায় কই? আমি বোম্বাই ও পুনা প্রভৃতি স্থানে দেখিলাম, কি মহারাষ্ট্রীয়, কি গুজরাটী, কি পার্শী, কি অন্য জাতীয়, কি বালক, কি যুবা, কি প্রৌঢ়,

কি বৃদ্ধ, সকলেই যেন জীবনে পরিপূর্ণ, তাঁহাদের হাতে যেন সর্ব্বদাই এত কাজ রহিয়াছে, যে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়াও শেষ হইতেছে না। আর এখানে বাঙ্গালীর দিকে চাহিয়া দেখিলে বোধ হয়, যেন ইহাদের হয় সব কায শেষ হইয়া গিয়াছে, নয় যেন নির্জীব দাসত্ব ব্যতীত ইঁহারা আর কোন কাজ করিতেই জগতে আসেন নাই। এমন কি বোম্বাই প্রভৃতি স্থানের বৃদ্ধ লোকদিগের ও যে উৎসাহ ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়াছি বঙ্গদেশের পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রেবরেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বাবু জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ও আর জন কয়েক যুবা পুরুষ ব্যতীত অতি অল্প লোকেরই তাহা দেখিতে পাই।

সাহেবী জিনিষটা যে একেবারেই মন্দ, তাহা আমি বলি না, কিন্তু যাহাকে সাধারণত সাহেবী কহে, তাহার সকলটা সাহেবী নহে। হিন্দুরও সে সকল ছিল। সাহেবের উৎসাহ, উদ্যম, ক্ষিপ্রকারিতা—কি হিন্দুর ছিল না? আমরা সে সকল শিক্ষা করি না কেন? বোম্বাই বাসীর ত এ সকল যথেষ্ট আছে; কিন্তু কয় জন বোম্বাইবাসী সাহেবের পোষাক করেন? বা কয় জন আপন মাতৃভাষায় অনাদর করেন?

বোম্বায়ের অধিবাসীদিগকে এই কয় শ্রেণীতে বিভক্ত করিব।

বৌদ্ধ ও জৈন,	..	১৭,২১৮	পার্শী,	...	৪৮,৫৯৭
ভাটিয়া,	...	৯,৪১৭	ইহুদি,	...	৩,৩২১
ব্রাহ্মণ,	..	৩৫,৪২৮	দেশীয় খ্রীষ্টান,	...	৩০,৭০৮
ধর্ম্মচ্যুত হিন্দু,	...	৪,০৭,৭১৭	ফিরিঙ্গি,	...	১,১৬৮
অন্যজাতীয় হিন্দু,	...	৪৯,১২২	ইউরোপীয়,	...	১০,৫৫১
মুসলমান,	...	১,৫৮,০২৪	চিনবাসী,	...	১৬৯
আফ্রিকার নিগ্রো,	...	৬৮৯			

সর্ব্বশুদ্ধ ৭,৭৩,১৯৬

জৈনদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণ এবং ভাটিয়াও আছে, উহারা মৎস্য ও মাংস আহার করেন না। জৈন ধর্ম্ম অনেকটা বৌদ্ধ ধর্ম্মের মত। ইহারাও মূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকেন, ইঁহাদিগের উপাস্য মূর্ত্তি অনেকটা বৌদ্ধদিগের উপাস্য মূর্ত্তির ন্যায়। ইঁহাদের মধ্যে জাতিভেদ নাই। আত্মার দেহান্তর প্রাপ্তিতে ইঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সেই জন্যই জীব হত্যা করেন না। ব্যব-

সাই ইহাদের উপজীবিকা,—ইহারা দাসত্ব করিতে প্রায় জানে না। ইঁহাদের মধ্যে প্রায় সকলেই ধনী। ইঁহারা ভারতের নানাস্থানে, বহু অর্থব্যয় করিয়া, উপাস্য দেবের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। মন্দির গুলি ও উপাস্য দেবমূর্ত্তির অঙ্গ বিস্তর স্বর্ণ ও জহরত দিয়া সুশোভিত করা আছে, কাটীওয়ারে গির্ণার ও পালিটানা নামক স্থানে, এবং "আবু" পর্ব্বতে ইহাদের অতি বিখ্যাত উপাস্য মন্দির আছে। আবু পর্ব্বতে যে উপাস্য মন্দির আছে, শুনিয়াছি, তথায় ১,৪৪৪ মণ এক স্বর্ণ মুর্ত্তি আছে, উহার মূল্য প্রায় সাড়ে আট কোটী টাকা।

বোম্বায়ের ব্রাহ্মণদিগকে সাধারণত দুই ভাগে বিভক্ত করিব। এক দল বিষ্ণু উপাসক,—এক দল শিব উপাসক। শৈবেরা সকলেই ললাটে চন্দন রেখা, একদিক হইতে অন্য দিক পর্য্যন্ত লেপন করেন এবং বৈষ্ণবেরা উর্দ্ধভাবে চন্দন রেখা লেপন করেন। বোম্বায়ে বিষ্ণু উপাসকই অধিক। ভাটিয়ারা অনেকেই কৃষ্ণ উপাসক এবং ইঁহারা ইহাদের ধর্ম্মগুরুকে অবতারের ন্যায় জ্ঞান করেন। পূর্ব্বে ইহারা অতি আনন্দ সহকারে, স্ত্রী ও কন্যা গুরুকে উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ করিয়া লইতেন, এক্ষণে সে জঘন্য প্রথা আছে কি না তাহার সন্ধান করিতে পারি নাই। প্রায় বিংশতি বৎসরের অধিক হইল বোম্বায়ে একটী মোকদ্দমায় ইহাদের এই প্রথা প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছিল। ইঁহারা গণপতিরও উপাসনা করিয়া থাকেন। শৈবদল শিবের উপাসক বটে, কিন্তু শিবপত্নী কালীপূজায় অধিকতর ভক্ত। মধ্য ও পশ্চিম ভারতে ভবানীর উপাসকই অধিক। প্রসিদ্ধ ঠগি দলের সহায় ভবানী নিজে হইতেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

"বেনে" বলিয়া যাঁহারা পরিচয় দেন, তাঁহাদের মধ্যে ভাটীয়াই অধিক। ধন সঞ্চয় করাই ইহাদের জীবনের উদ্দেশ্য, যিনি ক্রোড়পতি, এক পয়সা ব্যয় করিতে হইলে তিনিও কুণ্ঠিত হয়েন। Ovington সাহেব যিনি ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ভাটীয়াদিগের সম্বন্ধে এইরূপ তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন;—"They are mainly addicted to prosecute their temporal interest, and the amassing of treasure and therefore will fly at the securing of a pie, though they can

command whole lakhs of rupees. I know those amongst them, computed to be worth £1,000, 000, whose service, the prospect of six pence advantage, will command, to traverse the whole city of Surat."

ভারতের প্রাচীন ইতিহাস লেখক হণ্টল নামক জনৈক ইউরোপীয় বলেন যে গুজরাটে বেণিয়াদিগের সম্বন্ধে এই রূপ প্রবাদ আছে "It took three Jews to make one Chainaman and three Chainamen to make one Baman." যিনি যাহাই বলুন, ভিন্ন দেশের সহিত ভারতের প্রাচীন ব্যবসায় বাণিজ্য যে বেনিয়াদিগের দ্বারায় চালিত, তাহার আর সন্দেহ নাই। প্রাচীন কালে পারশ্য উপসাগরের উপকূলে ও ভারত সমুদ্রের উপকূলে যে সকল জাতি ছিল, তাঁহাদের সহিত এই বেণিয়ারাই যে ব্যবসা বাণিজ্য করিতেন, সে কথা একরূপ স্থির হইয়াছে। আজিকালি, আফ্রিকা ও আরবের পূর্ব্ব উপকূলে, প্রধানত বোম্বায়ের এই বেণিয়াদিগের দ্বারাই বাণিজ্য চলিতেছে; জাঞ্জিবার, মসকট ও অন্যান্য স্থানে ইঁহাদের বিস্তর এজেণ্ট আছে। বেণিযারা অধিকাংশ জৈন ধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া কোন প্রকার জীব হিংসা করেন না। বোম্বায়ে প্রায় সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়, যে বেণিয়ারা রাস্তার ধারে ও বাটীর প্রাচীরের পার্শ্বে পীপীলিকাদির আহারের জন্য চিনি ছড়াইতেছেন। পীড়িত, অথর্ব্ব ও নিরাশ্রয় সকল প্রকার পশুর চিকিৎসা ও প্রতিপালন জন্য বোম্বায়ের স্থানে স্থানে ইঁহারা পশুশালা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। এই সকল পশুশালাকে "পীঁজরাপোল" কহে।

মাড়োয়ারীদের মহাজনী ও জেওয়াহিরাতি ব্যবসা। বোম্বাই ও পশ্চিম ভারতের অধিকাংশ লোকেই এই মাড়োয়ারীদিগের নিকট হইতে টাকা কর্জ্জ লইয়া বিষয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করেন।

বোম্বায়ে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট অধিবাসীদিগের মধ্যে মৎস্য ব্যবসায়ী, কুলী ও মুটে মজুরই অধিক। ইহারা এই দ্বীপের, গুজরাটের ও দাক্ষিণাত্যের আদিম নিবাসী বলিয়া বোধ হয়।*

* বোম্বায়ে অতি প্রাচীনকালে আফ্রিকার নিগ্রোদিগকে আনা হইত এবং তাহারা দাসের ন্যায় ক্রীত ও বিক্রীত হইত। নীচলোকদিগের মধ্যে ইহাদের বংশসম্ভূত দুই এক জন, সন্ধান করিলেও পাওয়া যাইতে পারে।

আত্মতীর্থম্।

আত্মৈব পরমং তীর্থং মুক্তিক্ষেত্রং সনাতনম্।
ত্রিতাপহারিণী যত্র ভক্তি-গঙ্গা বিরাজতে ॥ ১ ॥

আত্মাই মুক্তির ক্ষেত্র তীর্থ সনাতন,
কিবা আর আছে তীর্থ, এ তীর্থ যেমন?
ত্রিতাপহারিণী যথা পতিত পাবনী,
ভক্তিরূপে বিরাজিত গঙ্গানারায়ণী। ১।

ন দেবো বিদ্যতে মন্ত্রে ন তন্ত্রে ন ব্রতেঽপি বা।
ন তীর্থে প্রতিমায়াং বা ভাবগম্যোহি কেশবঃ ॥ ২ ॥

মন্ত্রে তন্ত্রে জপে তপে ব্রতে প্রতিমায়,
কিম্বা তীর্থে কভু কেহ নাহি পায় তাঁয়;
ভকত-বৎসল হরি ভকত জীবন,
কেবল ভকতি দিলে মিলে সেই ধন ॥ ২ ॥

ভক্তিহীনা তু যা বুদ্ধিঃ শাস্ত্র মাত্রানুশীলিনী।
পরমার্থং ন জানাতি দর্ব্বী পাক-রসং যথা ॥ ৩ ॥

ভক্তি নাই, শুধু করে শাস্ত্র আলোচন,
হেন বুদ্ধি—নাহি বুঝে ব্রহ্ম সনাতন;
দর্ব্বী দেখ! নাড়ে চাড়ে সুমিষ্ট ওদন, (১)
তথাপি সে নাহি জানে মিষ্ট যে কেমন। ৩।

ভবেঽস্মিন্ জন্মমরণরোগশোকাদ্যুপপ্লুতে।
কেবলং ভগবদ্ভক্তি র্মুক্তিক্ষেত্রং হি দেহিনাম্ ॥ ৪ ॥

---

(১) 'দর্ব্বী'—হাতা, তাড়ু, খুন্তী, ইত্যাদি। 'সুমিষ্ট ওদন'—মিষ্টান্ন

জন্ম, মৃত্যু, জরা, রোগ, শোক নিরন্তর,
সমস্ত সংসার তাহে হের! জরজর;
একমাত্র ভক্তি সেই দেব নারায়ণে,
জীবের মুক্তির ক্ষেত্র জানিবে ভুবনে। ৪।

রে মূঢ়! মজ্জ শততীর্থ জলেষজস্রম্,
ধৌতং ততঃ খলু ভবেদ্রজ এব বাহ্যম্।
নৈবাত্মতীর্থ পরিষেবণ মন্তরেণ
মালিন্য মান্তর মপৈতি ন নির্বৃতি র্বা॥ ৫॥

রে মূঢ়! সহস্র তীর্থে করহ মজ্জন,
বাহিরের ধূলা তাহে হইবে ক্ষালন;
আত্মতীর্থে নাহি যদি কর যোগ-স্নান,
যাবে না মনের রজ, পাবে না নির্ব্বাণ। ৫।

পরিভ্রমসি কিং দূরং তুচ্ছকাচজিঘৃক্ষয়া।
মনঃ! কিং নাভিজানীষে গৃহে চিন্তামণিং তব॥ ৬॥

কাচের আশায় দূরে ভ্রম কেন মন!
চিন না কি গৃহে তব চিন্তামণি ধন? ৬।

তীর্থে তীর্থে পরিভ্রম্য মূঢ়াস্তাম্যন্তি মুক্তয়ে।
আত্মৈব পরমং তীর্থং যত্র মুক্তিময়োহরিঃ॥ ৭॥

তীর্থে তীর্থে মুক্তি আশে করিয়া ভ্রমণ,
বৃথাই অশেষ ক্লেশ পা'য় মূঢ়গণ;
আত্মাই পরম তীর্থ জানিবে নিশ্চিত,
মুক্তিরূপে নারায়ণ যথা বিরাজিত। ৭।

ক্ষিপন্তি ভস্মনি ঘৃতং নানাযজ্ঞপরা জনাঃ।
আত্মাগ্নৌ ভক্তি হুতিভিঃ প্রীয়তে পরমেশ্বরঃ ॥ ৮ ॥

নানাবিধ যাগযজ্ঞ করিয়া সাধন,
ভস্মেই কেবল ঘৃত ঢালে মূঢ়গণ ;
আত্মাই পবিত্র বহ্নি, আহুতি ভকতি,
প্রীত হন নারায়ণ যাহে বিশ্বপতি। ৮।

কুরু জীব। মহাযজ্ঞং কৃষ্ণ প্রেম হুতাশনে।
কৃষ্ণায় নম ইত্যুক্তা নিক্ষিপাত্মান মাহুতিম্ ॥ ৯ ॥

রে জীব! একান্ত যদি লভিবে নির্ব্বাণ,
তবে এই মহাযজ্ঞ কর অনুষ্ঠান ,
যিনি যজ্ঞেশ্বর হরি, তাঁরি প্রেমানলে,
আত্মাকে আহুতি দেও 'কৃষ্ণায় নমঃ' বলে। ৯।

সর্ব্ব তীর্থানি তত্রৈব সর্ব্বসিদ্ধর্ষি যোগীনঃ।
আবির্ভবন্তি যত্রৈব হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ॥ ১০ ॥

ভক্তবৃন্দে প্রেমানন্দে হইয়া মগন,
যেই স্থানে হরি নাম করে সংকীর্ত্তন ,
যোগী ঋষি সিদ্ধ যত, যত তীর্থ স্থান,
সেই স্থানে সকলেরি হয় অধিষ্ঠান। ১০।

আত্মা কাশী মহাতীর্থং মুক্তিক্ষেত্রং সনাতনম্।
নিত্যং সন্নিহিতো যত্র রাজরাজেশ্বরঃ শিবঃ ॥ ১১ ॥

ভক্তের আত্মাই কাশী তীর্থ সনাতন,
কি আছে মুক্তির ক্ষেত্র এ তীর্থ যেমন ?
নিত্য বিরাজেন যথা জগতের গুরু,
রাজ রাজেশ্বর সেই শিবকল্পতরু। ১১।

শ্রীক্ষেত্রং পরমং তীর্থং ভক্তস্য হৃদয়ং হি তৎ।
মুক্তিদাতা স্বয়ং যত্র জগন্নাথো বিরাজতে॥ ১২॥

শ্রীক্ষেত্র পরম তীর্থ ভকতেরি চিত,
মুক্তিদাতা জগন্নাথ যথা বিরাজিত। ১২।

তদেব ভক্ত হৃদয়ং গয়াতীর্থং বিমুক্তিদম্।
পাদপদ্মং বিনিদধে যত্র দেবো গদাধরঃ॥ ১৩॥

গযাতীর্থ মোক্ষ ধাম ভক্তেরি হৃদয়,
গদাধর পাদপদ্ম নিত্য যথা রয়। ১৩।

নিত্যানন্দময়ো যত্র হৃদয়ে রমতে হরিঃ।
সর্ব্বতীর্থোত্তমং তদ্ধি সর্ব্বতীর্থোত্তমং হি তৎ॥ ১৪॥

যে হৃদয়ে নিত্যানন্দ হরির বিহার,
সর্ব্ব তীর্থ সার সেই সর্ব্ব তীর্থ সার। ১৪।

যম্‌ গত্বা ন শোচন্তি তদ্ ব্রহ্ম পরমং যয়া।
সম্পদ্যতে নমস্তস্যৈ ভক্তয়েঽচিন্ত্যশক্তয়ে॥ ১৫॥

যাঁহাকে লভিলে আর শোক নাহি রয়,
সেই ব্রহ্ম যাহার প্রসাদে লাভ হয়;
অচিন্ত্য শকতি সেই ভকতির পদে,
নমস্কার বার বার করি পদে পদে। ১৫।

শ্রীতারাকুমার শর্ম্মা।

সংসার আশ্রম।*

(সমালোচনা)

উপন্যাস মাত্রই এক একটি কৃত্রিম ও ক্ষুদ্র জগৎ। ভগবানের এই প্রত্যক্ষ অনন্ত জগতের অনুকরণেই ইহা সৃজিত হইয়া থাকে। এই অনুকরণ সাধারণত দুই প্রকারের—স্থূলের অনুকরণ ও মূলের অনুকরণ। স্থূলের অনুকরণে, অনুকরণের বিষয়টী সমষ্টিভাবে সমগ্ররূপে অনুকৃত হইয়া থাকে—মূলের অনুকরণে অনুকরণের বিষয়টি ব্যষ্টিভাবে আংশিকরূপেই অনুকৃত হয়। এক প্রকারের অনুকরণের আসলটা জগতে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকি—অন্য প্রকারের অনুকরণের আসলটা কোন স্থানেই সমষ্টিভাবে একত্রিত দেখিতে পাই না; কিন্তু সেই আসলটার অংশ প্রত্যংশ আমরা অপরাংশের সহিত অযুক্তাবস্থায় অন্যত্র বর্ত্তমান দেখিতে পাই। একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা কথাটি বুঝাইতেছি। এই যে শারদীয় দুর্গোৎসবের সময় দেবীপ্রতিমা গঠিত হইয়া থাকে, ইহাতেই আমরা উপরোক্ত দ্বিবিধ অনুকরণ দেখিতে পাই। এই যে অতসীবর্ণ পুষ্পাভা ত্রিনয়না দশভুজা মূর্ত্তি উহা আমাদের পূর্ব্ব বর্ণিত মূলের অনুকরণে গঠিতা হইয়াছে। সুন্দরী রমণীর প্রায় সমগ্র অংশ আসলরূপে গ্রহণ করিয়া অন্যত্র হইতে অতসী পুষ্পের বর্ণ অতিরঞ্জনে তিনটী চক্ষু, দশখানি হাত গড়িয়া দিব্যা এক দেবী প্রতিমা কল্পিতা হইল। মানুষ ঠিক মূল সৃষ্টি করিতে পারে না সত্য, কিন্তু প্রত্যক্ষীকৃত মূলের অপ্রত্যক্ষীকৃত সংযোগ কল্পনা বা সৃষ্টি করিতে সক্ষম। এই যে দেবী প্রতিমার দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিলাম, ইহাতে অবশ্য অতিরঞ্জন কিছু অস্বাভাবিক অনুমিত হইবে। কিন্তু এই অনুকরণে স্বাভাবিক অথবা স্বাভাবিক-বলিয়া-প্রতিপন্ন-হইবার-যোগ্য পদার্থও সৃষ্ট হইয়া থাকে। আবার

---

* সংসার আশ্রম—গার্হস্থ্য উপন্যাস।
শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত প্রণীত ও ১৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে শ্রীবিপিনবিহারি রক্ষিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য বার আনামাত্র।

এই যে দেবীপদতলে মহিষ মূর্ত্তিটি দেখিতে পাও, উহা আমাদের পূর্ব্ব কথিত স্থূলানুকরণে সৃজিত। যেমন জীবিত মহিষের আকার বা যেমন মৃত মহিষের আকার—ঠিক সেই রকমই উহার আকার গঠনের চেষ্টা হইয়াছে। যেমন এই প্রতিমা সম্বন্ধে দেখিতে পাইলে, তেমনই উপন্যাসের চরিত্র ও ঘটনা সম্বন্ধেও দেখিতে পাইবে। এক প্রকার উপন্যাসে বর্ণিত হয়, যাহা আছে তাহাই—অন্য প্রকার উপন্যাসে বর্ণিত হয়, যাহা হইতে পারে তাহাই। উদাহরণ রূপে দুই খানি উপন্যাস তুলনা কর। "স্বর্ণলতা" ও "দেবী চৌধুরাণী"। স্বর্ণলতা স্থূলানুকরণ-প্রধান উপন্যাস। ইহাতে আমাদিগের সচরাচর প্রত্যক্ষীকৃত একটি হিন্দু একান্নবর্ত্তী পরিবারের চিত্র অনুকৃত হইয়াছে। একেবারে যে ঠিক হইয়াছে—এরূপ নহে। তাহা হইলে ইহাকে চলিত কথায় ইতিহাসই বলিতাম। অরণ্যজাত বৃক্ষগুল্মাদি যত্নে উদ্যান মধ্যে রোপিত করিলে, যেরূপ পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, প্রকৃত ঘটনায় ও চরিত্রে, এবং স্বর্ণলতার ঘটনা ও চরিত্রেতে সেইরূপ পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয়। তাই "স্বর্ণলতাকে" স্থূলানুকরণে সৃষ্ট উপন্যাস বলিয়া আমরা অভিহিত করিলাম। এদিকে "দেবীচৌধুরাণী" প্রধানত মূলানুকরণে গঠিত উপন্যাস। ইহার নায়িকা প্রফুল্ল এ জগতে গ্রন্থকার কখনও দেখিতে পান নাই। কিন্তু তিনি যাহা দেখিয়াছেন, তাহা হইতেই এরূপ আদর্শ চিত্রের সম্ভাবিতা অনুমান করিয়া তিনি এই চিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। দেবী চৌধুরাণী প্রফুল্ল—যাহা আছে, তাহা নহে; যাহা হইতে পারে ও হইলে ভাল হয় তাহাই। যেরূপ পূর্ব্ব কথিত অনুকরণে এখনকার বর্ণিত অনুকরণের কিছু না থাকিলে, উপন্যাস ইতিহাস হইয়া পড়ে—সেইরূপ এখনকার কথিত অনুকরণে পূর্ব্ব কথিত অনুকরণের ভাগ অধিক না থাকিলে, তাহা আরব্য উপন্যাস হইয়া পড়ে। ফলত উৎকৃষ্ট উপন্যাস মাত্রেই দ্বিবিধ প্রকারের অনুকরণ থাকে, তবে উপন্যাসের যাহা প্রাণস্বরূপ, তাহা যে শ্রেণীর অনুকরণে গঠিত হয়, উপন্যাসকে সেই শ্রেণীর অনুকরণ প্রধান বলিয়া অভিহিত করা হয়।

ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই অসীম জগতের সমস্ত কেহ অনুকরণ করিতে সমর্থ হয় না। অংশ মাত্রই উপন্যাসে অনুকৃত হইতে পারে। তবেই

এই অনুকরণ সম্বন্ধে উপন্যাসকারের প্রথম প্রশ্ন—ইহার কোন অংশ তিনি অনুকরণ করিবেন? ইহার কি কি তিনি অনুকরণ করিবেন? এই বিষয় নির্ব্বাচনই গ্রন্থকারের সর্ব্ব প্রথম কার্য্য।

এই বিষয় নির্ব্বাচনের সঙ্গে সঙ্গে আর এক কথাও আসিয়া পড়ে—কিসের জন্য এ নির্ব্বাচন? উপন্যাসের মূল উদ্দেশ্য কি?

সম্প্রতি যে সকল উপন্যাস আমরা সচরাচর দেখিতে পাই, সেই সকলের বিশ্লেষণ করিলে প্রধানত দুই প্রকারের উদ্দেশ্য বিলক্ষিত হয়। আমরা তাহা নিম্নে নির্দ্দেশ করিতেছি।

এক প্রকার উপন্যাসের উদ্দেশ্য কেবলমাত্র সৌন্দর্য্য সৃষ্টি। ইহাকে আমরা চলিত কথায় "সকের' উপন্যাস" বলিতে পারি। যশের কথাটা ছাড়িয়া দিলে—অনুকরণই এই শ্রেণীর উপন্যাসের উদ্দেশ্য। অনুকরণে সৌন্দর্য্য প্রদর্শন অর্থাৎ যাহা অনুকৃত হইল তাহা আসলের ন্যায় অবিকল হইল অথবা তাহা জগতের প্রত্যক্ষীভূত অংশমাত্র সংগ্রহে অপ্রত্যক্ষীকৃত সৌন্দর্য্যরূপে কল্পিত হইল, ইহাই প্রদর্শনের জন্য এই শ্রেণীর উপন্যাস সৃষ্ট হইয়া থাকে। এই উপন্যাস লিখিবার সময়ে গ্রন্থকারের মনোমধ্যে প্রধান লক্ষ্যই থাকে নিজের বা পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জন। এই উপন্যাসে অন্য কোন উদ্দেশ্য গৌণভাবে সাধিত হইলেও মুখ্যভাবে লোকের চিত্ত-রঞ্জনই ইহার লক্ষ্য। প্রদর্শন বা সৃষ্টি দ্বারা লোকের মন বিমোহিত করা বা নিজে মুগ্ধ হওয়াই ইহা প্রণয়নের উদ্দেশ্য। এই প্রকার উদ্দেশ্যেই আয়েষা ও কপালকুণ্ডলা প্রভৃতি সৃষ্ট হইয়াছে।

অন্য প্রকারের উদ্দেশ্য—যশের কথা ছাড়িয়া দিলে, মুখ্যত জগতের বা সমাজ বিশেষের হিতসাধন। এই প্রকার উদ্দেশ্যে লিখিত উপন্যাসে গ্রন্থকারের প্রথম লক্ষ্য বা নির্ব্বাচনের মূল সূত্রই থাকে, জগতের বা সমাজ বিশেষের হিতসাধন। গৌণভাবে প্রথমোক্ত উদ্দেশ্যও ইহাতে অবশ্যই থাকিবে। কিন্তু তাহা উদ্দেশ্য সাধনার্থ অবলম্বিত উপায় মাত্র।

এই হিতসাধন বিবিধ প্রকারে হইতে পারে। দোষভাগ দেখাইয়া তজ্জন্য পাঠকবর্গকে সাবধান করা—কি উপায়ে তাহা পরিত্যাগ করা যায় তাহা প্রদর্শন করা—গুণভাগ, তৎপ্রতি আসক্তি আকর্ষণের জন্য পাঠকবর্গ

সমীপে উপস্থিত করা, প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে এই হিত সংসাধন সম্পন্ন হইতে পারে। বঙ্কিম বাবুর অধিকাংশ উপন্যাসই এই উদ্দেশ্যে লিখিত। মানব জীবনের কঠোর সমস্যা ব্যাখ্যাকে তিনি উপন্যাস বলিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা, জগতের বা সমাজ বিশেষের হিতসাধন জন্যই তিনি করিয়াছেন। তাঁহার বিষবৃক্ষ, কৃষ্ণকান্তের উইল, তাঁহার শান্তি, প্রফুল্ল, প্রভৃতি সকলই এই উদ্দেশ্যে লিখিত। এই উদ্দেশ্যানুসারে বিষয় নির্ব্বাচন করিয়া আমাদিগের পূর্ব্ব বর্ণিত অনুকরণের পন্থাবিশেষ গ্রন্থবিশেষে অনুকরণ করিয়া, তিনি উপন্যাস বা কৃত্রিম জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন।

এই উদ্দেশ্য ও নির্ব্বাচনের সঙ্গে মানসিক অনুকরণ সংযুক্ত হইলেই গ্রন্থকারের মনোমধ্যে উপন্যাসখানি নির্ম্মিত হইল। ইহার পরে, এই মনের উপন্যাসকে লিপিকৌশলে পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিলেই, তবে পুস্তকের উপন্যাস হইবে।

তবেই দেখিতে পাইলাম, উপন্যাস লেখা বড় সহজ কার্য্য নহে। ইহাতে বহু প্রকারের শিক্ষা চাই। রাজনীতি, অর্থনীতি, ব্যবহারনীতি, ধর্ম্মনীতি, বিজ্ঞাননীতি সর্ব্বশাস্ত্রেই গ্রন্থকারের সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা চাই। এ জগৎ এমন রহস্যময়, যে, ইহার কি ভাল, কি মন্দ, ভালটা কি করিলে মন্দ হইয়া যাইতে পারে, মন্দটা কি হইলে ভাল হইয়া উঠিতে পারে, আদর্শ ভাল কি—এ সকল সহজ বুদ্ধিতে বুঝা যায় না। এরূপ স্থলে গ্রন্থকারের বিশেষ জ্ঞান ও ভূয়োদর্শন না থাকিলে গ্রন্থের উদ্দেশ্য সাধন হইবে কেন? তাহার পরেও উপন্যাসকারের মানব মন সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান থাকা নিতান্ত আবশ্যক। উপন্যাসের অধিকাংশ স্থলেই এই মানব মনই অনুকরণের বিষয় হইয়া থাকে। যাহা অনুকরণ করিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া না দেখিতে জানিলে, অনুকরণ ভাল হইবে কেন? কাজেই বলিতে হয়, দেশের হিতসাধন জন্য উপন্যাস লিখিতে, অনেক শিক্ষা ও জ্ঞান চাই।

তবে আর এক শ্রেণীর উপন্যাস লেখা কিছু সহজ। অনুকরণের যাথার্থ্য দেখাইবার জন্য, জগতে যাহা আছে, তাহারই অংশ বিশেষ প্রদর্শন করা তত কষ্টকর নহে। তাহাতে দেশের হিত সাধনের উপলক্ষ থাকে না—তাহাতে মূলানুকরণের, বা নূতন সৃষ্টির চেষ্টা থাকে না, তাহা সরলভাবে অনু-

করণের বাহবা লইবার জন্যই সৃষ্ট হইয়া থাকে। এরূপ স্থূলানুকরণে চিত্ত-রঞ্জন জন্য লিখিত উপন্যাস মনোমধ্যে গড়িতে বিশেষ বিদ্যা বুদ্ধির আবশ্যক করে না। এরূপ উপন্যাস লিখিয়া কৃতকার্য্য হইতে কেবলমাত্র লেখার কৌশল ও মানসিক সামান্যমাত্র নির্ব্বাচন ক্ষমতার আবশ্যক। একখানি "স্বর্ণলতা" লেখা বড় কঠিন নহে—কিন্তু একখানি "দেবীচৌধুরাণী" লেখা অতি কষ্টসাধ্য।

কোন্ প্রকার উপন্যাস কিরূপ ভাবে মনে গড়িতে হইবে, এবং তাহার জন্য কিরূপ শিক্ষার প্রয়োজন, তাহা উক্ত হইয়াছে। এক্ষণে তাহা পুস্তকাকার করিতে কি কি আবশ্যক, সংক্ষেপে তাহাই বলিব।

এই লিপিকৌশল সম্বন্ধেও আমরা গ্রন্থকারের সর্ব্ব প্রধান ও অতি প্রয়োজনীয় গুণ দেখিতে পাইতেছি—গ্রন্থকারের নির্ব্বাচিত বিষয়ের উপর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও সেই বিষয়ের সর্ব্বোজ্জ্বল এবং পার্থক্য-প্রকাশক অংশ নির্ব্বাচনের ক্ষমতা। মনে যাহা ভাবা যায়, চক্ষে যাহা দেখা যায়, তাহার সকল কিছু কাগজে লেখা যায় না। তবেই আবার নির্ব্বাচন চাই—আবার দেখা চাই, কোন্ বিষয়ের কোনটি মজ্জা এবং সার অংশ। সেই পার্থক্য-প্রকাশক উজ্জ্বল অংশটিই লিখিতে হইবে। প্রকৃতি বর্ণনায়ই বল, আর চরিত্র চিত্রণেই বল, নির্ব্বাচন না করিয়া লইলে, চিত্রই ফুটে না। তবে সর্ব্ব প্রথমেই লিখিতব্য বিষয়ের (জান) মূল ভাগ দেখা চাই।

তার পরে বাক্যবিন্যাস কৌশল ও শৃঙ্খলা কৌশল। লেখা,—সরল, মধুর, সংক্ষিপ্ত, কার্য্যকর, রুচিকর ও রসময় হওয়া চাই। শৃঙ্খলা এরূপ ভাবে হওয়া চাই যে, প্রত্যেক দৃশ্য দর্শনান্তেই যেন তাহার পরিণাম দেখিবার জন্য মনের কৌতূহল উদ্রিক্ত হয়। দৃশ্য বিস্তৃত হইয়া যেন দর্শকের মনে বিরক্তি সঞ্চার না করে। কোন কথা যেন অতিরিক্ত না হয়। যেখানে একটি সামান্য রেখা পাতে চিত্রের সৌন্দর্য্য ফুটিতে পারে, সেখানে যেন বহু রেখা পাত দ্বারা তাহা ফুটাইবার চেষ্টা না করা হয়। কত আর বলিব? আমরা কিছু সকল জানি, তাহাও নহে। তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি, বাক্যবিন্যাস ত মনের ভাববিশেষের বা দৃশ্য বিশেষের প্রতিকৃতি তুলিবার জন্য,—তবে সেই প্রতিকৃতি তুলিবার উপকরণ, ছায়া ও আলোক, মসী ও

রঙ প্রভৃতি ভাল না হইলে, ঠিক প্রতিকৃতি উঠিবে কেন? সে প্রকৃতি দেখিয়া আসলের ধারণা মনোমধ্যে আসিবে কেন?

এই যে সকল কথা বলিলাম, এ ছাড়া উপন্যাসের আরও এক ভাগ আছে। সে ভাগে গ্রন্থকার স্বয়ং ব্যাখ্যাকারক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া পাঠকবর্গকে তাঁহার সৃষ্টি বুঝাইয়া দেন। এই ভাগেই গ্রন্থকারের বড় সাবধান হইয়া চলিতে হয়। প্রস্তাব বাহুল্যভয়ে এ সম্বন্ধে কিছুই লিখিলাম না।

আমরা এখন উপরোক্ত কথানুসারে সংসার আশ্রম উপন্যাসখানি কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিতে চাহি। এই উপন্যাসের উদ্দেশ্য আমাদিগের বর্ণিত দ্বিবিধ উদ্দেশ্যের কোন্‌টি, তাহা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। যদি দেশের হিত সাধন এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য হয়, তবে তাহা গ্রন্থে প্রকাশিত হয় নাই। শুদ্ধ চিত্তরঞ্জনই মুখ্য উদ্দেশ্য ধরিয়া তিনি উপন্যাস খানি লিখিয়াছেন, ইহাই আমাদিগের বোধ হয় এবং আমাদিগের ন্যায় শিক্ষিত লোকের পক্ষে তাহাই উচিত।

অনুকরণে চিত্তরঞ্জনই উদ্দেশ্য করিয়া গ্রন্থকার হিন্দু পরিবারের সংসার আশ্রমের একভাগ নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। এই ভাগ যথাযথরূপে লিখিয়া প্রদর্শন করাই বোধ হয়, তাঁহার অভিপ্রায়। সুতরাং তাঁহার উদ্দেশ্য অনুকরণ দ্বারা ক্ষুদ্র সংসার আশ্রম সৃষ্টি করিয়া লোকের চিত্তরঞ্জন; কাজেই তাঁহার নির্ব্বাচিত বিষয় হিন্দু পরিবারের সংসার আশ্রমের একটি সকরুণ দৃশ্য। ইহা তিনি আমাদিগের পূর্ব্ব কথিত স্থূলানুকরণ পন্থা অবলম্বন করিয়া আমাদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছেন।

এরূপ উদ্দেশ্যে লিখিত উপন্যাসের বিচার করিতে হইলে, দেখিতে হইবে—প্রদর্শিত অনুকরণটি অবিকল হইয়াছে কি না ও তাহা পড়িলে যে-জন্যই হউক, চিত্ত আনন্দে উচ্ছ্বলিত হয় কি না।

এই বিচারে আবার দুইটী বিষয়ই দেখিতে হইবে—গ্রন্থকারের মনের উপন্যাস ও তাঁহার পুস্তকের উপন্যাস। আমরা যথাক্রমে এই দুই বিষয় আলোচনা করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

যতদূর বুঝিতে পারা যায়—গ্রন্থকারের মনের উপন্যাস অধিকাংশ স্থলেই আসলের অবিকল অনুকরণেই সৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহার ধারণাগত "সংসার-

আশ্রম" জগতের অকৃত্রিম সৃষ্টির একাংশ বলিয়াই অনুমিত হয়। তাঁহার নির্ব্বাচিত ঘটনাগুলি—তাঁহার নির্ব্বাচিত চরিত্রগুলি,—অধিকাংশ স্থলেই সরল ও স্বাভাবিক। তাঁহার 'আনন্দময়ী'র চরিত্র যেমন স্বাভাবিক, তেমনই আবার বড় সুন্দর। তাঁহার 'মাতঙ্গিনী'র অধিকাংশ ও 'ব্রজসুন্দরী' 'হরসুন্দরী'র সম্পূর্ণই স্বাভাবিক উজ্জ্বল চিত্র। তাঁহার শৈলেন্দ্রের চরিত্র অন্য উদ্দেশ্যে লিখিত; অন্যরূপ অনুকরণের গঠিত উপন্যাসেরই তাহা উপযোগী, এ উপন্যাসে না লিখিলেই ভাল হইত। অর্থাৎ এই চরিত্রটি গ্রন্থকার বিকশিত করিতে পারেন নাই সুতরাং এরূপ আদর্শ চরিত্র বিকাশের ক্ষমতাও তাঁহার নাই বলিলেও চলে। তাই বলিতেছিলাম, এরূপ চরিত্র তিনি গ্রন্থমধ্যে না লিখিলেই ভাল হইত। যাহা হউক এই চরিত্রটি ও ইহার আনুসঙ্গিক দুই একটি চরিত্র ও ঘটনা ছাড়িয়া দিলে, আমরা মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, হারাণ বাবুর উপন্যাসের ধারণা—স্বাভাবিক, এবং উদ্দেশ্য—সরল।

তার পরে দেখিতে হইবে, তাঁহার লিপিকৌশল। লিপিকৌশল দেখিতে হইলে, তৎসঙ্গে লিখিতব্য বিষয়ের প্রাণ নির্ব্বাচন ক্ষমতাও দেখিতে হয়। এই ক্ষমতা যে লেখকের থাকে, তিনি অতি অল্প কথায় অতি সুন্দর ফল উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়েন। হারাণ বাবুর এ ক্ষমতা এখনও পরিপক্কাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। নাই হউক, তাঁহার এ ক্ষমতা আছে, তাহা আমরা স্বীকার করিতে প্রস্তুত। তাঁহার লিখিত কথোপকথনগুলি ইহার নিদর্শন স্থল।

এই নির্ব্বাচন ক্ষমতার পরে যাহা যাহা আবশ্যক, হারাণবাবুর তাহা এখনও অভ্যাস হয় নাই। তাঁহার স্থানে স্থানে লেখা বড়ই অপরিপক্ক, মন্তব্য অধিকাংশ স্থলেই পাঠকের অরুচিকর ও বালকত্ব পরিচায়ক। গ্রন্থের স্থানে স্থানে করুণরস জমাট বাঁধিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহাতেও লিপি কৌশলের অভাব পরিদৃষ্ট হয়। গ্রন্থের যে ভাগে গ্রন্থকার দর্শকদিগের নিকট ব্যাখ্যাকারক ভাবে দণ্ডায়মান থাকেন, হারাণবাবুর গ্রন্থ সেই ভাগে পাঠকবর্গের আনন্দ জন্মাইতে সমর্থ হয় নাই। হারাণবাবুর মন্তব্যগুলি ভাল নহে। যাহা হউক, হারাণ বাবুর বয়স অল্প। তিনি যে অনুকরণে মনে একটি জগৎ গড়িতে পারিয়াছেন, তাহা কম প্রশংসার কথা নহে। উপযুক্ত লিপিকৌশল হইলেই, হারাণ বাবু "স্বর্ণলতা" শ্রেণীর উপন্যাস

লিখিয়া পাঠকবর্গের চিত্তরঞ্জন করিতে সমর্থ হইবেন, আমরা এরূপ ভরসা করি।

উপসংহারে আমরা হারাণ বাবুর "সংসার আশ্রমের" প্রশংসাই করি।

হিতোপদেশ।*

বিষ্ণু শর্ম্ম প্রণীত হিতোপদেশ অতি আশ্চর্য্য সংগ্রহ গ্রন্থ এবং শ্রীযুক্ত তারাকুমার কবিরত্ন কৃত সেই হিতোপদেশের এই ভূমিকা, পরিশোধিত মূল, বঙ্গানুবাদ, ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট অতি আশ্চর্য্য অধ্যবসায় ও পরিশ্রমের ফল। কবিরত্ন লিখিয়াছেন, "মধুমক্ষিকা যেমন নানা পুষ্পের মধু আহরণ করিয়া অপূর্ব্ব মধুচক্র রচনা করে, বিষ্ণুশর্ম্মাও তেমনি তৎপূর্ব্ববর্ত্তী পণ্ডিতগণের শাস্ত্র হইতে সার সঙ্কলন করিয়া এই হিতোপদেশ রচনা করিয়াছেন।" কিন্তু সেই অপূর্ব্ব অফুরন্ত মধুচক্র লইয়া কবিরত্ন যে কি করিয়াছেন, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। তিনি সেই সমগ্র মধুচক্রের সহস্র প্রকোষ্ঠের কোনটিতে কোন ফুলের মধু সঞ্চিত হইয়াছে, তাহা ধীরে ধীরে দেখাইয়া দিয়াছেন, ফুলের গন্ধের সহিত মধুর গন্ধ মিলাইয়া দিয়াছেন, আর দেখাইয়াছেন, যে মধুমাত্রই শ্লেষ্মঘ্ন হইলেও, পদ্মমধু নেত্র রোগে, তালমধু অম্লরোগে, এক এক ফুলের এক এক প্রকার মধু, বিশেষ বিশেষ স্থলে, বিশেষ উপকারী। এখন আপনারাই বলুন, আমরা সেই মধুমক্ষীর, না এই মধু বৈদ্যের, প্রশংসা করিব!

মনু, বৃহস্পতি, শুক্রাচার্য্য, বাল্মীকি, পরাশর, ব্যাস, চাণক্য, কামন্দক প্রভৃতি হইতে বিষ্ণু শর্ম্মা উপদেশ সঙ্কলন করিয়াছেন; কিন্তু কোথা হইতে

---

* হিতোপদেশ, শ্রীতারাকুমার কবিরত্ন কর্তৃক পরিশোধিত মূল এবং তৎকর্তৃক অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও পরিশিষ্ট প্রভৃতির সহিত। কলিকাতা ১১৯ নং ওল্ড বৈটকখানা রোড বানার্জি যন্ত্রে মুদ্রিত এবং জে, এন্, বানর্জি এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত।

কোনটি লওয়া, গ্রন্থে তাহার কোন পরিচয় নাই। এই মাত্র আছে, যে পঞ্চতন্ত্র এবং অন্যান্য গ্রন্থ হইতে হিতোপদেশ সঙ্কলিত হইল। কবিরত্ন অগাধ পরিশ্রমে, কোন শ্লোকটি বা পর্য্যায়টি কোথা হইতে গৃহীত তাহা পরিশিষ্টে বলিয়া দিয়াছেন, এবং ব্যাখায় ও 'হিতোপদেশের উপদেশ' বিবরণে সঙ্গৃহীত শ্লোকাদির বিশেষ উপকারিতা বুঝাইয়া দিয়াছেন, তাহাতেই বলিতেছিলাম, যে সেই পূর্ব্বকালের মধুমক্ষীব, না এই উপস্থিত মধু বৈদ্যের, কাহার অধিক প্রশংসা করিব?

বিষ্ণু শর্ম্মার পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশের গৌরব জগদ্ বিখ্যাত। খাস ধর্ম্মগ্রন্থ ছাড়া, অন্য কোন গ্রন্থের এত অধিক ভাষায় অনুবাদ বা অনুকরণ হয় নাই। হিব্রু, পহ্লবী, আরবিক, পারসিক, সাইরিক, তুরস্ক, চীন, গ্রীক্, লাটিন, ইটালিক, জর্ম্মানিক, ফ্রেঞ্চ, ইংরাজী, স্পানিস্, হিন্দী, উর্দ্দু, বাঙ্গালা প্রভৃতি পৃথিবীর প্রাচীন ও আধুনিক অনেক ভাষায়, গদ্যে ও পদ্যে, বিষ্ণু শর্ম্মার হিতোপদেশের ও পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ ও অনুকরণ হইয়াছে। বহুদিন হইতে বিষ্ণু শর্ম্মাব অনুসরণ জগতে চলিতেছে। বোধ হয়, পারস্যরাজ নৌশেবানের সময় হইতে হিতোপদেশের অনুসরণ আরম্ভ হয় এবং আপাতত আমাদের আলোচ্য সংস্করণই শেষ বলিতে হইবে। কিন্তু কবিরত্ন কৃত এই উপস্থিত সংস্করণের মত, এমন উৎকৃষ্ট সংস্করণ হিতোপদেশের অদৃষ্টে আর কখন হইয়াছে কিনা সন্দেহ। কবিরত্ন বহু গ্রন্থ মিলাইয়া, সংহিতাদি মূল গ্রন্থ দেখিয়া, সমগ্র হিতোপদেশের পাঠ উদ্ধার করিয়াছেন, গদ্যভাগের গদ্যে ও পদ্য ভাগের পদ্যে অতি সরল সহজ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন এবং দুরূহ স্থলে ভাবার্থের ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছেন। আর কি করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এখন নাকি চারুপাঠ হইতে সংগ্রহ হইয়া সুচারু পাঠ হইতেছে, কথামালা হইতে কথামালা-সার হইতেছে, এমন দিনে, একখানি অতি পুরাতন গ্রন্থের সংস্করণে ও বিশ্লেষণে এরূপ অগাধ শ্রম অতি আশ্চর্য্য ব্যাপার।

আমরা বলিতেছিলাম, পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ জগদ্বিখ্যাত, কেন না ঐ গ্রন্থদ্বয় জগতের নানা ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। কিন্তু আমাদের দেশে আজি কালি জগৎ ছাড়া লোক বিস্তর হইয়াছেন। জগতের লোক আপ-

নাদের গৌরব রক্ষার্থ বিব্রত, কিন্তু আমাদের জগৎ ছাড়া মহাত্মারা আত্মগৌরব নষ্ট করণার্থ বদ্ধ পরিকর। তাঁহারা যেমন শুনিবেন যে, হিতোপদেশ হইতে Pilpay's Tales প্রভৃতি গৃহীত হইয়াছে অমনই বলিবেন যে, হিতোপদেশ যে ঐ Pilpay's Tales হইতে গৃহীত হয় নাই, তাহা কে বলিতে পারে? তুমি যদি প্রমাণ দেখাইতে যাও, অমনই তাঁহারা বলিবেন, আমরা এখন সাহিত্য বিতণ্ডায় প্রবেশ করিতে পারি না, এই মাত্র বলিতে পারি, যে দুই মতের পক্ষেই অনেক কথা বলিতে পারা যায়। সুতরাং জগৎ ছাড়া লোক-দের কোন বিষয়েই সিদ্ধান্ত নাই। কেবল একটি স্থূল সিদ্ধান্ত আছে, যে আমাদের কিছুই ছিল না। এই সকল লোকদের কথা ছাড়িয়া দিয়া, আমরা সাধারণ লোকদের বলিতে পারি, যে ভারতবর্ষ প্রচলিত ঐ দুই গ্রন্থ হইতে যে বিদেশীয়গণ গ্রহণ করেন, তাহা তাঁহারা আপনারই বলিয়া দিয়াছেন! না বলিলেও, ইহা বুঝিতে পারা যায় যে, যে জাতি পশু পক্ষী পর্য্যন্তের আত্মা থাকা ধর্ম্মত এবং কর্ম্মত বিশ্বাস করে, তাহারাই পশু পক্ষীর মুখ দিয়া ধর্ম্মো-পদেশ বলাইবে ও শুনিবে। তাহাদের স্থানে শুনিয়া অন্যে অনুকরণ করিতে পারে, কিন্তু যে কথায় জাতি সাধারণের বিশ্বাস নাই, সে কথা কখন কোন মৌলিক রচনার মূল হইতে পারে না।

পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ উভয় গ্রন্থই বিষ্ণু শর্ম্ম-প্রণীত; উভয় গ্রন্থই দুর্বৃত্ত রাজকুমারগণকে নীতিশিক্ষা প্রদানার্থ সঙ্গৃহীত। পঞ্চতন্ত্র কিছু বিস্তৃত, হিতোপদেশ অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত। গ্রন্থের উদ্দেশ্যানুসারে ইহাতে রাজনীতি বিস্তর আছে; কিন্তু এখনকার মত তখনকার রাজনীতি সাধারণ নীতির বিরোধিনী ছিল না, কাজেই হিতোপদেশের নীতি সাধারণের উপযোগিনী। গ্রন্থের বিভাগ চারিটি—মিত্রলাভ, সুহৃদ্‌ভেদ, বিগ্রহ ও সন্ধি। কেবল রাজা রাজড়া বলিয়া নয়, আমাদের সাংসারিক জীবনেও আমরা ঐ চারিটি অবস্থা দেখিতে পাই। প্রথমে অন্ধ মৈত্র, তাহার পর স্বার্থান্বেষণে সুহৃদ্‌ভেদ, তাহার ফলে ঘোরতর বিগ্রহ ও লাঞ্ছনা, তাহার পর ঠেকিয়া শিখিয়া শেষে—সন্ধি।

সুতরাং মানবের বৈষয়িক জীবনের অবস্থোপযোগী সকল উপদেশই—হিতোপদেশে আছে। কেবল বৈষয়িক জীবনের কেন, বুঝিতে পারিলে

ইহাতে পারমার্থিক জীবনের উপযোগী উপদেশও, কথার ছলে বলা হইযাছে। পারমার্থিক জীবনে অনেকেরই প্রথমে থাকে ভগবানে এক রূপ অন্ধ বিশ্বাস; তাহার পর সংশয়বাদে ক্রমে সুহৃদ্ ভেদ হয়, আমরা সেই সখার সখা প্রাণপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে থাকি। তাহার পর বিগ্রহ; আশা ভরসা ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যায়; এমন যে মানব হৃদয়ের শান্তি রাজ্য তাহা ঘোর বিপদ সঙ্কুল হইয়া উঠে; শরীরে স্বাস্থ্য, হৃদয়ে স্বস্তি, প্রাণে শান্তি—কিছুই থাকে না। তখন সেই পাষণ্ডতার বিঘোরে চৈতন্যের উদয় হয়; হৃদয়ে সন্ধির আকাঙ্ক্ষা উঠে। তখন সেই সখার সখা সন্ধি বন্ধনে আপনা আপনি আবদ্ধ হয়েন। হিতোপদেশ বৈষয়িক বিচারে, সেই পারমার্থিক কথাই বুঝাইয়াছেন।

তাহাতেই উপসংহারে কবিরত্ন লিখিয়াছেন; "হিতোপদেশের উপদেশ এই যে, এ জগতে সকলেই মিত্র লাভ কর। যদি না বুঝিয়া সুহৃদ্ ভেদে ও বিগ্রহে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া থাক, পুনরায় সন্ধি অর্থাৎ সদ্ভাব স্থাপন কর অবশ্যই শক্তি ও সিদ্ধি লাভ করিতে পারিবে। সিদ্ধিঃ সাধ্যে সতামস্তু।"

সদ্ভাবের ব্যাখ্যা অন্যত্র কবিরত্ন করিয়াছেনঃ—

"বিশ্বেষাং হৃদয়ানাং যদক্ষয্যং পরিবন্ধনং।
এক ব্রহ্ম মহাসূত্রেণৈব সদ্ভাব ঈরিতঃ॥ ১॥
প্রীতির্নো বর্দ্ধতাং নিত্যং বয়ং সর্ব্বে সহোদরাঃ।
ইতি মৈত্রীময়ী বুদ্ধিঃ সদ্ভাবাদুপজায়তে॥ ২॥
মৈত্রী বুদ্ধের্ম্মহাশক্তি রনন্তা জায়তে হ্যক্ষয়া।
মহাশক্তিময়ো লোকঃ প্রলয়েঽপি ন লীয়তে॥ ৩॥

এক ব্রহ্ম-রূপ মহা সূত্র দ্বারা সমস্ত বিশ্ববাসীর হৃদয়মণ্ডলের যে অক্ষয় বন্ধন, তাহারি নাম সদ্ভাব। ১। নিত্যই আমাদের মধ্যে প্রীতি পরিবর্দ্ধিত হউক, আমরা সকলেই এক মায়ের সন্তান, এই মৈত্রীময়ী বুদ্ধি সদ্ভাব হইতে উৎপন্ন হয়। ২। মৈত্রীময়ী বুদ্ধি হইতে অনন্ত ও অক্ষয় মহাশক্তি উৎপন্ন হয়; যে মনুষ্য সমাজ সেই মহাশক্তির বলে বলীয়ান্, মহাপ্রলয়েও তাহার বিলয় নাই॥ ৩॥""

এইরূপ সন্ধি, মৈত্রী ও সদ্ভাবের কথাই হিতোপদেশের প্রধান উপদেশ।

ঐ মূল উপদেশ ব্যতীত হিতোপদেশে আরও অনেক উপদেশ আছে। কবিরত্ন তাহার মধ্যে গুটি ৩০।৩২ উপদেশ পৃথক করিয়া বুঝাইয়া দিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রের আর একটি মূল মীমাংসার কথা আমরা, কবিরত্নকে অনুসরণ করিয়া, হিতোপদেশ হইতে দেখাইতেছি :—

যখন যে স্থানে মানুষের মনে বিচার বিতর্ক আরম্ভ হইয়াছে, তখনই সেই স্থলে, দৈব ও পুরুষকার লইয়া মানুষের মনে একটা মহা গণ্ডগোল উপস্থিত হইয়াছে, বিষম খট্‌কা লাগিয়াছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মধ্যে কেহ কেহ অদৃষ্ট বাদকে কেবল কুসংস্কার মাত্র বলিয়াছেন; আবার দৈবই সর্ব্বেসর্ব্বা এমনও অনেকে বলিয়াছেন। সকলেই জানেন, পাশ্চাত্য কবির উক্তি ;—

Man proposes,
And God disposes.
মানুষে করে আশা,
কিন্তু ঘটান জগদম্বা।

এটি দৈববাদীর কথা। পোপের উক্তিও অনেকের স্মরণে আসিতে পারে ;—

Yet gave me, in this dark estate,
To see the good—from ill ,
Binding *Nature* fast in fate,
Left free the human will.

তবু এই অন্ধকারে, ভাল মন্দ দেখিবারে,
মোরে নাথ। দিয়াছ ক্ষমতা।
অদৃষ্ট পাশে স্বভাবে, বেঁধেছ নিগূঢ় ভাবে,
নরেচ্ছারে দিয়ে স্বাধীনতা।

ইহাতে দৈববাদের সঙ্গে পুরুষকারের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা হইয়াছে, আবার পুরুষকারের প্রাধান্যও পাশ্চাত্য সাহিত্যে বিশেষরূপে প্রথিত হইয়াছে, বাল-পাঠ্য কবিতায় তাহা সকলে দেখিয়া থাকিবেন।

Lives of greatmen all remind us,
We can make our lives sublime.
And, departing, leave behind us,
Foot-prints on the sands of time :—

মহৎ চরিত্র দেখি এই মনে হয়,
সকলে মহৎ হতে আমরাও পারি,
রেখে যেতে পারি মোরা, যাবার সময়,
সময় সাগর তটে পদ চিহ্ন সারি।

প্রধান পাশ্চাত্য দার্শনিক মিল্ অদৃষ্ট এবং পুরুষকারের মীমাংসা করিতে গিয়া, আমাদের দেশের অদৃষ্টবাদ হইতে (Asiatic fatalism) বিভিন্ন রূপে তাঁহার নিজের এককপ অদৃষ্টবাদ (Modified fatalism) সৃষ্টি করিয়া কি যে এক কাণ্ড করিয়াছেন, তাহাও অনেকে দেখিয়াছেন। অথচ প্রকৃত হিন্দুর পক্ষে এই গণ্ডগোল একেবারে নিষ্প্রয়োজন। হিন্দু কর্ম্ম-ফলে বিশ্বাসবান। কর্ম্মের অনন্ত প্রবাহ। পূর্ব্ব কর্ম্মের কতক ফল ভোগ হইয়াছে, কতক এখন ভোগ করিতেছি, বর্ত্তমান কর্ম্মেরও এখন কতক ফল ভোগ হইতেছে, কতক ফল সঞ্চিত থাকিতেছে। যে টুকু ভোগ করি, সে টুকু অদৃষ্ট বা দৈবায়ত্ত, ভোগ করিতে করিতে যাহা করি, তাহা পুরুষায়ত্ত। সুতরাং দৈব ও পুরুষকার উভয়ই আমাদের জীবনের নির্দ্দেশক। পাশ্চাত্য গণিতের ভাষায় Co-ordinates। সুতরাং কার্য্যকালে কেবল দৈবের উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকা, নিতান্ত নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচায়ক এবং কাপুরুষতার লক্ষণ। সমস্ত হিন্দুশাস্ত্রে যেমন, হিতোপদেশেও তেমনই এই কথা পরিষ্কার করিয়া বলা আছে ,—

দৈবের প্রভাব বর্ণনায় কথিত হইয়াছে ,—

অবশ্যম্ভাবিনো ভাবা ভবন্তি মহতামপি।
নগ্নত্বং নীলকণ্ঠস্য মহাহি-শয়নং হরেঃ ॥

অপিচ। যদ ভাবি ন তদ্ভাবি ভাবি চেন্ন তদন্যথা।
ইতি চিন্তা বিষঘ্নোঽয়মগদঃ কিং ন পীয়তে ?

কপালে যা আছে তাহা অবশ্য ঘটিবে,
সকলের শ্রেষ্ঠ যিনি তাঁরো না খণ্ডিবে ;
কপালের দোষে শিব সদা বিবসন,
সর্পের শয্যায় দেখ ! বিষ্ণুর শয়ন।

না হবার যাহা, তাহা কে করে ঘটন,
যা হবার হবে, তার কে করে খণ্ডন ;
সর্ব্ব চিন্তা-বিষ নাশ করে এই জ্ঞান,
এ ঔষধ কেন লোকে নাহি করে পান ?

অন্যচ্চ। স হি গগনবিহারী, কল্মষধ্বংসকারী,
দশ শত করধারী, জ্যোতিষাং মধ্যচারী।
বিধুরপি বিধি যোগাদ্ গ্রস্যতে রাহু নাসৌ,
লিখিত মপি ললাটে প্রোজ্ঝিতুং কঃ সমর্থঃ॥

অত্যুচ্চ আকাশে বাস, যে করে তিমির নাশ,
তারা মধ্যে জ্বলে যার সহস্র কিরণ,
দেখ না। দৈবের বশে, সে শশী রাহুর গ্রাসে,
ললাটে বিধির লেখা কে করে খণ্ডন।

যোঽধিকাদ্ যোজন শতাৎ পশ্যতীহামিষং খগঃ।
স এব প্রাপ্ত কালস্ত পাশবন্ধং ন পশ্যতি॥

শত শত যোজন হ'তেও উচ্চ দেশে
থাকি পক্ষী, নিজ ভক্ষ্য দেখে অনায়াসে,
কিন্তু দেখ বিধি যবে বিপদ ঘটায়,
কাছেতে ব্যাধের ফাঁদ দেখিতে না পায়।

অপিচ। শশি দিবাকরয়ো গ্র্হ পীড়নম্,
গজ ভুজঙ্গময়োরপি বন্ধনম্।
মতি মতাং চ বিলোক্য দরিদ্রতাম্,
বিধি রহো বলবানিতি মে মতিঃ।

মাতঙ্গ ভুজঙ্গগণে দেখিয়া বন্ধন,
শশধর দিবাকরে রাহুর পীড়ন ;
সুবুদ্ধি পণ্ডিতগণে দেখিয়া নির্ধন,
অলঙ্ঘ্য জানিনু ভবে বিধির শাসন।

অন্যচ্চ। ব্যোমৈকান্ত বিহারিণোঽপি বিহগাঃ সম্প্রাপ্নুবন্ত্যাপদম্‌,
বধ্যন্তে নিপুণৈরগাধ সলিলান্মৎস্যাঃ সমুদ্রাদপি।
দুর্নীতং কিমিহাস্তি কিং সুচরিতং কঃ স্থান লাভ গুণঃ,
কালোহি ব্যসন প্রসারিতকরো গৃহ্ণাতি দূরাদপি॥

আরো। মীন থাকে সিন্ধুতলে, বিহঙ্গ আকাশে চলে,
তবু দেখ জাল মধ্যে বন্ধন তাহার,
দুরন্ত কালের ঠাঁই, নিস্তার কাহারো নাই,
গুণাগুণ দেশ পাত্র না করে বিচার॥

অচিন্তিতানি দুঃখানি যথৈবাযান্তি দেহিনাম্‌।
সুখান্যপি তথা মন্যে দৈব মত্রাতিরিচ্যতে॥

অচিন্তিত দুঃখ কত আসিছে যেমন,
তেমনি হতেছে কত সুখের ঘটন,
এ জগতে যার ভাগ্যে যবে যাহা হয়,
সকলি দৈবের হাত জানিবে নিশ্চয়।

তথাচোক্তং। অপরাধঃ স দৈবস্য ন পুন র্মন্ত্রিণাময়ম্‌।
কার্য্যং সুঘটিত যত্নাদ্‌ দৈব যোগাদ্‌ বিনশ্যতি।

অনেক যতনে হয় যার সুঘটন,
সে কার্য্যে যদ্যপি ঘটে বিধি বিড়ম্বন,
সে কারণে মন্ত্রীগণ অপরাধী নয়,
অদৃষ্টের দোষ তাহা জানিবে নিশ্চয়।

এইরূপ নানা কথা শাস্ত্রে আছে, কিন্তু তা বলিয়া, শাস্ত্র কখন দৈবে নির্ভর করিতে বলেন না। হিতোপদেশ হইতে সার সংগ্রহ করিয়া কবিরত্নের উপদেশ শুনুন,—

অসীম সমুদ্রের ন্যায় সম্মুখে সঙ্কটাকীর্ণ বিশাল কর্ম্মক্ষেত্র বিস্তীর্ণ রহিয়াছে। অর্জ্জুন যেমন কৃষ্ণকে সারথি করিয়া এবং অক্ষয় তূণ ও অজেয় গাণ্ডীব ধারণ করিয়া, সমর সাগর পার হইয়াছিলেন, তেমনি তোমরাও ধর্ম্মকে সহায় করিয়া এবং অটল অধ্যবসায় ও অমেয় 'উদ্যোগ ধারণ করিয়া, এই

কর্ম্মসাগর পার হও। দৈবের দোহাই দিয়া নিজের অস্তিত্ব লোপ করিও না। দৈবও পুরুষকার ভিন্ন কদাচ ফলপ্রদ হয় না। অতএব পুরুষকারই মানুষের একমাত্র গতি ;—

ন দৈবমপি সঞ্চিন্ত্য ত্যজেদুদ্যোগমাত্মনঃ।
অনুদ্যোগেন তৈলানি তিলেভ্যো নাপ্তুমর্হতি ॥
উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মীং।
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্ম শক্ত্যা।
যত্নে কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোঽত্র দোষঃ ॥
যথা হ্যেকেণ চক্রেণ ন রথস্য গতির্ভবেৎ।
এবং পুরুষকারেণ বিনা দৈবং ন সিধ্যতি ॥
যথা মৃৎপিণ্ডতঃ কর্ত্তা কুরুতে যদ্ যদিচ্ছতি।
এবমাত্মকৃতং কর্ম্ম পুরুষঃ প্রতিপদ্যতে ॥
কাকতালীয়বৎ প্রাপ্তং দৃষ্ট্বাপি নিধিমগ্রতঃ।
ন স্বয়ং দৈবমাদত্তে পুরুষার্থমপেক্ষতে ॥
উদ্যোগেন হি সিদ্ধন্তি কার্য্যাণি ন মনোরথৈঃ।
নহি সুপ্তস্য সিংহস্য প্রবিশন্তি মুখে মৃগাঃ ॥

দৈবের দোহাই দিয়া থাকা কিছু নয়,
বিনা যত্নে তিল হ'তে তৈল নাহি হয়।
লভে লক্ষ্মী সতত উদ্যোগী নরবর,
কাপুরুষ দৈবে সদা করয়ে নির্ভর,
দৈব ছাড়ি দেখাও পৌরুষ প্রাণপণে,
কি দোষ ? রতন যদি না মিলে যতনে।
শুধু চক্রে যেমন শকট নাহি চলে,
তেমনি পৌরুষ বিনা দৈব নাহি ফলে।
যেমতি মৃত্তিকাপিণ্ড লয়ে কুম্ভকার,
ইচ্ছামত গড়ে কত বিচিত্র আকার,

তেমতি করিয়া কার্য্য আপন ইচ্ছায়,
আপন কর্ম্মের ফল আপনিই পায়।
দৈবাৎ সম্মুখে যদি হেরে কেহ নিধি,
হাতে কি নিজেই তাহা তুলে দেন বিধি?
কুড়াইয়া লইতেও চেষ্টা করা চাই,
পুরুষের চেষ্টা বিনা কোন সিদ্ধি নাই।
ইচ্ছায় না হয় কাজ উদ্যম বিহনে,
মৃগ নাহি পশে সুপ্ত সিংহের বদনে।

পুনশ্চ,—

উৎসাহ সম্পন্ন মদীর্ঘসূত্রম্,
ক্রিয়া বিধিজ্ঞং ব্যসনেষ্বসক্তম্।
শূরং কৃতজ্ঞং দৃঢ় সৌহৃদং চ
লক্ষ্মীঃ স্বয়ং যাতি নিবাসহেতোঃ॥

অতুল উৎসাহী, শূর, কার্য্যে অনলস,
কোনরূপ ব্যসনের নহে পরবশ;
কার্য্যের ব্যবস্থা জ্ঞানে অতি বিচক্ষণ,
প্রণয়ে অটল আর কৃতজ্ঞ যে জন,
আপনি কমলাদেবী বসতির তরে,
গমন করেন সেই পুরুষের ঘরে।

হিতোপদেশের এইরূপ মীমাংসা-পূর্ণ উপদেশ সকল হিন্দুশাস্ত্রের সার। সরল সহজ ভাষায় অনুবাদসহ সেই সমগ্র হিতোপদেশের এই সংস্করণ প্রকাশ করিয়া কবিরত্ন স্বয়ং ধন্য হইয়াছেন এবং আমাদের সকলকেই ধন্য করিয়াছেন।

ঢাকুর সমালোচনা।*

পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগের ইতিবৃত্ত লিখিবার যে প্রবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাহা মন্দ নহে। কিন্তু এই শিক্ষা বলে, আমরা যে কতকগুলি মন্দ বিষয় লাভ করিতেছি তাহা বোধ হয়, কেহই অস্বীকার করিবেন না। অধুনাতন, ইতিবৃত্তের নাম করিয়া, আমাদিগের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের অনেকেই সত্যের অপলাপ ও অপরের সহিত নিরর্থক কলহ করিতে শিখিয়াছেন। এতদিন আমাদিগের ধারণা ছিল, যে এই দোষ প্রধানত পাশ্চাত্য শিক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যেই বর্ত্তমান আছে। দুঃখের বিষয়, এই রোগ, যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার গৌরবের ফলভাগী হইতে ইচ্ছুক নহেন, তাঁহাদিগের মধ্যেও প্রবেশ লাভ করিয়াছে।

সমালোচ্য গ্রন্থের বিজ্ঞাপনের আরম্ভেই গ্রন্থকার বলিতেছেন "সামাজিক বারেন্দ্র কায়স্থকুলের বংশ-বিবরণ যুক্ত পুস্তকের নাম" ঢাকুর বা ঢাকুরী। এই শব্দ কোন ভাষা হইতে সমুৎপন্ন, মূল, কি অপভ্রংশ, তাহা জানিতে পারা যায় নাই।" গ্রন্থকার ঢাকুর শব্দ সম্বন্ধে জানিতে পারেন নাই। কিন্তু এ সম্বন্ধে আমরা যেরূপ মনে করি, তাহা প্রকাশ করিতেছি।

ঢক্কা শব্দের উত্তর শীলার্থ উরপ প্রত্যয় করিয়া ঢক্কুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। ঢক্কুর শব্দের অপভ্রংশ যে ঢাকুর, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ "ঠক্কুর" শব্দের অপভ্রংশ যে "ঠাকুর' তাহা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য ঢক্কুর বা ঢাকুর শব্দের এস্থলে অর্থ কি? ঢাকের স্বভাব বিশিষ্ট বা উচ্চ শব্দ বোধক যে সামগ্রী, তাহাই ঢাকুর নামে কথিত। কুল গ্রন্থ যে আমাদিগের দেশে উচ্চ শব্দ বোধক সে কথার উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। ইহাতে যাহা কথিত হয়, তদপেক্ষা উচ্চ বা শ্রেষ্ঠ কথন আর নাই। বঙ্গদেশে ঢাকই এক মাত্র উচ্চ শব্দ বিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। কোন

---

* ঢাকুর অর্থাৎ কায়স্থ জাতি ও বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজের ইতিবৃত্ত। শ্রীগোবিন্দমোহন রায় বিদ্যাবিনোদ বারিধি কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। শকাব্দা ১৮১০।

প্রকাশ্য কথা কেহ গোপন করিতে উদ্যত হইলে, লোকে বলে "ঢাকে ঢোলে কথা।" অপিচ, জনশ্রুতি বলিতেছে, যে পূর্ব্বতন কুলাচার্য্যগণ যখন কুল কাহিনী বলিতেন, তখন বাদ্য হইত এবং তাঁহারা বাদ্যসহ অঙ্গ ভঙ্গি পূর্ব্বক কুলকাহিনী কীর্ত্তন করিতেন। আমরা এখনও দেখিতে পাই, যে কোন কোন স্থলে, কুলাচার্য্যগণ তাকিয়াতে আঘাত পূর্ব্বক কুলকাহিনী বর্ণন করেন। এক্ষণ বঙ্গদেশ সভ্যতাভিমানী, সেই জন্যই আমরা বহুবিধ পরিবর্ত্তন অবলোকন করি। পূর্ব্বে যে ঢাকের বাদ্য হইত, তাহাতে আর বিচিত্র কি? সুতরাং "ঢেকুর" শব্দ হইতে যে ঢাকুর শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে তাহা প্রমাণিত হইল।*

এইরূপ ভাবে কোন কিছুর নামকরণ বা উপাধি যে পূর্ব্বে হইত, তাহার বিস্তর প্রমাণ, পাঠকগণ অনুসন্ধান দ্বারায় পরিজ্ঞাত হইতে পারিবেন। আমরা এস্থলে একটী সাদৃশ্য প্রদর্শন করিতেছি। নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী ভবানীর একমাত্র কন্যা তারার বিবাহে যে মহতী ঘটা ও অপর্য্যাপ্ত অর্থ ব্যয় হইয়াছিল, এমন অদ্য বঙ্গদেশে, বোধ হয়, কখন হয় নাই। যাহা হউক, এই বিবাহে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ সমাজের রাণীর মতের যাবতীয় কুলীন একত্রিত হইয়াছিলেন। ইঁহাদিগকে আহারের সময় অনুসন্ধান করিয়া লওয়া নিতান্ত অসম্ভব হওয়ায় অধুনাতন কলিকাতায় ঢোল মহাশয়দিগের পূর্ব্বপুরুষ (ইঁহার নাম স্মরণ নাই) সকলকে বলিয়া দেন, যে আমি ঢোল বাজাইলেই আপনারা আহারে গমন করিবেন। ইনি একজন শ্রেষ্ঠ কুলীন

---

* 'ঢাকুর' বা 'ঢেকুর' শব্দ বঙ্গসাহিত্যে অন্যত্র পাওয়া যায়। ধর্ম্মমঙ্গলে আছে;—

"বিপক্ষ করিলে বল, বাড়িবে নদীর জল,
অরি প্রবেশিতে নারে পুর;
অপর প্রার্থনা শুন, ত্রিষষ্টির গড় পুন
নাম হবে অজয় ঢাকুর।"

ধর্ম্মমঙ্গলে যে ভাগে এই গড়ের বর্ণনা আছে, তাহার নাম 'ঢেকুর পালা' বা 'ঢাকুর পালা'। সুতরাং ঢাকুর শব্দ আদিতে যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক, ধর্ম্মমঙ্গলে যে স্থানবাচক তাহা বেশ বুঝা যায়। সেই ঢাকুর হইতে ঢাকুর গ্রন্থ রচিত হয় নাই ত?

নবজীবন সম্পাদক।

ছিলেন। ঢোলের বাদ্যের জন্য সকলে ইহাঁকে ঢোল নামে অভিহিত করেন। তদবধি ইহাঁর বংশধরগণ ঢোল উপাধিতে পরিচিত। এই সাদৃশ্য দ্বারা পাঠকগণ বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন যে, ইহার বহুপূর্ব্বে ঢাকুর শব্দ যে পূর্ব্ব কথিত ভাবেই উৎপন্ন হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকার বিজ্ঞাপনে বলিয়াছেন যে "যদি কোন সামাজিক বারেন্দ্র কায়স্থ মহোদয়ের কৌলিক ইতিহাস সম্বন্ধে সন্দেহ হয়, তবে তিনি পদ্য ঢাকুরের সহিত গদ্য ঢাকুরের ঐক্য করিয়া লইবেন।" মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে তাঁহার গ্রন্থখানি সাধারণের পাঠ করা সহজ। কিন্তু পদ্য ঢাকুর সেরূপ নহে। যে পদ্য ঢাকুরের সহিত, গদ্য ঢাকুরের ঐক্য করিতে অনুরোধ করিয়াছেন, সে খানিকে মুদ্রিত করিলেন না কেন? গ্রন্থকার বলেন, সেইখানি অবিকল মুদ্রিত করিতে ইচ্ছুক ছিলাম, কিন্তু তাহার রচনা প্রণালী বর্ত্তমান কৃতবিদ্য সমাজের প্রীতিকর হইবে না বলিয়া, প্রচলিত বাঙ্গালা সাধু ভাষাতে প্রকাশিত হইল। গ্রন্থকার এই স্থলে, 'আধুনিক কৃতবিদ্য সমাজ' শব্দের কিরূপ অর্থ করেন, তাহা বলিতে পারি না। আমরা, আধুনিক কৃতবিদ্য সমাজ বলিলে বিপ্লব-প্রয়াসী ইংরেজি-নবিশ সম্প্রদায়কেই সাধারণত বুঝিয়া থাকি। এই সম্প্রদায় যে সকল মানসিক রোগগ্রস্ত, গ্রন্থকার সেরূপ নহেন। প্রাচীনের প্রতি অভক্তি, ইঁহাদিগের একটী প্রধান রোগ। প্রবীণ গ্রন্থকার তাহার উপশম না করিয়া বরং প্রশ্রয় দান করিয়াছেন, এজন্য আমরা দুঃখিত হইলাম। সামাজিক কুল কাহিনী যিনি অবগত হইতে ইচ্ছুক —স্বজাতি ও সবংশের প্রতি যিনি ভক্তিমান, সামাজিক ও কুল গ্রন্থের রচনা প্রণালী যেরূপই হউক না কেন, তিনি উহা অবশ্যই পাঠ করিবেন।

বিজ্ঞাপনের পর গ্রন্থকারের বংশ বর্ণনা এবং উহার পরেই, গ্রন্থ সম্বন্ধে সামাজিক ব্যক্তি বিশেষের একখানি সার্টিফিকেট আছে। এ সম্বন্ধে কোন কথা বলা নিষ্প্রয়োজন হইলেও, ইহা উল্লেখ করা অসঙ্গত নহে যে, আজি কালিকার সার্টিফিকেট দেখিলেই বিলাতি সভ্যতার উচ্চ অঙ্গ মনে পড়ে!

এই সকলের পর, মূল গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছে। গ্রন্থকার এই স্থলে কায়স্থ জাতি সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করিয়াছেন।* অনেক দিন হইতেই কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব বিষয়ে আন্দোলন চলিয়া আসিতেছে। সেই আন্দ-

পুরাণ কথা লইয়া, সেই স্কন্দ পুরাণের চন্দ্রসেন রাজার অন্তর্বর্ত্তী মহিষীর গর্ভজাত পুত্র মহর্ষি দাল্‌ভ্যের আশ্রিত কায়স্থ, সেই পদ্মপুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের চিত্র গুপ্ত কায়স্থ, * সেই পুরাণ, সেই তন্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে, গ্রন্থকার স্বীয় বিচক্ষণতা প্রতিপাদন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক যাহা স্থির মীমাংসা করা সহজ নহে, পুরাণেতিহাস যে স্থলে, কোন পক্ষকে অধিক বা কোন পক্ষকে অল্প পরিমাণে সমর্থন করে, সে স্থলে এইরূপ বাগ্‌বিতণ্ডাকে, কলহ ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে? এইরূপ খাস বিলাতি ধরণের বাগ্‌বিতণ্ডার দ্বারায় আমরা কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি না; অথচ আপনার তত্ত্বজ্ঞতা বা পাণ্ডিত্যের ভাণ করিয়া, বিপক্ষকে হীন করিবার জন্য অগ্রসর হইয়া, আপনার শ্রেষ্ঠতাকে মলিন বা অধিকতর তর্কানুবদ্ধ করিয়া থাকি। কিন্তু গ্রন্থকার করণ শব্দের মীমাংসা করিতে যাইয়া, ভরত মল্লিকের প্রতি যে বাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা দৃষ্টান্ত স্বরূপ আনয়ন করিলেই উহা প্রতীয়মান হইতে পারিবে।

গ্রন্থকার বলেন "ভরত মল্লিক এদেশের একজন আধুনিক লোক, জাতিতে বৈদ্য। নিজে বর্ণসঙ্কর, তাই কায়স্থকে বর্ণসঙ্কর রূপে প্রতিপাদনে বিশেষ যত্ন করিয়াছেন।" পাঠকগণ দেখিতে পাইবেন, যে ভরত মল্লিক যে করণ শব্দের উল্লেখ করেন, তাহা নানার্থক ও 'বৈশ্য হইতে শূদ্রা-গর্ভজাত জাতি বিশেষ' এবং কায়স্থ উভয়কেই বুঝায়। তাহা গ্রন্থকারও স্বীকার করেন। তবে তাঁহার আপত্তি এই যে "দ্বিজশব্দ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন জাতি-কেই বুঝায়, তাই বলিয়া কি এই তিন জাতি অভিন্ন?" এই শেষোক্ত স্থলে আমাদিগের মত এই যে, ত্রিবর্ণ যখন অভিন্ন ছিল, তখনই দ্বিজত্বের আরম্ভ ও উত্তর কালে গুণ কর্ম্মের বিভাগ দ্বারায় ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য নাম করণ হইয়াছে। সুতরাং ভরত মল্লিক যে "করণ" শব্দের দ্বারা বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ এবং কায়স্থ উভয়কে বুঝিবেন, তাহা বিচিত্র নহে। বৈশ্য হইতে শূদ্র-গর্ভজাত একই ব্যক্তির সন্তানগণ, গুণ কর্ম্মানুসারে দ্বিবিধ সংজ্ঞায় অভিহিত হইবে, তাহা কি তিনি অসঙ্গত রূপে অনুমান করিয়াছেন? অপিচ,

---

* বৈদ্যগণ গুপ্ত নামে পরিচয় দান করেন। চিত্রগুপ্তের বংশ ক্ষত্রিয় হওয়ায় দোষ কি?

অগ্নিপুরাণ কায়স্থগণের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনের বিরুদ্ধ। এই পুরাণে ঘোষ প্রভৃতির উল্লেখ থাকায় যে ঐ বচন প্রক্ষিপ্ত, গ্রন্থকারের এ যুক্তি সঙ্গত নহে। পঞ্চ বিপ্রসহ যখন কায়স্থগণ এদেশে আসেন, তখনও তাঁহাদিগের মধ্যে ঐ উপাধি ছিল। সুতরাং তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের ঐ উপাধি থাকা অসম্ভব নহে। এখনও ঐরূপ উপাধি কোলাঞ্চ প্রদেশে থাকার বিষয় আমরা অবগত আছি। তবে উচ্চারণে তারতম্য আছে মাত্র, যথা, "বসু" "বসা' ইত্যাদি। গ্রন্থকার অগ্নি পুরাণের বচনের কোন এক অংশকে অমৌলিক ও প্রক্ষিপ্ত বলিতেছেন। আমরা যদি অগ্নি পুরাণের বচনকে প্রক্ষিপ্ত বলি, তাহা হইলে বিরুদ্ধবাদীরা স্কন্দপুরাণাদির বচনও প্রক্ষিপ্ত বলিলে, তাহাতে আমাদিগের কি কোন যুক্তিযুক্ত প্রত্যুত্তর আছে? যাহা যখন যাঁহার বিরুদ্ধে হইবে, তখনই তাহাকে প্রক্ষিপ্ত বলিলে এবং এইরূপ তর্কমার্গে ভ্রমণ করিলে, সমুদায় শাস্ত্রই প্রক্ষিপ্ত বচনের বোঝা হইয়া পড়ে এবং তাহা হইলে শাস্ত্রের প্রতি আস্থা থাকে কৈ? আর এরূপ তর্কের মূল্যই বা কি হইবে?

আধুনিক অবস্থা এইরূপ দাঁড়াইয়াছে যে, কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় নামে আপনাদিগকে পরিচিত করিলে, বৈদ্যগণ তাহার প্রতিবাদ করেন এবং বৈদ্যগণ আপনাদিগকে সেন বংশীয় বলিলে কায়স্থগণ তাহার প্রতিবাদ করেন। উভয়েই পাণ্ডিত্যাভিমানে, উভয়েই ঈর্ষা প্রাবল্যে, সত্য বা প্রকৃত মীমাংসায় উপস্থিত হইতে অনিচ্ছুক। এ বিষয়ে আমাদের বক্তব্য আছে।

বৈদ্যগণ আপনাদিগকে অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত করেন। একটু আলোচনা করিলেই অম্বষ্ঠ এবং কায়স্থ শব্দ যে একার্থক, তাহা বিলক্ষণ প্রতীত হইবে।

স্কন্দ পুরাণের রেণুকা মাহাত্ম্য পাঠে অবগত হওয়া যায় যে, চন্দ্রসেন মহিষী গর্ভবতী থাকায় মহর্ষি দালভ্য পরশুরামের নিকট তাঁহার গর্ভ রক্ষার্থ প্রার্থী হওয়ায় ও গর্ভস্থ সন্তান ক্ষত্র ধর্ম্মানুযায়ী হইবে না, ইহা প্রতিশ্রুত হওয়ায়, গর্ভ রক্ষা হয়।

——কায়াস্থো গর্ভ উত্তমঃ ॥

তস্মাৎ কায়স্থ ইত্যাখ্যা ভবিষ্যতি শিশু শুভাঃ।

ইহার দ্বারায় প্রতীয়মান হয় যে শিশু তৎকালে "কায়াতে" (মাতৃকায়াতে) স্থিত, তজ্জন্যই কায়স্থ নামকরণ হইয়াছে। এবং মহর্ষি—

রামাজ্ঞয়া সদাল্‌ভ্যেন ক্ষত্র ধর্ম্মাদ্বহিষ্কৃতঃ।
কায়স্থ ধর্ম্মাদত্তোহস্মৈ চিত্রগুপ্তস্য বঃ স্মৃতঃ।

তাহাকে ক্ষত্র ধর্ম্ম হইতে বহিষ্কৃত করেন ও চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম প্রদান করেন।

এক্ষণে "অম্বষ্ঠ" সম্বন্ধে বিবেচনা করা হউক। অম্বা হইতে যে অম্বষ্ঠ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। অম্বাতে অর্থাৎ মাতাতে (মাতৃ গর্ভেতে) স্থিত যে শিশু তাহাই অম্বষ্ঠ নামে অভিহিত হইয়াছে। সুতরাং "কায়াতে" স্থিত এবং "অম্বাতে" স্থিত যে একই কথা, তাহা অস্বীকার করিবার যোগ্য নহে। গ্রন্থকার ভবিষ্য পুরাণের "বর্ণাবর্ণদ্বয়ঞ্চৈব অম্বষ্ঠ্যা দাশ্চ সত্তম" উল্লেখ করিয়া বলেন, যে "এই অম্বষ্ঠ হইতেই বোধ হয় অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় বংশের উৎপত্তি হইয়াছে।" ভবিষ্য পুরাণের অম্বষ্ঠ চিত্রগুপ্তের অন্যতম পুত্র। তাঁহার এক পুত্রের দ্বারা অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় উৎপত্তি হইলে, তদীয় অন্যতম পুত্র সৌভসেনা, অহিফণা প্রভৃতির বংশও তাহাদিগের নামেই পরিচিত হইত। যেমন কুরু, পাণ্ডু প্রভৃতি, ইঁহাদিগের বংশ উৎপত্তি হওনান্তর ঐ নামেই পরিচিত হইয়াছে। অথবা যেরূপ বলীরাজার পুত্র, অঙ্গ, বঙ্গ, পৌণ্ড্র ইত্যাদি হইতে তাঁহাদিগের শাসিত দেশের নামকরণ হইয়াছে, সেই রূপ হওয়াই স্বাভাবিক। কিন্তু তেমন কোন স্পষ্ট প্রমাণ না থাকায় গ্রন্থকারের অনুমান সম্পূর্ণ অলীক। সুতরাং আমরা কায়স্থ ও অম্বষ্ঠকে যে এক ও অভিন্ন মনে করিলাম, তাহা পরিহার যোগ্য নহে।

আমরা এ স্থলে আর একটী কথা বলিয়া রাখি। পদ্মপুরাণ বলিতেছেন,—

ক্ষণং ধ্যানাস্থিতস্যাস্য সর্ব্বকায়াদ্বিনির্গতঃ।
* * * *
চিত্রগুপ্ত ইতি খ্যাত ধর্ম্মরাজ সমীপতঃ
* * * *
ব্রহ্মকায়োদ্ভবো যস্মাৎ কায়স্থ বর্ণ উচ্যতে।

ভবিষ্য পুরাণও এইরূপ স্বীকার করেন। ইঁহাদিগের মধ্যে মহর্ষি দালভ্যের রক্ষিত চন্দ্রসেন তনয়ের উল্লেখ নাই। অপিচ স্কন্দপুরাণে উক্ত আছে যে মহর্ষি দালভ্য চন্দ্রসেন তনয়কে ক্ষত্রধর্ম্ম বহিষ্কৃত করিয়া চিত্রগুপ্ত ধর্ম্ম

প্রদান করেন। ইহাতে অনুমান হয়. যে শেষোক্ত গ্রন্থ পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থাদির পূর্ব্বে রচিত হওয়ায় ঐ বিষয়ের উল্লেখ নাই।

পদ্ম-পুরাণ—ব্রহ্মকায়া হইতে চিত্রগুপ্তের উৎপত্তি ও তদনুসারে কায়স্থ আখ্যা বলিতেছেন; স্কন্দ পুরাণ দ্বারায় বলা হইয়াছে যে চন্দ্রসেন তনয় মাতৃ-কায়াতে স্থিতি জন্য "কায়স্থ" নামে উক্ত হয়। চিত্রগুপ্তই আদি, তজ্জন্য তিনি ব্রহ্মকায়া হইতে উৎপত্তি বলিয়া উক্ত হইবেন, ইহা বিচিত্র নহে। সুতরাং তিনি ব্রহ্মকায়া হইতে উৎপত্তি একপ অনুমিত হইলেও, চন্দ্রসেন তনয় যে মাতৃকায়াতে স্থিতিজন্য কায়স্থ নামে অভিহিত ও উত্তরকালে অম্বষ্ঠ নামে বিবেচিত হইবেন, বিশেষ প্রণিধান করিলে, ইহা অযুক্তিক বোধ হইবে না।

বিষ্ণু পুরাণে "অম্বষ্ঠ" নামক জাতির উল্লেখ আছে। পাণিনী অম্বষ্ঠ শব্দের অর্থ দেশবিশেষ ও ক্ষত্রিয় জাতি বিশেষকে নির্দ্দেশ করেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাভারতকার প্রাগুক্ত দুই অর্থে অম্বষ্ঠ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র অনুমান করেন যে, এই অম্বষ্ঠ ক্ষত্রিয় শ্রেণী হইতেই সেনবংশীয় রাজাগণ উদ্ভব হইয়া থাকিবেন। তিনি আরো অনুমান করেন যে, পূর্ব্বতন কালে, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে, অম্বষ্ঠ নামক যে ক্ষত্রিয় জাতি ছিল, উত্তরকালে সাধারণে তাহাকেই মনুক্ত অম্বষ্ঠ (ইহারা ব্রাহ্মণের ঔরস ও বৈশ্যার গর্ভ জাত বর্ণসঙ্কর জাতি বিশেষ) নামক জাতিতে পরিগণিত করিয়া থাকিবে।

আমাদিগের দেশের প্রাচীন সংস্কার এই যে, সেনরাজগণ বৈদ্যবংশীয় ছিলেন। ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তিগণ সেনবংশীয় রাজগণকে ক্ষত্রিয় প্রতিপাদনে বিশেষ যত্ন করিতেছেন। যদি সেন রাজাগণ ক্ষত্রিয় সাব্যস্ত হয়েন, তবে তাহার ফলভাগী বৈদ্যগণ কেন না হইবেন? বরং সোম-বংশীয় উল্লেখ থাকায় "ওষধি নাথ" বা বৈদ্যবংশীয় অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় বাক্যের দ্বারা ক্ষত্রিয় অনুমান করিলেও বৈদ্যগণের ক্ষত্রিয় হওয়া অসঙ্গত নহে। আমাদিগের গ্রন্থকার শ্রীমদ্ভাগবতের বিতথ রাজার বংশের শেষ ব্যক্তি ক্ষেমকের প্রসঙ্গে বলিতেছেন, যে "কলিতে ক্ষেমক হইতেই যদি ব্রহ্ম ক্ষত্রিয় কুলের অবসান হইয়া থাকে, তবে সেন বংশীয়দিগের ব্রহ্মক্ষত্রিয়ত্ব কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে? এ প্রশ্নের সদুত্তর সহজ সাধ্য নহে। এ

বিষয়ের অবশ্যই কোন কারণ আছে, ফল কথা সেন রাজগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন।" 'এ প্রশ্নের উত্তর সহজ সাধ্য নহে' অথচ 'সেন রাজাগণ ক্ষত্রিয় ছিলেন' ইহার তাৎপর্য্য কি? একখানি তাম্রফলকে বা প্রস্তর খণ্ডে লিখিত বাক্য, যাহা প্রকৃত পক্ষে দ্ব্যর্থঘটিত বলিয়াই সকলে স্বীকার করিবেন, তাহা যে বাস্তবিক দ্ব্যর্থ করিবার জন্যই লিখিত হইয়াছিল, এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে এবং এ স্থলে একটি অর্থ পরিগ্রহণ করিয়া অপরটি পরিবর্জ্জন করা কিছুতেই সমীচীন বোধ হয় না।

তাম্র-শাসনে লিখিত "সোম বংশ" শব্দ দ্ব্যর্থঘটিত। আবার "ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়" শব্দের অর্থ কেহ প্রধান ক্ষত্রিয় বলিতেছেন, কেহ 'বিতথের কুল' অর্থ করিতেছেন; কেহ কেহ বলিতেছেন, ব্রাহ্মণের ঔরস ও ক্ষত্রিয়ানীর গর্ভ জন্যই ব্রহ্মক্ষত্রিয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়া থাকিবেক। ইহার যাথার্থ অবধারণ করা সহজ নহে।

আমাদিগের ঘটকগণের গ্রন্থ কিন্তু বল্লালসেনের অব্যবহিত পরেই রচিত হইতে আরম্ভ হয়। এই সকল গ্রন্থ এবং জনশ্রুতি বিশেষত বক্তিয়ার খিলিজীর বঙ্গ বিজয়ের সমকালীয় ব্যক্তিগণের প্রমুখাৎ, লাক্ষণেয় সেন সম্বন্ধে মুসলমান ইতিহাসবেত্তা মেনহাজউদ্দীন যে সকল কথা শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহা কিছুতেই অবিশ্বাসযোগ্য নহে। তিনি সেন রাজাগণকে বৈদ্য বলিয়াই উল্লেখ করেন। সুপ্রসিদ্ধ আবুলফজল সেন রাজাগণকে যে কায়স্থ বলিয়াছেন, ইহার তাৎপর্য্য এই বোধ হয়, যে আকবরের দরবারের প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ "অম্বষ্ঠ" ও কায়স্থকে অভিন্ন বলাতেই তিনি সেন রাজাগণকে কায়স্থ উল্লেখ করিয়া থাকিবেন।

কায়স্থ ও বৈদ্যজাতির আচারগত কিছু বৈলক্ষণ্য থাকিলেও ইহাদিগকে স্বতন্ত্র অনুমান না করিবার হেতু আছে। কারণ আমরা দেখিতে পাইতেছি যে, অদ্যাপিও পাশ্চাত্য কায়স্থগণ উপবীত ধারণ ও ক্ষত্রিয়বৎ অশৌচাদি ব্যবহার করেন। বেহার অঞ্চলের কায়স্থগণ উপবীত ধারণ না করিলেও গায়ত্রী জপ করিয়া থাকেন। রাজা রাজ বল্লভের পূর্ব্বে বৈদ্যজাতি উপবীত ধারণ করিতেন, কি না সন্দেহ। আন্দুলের রাজা রাজনারায়ণ দেবের পূর্ব্বে বঙ্গীয় কায়স্থগণ মধ্যে উপবীত ধারণ ও ক্ষত্রিয়বৎ অশৌ-

চাদি প্রতিপালনের চেষ্টা, বোধ হয়, না হইয়াই থাকিবে। বিক্রমপুর ও সোণার গ্রাম পরগণাতে এমন অনেক বৈদ্য ও কায়স্থ বংশীয় লোক আছেন যাঁহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষের মধ্যে কন্যাপুত্রের আদান প্রদান চলিত। বিক্রম পুরে আদিশূর ও বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। পঞ্চ কায়স্থ প্রথমে ঐ স্থানেই বিপ্রগণ সহ সমাগত হয়েন। পূর্ব্বে উক্ত প্রদেশে কোন কোন বৈদ্য ও কায়স্থ বংশে কন্যাপুত্রের আদান প্রদানের প্রথা থাকায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, কান্যকুব্জাগত পঞ্চ কায়স্থ আদিশূরের সবংশীয় ও বৈদ্যগণ তাঁহার বঙ্গীয় জ্ঞাতি বিধায়, সদাচারসম্পন্ন পঞ্চ কায়স্থের সমকালে না হউক, তাঁহাদিগের উত্তরকালে উক্ত প্রথা প্রচলিত হইয়াছিল। এখনও চট্টল ও কুমিল্লা প্রদেশে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি মধ্যে বৈবাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইতেছে।

আমরা দেখিতে পাই যে, যে সমাজে যতই ধনবান ও বিদ্বানের আবির্ভাব যখনই হইয়াছে, সে সমাজের বন্ধন তখনই অধিক দৃঢ়তর ও অন্য হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। রাজা রাজবল্লভ বৈদ্যজাতির কতকগুলি ঘর লইয়া একটী স্বতন্ত্র দল সৃষ্ট ও কতকগুলি প্রথা প্রচার করেন। উত্তরকালে ঐ দলই পরিপুষ্টি হয়। আমরা অবগত আছি, যে কুমিল্লা প্রদেশে এক সম্প্রদায় আচারভ্রষ্ট কায়স্থ আছে, তাহারা শুঁড়ী প্রভৃতি শূদ্রজাতির সহিত কন্যার বিবাহ প্রদান করে, কিন্তু তাহাদিগের কন্যা গ্রহণ করে না। এবং যে কন্যাকে দান করে, তাহার রন্ধন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা ধনী ও বিদ্বান হইতেছে, তাহারা কিন্তু স্বাতন্ত্র্যলাভের চেষ্টায় আছে।

ঘটকগণের মধ্যে অধিকাংশই সৎ ব্রাহ্মণ। ইহাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ বিশেষ বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন ছিলেন। নতুবা তাঁহাদিগের প্রতি বংশের নামাদি রক্ষণের ভার অর্পিত হইবে কেন? "বৈদ্যগণের অনেকের সেন উপাধি আছে, সেনবংশীয় রাজাগণ সেনান্ত নামে বিখ্যাত" এই ধারণা বলেই ঘটকগণের বুদ্ধিতে বৈদ্যগণ সেনবংশীয় বলিয়া অনুমিত হইয়াছে, এমন কথা বলা যাইতে পারে না। কারণ ভীমসেন, চন্দ্রসেন প্রভৃতির "সেন" শব্দ যে নামের একটী অংশ তাহা বিলক্ষণ তাঁহাদিগের জানা ছিল। কায়স্থ ও অন্যান্য কতিপয় জাতিতেও সেন-উপাধি আছে। বাস্তবিক

সেনবংশীয় রাজগণ বৈদ্য ছিলেন, এই জন্যই, ঘটকগণ ও জনশ্রুতি তাঁহাদিগকে বৈদ্য বলিয়া প্রমাণ করিতেছে। তাঁহাদিগকে বৈদ্য ঠিক রাখিয়া, কায়স্থই করুন বা যাহাই করুন, সে স্বতন্ত্র কথা।

এ পর্য্যন্ত বৈদ্য ও কায়স্থ জাতি এক মূল হইতে উৎপত্তি এরূপ বলা হইল, এজন্য কেহ এরূপ মনে করিবেন না, যে আমরা উচ্ছৃঙ্খলতা পরতন্ত্র হইয়া বহুকালগত সমাজ বন্ধনকে ছিন্ন করিতে উদ্যত হইয়াছি। প্রকৃত যুক্তির অনুসরণ করিলে "কায়স্থ" ও "অম্বষ্ঠ" যেরূপ ভাবে পরিগৃহীত হইতে পারে, তাহাই আলোচিত হইয়াছে মাত্র। বহুকালাগত সামাজিক স্বাতন্ত্র্যে কায়স্থ ও বৈদ্যজাতি বিভিন্নভাবে আছেন। এক্ষণে "পরধর্ম্ম ভয়াবহ" পরিগ্রহণ করিলে সমাজ স্বপদে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে কেন।

আমাদিগের আর একটি নিবেদন এই যে, কায়স্থগণ আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদন করিতে যাইয়া নিরর্থক তর্কের বিষয়ীভূত না হয়েন। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণের নিম্নে ব্যতীত, কথনই ব্রাহ্মণের সমানে হিন্দুসমাজে স্থান লাভ করিতে পারিবেন না। বঙ্গদেশে, ব্রাহ্মণের নিম্নেই কায়স্থগণ আসন লাভ করিয়াছেন। কায়স্থগণ হিন্দু সমাজে যে অধিকার বিস্তীর্ণ করিয়া এক্ষণে বর্ত্তমান আছেন, তাহা বাস্তবিক ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে ন্যূন নহে! বঙ্গদেশে প্রথমে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি না থাকায়, তদানীন্তন বিপ্রগণ কায়স্থগণকে শূদ্রবৎ শাসনাধীন করিয়াছেন। এই জন্য স্মৃতিশাস্ত্রে কায়স্থগণ শূদ্রবৎ শাসনাধীন মাত্র এবং বহু পুরুষ পরম্পরায় ঐ ভাবেই তাঁহারা চলিয়া আসিতেছেন। ইহাতে কায়স্থ জাতির অগৌরব কি, তাহা আমরা বুঝিতে সমর্থ নহি।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রিয়ত্ব সম্বন্ধে গ্রন্থকারের ক্ষুদ্র পুস্তকের প্রায় অর্দ্ধাংশ আলোচিত হইয়াছে। বোধ হয় এই জন্যই তিনি সমালোচ্য গ্রন্থকে কায়স্থ জাতির ইতিবৃত্ত নাম দিয়াছেন। কিন্তু এই ইতিবৃত্তে গ্রন্থকারের নিকট আমরা আরও গুরুতর গবেষণা পাইবার আশা করিয়াছিলাম। (ক্রমশ)

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। | শ্রাবণ ১২৯৬ সাল। | ১১শ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্।

যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়ে জ্ঞানদীপ্তিরাবিবেকখ্যাতেঃ। ২৮॥

পদচ্ছেদঃ। যোগ-অঙ্গ অনুষ্ঠানাৎ, অশুদ্ধিক্ষয়ে, জ্ঞানদীপ্তিঃ, আ-বিবেক-খ্যাতে॥

পদার্থঃ। যোগাঙ্গানি বক্ষ্যমাণানি যম নিয়মাদীন্যষ্টৌ, তেষাং অনুষ্ঠানাৎ পুনঃ পুনর্জ্ঞানপূর্ব্বকাভ্যাসাৎ, অশুদ্ধির্নাম চিত্তসত্ত্বস্য প্রকাশাবরণলক্ষণ ক্লেশরূপা পঞ্চপর্ব্বা তস্যাঃ ক্ষয়োনাশস্তস্মিন্ সতি জ্ঞানস্য দীপ্তিঃ সম্যক্ অভিব্যক্তিঃ আ বিবেকখ্যাতেঃ বিবেকখ্যাতির্নাম প্রকৃতিপুরুষস্বরূপ বিজ্ঞানং তৎ পর্য্যন্তং।

অন্বয়ঃ। যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদশুদ্ধিক্ষয়েঽসতি, আবিবেকখ্যাতেজ্ঞানদীপ্তির্ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সাধনমন্তরেণ ন সিদ্ধির্ভবতীতি অভিপ্রেত্যাহ যোগাঙ্গানুষ্ঠানাদিতি যোগাঙ্গানাংবক্ষ্যমাণানাং যমনিয়মপ্রভৃতীনাং অনুষ্ঠানাৎ পুনঃ পুনরভ্যাসাৎ হেতোঃ চিত্ত সত্ত্বাবরক ক্লেশ রূপায়া অশুদ্ধের্নাশে সতি জ্ঞানস্য সম্যক্ অভিব্যক্তির্ভবতি বিবেক খ্যাতি পর্য্যন্তং তথাহি যথা যথা সাধনান্যনুষ্ঠীয়ন্তে তথা তথা। শুদ্ধিঃ তনুত্ব মাপদ্যতে, যথাযথাচাশুদ্ধিঃ ক্ষীয়তে তথা তথা চ ক্ষয়ক্রমানুরোধিনী জ্ঞানস্যাপি দীপ্তির্বিবর্দ্ধতে, সা খলু বৃদ্ধি

রাবিবেকখ্যাতেঃ প্রকৃতিপুরুষস্বরূপজ্ঞানং ভবতি তাবৎ পর্য্যন্ত মিত্যর্থঃ প্রকর্ষ মনুভবতি। যোগাঙ্গানুষ্ঠানমশুদ্ধে র্বিয়োগকারণং যথা পরশুঃ ছেদ্যস্য বিবেকঃ খ্যাতেস্তু প্রাপ্তিকারণম্ যথা ধর্ম্মঃ সুখস্য চ কিঞ্চাশুদ্ধি ক্ষয়দ্বারা যম নিয়মা-ন্তর্গত কর্ম্মণাং জ্ঞানহেতুত্বসিদ্ধিরত এব—

কর্ম্মণা সহিতাজ্জ্ঞানাৎ সম্যগ্ যোগাভিজায়তে।

জ্ঞানঞ্চ কর্ম্ম সহিতং জায়তে দোষবর্জ্জিতম্।

অনুবাদ। যম, নিয়ম, প্রভৃতি আট প্রকার যোগাঙ্গের বারম্বার অভ্যাস দ্বারা চিত্তাবরকক্লেশরূপ অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে, বিবেকখ্যাতি পর্য্যন্ত অর্থাৎ প্রকৃতি পুরুষের স্বরূপোপলব্ধি পর্য্যন্ত, জ্ঞানের বৃদ্ধি হয়।

সমালোচন। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে স্থির অর্থাৎ স্থায়িতাপ্রাপ্ত বিবেক খ্যাতিই জ্ঞানের উপায়। সুতরাং পুরুষার্থ লাভ করিতে হইলে, প্রথমে বিবেক খ্যাতির প্রাপ্তি আবশ্যক। বর্ত্তমান সূত্রে সেই বিবেক খ্যাতির প্রাপ্তি কিরূপে হয়, তাহাই বলা হইয়াছে।

যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম ... প্রভৃতি যাহার এই পাঁচটি যোগের অঙ্গ, ইহা-দের প্রত্যেকের স্বরূপ পরে বলা হইবে। এই যোগাঙ্গ সকলের বারম্বার অনু-ষ্ঠান অর্থাৎ অভ্যাস করিলে, আমাদিগের চিত্তের প্রকাশ শক্তির আবরক ক্লেশ রূপা অবিদ্যার ক্ষয় হয়। অবিদ্যাদ্বারা চিত্তের প্রকাশ শক্তির অবরোধ থাকাতেই, আমাদের অজ্ঞানের প্রাদুর্ভাব। ঐ চিত্তের অবরোধের যত ক্ষয় হয়, ততই আমাদের অজ্ঞানের নাশ এবং জ্ঞানের প্রাদুর্ভাব হয়। এইরূপে জ্ঞানের বৃদ্ধি হইতে হইতে অবশেষে আমাদের প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ উপলব্ধির অর্থাৎ বিবেক খ্যাতির উদয় হয়। যদি বল, যম নিয়মাদি কর্ম্ম, তাহারা তত্ত্বজ্ঞানের হেতু কিরূপে হইতে পারে? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলি-য়াছেন, যে ঐ সকল কর্ম্মদ্বারা অবিদ্যার ক্ষয় হয়, অবিদ্যার ক্ষয় হইতেই জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। কূর্ম্ম পুরাণে—এই কথাই বলা হইয়াছে, কর্ম্ম সহচর জ্ঞান হইতে সম্যক্ প্রকার যোগ উৎপন্ন হয়। কর্ম্ম সহচর জ্ঞানও সম্পূর্ণ দোষ শূন্য হইতে পারে। ভাষ্যকার বলেন, পরশু যেমন ছেদ্য বস্তুর বিয়ো-গের কারণ, এই যোগাঙ্গ কর্ম্ম সকল সেইরূপ অশুদ্ধির নাশের কারণ এবং ধর্ম্ম যেমন সুখের প্রাপ্তির কারণ, সেইরূপ যোগাঙ্গ কর্ম্ম বিবেক খ্যাতির প্রাপ্তির

কারণ অর্থাৎ ধর্ম্ম যেমন সুখোৎপত্তির প্রতিবন্ধক দুরদৃষ্টের নিবৃত্তি করে, সেই-রূপ যোগাঙ্গসকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান ও বিবেক খ্যাতি বা তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিবন্ধক অশুদ্ধির নিবৃত্তি করে; তাহাতেই কারণ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সচরাচর কারণ শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হয়, এখানে কারণ শব্দ সে অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই। পূর্ব্বাচার্য্যগণ নয় প্রকার কারণের নির্দ্দেশ করিয়াছেন যথা,—(১) উৎপত্তি কারণ, (২) স্থিতিকারণ, (৩) অভিব্যক্তি কারণ, (৪) বিকার কারণ, (৫) প্রত্যয় কারণ, (৬) আপ্তিকারণ, (৭) বিয়োগকারণ, (৮) অন্যত্বকারণ, এবং (৯) ধৃতিকারণ। ইহাদের মধ্যে উৎপত্তি কারণ বলিতে উপাদান কারণ, যেমন, মন জ্ঞানের উৎপত্তি কারণ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি সমুদায় বৃত্তিই মনের পরিণাম মাত্র, জ্ঞানও এক প্রকার বৃত্তি সুতরাং উহার উপাদান মন। যাহা কোন বস্তুর অবস্থানের প্রতি কারণ হয়, তাহার নাম স্থিতিকারণ যেমন পুরুষার্থতা অর্থাৎ ভোগাপবর্গ মনের স্থিতির প্রতি কারণ, কেননা ভোগাপবর্গ সমাপ্তি হইলে, মনের আপনা আপনিই লয় হয়। অভিব্যক্তি দুই প্রকার; প্রথম বুদ্ধি অর্থাৎ প্রকাশ, দ্বিতীয় বোধ অর্থাৎ তদ্বিষয়ে পুরুষের জ্ঞান। প্রকাশরূপ অভিব্যক্তির প্রতি আলোক কারণ এবং পুরুষের জ্ঞানরূপ অভিব্যক্তির প্রতি রূপজ্ঞান কারণ। বিকার বলিতে অবস্থান্তর প্রাপ্তি; তাহার প্রতি কারণকে বিকার কারণ বলা যায়, অগ্নি যেমন পাক্য বস্তুর বিকার কারণ। কোন বিষয়ে মন একাগ্র হইলে অপর প্রলোভন বিষয় তাহার সম্মুখে আসিয়া উহাকে আপনার দিকে আকর্ষণ করিয়া একাগ্রতা ভঙ্গ করে; এস্থলে ঐ বিষয়ান্তরকে মনের বিকার কারণ বলা যায়। প্রত্যয় শব্দের অর্থ প্রমাণ নিশ্চয়, যেমন পর্ব্বতে অগ্নি আছে ইহা লোকমুখে জানা থাকিলে, পরে দূর হইতে ধূম দেখিলে, সেই পূর্ব্ব বহ্নি জ্ঞানের নিশ্চয় হয়, কাযেই ধূম দর্শন বহ্নি জ্ঞান নিশ্চয়ের কারণ, এইরূপ কারণকে প্রত্যয় কারণ বলে। আপ্তি এবং প্রাপ্তি একই; আপ্তিকারণ বলিতে সেইরূপ কারণ বুঝিতে হইবে, যাহা কোন বস্তুর উৎপত্তির প্রতিবন্ধকদিগকে নিবৃত্তি করে; যেমন যোগানুষ্ঠান বিবেক খ্যাতির প্রতিবন্ধকের নিবৃত্তি করে বলিয়া উহার আপ্তিকারণ। বিয়োগকারণ বলিতে কোন বস্তুর বিনাশ বা ধ্বংসের কারণকে বুঝিতে হইবে, যেমন মশকের প্রতি ধূম বিয়োগ কারণ। অন্যত্ব-

কারণ বলিতে রূপভেদের কারণ। যেমন সুবর্ণের কটক ভাঙ্গিয়া কুণ্ডল গড়িলে, যাহাদ্বারা কটকের কুণ্ডলরূপে পরিণাম হয়, উহা কটকের অন্যত্ব কারণ এবং সুবর্ণের বিকার কারণ। আরও দেখ একই স্ত্রীজ্ঞান অবিদ্যা প্রভাবে মোহজনক, দ্বেষবশত দুঃখজনক, অনুরাগবশত সুখজনক এবং তত্ত্বজ্ঞানবশত বৈরাগ্যের কারণ হয়, অর্থাৎ অবিদ্যাযুক্ত ব্যক্তি কোন এক সুন্দরী স্ত্রীর নাম শুনিয়াই মূঢ় অর্থাৎ হিতাহিত বিবেকশূন্য হইয়া পড়ে, দ্বেষপরবশ ব্যক্তি সেরূপ স্ত্রী তাহার নাই ভাবিয়া দুঃখ ভোগ করে, বিষয়াসক্ত ব্যক্তি তাহাতে সুখ অনুভব করে এবং তত্ত্বজ্ঞানী অবিচলিত চিত্তে অবস্থান করেন। এখানে দেখা যাইতেছে, অবিদ্যা, দ্বেষ, রাগ, এবং তত্ত্বজ্ঞান একই স্ত্রী জ্ঞানের মূঢ়তাদি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির উৎপাদক; কাযেই উহাদিগকে স্ত্রীজ্ঞানের অন্যত্ব কারণ বলা যাইতে পারে। ধৃতিকারণ বলিতে আশ্রয়রূপে ধারক, যেমন শরীর ইন্দ্রিয়দিগের ধারক বা ধৃতিকারণ, এবং ইন্দ্রিয় সকল ও শরীরের ধৃতিকারণ; মহাভূতসকল শরীরের ধারক এবং মহাভূতগণ পরস্পর পরস্পরের ধারক। এইরূপ তির্য্যগ্‌জাতীয় শরীর, মনুষ্য জাতীয় শরীর, ও দৈব শরীর পরস্পর পরস্পরের ধৃতিকারণ। এই নয় প্রকার কারণ ব্যাখ্যাত হইল। যোগাঙ্গ কর্ম্মসকল তত্ত্বজ্ঞান বা বিবেক খ্যাতির প্রাপ্তির কারণ বলা হইল। সেই যোগাঙ্গ কর্ম্মগুলি কি? এই জিজ্ঞাসার উত্তরে পরসূত্রের অবতারণা করিতেছেন।

যম নিয়মাসন প্রাণায়াম প্রত্যাহার ধারণ ধ্যান সমাধয়োঽষ্টাবঙ্গানি।২৯॥

পদচ্ছেদঃ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান, সমাধয়ঃ অষ্টৌ অঙ্গানি।

পদার্থঃ। যমাদি স্বরূপস্য সূত্রকৃতৈব বক্ষ্যমাণত্বাৎ অত্র তদর্থ দর্শনং গ্রন্থগৌরবায়ৈবেতি জ্ঞেয়ং।

অন্বয়ঃ। এতে অষ্টৌ অঙ্গানি যোগস্যেবেতিশেষঃ।

অনুবাদ। যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান এবং সমাধি এই আটটি যোগের অঙ্গ।

সমালোচন। সূত্রকার নিজেই এক একটি সূত্রদ্বারা যমাদির স্বরূপ নির্দেশ করিবেন সুতরাং এখানে তাহাদের বিষয় আড়ম্বর করিয়া বলিয়া গ্রন্থগৌরব করিবার প্রয়োজন নাই? তবে এইমাত্র বলা যাইতে পারে, যে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সমাধির সাক্ষাৎ উপকারী, এই নিমিত্ত অন্তরঙ্গ; যেমন ধারণাদি; এবং কতকগুলি প্রতিপক্ষ হিংসাদির উন্মূলন দ্বারা সমাধির উপকারক; যেমন যমনিয়মাদি; আবার আসনাদি কতকগুলি পরস্পর পরস্পরের উপকার করে। কেহ আশঙ্কা করিয়াছিল, যে প্রথম পাদে অভ্যাস, বৈরাগ্য, শ্রদ্ধা, প্রাণায়াম, প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্গ উক্ত হইয়াছে। এবং এই দ্বিতীয় পাদের প্রথমে তপঃ স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধান প্রভৃতি মধ্যম সাধনের কথাও বলা হইয়াছে; যমাদি দ্বারা ত আবার সেই গুলিরই উক্তি হইতেছে, অতএব উহাদের পুনরুক্তিরূপ দোষ হইয়াছে না বলিব কেন? ইহার উত্তরে বিজ্ঞানভিক্ষু বলেন, এখানে কেবল সেই গুলি কথা যদি বলা হইত, তবে পুনরুক্তি হইত কিন্তু এখানে তাহাদের সহিত আরও কতকগুলি নূতন সাধনের কথা বলা হইয়াছে এবং উহারা যোগ ও জ্ঞান উভয়ের সাধন বলিয়া নির্দেশ করা হইয়াছে, কাযেই পুনরুক্তি নাই। তিনি বলেন বৈরাগের সন্তোষে, শ্রদ্ধা প্রভৃতির তপআদিতে এবং পরিকর্ম্মদিগের ধারণাদিত্রয়ের মধ্যে প্রবেশ আছে বলিয়া এবং শ্রবণ ও মনন জ্ঞানের প্রতি সাক্ষাৎ হেতু বলিয়া প্রমাণ সিদ্ধ থাকায়, এস্থলে তাহাদের বর্ণনা করা হইল না।

অহিংসাসত্যাস্তেয় ব্রহ্মচর্য্যাপরিগ্রহা যমাঃ।৩০॥ *

পদচ্ছেদঃ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহা যমঃ।

পদার্থঃ। প্রাণ বিয়োগ প্রয়োজন ব্যাপারো হিংসা, সাচ সর্ব্বানর্থ হেতুঃ তদভাবঃ অহিংসা; সর্ব্বথা, সর্ব্বদা সর্ব্বভূতানামনভিদ্রোহ ইতি যাবত্। সত্যং বাঙ্মনসয়োর্যথার্থত্বং। পরস্বাপহরণং স্তেয়ং, তদভাবঃ অস্তেয়ং। ব্রহ্মচর্য্যং ভোগসাধনানামস্বীকরণং। যমাঃ যম শব্দ বাচ্যা।

অন্বয়ঃ। এতে অহিংসাদয়ঃ পঞ্চ যমাঃ কথ্যন্তে ইতি শেষঃ।

---

* কোন কোন পুস্তকে, 'তত্রাহিংসা' এইরূপ পাঠ আছে; কোন কোন পুস্তকে 'তত্র' সূত্র হইতে পৃথক করা আছে। কোন কোন পুস্তকে 'তত্র' একেবারেই নাই।

অনুবাদ। অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য এবং অপরিগ্রহ ইহাদিগকে যম বলা হয়।

সমালোচন। যম ধাতুর অর্থবন্ধন। মত্ত হস্তীর মত, প্রবল বিষয় তৃষ্ণায় সর্ব্বদা ইতস্তত প্রধাবিত চিত্তের বেগ নিরোধকারী কার্য্য সকলের নাম যম। চিত্ত—সত্ত্ব রজ ও তম এই—ত্রিগুণময়, ইহা অনেক বার বলা হইয়াছে এবং উহার বৃত্তি সকল ত্রিগুণময় ইহাও অনেক বার বলা হইয়াছে। অনেক বার ইহাও বলা হইয়াছে, যে যখন চিত্তে সত্ত্বময় বৃত্তি সকল প্রবল থাকে, তখন উহা প্রকাশ স্বরূপ স্থিরতা এবং একাগ্রতা প্রাপ্ত হয়। যখন উহাতে রজঃ ও তমোময় বৃত্তি সকল প্রবল থাকে, তখনই উহা চঞ্চল বিষয়াসক্ত এবং অজ্ঞানে আবৃত হইয়া নানাবিধ পাপাচরণে প্রবৃত্ত হয়। কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ বৃত্তি সকল রজ ও তমোময়। এই সকল বৃত্তি অসংখ্য হইলেও ইহাদের ব্যাপার (action) সকলকে সাধারণত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত করা যাইতে পারে। যথা প্রথম অপরকে উৎপীড়ন করা, পরের অনিষ্ট করা, পরের প্রাণনাশ করা ইত্যাদি; ইহাদিগের সাধারণ নাম হিংসা। দ্বিতীয় পরকে প্রবঞ্চনা করা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা। তৃতীয় পরের দ্রব্য পরের অজ্ঞাতসারে গ্রহণ করা, পরের গচ্ছিত ধন পুনর্ব্বার তাহাকে না দেওয়া; ইহা সচরাচর চৌর্য্য বা অপহরণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। চতুর্থ ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করা। পঞ্চম প্রার্থনা পূর্ব্বক ভোগ্য বস্তুর গ্রহণ ইত্যাদি। আমাদের চিত্তের রজোগুণোময়ী বৃত্তি সকলের ব্যাপারগুলি উপরি উক্ত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত থাকায় চিত্ত ও সাধারণত এই পাঁচ প্রকার ব্যাপারে ব্যাপৃত থাকে। অতএব যে সকল কার্য্য চিত্তকে ঐ পাঁচ প্রকার ব্যাপার হইতে রুদ্ধ করিবার নিমিত্ত (যেন) বন্ধন করিয়া রাখে অর্থাৎ উহার গতি নিবৃত্তি করে, তাহাদিগকে যম বলা হয়। পূর্ব্বোক্ত পাঁচ প্রকার ব্যাপার হইতে চিত্তকে রুদ্ধ করে বলিয়া যমও সাধারণত পাঁচ প্রকারে বিভক্ত হইয়াছে। যথা (১) অহিংসা (২) সত্য (৩) অস্তেয় (৪) ব্রহ্মচর্য্য এবং (৫) অপরিগ্রহ। অহিংসা সকল প্রকার জীবের উপর কোন প্রকারে কোন সময় বিদ্রোহাচরণ না করা। যম ও নিয়মের অন্তর্গত যত প্রকার কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কোন প্রকার জীবের প্রতি কোন কালে উৎপীড়ন না করাই শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম; এই নিমিত্ত

প্রথমে উহার উক্তি হইয়াছে। তবে এখানে ইহাও অবশ্য জ্ঞাতব্য, যে পরের ক্লেশ হইবে বলিয়া অথবা তাহা হইতে আপনার সুখ হইবে বলিয়া, ইচ্ছা পূর্ব্বক পরের প্রতি কোন রূপ বিদ্রোহাচরণ করার নামই হিংসা নতুবা আমরা যে নিত্য কর্ম্ম করিতে, হাত নাড়িতে, পা নাড়িতে, শয়ন করিতে, উপ-বেশন করিতে, অজ্ঞাতসারে শত শত ক্ষুদ্র জীবের প্রাণ সংহার করি, তাহা হিংসা বলিয়া গণ্য হইতে পারে না। আমাদের চতুষ্পার্শ্বে, জলে, স্থলে, আকাশে, বায়ুতে, এমন কি আমাদের শরীরের প্রতি লোমকূপে, এত অসংখ্য কীটাণু বাস করে, যে আমাদের প্রতিপদক্ষেপে, এক এক ঢোঁক জল পানে, প্রতি শ্বাস গ্রহণে এবং এক এক বার গাত্র কণ্ডূয়নাদি করিবার সময় এত ক্ষুদ্র জীবের প্রাণবিয়োগ হয়, তাহার আর ইয়ত্তা নাই। আমরা সবিশেষ যত্নবান্ এবং সাবধান হইয়াও উহাদিগের প্রাণনাশ না করিয়া থাকিতে পারি না। যাহারা ঐ সকল কীটাণুরও প্রাণ নাশ না করিবার চেষ্টা করিয়া, কতকগুলি বাহ্যাডম্বর করিয়া বেড়ায়, তাহারা কেবল অহিংসা শব্দের অর্থে অনভিজ্ঞ নয়, পরমেশ্বর সৃষ্ট প্রাণিতত্ত্বেও সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। তাহারা বুঝে না, যে তাহা-দের ঐ বাহ্যাড়ম্বরের দরুণ, ঐরূপ কীটাণুর বরং আরও অধিক পরিমাণে বিনাশ হইয়া থাকে। ভাষ্যকার বলেন, সত্য আদি যাবদীয় কর্ম্ম এই অহিং-সারই সাধক। চিত্ত যতই নির্ম্মল হয় ততই হিংসা মন হইতে নিবৃত্ত হয়। ব্রাহ্মণ যতই ব্রত আদি ধর্ম্মাচরণ করিতে থাকে, ততই প্রমাদকৃত হিংসার নিদান হইতে নিবৃত্ত হইয়া সুনির্ম্মল অহিংসারই অনুষ্ঠান করে। মোক্ষ ধর্ম্মেও উক্ত হইয়াছে, যে যেমন হস্তিপদের মধ্যে সমুদয় পদ প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ অহিংসাতে সকল প্রকার ধর্ম্মার্থ সন্নিবিষ্ট।

সত্য। ভাষ্যকার সত্য শব্দের লক্ষণ করিলেন, 'যথার্থে বাঙ্মনসে'. বাক্য ও মনের যথার্থতার নাম সত্য। মন শব্দের অর্থ এখানে তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধি অর্থাৎ যেরূপ দেখিবে, যেরূপ অনুমান করিবে, বা যেরূপ শুনিবে ঠিক্, সেই-রূপ অর্থ প্রকাশক, সেইরূপ তাৎপর্য্যে বা অভিসন্ধিতে প্রযুক্ত বাক্যের নাম সত্য। কেবল প্রকৃত বা যথার্থ অর্থ প্রকাশক বাক্যকে সত্য বলা যায় না, তাহ'লে যুধিষ্ঠিরের "অশ্বত্থামা হতো গজ!" এই বাক্যটি মিথ্যা হইত না। কারণ তৎকালে বাস্তবিকই অশ্বত্থামা নামে একটি হস্তীর মৃত্যু হইয়াছিল।

কিন্তু ঐ বাক্যের উচ্চারক যুধিষ্ঠিরের মন, তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধি ঠিক 'হাতী মরেচে' এইরূপ বুঝানতে ছিল না কিন্তু উহা দ্বারা দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু হইয়াছে এইরূপ বোধ করানই তাঁহার তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধি ছিল, সুতরাং যথার্থ অর্থ প্রকাশক বাক্যও বিভিন্ন তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধিতে প্রযুক্ত হওয়ায়, উহা সত্য না হইয়া মিথ্যা হইল; সেই পাপে আজন্ম সত্যশীল যুধিষ্ঠিরেরও নরক দর্শন হইল। তাৎপর্য্য বা অভিসন্ধির—ভাষা অর্থ মৎলব্—ইংরাজী অর্থ, motive। ভাষ্যকার সত্য বুঝাইবার জন্য আরও একটু খুলিয়া বলিয়াছেন। তিনি বলেন আপনার মনে যেরূপ জ্ঞান আছে, অপরের মনে ঠিক সেইরূপ জ্ঞানের উদয় করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে যে কথা বলা হয়, তাহা যদি বঞ্চিতা অর্থাৎ বিপরীতার্থ বোধ করাইবার অভিপ্রায়ে প্রযুক্ত, ভ্রান্তা অর্থাৎ ভ্রমবশে প্রযুক্ত এবং প্রতিপত্তিবন্ধ্যা অর্থাৎ অভিপ্রেত অর্থ বোধ করাইবার নিমিত্ত অক্ষম না হয়, তাহা হইলেই উহাকে সত্য বলা যায়। সমুদয় প্রাণিবর্গের উপকারের নিমিত্ত ভগবান্ বিধাতা এই সত্য বাক্যের সৃজন করিয়াছেন, ইহা দ্বারা জীবগণের কোনরূপ অহিত হইবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু যদি ঐরূপ বাক্য কখন কোন প্রাণীর অহিতের কারণ হয়, তখন উহ'র সত্যত্ব থাকে না। অর্থাৎ যদি কোন দস্যু গ্রামস্থ কোন ধনীর বাসস্থান জিজ্ঞাসা করে সে স্থলে, সত্য বাক্য বলা উচিত নয়, কারণ আমার সত্য কথার দরুণ একজন নিরপরাধ ধনীর সর্ব্বস্বান্ত হইবার সম্ভাবনা, সুতরাং সত্য তখন পুণ্যের কারণ না হইয়া,পাপের কারণ হইয়া উঠে। অনেকে এস্থলে শাস্ত্রকারদিগের বচনের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া,বলিয়া থাকেন, যে কোন ব্রাহ্মণ যদি আমার সম্মুখে কাহাকে হত্যা করে,তাহলে ব্রাহ্মণের প্রাণ রক্ষার্থ রাজদ্বারে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া উচিত। এক্ষণে বিচার করিয়া দেখ, শাস্ত্রকারেরা ব্রাহ্মণ শূদ্র কোন বিশেষ করিয়া বলেন নাই, তাঁহারা সামান্যরূপে বলিয়াছেন, সত্য কথা বলিলে যদি কোন প্রাণীর হানি হয়, সেরূপ স্থলে ঐ সত্য সত্য না হইয়া বরং পাপের কারণ হইয়া উঠে। এস্থলে যে নিরপরাধ প্রাণীর হানি, তাঁহাদের অভিপ্রেত সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই; অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করা যদি তাঁহাদের অভিপ্রেত হইত,তবে তাঁহাদের অপরাধীর দণ্ড বিধানের কোন আবশ্যকতা থাকিত না। তবে যে স্থলে দুষ্ট

অভিপ্রায়ে নয়, কিন্তু নিহত ব্যক্তি দ্বারা অন্যায় রূপে উত্তেজিত হইয়া হত্যাকারী উহার হত্যা করিয়াছে, সে স্থলে হত্যাকারী এক প্রকার নিরপরাধ, সে ব্রাহ্মণই হউক, আর শূদ্রই হউক, তাহার রক্ষার্থ সত্য না বলিলে, কোন দোষ হয় না। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতে পারে, যে গ্রামস্থ কোন ভদ্র লোকের টায়টোয় ৫০০্ শত টাকা আয় হইতে পারে, এইরূপ আমার বিশ্বাস। বিশ্বাসের কারণ, তিনি সম্বৎসর সপরিবারে আধপেটা খেয়ে এবং নানাবিধ কষ্ট সহ্য করে অতিবাহিত করেন, তাহা আমি দেখি না, কিন্তু বৎসরান্তে তিনি দুর্গোৎসব করিয়া কতকগুলি দীন দুঃখীকে অকাতরে অন্নদান করেন, ইহা আমি দেখিতে পাই; আরও দেখিতে পাই, আমার বৎসরে ২০০০ হাজার টাকা আয়, একজন উপরিলোককে অন্ন দেওয়া দূরে থাকুক, স্বর্ণকারের ঘন তাগাদায় বৎসরের মধ্যে দুই তিনবার বৃদ্ধ পিতা মাতাকেও দিন থাকিতে আপনার আপনার পথ দেখিবার পরামর্শ দিয়া থাকি; সুতরাং এ অবস্থায় যে ব্যক্তি বৎসরে তিন দিন অন্যূন তিন শত উপরি দরিদ্র ব্যক্তিকে অকাতরে অন্ন দেয়, তাহার যে পাঁচ শত টাকা আয় হইবে, একথা বিশ্বাস না করিয়াই বা কি করি! এমন স্থলে আসেসর বাবু যদি আমাকে ঐ ব্যক্তির আয়ের কথা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে আমার যেরূপ বিশ্বাস তদনুরূপ সত্য বলা উচিত, না, ব্রাহ্মণকে বাঁচাইবার জন্য বিশ্বাসের বিপরীত মিথ্যা বলা উচিত? তুমি হয়ত বলিবে, আসেসর বাবু দস্যুর সমান, যত টাক্স বাড়াইবেন, ততই তাঁহার পদোন্নতি, বেতন বৃদ্ধি হইবে; এই স্বার্থে অন্ধ হইয়া, দীন দুঃখীর হৃদয় মর্ম্মভেদী হাহাকার রবে কর্ণপাত না করিয়া দুই হাতে টাক্স বসান ব্রতে ব্রতী। ব্রাহ্মণ নিরপরাধ নিতান্ত ধর্ম্মপ্রিয় বলিয়া দুর্গোৎসবটি করিয়া থাকেন। সম্বৎসর না খেয়ে, না দিয়ে, অর্থ সঞ্চয় করিয়া দুর্গোৎসবটি করেন মাত্র, তাঁহার সেই অর্থের উপর টাক্স বসাইলে, ধর্ম্ম কার্য্যের হানি হয় এবং ব্রাহ্মণকে মনস্তাপ দেওয়া হয়। এরূপ স্থলে, তাঁহার বাস্তবিক ৫০০ শত টাকা আয় হইলেও মিথ্যা বলিলে দোষ হয় না। আমার যুক্তি ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত। ফল, আমার ন্যায় সত্য ভীরু লোক আছে বলিয়া প্রতি বৎসর গবর্ণমেণ্ট ইনকম টাক্সের দরুণ আয় বৃদ্ধি অনুভব করিতে পারিতেছেন। প্রকৃত কথা এই, যে স্থলে সত্য বলিলে সম্পূর্ণ নিরপরাধের উপর মহা আপদ

আসিয়া উপস্থিত হয়, সে সত্য কখন পুণ্যের কারণ না হইয়া, পাপের কারণ হয় এবং ঐরূপ কঠোর সত্য হইতে পরিণামে নরক প্রাপ্তিও ঘটে। অতএব পূর্ব্বে, লোকের হিতাহিত বিশেষরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া সত্য বাক্যের প্রয়োগ করিবে। আমরা বলি, যে স্থলে সত্য বলিলে নিরপরাধের উপর বিশেষ বিপৎপাতের সম্ভাবনা, সে স্থলে সত্য না বলুক, কিন্তু তাই বলিয়া মিথ্যাও বলিবে না, মৌন অবলম্বন করাই শ্রেয়স্কর। কারণ, সেরূপ স্থলে বাক্য না বলাই শাস্ত্রকারের অভিপ্রেত।

অস্তেয় শব্দের অর্থ স্তেয়াভাব। কাযেই অস্তেয শব্দের অর্থ জানিতে হইলে প্রথমে স্তেয় শব্দের অর্থ জানা আবশ্যক। ভাষ্যকার বলেন অশাস্ত্র পূর্ব্বক পর হইতে দ্রব্য গ্রহণের নাম স্তেয়। অর্থাৎ জ্ঞানপূর্ব্বক পরের অজ্ঞাতে পরের দ্রব্যকে আত্মসাৎ করার নাম স্তেয়, ভাষায় ইহা চুরি বলিয়া প্রসিদ্ধ। ঐ স্তেয়ের অভাব অস্তেয় অর্থাৎ কোন, চুরি বা অপহরণ না করা। ভাষ্যকার বলেন কেবল কাযে চুরি না করাই যে অস্তেয় তাহা নহে। চৌর্য্যে স্পৃহাশূন্য হওয়াই অস্তেয়। অর্থাৎ চুরি বা অপহরণ করিবার ইচ্ছা পর্য্যন্ত না করা। বলপূর্ব্বক দুর্ব্বলের বস্তু গ্রহণ, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গচ্ছিত ধনের অপলাপ ইত্যাদি কার্য্যও স্তেয় মধ্যে পরিগণিত।

ব্রহ্মচর্য্য শব্দের অর্থ আসঙ্গলিপ্সা হইতে বিরতি বা কাম ভোগেচ্ছার প্রতিরোধ। *

অপরিগ্রহ বলিতে স্রক্ চন্দন প্রভৃতি ভোগ্য বস্তুর অগ্রহণ অর্থাৎ স্বয়ং কোনরূপ ভোগ্য বস্তুর আহরণের জন্য যত্ন করিবে না এবং যদি কেহ ঐ সকল দান করে তাহা হইলেও সে সকল গ্রহণ করিবে না। কারণ প্রথমে ভোগ্য বস্তু সমূহের উপার্জ্জন দুঃখপ্রদ, উপার্জ্জিত বস্তুর রক্ষণাবেক্ষণ আরও দুঃখপ্রদ, তাহার উপর, বস্তু সকল আবার নশ্বর, কোন বস্তু চিরস্থায়ী নয়। ভোগ করিতে করিতে তৃপ্তিই কি ছাই সহজে হয়? শাস্ত্রকারেরা বলেন তৃপ্তি একেবারেই হয় না। তাঁহারা বলেন, ভোগ্য বস্তুর উপভোগেত তৃপ্তি হয়

---

* আসঙ্গ লিপ্সা বা মৈথুন আট প্রকার। যথা স্মরণং কীর্ত্তনং কেলি প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং সংকল্পোধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া নিবৃত্তিরেবচ। এই আট প্রকার মৈথুন হইতে বিরক্তির নাম ব্রহ্মচর্য্য।

না বরং অগ্নি ঘৃতাহুতি দ্বারা যেমন পূর্ব্বাপেক্ষা প্রজ্বলিত হয়, তেমনি ভোগেও বিষয় তৃষ্ণা কেবল বর্দ্ধিত হয়। আরও দেখ, যাহা অপেক্ষাকৃত অধিক ভোগ্য আছে, তাহার প্রতি অল্প ভোগ্য বস্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিরা হিংসা করে এবং অল্প ভোগ্য বস্তু বিশিষ্টেরা আবার অধিক ভোগ্য বস্তু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক ঘৃণিত হয়। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া শাস্ত্রকারেরা বিষয়সঙ্গ হইতে এককালে নিবৃত্ত হইতে উপদেশ দিয়াছেন।

জাতিদেশকালসময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা মহাব্রতম্ ।৩১॥

পদচ্ছেদঃ। জাতি-দেশ-কাল-সময়-অনবচ্ছিন্নাঃ, সার্ব্বভৌমা, মহাব্রতাঃ।

পদার্থঃ। জাতিঃ ব্রাহ্মণত্বাদিঃ, দেশঃ তীর্থাদিঃ, কালঃ চতুর্দ্দশ্যাদিঃ, সময়ঃ ব্রাহ্মণপ্রয়োজনাদিঃ (জাতিশ্চ, দেশশ্চ, কালশ্চ, সময়শ্চ তৈঃ) অনবচ্ছিন্নাঃ অনিয়তীভূতাঃ সর্ব্বাসু চিত্তভূমিষু ভবাঃ সার্ব্বভৌমাঃ মহাব্রতং মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানং ইতি।

অন্বয়ঃ। তে অহিংসাদয়ো যমা জাতিদেশ কাল সময়ানবচ্ছিন্নাঃ সার্ব্বভৌমা শ্চেৎ তদা মহাব্রতং ইতি উচ্যন্তে ইতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদি তে অহিংসাদয়ো জাতি দেশ-কাল-সময়ৈরবচ্ছিন্না ন ভবেযুঃ তত্র জাত্যবচ্ছিন্না অহিংসা যথা মৎস্য ঘাতকস্য মৎস্যেষেব হিংসা নান্যত্র দেশাবচ্ছিন্না যথা তীর্থে ন হনিষ্যামীতি, কালাবিচ্ছিন্না যথা চতুর্দ্দশ্যাং অন্যত্র, বা পুণ্যেহ হনি ন হনিষ্যামীতি, সময়াবচ্ছিন্না যথা দেব ব্রাহ্মণার্থমেব হনিষ্যামি নান্যথা, যা অহিংসা এবং অবচ্ছিন্না ন ভবতি সা অনবচ্ছিন্না এবং সত্যাদিষপি যোজ্যম্। জাতিদেশ কাল সময়ৈঃ অনবচ্ছিন্নাঃ সর্ব্বমেব পরিপালনীয়া অহিংসাদয়ঃ সার্ব্বভৌমাঃ সর্ব্বথৈবাবিদিতব্যাভিচারাশ্চেতি মহাব্রতং উচ্যতে ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। সেই অহিংসা আদি যম, যদি জাতি, দেশ, কাল এবং সময় দ্বারা অবচ্ছিন্ন অর্থাৎ নিয়মিত না হয় এবং চিত্তের সমুদয় ভূমি অর্থাৎ অবস্থায় অবস্থিত হয়, তাহা হইলে উহাদিগকে মহাব্রত বলা যায়।

সমালোচন। যোগভ্যাসার্থীর স্বাভাবিক চঞ্চল চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনার্থ যম নিয়ম প্রভৃতি আট প্রকার অঙ্গের অনুষ্ঠান উপদিষ্ট হইয়াছে; তাহা-

দের মধ্যে আবার প্রথম অনুষ্ঠেয় যম অহিংসা আদি পঞ্চ। যম শব্দের অর্থ বন্ধন ইহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; যে সর্ব্বতোভাবে বিশৃঙ্খল, সহসা তাহার হস্ত পদাদি সর্ব্বাবয়ব বন্ধন করিয়া স্থিরতা সম্পাদন করিবার চেষ্টা, বালকের চেষ্টার মত, উপহাসাস্পদ, এই নিমিত্ত শাস্ত্রকারেরা অহিংসাদিকে নিয়মিত করিয়া উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় সকল ব্যক্তি সকল সময়েই অহিংসাদির অনুষ্ঠান করুক কিন্তু মনুষ্যের শরীর ও মন এইরূপ উপাদানে গঠিত, যে তাহা ক্রমশ অভ্যাস না করিলে একেবারে সিদ্ধ হয় না। এই জন্য শাস্ত্রকারেরা নিয়ম করিয়াছেন যে অধম জাতির, মৎস্যজীবী ধীবরের, পশুঘাতী ব্যাধের, মৎস্য বা পশু হিংসা দোষাবহ নহে, ক্ষত্রিয় বীরের যুদ্ধে মনুষ্য হত্যা দোষাবহ নহে, চতুর্দ্দশী বা পুণ্য তিথিতে ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠবর্ণ ভোজনের নিমিত্ত মৎস্যাদির হিংসা করিবে না, এতদ্ভিন্ন অন্যকালে মৎস্যাদি ভক্ষ্য জীবের হিংসা করিলে বিশেষ দোষ নাই, পবিত্র তীর্থ ভিন্ন অন্য দেশে আহারার্থ পশুহিংসা করিতে পারে, দেবকার্য্য পিতৃকার্য্য অতিথিসেবা এবং যাগ যজ্ঞাদির নিমিত্ত পশু হিংসা দোষাবহ নয়। এইরূপ সত্যাদির ও জাতি, কাল, দেশ ও সময়ের নিয়ম করিয়াছেন। ঐ সকল নিয়মের অনুসরণ করিয়া যাহারা চলে, তাহাদিগকেও যমী বলা যায়। কিন্তু যাহারা ঐ নিয়মের অতিরিক্ত স্থলেও যমাদির অনুষ্ঠান করে, শাস্ত্রে যে সকল কাল দেশ পাত্র প্রভৃতি ভেদে হিংসাদি উক্ত হইয়াছে, সেই সকল স্থানেও হিংসাদির অনুষ্ঠান না করে অর্থাৎ যাহারা সকল অবস্থায়, সকল দেশে, সকল কালে কোন প্রকার হিংসাদির অনুষ্ঠান না করে, তাহাদের সেই যম বা অহিংসাদির অনুষ্ঠানকে মহাব্রত বলা যায়।

শৌচসন্তোষতপঃস্বাধ্যায়েশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ।৩২॥

পদচ্ছেদঃ। শৌচ, সন্তোষ, তপস্, স্বাধ্যায়, ঈশ্বর প্রণিধানাণি, নিয়মাঃ।

পদার্থঃ। শৌচং দ্বিবিধং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চেতি, তত্র বাহ্য মৃজ্জলাদিভিঃ শরীরাদি প্রক্ষালনং আন্তরঞ্চ মৈত্র্যাদিভিশ্চিত্তমলানাং প্রক্ষালনং, সন্তোষঃ তুষ্টিঃ, তপোনাম চান্দ্রায়ণাদীনি ব্রতানি দ্বন্দ্ব সহনঞ্চ; দ্বন্দ্বশ্চ শীতোষ্ণাদি স্বাধ্যায়ো মোক্ষশাস্ত্রাণামধ্যয়নং প্রণবজপো বা, ঈশ্বরপ্রণিধানং তস্মিন্ পরমগুরবা সর্ব্ব কর্ম্মার্পণং—নিয়মাঃ—নিয়ম শব্দবাচ্যা।

অন্বয়ঃ। শৌচঞ্চ সন্তোষশ্চ, তপশ্চ, স্বাধ্যায়শ্চ ঈশ্বর প্রণিধানঞ্চ তানি এতে শৌচাদয়ঃ নিয়মাঃ কথ্যন্ত ইতি শেষঃ।

অনুবাদ। শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বরপ্রণিধান ইহা-দিগের নাম নিয়ম।

সমালোচন। "নি পূর্ব্বক যম ধাতুর অর্থ নিয়ম, যাহা দ্বারা চিত্ত অতিশয় রূপে আবদ্ধ হয় এইরূপ কার্য্য সকল। সেই কার্য্য কি কি,—(১) শৌচ, (২) সন্তোষ,(৩) তপস্যা,(৪) স্বাধ্যায়, এবং (৫) ঈশ্বর প্রণিধান; এই পাঁচটী কর্ম্ম। ইহাদের মধ্যে শৌচ দুই প্রকার বাহ্য এবং আভ্যন্তর; বাহ্যশৌচ মৃত্তিকা এবং জলাদি দ্বারা শরীর, বস্ত্র, আসন, শয্যা ও গৃহাদির মল অপনয়ন করা, পবিত্র বস্তু সকলের সেবা করা ইত্যাদি; আভ্যন্তর শৌচ চিত্তের মলিনতা দূর করিয়া তাহার পবিত্রতা সম্পাদন; সন্তোষ শব্দের অর্থ তুষ্টি আপনার যেরূপ সামর্থ্য তাহার অধিক কার্য্য করিতে অভিলাষ না করা, সামর্থ্যানুরূপ ফল লাভ করিয়াই পরিতৃপ্ত হওয়া। তপস্যা বলিতে—শীত, উষ্ণ,—ক্ষুধা, পিপাসা প্রভৃতি দ্বন্দ্বের সহন; এখানে দ্বন্দ্ব বলিতে যাহাদের একটি করে যোড়া আছে; কৃচ্ছ্র চান্দ্রায়ণ, সান্তপনাদি প্রায়শ্চিত্তও তপস্যার মধ্যে পরিগণিত; স্বাধ্যায় বলিতে মোক্ষোপযোগী শাস্ত্র সকলের অধ্যয়ন অথবা প্রণবের জপ। ঈশ্বর প্রণিধান বলিতে সেই পরম পুরুষ পরমেশ্বরে সকল কর্ম্মফলের অর্পণ। এ বিষয়ে একটি শ্লোক আছে, যথা "শয্যাসনস্থোহথে পথিব্রজন্ বা স্বস্থঃ পরি-ক্ষীণ বিতর্কজালঃ। সংসারবীজক্ষয়মীক্ষমানঃ স্যান্নিত্যমুক্তোহমৃত ভোগভাগী।

যে ব্যক্তি শয়ন, উপবেশন, বা গমন করত আত্মনিষ্ঠ হয় অর্থাৎ আপনার অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া পরমেশ্বরের সহিত ঐক্য ভাবনা করে, আপ-নার সমুদয় কর্ম্ম পরমেশ্বরে অর্পণ করে, তাহার সংশয় সকল ক্ষয় হয় এবং সেই ব্যক্তি নিত্যমুক্ত হইয়া অমৃতের ভাগী হয়।

বোম্বাই পরিদর্শন।

৪।

বোম্বায়ে মহারাষ্ট্রীয়দিগকে আজ কাল ব্যবসা বাণিজ্য করিতে দেখা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালে ইঁহারা বণিগ্বৃত্তির লোক ছিলেন না। গুজরাটীরাই ভারতের প্রধান বণিক জাতি। ভারতবর্ষের অধিকাংশ স্থানের ব্যবসা বাণিজ্য গুজরাটী ভাষাতেই চলিয়া আসিতেছে। মহারাষ্ট্রীয়েরা স্বভাবত চতুর, বুদ্ধিমান্, পরিশ্রমী ও ক্ষিপ্রকর্ম্মা। ইঁহাদের ভাষার সীমা বলিতে হইলে, উত্তরে বোম্বায়ের ১০৮ মাইল দূরে "দামান" নামক নদী তীর হইতে, দক্ষিণে গোয়া পর্য্যন্ত, সমস্ত উপকূল ভাগেই এবং মধ্যে তাপ্তী ও কৃষ্ণার মধ্যস্থিত তাবৎ প্রদেশেই মহারাষ্ট্রীয় ভাষা প্রচলিত। "ডাক্তার উইলসন্" পশ্চিম ভারতের প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড বৌদ্ধকীর্ত্তির ধ্বংশাবশেষ দেখিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে খৃষ্টীয় শাকের দুই শত বৎসর পূর্ব্বে সমস্ত মহারাষ্ট্রীয় প্রদেশে বৌদ্ধদিগের অত্যন্ত প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কিন্তু তথাপি, আজ কাল ভারতবর্ষে সেই মহারাষ্ট্রীয়দিগের ন্যায়, ব্রাহ্মণ অনুরক্ত জাতি আর নাই। শিবজীর পৌত্র "সাহুকে" যখন অনেক হিন্দু রাজা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে হিন্দুধর্ম্মের পুনরুত্থানের জন্য মহারাষ্ট্রীয়েরা কি করিয়াছেন, তখন সাহু উত্তর করিয়াছিলেন, "দক্ষিণ ভারত হইতে যমুনা পর্য্যন্ত জয় করিয়া, আমরা ব্রাহ্মণদিগকেই দিয়াছি।" সাহুর এ গর্ব্ব মিথ্যা নহে; কারণ শিবজীর রাজত্ব, পরিণামে তাঁহার গুরুবংশ পেশোয়াদিগেরই, হইয়াছিল। ইঁহাদের প্রধান তীর্থ গোদাবরী; এবং নাসীকের যে ত্র্যম্বক নামক স্থানের বিষয় পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহাই ইঁহাদের প্রধান তীর্থ স্থান। ইঁহাদের মধ্যে জাতীয় ধর্ম্মভাবের লাঘব হইলে, মহারাষ্ট্রীয় কবি তুকারাম, প্রভৃতির দ্বারায় পুনরুত্থিত হইয়া, এখনো সঞ্জীবিত রহিয়াছেন। বহুদিবস হইল Nineteenth Century নামক বিলাতের সাময়িক পত্রে একবার পড়িয়াছিলাম, যে "God sent a poet to reform his earth" তুকারামের কার্য্য ভাবিলে, এ কল্পার সার্থকতা বুঝিতে পারি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, যে মহারাষ্ট্রীয়েরা ব্যবসা বাণিজ্যে তত পটু নহেন। ইংরাজ কর্ত্তৃক ভারত অধিকারের পূর্ব্বে, যুদ্ধনীতিই ইঁহাদের প্রধান চর্চ্চা ছিল। এক্ষণে রাজনীতি, সমাজনীতি ও অধ্যাপনা প্রভৃতি বিষয়, এ অঞ্চলে প্রধানত ইঁহাদের ও পার্শীদের দ্বারায় আলোচিত হইতেছে। এখানে এই দুই জাতিই অধিকাংশ ব্যবহারজীবী, শিক্ষক, রাজ কর্ম্মচারী ও অন্যান্য কর্ম্মচারী। দেশীয় সংবাদ ও সাময়িক পত্রাদি, ইঁহাদের দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে। এই সকল পত্রে যে সকল মতামত প্রকাশিত হইতেছে তৎ-প্রতি গবর্ণমেণ্টেরও বিশেষ লক্ষ্য আছে। গবর্ণর জেনরল, কাউন্সিলের মেম্বর Gibbs সাহেব ইঁহাদের মতামত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা আমি উদ্ধৃত করিতেছি।

"I think I may safely say, that in no city in India has pnblic opinion so much force and so much value, as it has in Bombay. I am aware that a late able member of the Bar said, that public opinion is not to be found in India. It may not have been found to any great extent in his day, perhaps, but I think at the present time, it will be admitted by all, that public opinion in Bombay, has a very great effect. It has a great effect, in turn, on Govt, and on the people, and I am quite sure that, the effect of public opinion in Bombay, is certainly being felt in England."

বোম্বায়ের মুসলমানেরা অন্যান্য স্থানের ন্যায় প্রধানত সুন্নি ও সিয়া নামক দুই দলে বিভক্ত। তুর্কী ও আরবীরাই প্রধানত সুন্নী এবং পারস্য প্রদেশীয়েরা সিয়া শ্রেণীভুক্ত। বোম্বায়ে সিয়াই অধিক। এখানকার সিয়াদিগের মধ্যে বোরা বলিয়া এক শ্রেণী মুসলমান আছে, ইহারা দৃশ্যে, আচারে ও নৈপুণ্যে প্রায় য়িহুদীদিগের ন্যায়। খোজা মুসলমানেরাও সিয়া। বোম্বায়ে অনেক মুসলমানকে লোকে মোগল বলিয়া জ্ঞান করে, কিন্তু তাঁহারা মোগল নহেন, তাঁহারা পারস্যবাসী। মুসলমানদিগের মহাতীর্থ মক্কা যাতায়াতের পথ, আজ কাল এইখান দিয়া হইয়াছে, শীতকাল ইঁহাদের মক্কা যাত্রার সময়। এই সময়ে এইখানে দেশ দেশান্তর হইতে মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে। ভারতের ওহাবী মুসলমানদিগকে অনেকেই পাটি-

নার আমীর খাঁর শিষ্য বলিয়া জানেন, কিন্তু বোম্বায়ের ১৮৭২ সালের Census তালিকায় এরূপ অনেক ওহাবীর নাম আছে, যাঁহারা কেহই তাঁহার শিষ্য বলিয়া স্বীকার করেন না।

পার্শী। সকলেই অবশ্য জ্ঞাত আছেন যে পার্শীদিগের আদিম বাসস্থান পারস্য দেশ, এবং ইঁহাদেরি নাম ইরাণী ছিল। সপ্তম শতাব্দীতে মুসলমানেরা পারশ্য জয় করিলে, ইরাণীদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা পারশ্যেই রহিয়া গেলেন, এবং যাঁহারা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিলেন না, তাঁহারা নির্ব্বাসিত হইয়া পারস্য উপসাগর কূলে অরমস্ প্রণালীর ধারে বাস করিলেন, এবং তথায় জাহাজ নির্ম্মাণ কার্য্যে রত হইয়া অচিরে সে কার্য্যে নিপুণতা লাভ করিলেন। পরে তথা হইতে ক্রমশ ছড়াইয়া পড়িয়া ভারত উপকূলে বিশেষত কাটিওয়ারে "ডিউ" নামক স্থানে উপনিবেশ করেন। উক্ত স্থানে কোন প্রকার উন্নতির আশা না দেখিয়া গুজরাটে সানজাম নামক স্থানে বাস করিতে যান। এই অবস্থায় ইঁহারা যেখানে যেখানে গিয়াছেন, সেই স্থানেই বহুকাল রক্ষিত উপাস্য অগ্নি সঙ্গে করিয়া লইয়া গিয়াছেন। ইঁহারা এক মাত্র অগ্নি উপাসক বলিয়া অনেকেরি বিশ্বাস, অন্য দেব দেবীর উপাসনা করেন না বলিয়া অনেকের ধারণা, কিন্তু এরূপ বিশ্বাস ভ্রান্তিমূলক। আমি সে বিষয় পরে বলিব, ইঁহাদের প্রত্যেকের বাটীতেই একটি ঘরে উপাস্য অগ্নি আছে; এ অগ্নি নির্ব্বাণ হইতে পারে না—কেহ কেহ বলেন যে পার্শীদের বাটীতে দেড়শত কি দুইশত বৎসরের অগ্নি রক্ষিত হইতেছে। ইঁহারা সান্‌জামে বাস করিতে ইচ্ছুক হইলে তথাকার হিন্দু রাজা রাণা যাদু ইঁহাদিগকে সাদরে, স্বীয় অধিকারে বাস করিবার, ও ইঁহাদের উপাস্য অগ্নি তথায় লইয়া যাইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছিলেন। এই হিন্দুরাজের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্য ইঁহাদের বিবাহ প্রভৃতি শুভকার্য্য, একবার পার্শী প্রথা ও একবার হিন্দু প্রথা অনুসারে এখনো সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইঁহাদের যতই দল বৃদ্ধি হইতে লাগিল ততই ক্রমশ গুজরাটের প্রধান প্রধান নগরে ছড়াইয়া পড়িতে লাগিলেন এবং ক্রমশ গুজরাটী ভাষা ও হিন্দুর অনেক আচার ব্যবহার ইঁহাদের মধ্যে প্রচ-

লিপ্ত হইয়া পড়িল। ইংরাজের সংশ্রব হইতেই ইঁহাদের প্রকৃত প্রভাবে সৌভাগ্য আরম্ভ হইল। বিজাতীয়দিগের সম্বন্ধে ইঁহাদের কোন প্রকার কুসংস্কার ছিল না, সুতরাং ইংরাজের কার্‌কারবারের সহায়তা করিয়া শীঘ্রই ইংরাজের প্রিয় হইয়া উঠিলেন। এই সূত্রে ইঁহাদের যথেষ্ট ধনোপার্জ্জনও হইতে লাগিল। বোম্বাই যখন ইংরাজের হস্তে আইসে, তখন বোম্বায়ে এক জনমাত্র পার্শী ছিলেন। ইংরাজের অধিকারে বোম্বায়ের উন্নতি হইতে লাগিল, সুরাট অপেক্ষা বোম্বাই প্রসিদ্ধ স্থান হইয়া দাঁড়াইল; পার্শীরাও ইংরাজ অদৃষ্ট অনুসরণ করিয়া, দলে দলে বোম্বায়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন এবং এইরূপ প্রমাণ আছে যে জাহাজাদি নির্ম্মাণে পার্শীদিগের নৈপুণ্য দেখিয়া, Dockyard সংক্রান্ত কার্য্য নির্ব্বাহের জন্য ইংরাজেরা ইঁহাদিগকে নিমন্ত্রিত করিয়া লইয়া যান। এক্ষণে ইঁহারা বোম্বায়ে দেশীয়দিগের মধ্যে প্রধান বাণিজ্য-ব্যবসায়ী ও সাধারণ হিতৈষী বলিয়া বিখ্যাত। ইঁহাদের কার্য্য-পটুতা ও ক্ষিপ্রকারিতা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। ইঁহাদের মধ্যে ছোট জাতি যাহারা, তাহারাও অতি চতুর দোকানদার এবং অতি উত্তম কারিগর। ছুতারের কার্য্যে ইহারা বিশেষ পটু।

পার্শীরা যে ইংরাজের কতদূর প্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন, তাহা বোম্বাই না দেখিলে ঠিক বুঝিতে পারা যায় না। সকলেই অবশ্য জানেন, যে প্রায় ২১ বৎসর পূর্ব্বে সর্ জেমশেট্‌জি জিজিভাই নামক জনৈক পার্শী ব্যারনেট পদে অভিষিক্ত হন এবং তাহার পর সর কাউয়াস, জি, জাহাঙ্গীর নাইট পদে অভিষিক্ত হইয়াছেন। আরো কয়েক জন পার্শী ঐরূপ উপাধি পাইয়াছেন।

পার্শীরা ইংরাজের বড় অনুকরণ করেন বলিয়া, বোম্বায়ের মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটীরা ইঁহাদিগকে "Apes" অর্থাৎ বাঁদর কহেন। পার্শীদের, ইংরাজের অনুকরণ আশ্চর্য্য বটে, আমাদের বাঙ্গালিরা বিলাত যাইলে, বা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিলে, আচার ব্যবহারে যেরূপ সাহেবের ন্যায় হইয়া পড়েন, পার্শীরা বিলাত না গিয়া, স্বধর্ম্ম-ত্যাগ না করিয়া, জাতীয় পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন না করিয়া, পুরো সাহেব। টেবলে আহার, কাঁটাচামচ ব্যবহার, পার্শীদিগের মধ্যে নিত্য প্রচলিত। পুরুষেরা সর্ব্বদাই পায়জামা

পরিধান করেন। পার্শী রমণীরাও বিলক্ষণ পরিস্কার পরিচ্ছদাদি ব্যবহার করেন। তাঁহাদের পরিধান সাড়ী, গায়ে জামা এবং জামার উপর বিবিয়ানা একটি জ্যাকেট। গৃহে যখন কর্ম্ম কায করেন, তখন সূতার সাড়ী ব্যবহার করেন, নতুবা বায়ু সেবনের সময় অথবা কোথাও গমনাগমনের সময়, যিনি দরিদ্র, তিনিও একখানি রেসমী সাড়ী পরিধান করেন। এ সকল সাড়ী পার্শী রমণীদিগের জন্যই চীন হইতে প্রস্তুত হইয়া বোম্বায়ে আমদানি হয়। রেসমী সাড়ী পরিবার সময়, ইঁহারা ভিতরে সুতার ছোটসাড়ী অথবা পায় জামা পরিধান করেন। আমাদের যেমন যজ্ঞোপবীত, পার্শী পুরুষ রমণী উভয়েরি এক প্রকার সূতার উপবীত গ্রহণ প্রথা আছে। আমরা উপবীত গলায় ধারণ করি, ইঁহারা কি পুরুষ কি রমণী, উভয়েই কোমরে ধারণ করেন। পুরুষের পক্ষে উপবীত ধারণের সঙ্গে, মসলিনের হাঁটু পর্য্যন্ত একটি জামা পরিধান করিতে হয়, স্ত্রীলোকের উপবীতেও ঐরূপ হাঁটু পর্য্যন্ত মসলিনের জামা এবং শ্বেত বস্ত্রের একটি মস্তকের আবরণ ধারণ করিতে হয়। কলিকাতায় যদি কেহ পার্শী রমণী দেখিয়া থাকেন, তবে অবশ্যই লক্ষ্য করিয়াছেন, যে রুমালের ন্যায় একখান শ্বেত বস্ত্রে তাঁহাদের মস্তকের কেশ আবৃত থাকে, সে আবরণ শোভার জন্য নহে, দীক্ষার সময় তাঁহাদের উহা ধারণ করিতে হয়। পার্শীরা এই সকল দীক্ষার চিহ্ন স্নানের সময় ব্যতীত অঙ্গ হইতে পৃথক করে না। পার্শীরা প্রথমে সমুদ্রের উপকূলে বাস করিতেন, সেই জন্য পূর্ব্বকালে অশিক্ষিত লোকেরা, পার্শী রমণীদিগকে অপ্সরা মনে করিত এবং কহিত সমুদ্র হইতে ইঁহারা উদ্ভূত হইয়াছেন। অপ্সরা কথাটি পার্শী রমণীদিগেরই উপযুক্ত নাম বটে। ইঁহারা সন্ধ্যার পূর্ব্বে যখন নীল, পীত, লোহিত, হরিত, শ্যামল, পাটল প্রভৃতি বর্ণের রেসমী সাড়ী পড়িয়া সমুদ্র তীরে বায়ু সেবন করিতে আইসেন, তখন তোমার মনে হইবে, যেন তুমি ঘুম ঘোরে দেখিতেছ, যে চাঁদের এক একখানি জোৎস্না খসিয়া পড়িয়া মধুময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়া, সমুদ্র উপকূলে স্বর্গভ্রষ্ট অপ্সরার ন্যায় উদাসভাবে, কেহ বা বসিয়া, কেহ বা ধীরে ধীরে পাদচারণ করিতে করিতে, সাগর হৃদয়ে জন্মভূমি স্বর্গের প্রতিবিম্ব দেখিতেছেন। সিন্ধুসলিল, সে অপ্সরা মূর্ত্তির প্রতিবিম্ব বক্ষে করিয়া অতল গর্ভে, যেখানে বহুমূল্য রত্নাদি

রাখিয়াছে, সেই খানে রাখিয়া দিবার জন্য ছুটাছুটি করিতেছে। ইঁহাদের এমনি একটু শান্ত প্রকৃতি, যে সন্ধ্যার সময় বোম্বাই উপকূলে দাঁড়াইলে দেখিবে, আকাশে যেমন ধীরে ধীরে তারা ফোটে, বহুদিনের পুরাতন মধুর ভাবনাগুলি বুকের ভিতর যেমন ধীরে ধীরে আসে যায়, পার্শী রমণীরাও তেমনি ধীরে ধীরে সন্ধ্যার সময় সমুদ্র তীরে ফুটিয়া উঠেন। বোম্বাইবাসীর কার্য্য কুশলতা ও শিল্পকারিতা এদেশীয়ের পক্ষে প্রধান দেখিবার বস্তু তাহ'তে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহা পার্থিব দৃশ্য; বোম্বায়ের অপার্থিব দৃশ্য —সমুদ্র ও পার্শী রমণী।

পার্শীদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই এবং বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে।

Towers of Silence. পার্শীদিগের মৃতদেহের দাহ করা হয় না এবং কবর অর্থাৎ সমাধিও হয় না। ইঁহাদের মধ্যে মৃতদেহ ধ্বংস করা সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব নিয়ম আছে। বোম্বায়ের এক অংশের নাম "ম্যালাবার" গিরি। এই গিরি অন্তরীপের ন্যায় সমুদ্রের কিয়দ্দূরে প্রবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছে; উহার উপরে বড় বড় সাহেব ও বড় বড় ধনী লোকেরা বাস করেন। কলিকাতায় যেমন চৌরঙ্গী, বোম্বায়ের তেমনি "ম্যালাবার" গিরি। এই গিরির উপর যে সকল বাঙ্গালা আছে, তাহা অধিকাংশই দেশীয়দিগের, কিন্তু যাঁহাদের এই সকল বাঙ্গালা, তাঁহারা সহরের ভিতরে, খোঁজের ভিতর বাস করেন, আর তাঁহাদের এই সকল সুখের আশ্রমে বসিয়া বিদেশী ইংরাজেরা সুখ সচ্ছন্দতা উপভোগ করেন। কলিকাতায়ও এইরূপ; চৌরঙ্গীর বড় বড় বাটীগুলি যাঁহাদের, তাঁহারা সহরের ভিতর অপরিষ্কার পল্লীতে বাস করেন এবং ইন্দ্রভবনের ন্যায় চৌরঙ্গী সাহেবদের উপভোগের জন্য ছাড়িয়া দিয়াছেন। ম্যালাবার গিরির উপর হইতে, বোম্বায়ের দৃশ্য অতি চমৎকার। পূর্ব্বে যে তুলসী হ্রদের কথা বলিয়াছি, তাহা ইহারি উপরে। তুলসী হ্রদ ছাড়াইয়া কিয়দ্দূর গিয়াই, পার্শীদিগের Towers of Silence এই সকল দেখিতে ইউরোপের দেশ দেশান্তর হইতে লোক সমাগম হয়। ম্যালাবারের উপর প্রায় এক মাইল স্থান প্রাচীর বেষ্টিত, ইহার ভিতর ৫টি Towers আছে; তাহার চারিধারে উত্তম উদ্যানও আছে। Towers গুলির গঠন প্রকৃতি এইরূপ ;—পর্ব্বতের উপরে পাঁচটি কোয়া, প্রত্যেক কোয়ার চারিপার্শ্বে খোলা-

কার উচ্চ প্রাচীর ; প্রাচীর কোনটি দেড় তোলা, কোনটি দুই তোলা উচ্চ, ভিতর দেখা যায় না। প্রাচীরের উর্দ্ধভাগে ছাদ নাই—অনাবৃত। প্রত্যেক প্রাচীরের উপরে চারিধারে বিস্তর গৃধিনী সর্ব্বদা বসিয়া আছে। প্রাচীরের ভিতরে কোয়ার চতুষ্পার্শ্বে, তিনজন মানুষ শয়ন করিতে পারে, এতটা দীর্ঘ গোলাকৃতি স্থান আছে, এই স্থানটুকু তিন ভাগে বিভক্ত করা আছে। প্রত্যেক ভাগে চারিধারেই এক একটি মানুষ শয়ন করিবার উপযোগী স্থান বিভক্ত করা আছে। পার্শীদের পুরুষের মৃতদেহ প্রথম বিভাগে, অর্থাৎ বহির্দ্দেশ হইতে প্রাচীর মধ্যে প্রবেশ করিয়াই যে বিভাগ, তাহাতেই শায়িত করিয়া রাখা হয়, রমণীর মৃতদেহ, তাহার পরের বিভাগে স্থাপিত করা হয় এবং শিশুর মৃতদেহ তাহার পরে অর্থাৎ কোয়ার পার্শ্বেই যে বিভাগ, তাহাতে স্থাপন করা হয়। মৃতদেহ ইহার ভিতর স্থাপন করিয়া দ্বার বন্ধ করিতে না করিতে, প্রাচীরের উপরে যে সকল গৃধিনী বসিয়া আছে, তাহারা ভিতরে নামিয়া আসে এবং সেই সকব মৃতদেহ ছিন্ন করিয়া আহার করে। পরে অস্থি প্রভৃতি যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহা এই সকল Towers সংক্রান্ত লোক দ্বারায়, কূপের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হয়। Towersএর ভিতরে দর্শকের, কি মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বন্ধু, কাহারো প্রবেশ করিবার অনুমতি নাই। এই প্রাচীর বেষ্টিত গিরিখণ্ডের মধ্যে এক স্থানে মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দিগের উপাসনা গৃহ আছে এবং আর এক গৃহে বহুকাল রক্ষিত উপাস্য অগ্নিও স্থাপিত আছে। এই গৃহের ছিদ্র দিয়া উপাস্য অগ্নির কিরণ, এই সকল Towersএ পতিত হয়। এই Towers of Silenceএর এক স্থানে এক গৃহে কাষ্ঠ নির্ম্মিত ছোট একটি আদর্শ Tower আছে। Towers সংক্রান্ত প্রধান কর্ম্মচারী দর্শকদিগকে ইহাই দেখাইয়া, Towers এর বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিয়া থাকেন এবং এইরূপ সংকারের মর্ম্ম একখানি কাগজে ইংরাজিতে লেখা আছে, তাহাও দর্শকদিগকে পাঠ করিতে দেন। Towersএর তত্ত্বাবধারক দর্শককে সঙ্গে করিয়া অতি যত্ন সহকারে দেখাইয়া দেন এবং উহার সকল বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দেন। পার্শীরা কহেন যে মৃতদেহ দগ্ধ করিলে অথবা কবর দিলে, জগতের কোন উপকারী করা হইল না, গৃধিনীদিগকে আহার করিতে দিলে, তবুও জগতের এক শ্রেণী জীবের আহার্য্যের সহায়তা করা হইল।

আমাদের দেশে মৃত দেহের সৎকার করিবার লোকাভাব হইয়া উঠিতেছে। কোন গৃহস্থের বাটীতে কাহারো মৃত্যু হইলে, প্রতিবেশীর সহায়তা আজকাল সহজে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পার্শীদের মৃতদেহ, Towers of Silenceএ আনয়ন সম্বন্ধে অতি সুন্দর নিয়ম আছে। ইঁহাদের মধ্যে একটি কমিটি আছে, কমিটি হইতে বেতনভোগী বাহক আছে, পাড়ায় পাড়ায় নির্দিষ্ট বাহকের বন্দোবস্ত করা আছে। গৃহস্থের বাটীতে মৃত্যু উপস্থিত হইলেই, তিনি এই সকল বাহককে সংবাদ দিবেন, বাহকেরা গিয়া মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া চলিয়া যায়, বাহকেরা স্পর্শ করিয়া গেলে গৃহস্থের সে মৃতদেহ স্পর্শ করিবার আর অধিকার থাকে না। পরিবারবর্গের মৃতদেহের পার্শে বসিয়া জাতীয় প্রথা অনুসারে শোক তাপ বা উপাসনাদি করিবার জন্য, গৃহস্থের বাটীতে দেহ ২৪ ঘণ্টা স্থাপিত থাকে, তাহার পর বাহকেরা তাম্‌জামের ন্যায় এক শিবিকা করিয়া, মৃতদেহ এই Towersএ লইয়া আইসে। এই শিবিকার বহির্ভাগ কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু ভিতর দুগ্ধ ফেননিভ বস্ত্রাদিতে সুশোভিত। শবদেহও শুভ্রবর্ণ বস্ত্রে আবৃত করা হয়। এই শিবিকার পশ্চাতে পুরুষ আত্মীয় বান্ধবেরা, দুই দুই জনে দল বাঁধিয়া, সার দিয়া অনুগমন করেন। প্রত্যেক দলে, দুই জনে একখানি শ্বেতবর্ণ রুমাল, পরস্পরের মধ্যে ধারণ করিয়া চলে। Towers of Silenceএর ফটক ছাড়াইয়া গিরির উপর উঠিয়া, বিশ্রাম গৃহে শিবিকা স্থাপিত করে, তথায় উপাসনাদি হইলে বাহকেরা শিবিকা লইয়া যে কোন Towerএ স্থাপন করা হউক, তাহার ২০।৩০ ফিট দূরে দণ্ডায়মান হয়, আর এক দল বাহক আছে, ইহারা এই স্থান হইতে শিবিকা Towerএর ভিতর লইয়া যায়। এই বাহক দলের কেবল এই টুকুই বহন করিতে হয়। পূর্ব্বকথিত বাহকেরা Towerএর ভিতর প্রবেশ করিতে পারে না। তাহারা যে স্থান পর্য্যন্ত শিবিকা লইয়া যাইতে পারে, মৃত ব্যক্তির আত্ম বন্ধুরাও সেইখান পর্য্যন্ত গমন করিতে পারেন, তাহার অধিক অগ্রসর হওয়া নিষেধ। এইরূপ স্থানে sign বোর্ডে এইরূপ "নিষেধ বাক্য" লেখা আছে। Towersএর দ্বার, ভূমি হইতে প্রায় ৩ ফিট উর্দ্ধে, দরজা হইতে জমি পর্য্যন্ত ঢালু করিয়া দেওয়া আছে। দ্বিতীয় শ্রেণী-বাহকেরা শিবিকা লইয়া এই ঢালু স্থানের উপর দ্বারের চৌকাটে শিবিকা স্থাপিত করে

এবং মৃত দেহের মুখের আবরণ একবার খুলিয়া লয়, আত্ম বন্ধুরা দূর হইতে সেই সময়ে অভিবাদন করিয়া লয়, তখনি মৃতদেহ আবৃত করিয়া Towerএর ভিতর লইয়া যায় এবং তথায় দেহ বস্ত্রহীন করিয়া, পূর্ব্বকথিত মত এক একটি শয়ন স্থানে, স্থাপিত করিয়া আইসে। বস্ত্রহীন করিয়া দেওয়া হয়, তাহার কারণ, পার্শীরা কহেন যে মনুষ্য বিবস্ত্র হইয়া পৃথিবীতে আসিয়াছিল, তাহার বিবস্ত্র হইয়াই যাওয়া উচিত। মৃতদেহ স্থাপিত হইবার ঘণ্টা দুইয়ের মধ্যেই, গৃধিনীরা প্রায় সর্ব্বাঙ্গের মাংস ছিঁড়িয়া আহার করিয়া ফেলে অবশিষ্ট যাহা থাকে তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি কূপগর্ভে নিক্ষিপ্ত হয়। কূপে সকল সময় জল থাকে না; বর্ষার জল হইলে, অস্থির সঙ্গে যে একটু আধটু মাংস লাগিয়া থাকে, তাহাও ক্রমে খসিয়া পড়ে। এই সকল কূপের জল বাহিরে যাইবার নালা আছে, কিন্তু এ জল বিশুদ্ধ না হইলে মাতৃভূমি পৃথিবী বক্ষে পতিত হওয়া নিষিদ্ধ, এই জন্যই জল বর্হির্গমনের পথে, কয়লা এবং বালি দেওয়া আছে এবং এই জন্যই পার্শীরা তাঁহাদের এই সকল Towers পর্ব্বতের উপর এবং যে স্থানে পর্ব্বত নাই, তথায় কোন উচ্চ স্থানে নির্ম্মাণ করেন। এইরূপে মৃতদেহ কূপে নিক্ষেপ করিবার আরো এক উদ্দেশ্য ইঁহারা উল্লেখ করেন। ইহারা কহেন যে মৃত্যুর পর, কি ধনী কি নির্ধন সকলেরই অস্থি একস্থানে নিহিত করা হয়, তাহাতে তাহাদের এই শিক্ষা হয়, যে ধনী ও নির্ধনে প্রভেদ করিতে নাই, মনুষ্যেরা সকলেই সমান।

আমাদিগের জাতীয় চরিত্র।

২।

এলফিনষ্টোন বলিয়া গিয়াছেন, "আমাদিগের দেশের (ইংলণ্ডের) বড় বড় নগরের নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যেমন ভ্রষ্ট, হিন্দুজাতির মধ্যে সেরূপ ভ্রষ্ট নাই। সকল গ্রামের লোকেরাই প্রিয়দর্শন, পরিবারবর্গের প্রতি অনুরক্ত, শ্রেণী প্রতিবাসীগণের প্রতি সদয়, এবং অপর সাধারণের প্রতি সদ্ব্যবহার

করে। ঠগ এবং ডাকাইতদিগকে লইলেও ইংলণ্ড অপেক্ষা ভারতে কম অপরাধ ঘটে।”

অধ্যাপক ম্যাক্সমুলর বলেন, “হিন্দুদিগের সমস্ত সাহিত্যের মধ্যে সত্যের প্রতি ভালবাসার এবং সম্মানের জলন্ত নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়।” তিনি স্বীয় পরিচিত শিক্ষিত হিন্দুদিগের সম্বন্ধে বলেন, “আমি ইহা বলিতে বাধ্য হইতেছি যে, আমরা ইয়ুরোপ এবং আমেরিকায় যেরূপ দেখিতে পাই, তাঁহারা (শিক্ষিত হিন্দুগণ) তদপেক্ষা সত্যের প্রতি সম্মান প্রদর্শন এবং সমধিক মনুষ্যত্ব ও উদার ভাব প্রদর্শন করিয়া থাকেন।”

যাঁহারা ভারতে আসিয়াছেন, ভারতে বাস করিয়াছেন, ভারতীয়গণের সহিত আলাপ করিয়া করিয়া সমস্ত তথ্য জ্ঞাত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের মধ্যে কয়জনের মত পূর্ব্ব প্রবন্ধে এবং উপরে উদ্ধৃত করা গেল। এখন আমাদিগের বিরুদ্ধে যাহারা বলিয়াছেন, তাঁহাদিগের দুইজন প্রধান নেতার উক্তি অবশ্য এস্থলে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য।

জেমস্ মিলের নাম অনেকেই জানেন। তিনি স্বরচিত ব্রিটিস ভারতের ইতিহাস পুস্তকে হিন্দুজাতির সকল বিষয়েরই ভয়ানক নিন্দা করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি এক স্থলে চীনবাসীদিগের চরিত্রের সহিত হিন্দুদিগের চরিত্রের তুলনায় সমালোচনা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন, “উভয় জাতির আচার ব্যবহার এবং নৈতিক চরিত্রের প্রধান অঙ্গগুলির প্রবল সাদৃশ্য বিরাজমান। উভয় জাতিই সমতুল্য রূপে, সমান পরিমাণে অসরলতা, শঠতা, প্রতারণা, এবং মিথ্যাবাদিতারূপ পাপ সমূহে এরূপ কলঙ্কিত যে, তাহা অসভ্য সমাজকেও পরাজিত করে। উভয় জাতিই আপনাদিগের যে কোন বিষয় সম্বন্ধে অতিরিক্ত বর্ণনা করিতে ভাল বাসে; উভয় জাতিই ভীরু, এবং নির্ব্বোধ। উভয় জাতিই নিতান্ত আত্মম্ভরি, এবং অপরের প্রতি ঘৃণা প্রকাশকারী। উভয় জাতির শরীর এবং আবাস নিতান্ত ঘৃণ্যরূপে অপরিষ্কার।”

মিলের মনের ভাব উক্ত কয়টী কথায় অতি সুন্দররূপে প্রকাশ পায় নাই কি?

তাহার পর আমাদিগের পরম বন্ধু লর্ড মেকলে, বাঙ্গালী জাতি সম্বন্ধে

যাহা বলিয়া গিয়াছেন, শিক্ষিত বাঙ্গালী মাত্রেই যদিও তাহা জানেন, তথাপি প্রয়োজন বোধে এখানে দুই এক কথার উল্লেখ করা আবশ্যক। লর্ড মেকলে, ক্লাইবের জীবনী লিখিতে গিয়া বলিয়াছেন, "বাঙ্গালী যাহা কিছু করে, তাহা নিতান্ত অবসন্নভাবে করিয়া থাকে। আলস্যই তাহাদিগের প্রিয় অবলম্বনীয়। বাঙ্গালী শারীরিক শ্রমসাধ্য কোন কাজ করিতে চাহে না এবং যদিও বিবাদকালে খুব বাক্‌পটুতা দেখাইয়া থাকে, কিন্তু প্রায়ই তাহারা ব্যক্তিগত যুদ্ধে লিপ্ত হয় না এবং প্রায়ই সর্ব্বদা সৈন্যদল ভুক্ত হয় না। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমস্ত সৈন্যদলের মধ্যে একশতটী খাঁটী বাঙ্গালী আছে কি না, আমরা এমত সন্দেহ করি। বাঙ্গালীরা স্বভাব চরিত্র দ্বারা বিজাতীয়দিগের অধীনে থাকিতে এত দূর সম্পূর্ণ উপযুক্ত যে, জগতে এরূপ কোন জাতিই কোন কালে ছিল না।"

লর্ড মেকলে, আর এক স্থলে কেবল বাঙ্গালী জাতি নহে, সমগ্র ভারতবাসীকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন, "তিনি (লর্ড ক্লাইব) জানিতেন যে, ইংলণ্ডে সুনীতির যে, উচ্চ সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহার সহিত ভারতীয়দিগের নৈতিক চরিত্রের অসীম পার্থক্য বিরাজমান। তিনি জানিতেন যে, ইয়ুরোপে যাহাকে আত্ম সম্মান বলে, সেই আত্ম সম্মান বোধ হীন লোকদিগের সহিত এবং যে সকল লোক কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া প্রতিজ্ঞা করে, কিছুমাত্র লজ্জিত না হইয়া প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে এবং যে সকল লোক আপনাদিগের উদ্দেশ্য পূরণ জন্য অবাধে প্রবঞ্চনা, প্রতারণা, জালিয়াতি এবং মিথ্যার আশ্রয় লয়, তাহাদিগকে লইয়া কাজ করিতে হইবে।"

এখন মিল এবং মেকলের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের এক জন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজপুরুষ কি বলিয়া গিয়াছেন তাহা দেখা যাউক। বিখ্যাত বাগ্মী বর্কের নাম সকলেই জানেন। তিনি ওয়ারেণ হেষ্টিংসের স্মরণীয় বিচার কালে এক স্থলে বলিয়াছেন, "এই জাতির অর্থাৎ হিন্দুজাতির দোষ থাকিতে পারে, কিন্তু এই যে, জাতি তাহাদিগের সমাজনীতি এবং বিধি প্রণালী আমাদিগের (ইংরাজদিগের) সে দিনকার উৎপত্তির বহু বর্ষ পূর্ব্বে সৃষ্টি করিয়াছে, ঈশ্বর না করুন, আমাদিগকে সেই জাতির উপর মন্তব্য প্রকাশ করিতে না হয়। হিন্দুদিগের স্বভাবে দোষ এবং বিধি প্রণালীতে ভ্রম থাকি-

লেও তাহাদিগের সমাজবিধি, যাহা তাহাদিগের স্বভাবের উপর প্রবলভাবে প্রভুত্ব করিতেছে, সেই সমাজ বিধির দুইটী মূল গুণ থাকায়, তজ্জন্য তাহাদিগকে সম্মানের পাত্র করিয়াছে—প্রথমটী সেই সমাজ বিধির প্রবল শক্তি ও দৃঢ় স্থায়িত্ব এবং দ্বিতীয়টী উৎকৃষ্ট নৈতিক সুফল-জনকতা।"

এখন বর্কের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের আর একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ খ্যাতনামা শাসনকর্ত্তা মিঃ হলোযেল কি বলিয়া গিয়াছেন দেখা যাউক। তিনি বাঙ্গালার বিভিন্ন জেলার বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া শেষ বর্দ্ধমান জেলার লোকদিগের সম্বন্ধে বলেন, "সত্য বলিতে কি, এই সুখী প্রজা-দিগকে উৎপীড়িত করা নিতান্ত নিষ্ঠুরতাজনক হইবে, কারণ এই জেলাটীই প্রাচীন হিন্দুশাসনের সৌন্দর্য্য, পবিত্রতা, দয়া, সুনিয়ম, মমতা, এবং ন্যায় বিচারের নিদর্শনস্বরূপ বিরাজমান। এ'খন কাহাকেও লোকের ধন সম্পত্তি এবং শরীরের প্রতি আদৌ হস্তক্ষেপ করিতে দেখা যায় না। এখানে প্রকাশ্যে বা গোপনে আদৌ চুরির কথা শুনা যায় না। পর্য্যটক, বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাইলে, বা না লইয়া যাইলেও, তাহাকে আশু রক্ষণাধীনে লওয়া হয় অর্থাৎ তাহার রক্ষার জন্য বিনা ব্যয়ে প্রহরী নিযুক্ত করিয়া এক গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয়। ইহার দ্বারা জানা যাইতেছে যে, তাহাকে বাসা দান এবং তাহার ধনাদি নিরাপদে রক্ষা করিবার সমস্ত ব্যবস্থা করা হয়। এক গ্রাম পার হইয়া, তাহাকে অন্য গ্রামে লইয়া গিয়া ভদ্রতার সহিত অন্য প্রহরীর রক্ষণাধীনে অর্পণ করা হয়। প্রথম প্রহরী সেই পর্য্যটকের প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তাহা পর্য্যটকের মুখে শুনিয়া, তাহা একখানি কাগজে লিখিয়া, তৎসহ পর্য্যটকের দ্রব্যাদির এক খানি প্রাপ্তিস্বীকারপত্র প্রথম প্রহরীকে দিয়া, দ্বিতীয় প্রহরী তাহাকে বিদায় দান করে। সেই কাগজ ও প্রাপ্তিপত্রখানি প্রথম গ্রামের অধ্যক্ষের হস্তে দেওয়া হয়। তিনি তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া নিয়মিতরূপে রাজার নিকট পাঠাইয়া দেন। যদি এই বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে কাহারও কিছু হারাইয়া যায়, তাহা হইলে যে ব্যক্তি তাহা প্রাপ্ত হয়, সে তাহা নিকটবর্ত্তী বৃক্ষের উপর ঝুলাইয়া রাখিয়া নিকটবর্ত্তী থানায় তাহা জানায়। থানার অধ্যক্ষ

অবিলম্বে ঢোলের দ্বারা ঢেঁঢরা দিয়া, সেই বিষয়টী সকলকে জ্ঞাত করেন এবং যাঁহার দ্রব্য, তিনি আসিয়া লইয়া যান।”

এখন মিল মেকলের উক্তির সহিত আপনারা হলোয়েলের উক্তি মিলাইয়া দেখুন। অবশ্যই বুঝিতে পারিবেন, প্রথম দুই ব্যক্তি অনভিজ্ঞতা, এবং বিদ্বেষ বুদ্ধির বশম্বদ হইয়া বিষাক্ত উক্তি উদ্গীরণ করিয়াছেন কি না? মিলের ইতিহাসখানি আমাদিগের পরম বন্ধু হোরেস হেমান উইলসনের দ্বারা সম্পাদিত। সন্তোষের বিষয় যে, মুখের মত প্রতিষেধক ঔষধ তিনি ইতিহাসের প্রত্যেক গলিত পূতিগন্ধবিশিষ্ট স্থলে সংলিপ্ত করিয়া দিয়াছেন। উইলসনের দুই একটা কথা এখানে উদ্ধৃত করা কর্ত্তব্য।

সকলেই জানেন, উইলসন কলিকাতায় বাস করিতেন, বাঙ্গালী জাতির সকল শ্রেণীর সহিত মিশিতেন, সুতরাং বাঙ্গালী চরিত্র সম্বন্ধে তাঁহার যেরূপ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছিল, মিল্ মেকলের সেরূপ ছিল না, ইহা অভ্রান্ত সত্য। উইলসন উচ্চ শ্রেণীর বাঙ্গালীদিগের সম্বন্ধে লেখেন, “বিশুদ্ধ সত্য আচরণ এবং বিস্তৃত অভিজ্ঞান শক্তি, উদার ভাব এবং স্বাধীন নীতিকৃতির জন্য তাহারা জগতের যে কোন দেশে ভদ্রলোক বলিয়া গণ্য হইতে পারেন। এই শ্রেণীর কয়েক জনের সহিত আমার বন্ধুতা হইয়াছে, এবং আশা করি যে, আজীবন আমি সেই বন্ধুতা রাখিতে পারিব।”

বাঙ্গালার পণ্ডিতমণ্ডলীর চরিত্র সম্বন্ধে তিনি লেখেন “আমি ইহাঁদিগের মধ্যে সেইমত শ্রমশীলতা, বুদ্ধিমত্তা, সন্তোষ এবং সরলতা দেখিতে পাই।”

কলিকাতা মিণ্টের নিম্নশ্রেণীর শ্রমজীবী, কারিকর প্রভৃতির সহিত কার্য্যসূত্রে প্রত্যহ উইলসনের সাক্ষাৎ হইত। তিনি সেই নিম্নশ্রেণীর বাঙ্গালী সম্বন্ধে বলেন, “আমি সর্ব্বদাই তাহাদিগের মধ্যে সানন্দে শ্রমশীল, উপরিতন প্রভুদিগের আজ্ঞা পালনে সতত তৎপর, এবং যে কোন শ্রমসাধ্য কার্য্যে অগ্রসর দেখিতে পাই। তাহাদিগের মধ্যে মদ্যপানে উন্মত্ততা, কুৎসিত আচরণ এবং অবাধ্যতা দেখিতে পাই না।”

এখন মিল মেকলের উক্তির বিরুদ্ধে আমাদিগকে আর অধিক প্রমাণ হাজির করিতে হইবে না। এখন আমরা কবিবর ভারতচন্দ্রের একটী উক্তি

স্মরণ করিয়া, মিল মেকলেকে এই স্থলেই হাস্যের সহিত বিদায় দিতে পারি।

এখন আমাদিগের জাতির বর্ত্তমান চরিত্রগত অবস্থা সম্বন্ধে দুই চারি কথা বলিয়া প্রসঙ্গের উপসংহার করিতে হইবে। আমাদিগের জাতীয় চরিত্রের বর্ত্তমান অব... ...বর অপেক্ষা আমরা নিজে অবশ্য অধিক জানি।

বিধির বিধানে ব্রিটি... ...বীন ভাবের নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। কত... আঁধারের পর এখন ব্রিটিস শাসনে উন্নতি সুখ শ... ...বে প্রাচ্যগগণে দেখা দিয়াছে। আমরা এখন সন্ধিস্থ... ...মরা এখন অতীতের অনেকগুলি বিষয়কে বিদায় দিয়া, ... ভাব, নবীন শিক্ষা, নবীন রুচি, নবীন কল্পনা, নবীন ... ...লঙ্গন দান করিতেছি। পাশ্চাত্য শিক্ষার সহিত প্রাপ্য জ্ঞা... উদ্বাহ সাধিত হইয়াছে, আমরা তাহার শুভ ফল প্রত্যাশী, ...রা এখন নবীন মূর্ত্তিতে নবীন স্ফূর্ত্তিতে, নবীন উৎসাহে, নবীন উদ্যমে, জগতের সমক্ষে দণ্ডায়মান হইয়াছি। আমরা ভীরু, শঠ, প্রবঞ্চক, জালিয়াত, মিথ্যাবাদী, কাপুরুষ, দুর্ব্বল এবং সাহসহীন—এখনও উদয়াস্ত এই কথাগুলি আমাদিগের কাণে প্রবেশ করিতেছে। প্রত্যহ প্রভাতে উঠিয়াই ইংরাজ সম্পাদিত দৈনিকপত্রে আমাদিগের জাতির শ্রাদ্ধের মন্ত্র পাঠ করিতে পাই। যাঁহারা ঐ কথাগুলি সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহারা আমাদিগের বিশেষণগুলি প্রদান করিয়া জগতের সমক্ষে আমাদিগের পরিচয় দান করিয়াছেন, তাঁহারা এখনও পূর্ব্বের সঙ্গে মিল রাখিবার জন্য সুর টানিয়া আসিতেছেন। জানি না কবে, তাঁহারা নীরব হইবেন।

ঢাকুর সমালোচনা।

কায়স্থ জাতির ক্ষত্রি .য সমাজের ইতিহাস লিখিয়াছেন। গ্রন্থব .র লিখিত আছে যে, বারেন্দ্র কায়স্থ সমা ,, নরদাস ঠাকুর ও মুরারী দেব বাকী ইঁহারা .নব সময় সাময়িক। গ্রন্থকার বলেন যে "বারেন্দ্র সংস্থাপন কারীগণ যে বল্লালের সমসাময়িক নহেন, ত নাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।" গ্রন্থকার এই স্থলে ভৃগুর অধঃস্তন যরমাত্র উল্লেখ করিয়া একটী গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা করিতে ইয়াছেন। গ্রন্থকার ভৃগুর অধঃস্তন চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ের উল্লেখ করে। ও আমরা ভৃগুর সমসাময়িক অন্যান্য ব্যক্তিগণের পর্য্যায়ের যে হিসাব সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাতে বর্ত্তমান পর্য্যায়ের উর্দ্ধে ১৬। ১৭ পর্য্যায়ের নামের তালিকা পাইয়াছি। কিন্তু তাহাতেও ভৃগুর সমকালীয় ব্যক্তিগণের নাম পাই নাই। গ্রন্থকার কিরূপ উপায়ে, ভৃগুর বংশের বর্ত্তমান শেষ পর্য্যায়ের উর্দ্ধে ভৃগুকে সংস্থাপন করিলেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। বরং এই বিষয়ে ভৃগুর বংশীয় কতিপয় প্রাচীন ব্যক্তির নিকট হইতে আমরা প্রতিবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। আর গ্রন্থকারের অবলম্বিত পদ্য ঢাকুরে আছে যে,—

চতুর্ব্বিংশতি পুরুষ ভৃগু অবধি করিয়া।
উত্তম মধ্যম কার্য্য যাইছে চলিয়া॥

গ্রন্থকার এ কথার বাদ প্রতিবাদ কিছুই করিলেন না কেন?

আমাদিগের গ্রন্থকার শৌলকুপ ও নন্দীগ্রামকে বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত নহে, বলিয়া একটী গুরুতর ভ্রমের কারণ করিয়াছেন। বরেন্দ্রভূমির ইতিহাস অনুসন্ধান করিতে যাইয়া, ঐ সকল স্থান যে বরেন্দ্র ভূমির মধ্যগত তাহা আমরা বিলক্ষণ রূপে অবগত হইয়াছি। আমরা অনুমান করি যে বল্লাল

ষেনের উৎপীড়ন ভয়েই, সম্ভবত ভৃগুনন্দী সর্ব্ব প্রথমে বরেন্দ্র ভূমির মধ্যগত নন্দীগ্রাম নামক স্থানে বাস করেন। এই সময় বরেন্দ্র ভূমিতে, পালবংশীয় রাজাদিগের রাজত্বের শেষাবস্থা। সুতরাং বল্লালসেনের পূর্ণ অধিকার না থাকাই সম্ভব। কারণ মহীপাল ও কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভূস্বামিগণ সেই সময় প্রতাপ সম্পন্ন ছিলেন। সুবিজ্ঞ রাজা (ডাক্তার) রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কনিংহাম সাহেব বিশিষ্ট-হেতুর দ্বারা এই কথা সপ্রমাণ করিয়াছেন।

আমরা এই ক্ষণ গোত্র ও প্রবর সম্বন্ধে গ্রন্থের অপরার্দ্ধ ভাগ আলোচনা করিব। বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে যে কয়েকটী বংশ আছেন, তাহার মধ্যে নন্দীবংশের কাশ্যপ গোত্র ও কাশ্যপ, অপ্সার ও নৈধ্রুব এই তিন প্রবর। চাকীবংশের গৌতম গোত্র ও গৌতম, আঙ্গীরস, বার্হস্পত্য, অপ্সার ও নৈধ্রুব এই পঞ্চপ্রবর। সিংহ বংশের বাৎস্য গোত্র ও নাগ বংশের সমান প্রবর। এই স্থলে বলিয়া রাখা কর্ত্তব্য যে কোন কোন দেববংশ নন্দীবংশের সহিত সমান গোত্র।

গ্রন্থকার বলেন যে "গোত্র শব্দে বাস্তবিক আদি পুরুষ বুঝায় এবং ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কোন জাতির গোত্র প্রবর্ত্তক নাই; ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রাদির গোত্র পুরোহিত সম্পর্কেই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। আর্য্য ধর্ম্ম শাস্ত্রের এই বাক্য আমরাও অবনত মস্তকে স্বীকার করি।

সমান গোত্রে ও সমান প্রবরে অর্থাৎ সমান বংশে বিবাহ করা আর্য্যধর্ম্ম শাস্ত্রের মত নহে। ইহার কারণ অনেকেই অনুমান করেন, যে একইবংশের স্ত্রী পুরুষ দ্বারায় সন্তান উৎপন্ন হইলে, তাহারা হীনবল ও ক্ষীণমনা হইয়া থাকে। গ্রন্থকার ইহাতে আপত্তি করিয়া বলেন, "ইতিহাস পুরাণাদিতে দেখা যায়, বহুকাল যাবত ক্ষত্রিয় জাতি সবংশ বিবাহ করিয়া আসিয়াছেন অথচ তাঁহাদিগের মধ্যেই অধিকাংশই শৌর্য্য বীর্য্যশালী বীর পুরুষ এবং সেরূপ বীর-পুরুষ ব্রাহ্মণ জাতিতে নাই।" গ্রন্থকার শাস্ত্রবিদ্ ও পণ্ডিত। ইতিহাস ও পুরাণাদি বিলোড়ন করিলে তিনি পরিজ্ঞাত হইবেন, যে সময় ক্ষত্রিয়গণের মধ্যে সবংশ বিবাহ প্রথার পূর্ণ প্রসারণ হইয়াছিল, তখন তাহাদিগের বাস্তবিক গৌরবের সময় নহে। যদুবংশ প্রভৃতি মামাতু পিসাতু ভাই ভগিনীতে ও পাণ্ডবেরা এক পত্নীতে *উপগত ছিলেন। ইহার কি কোনই মন্দ ফল

তাঁহাদিগের বংশধরগণ লাভ করেন নাই? বাস্তবিক ক্ষত্রিয়গণ এই সময় হইতেই ক্ষীণ বীর্য্য, হীন বল ও অল্পায়ু অপত্য উৎপাদন করিয়াছেন।

সবংশবিবাহ যে দূষণীয় তাহা উনবিংশ শতাব্দীর বিদ্যাভিমানী জার্ম্মন জাতিগণ সম্প্রতি উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইতেছেন। জার্ম্মণ রাজবংশীয় ব্যক্তিগণ যে হীনমনাদি হইয়া থাকেন তাহার কারণ, জর্ম্মাণ শারীর তত্ত্ববিদেরাও সবংশ বিবাহকেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু এই গুরুতর বিষয় সম্বন্ধে বহু কাল পূর্ব্বে সর্ব্বলোক দর্শী ত্রিকালজ্ঞ আর্য্য শারীরতত্ত্ববিদ্ মহর্ষিগণ বলিয়াছেন—

অতুল্য গোত্রাং বৃষ্যাঞ্চ প্রহৃষ্টাং নিরুপদ্রবাং।
শুদ্ধস্নাতাং ব্রজেন্নারীমপত্যার্থী নিরাময়ঃ॥

চরক-সংহিতা।

অতুল্য গোত্রা, বৃষ্যা, প্রহৃষ্টা ও শুদ্ধস্নাতা নারীতে গমন করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। অবশ্য ইহার কারণ এই যে, বৃষ্যা প্রহৃষ্টাদি নহে, এরূপ নারীতে গমন করিলে পুরুষ দুর্ব্বল ও সন্তান হীনবল ও ক্ষীণ মস্তিষ্ক সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহা হইলে, তুল্য গোত্রাও যে ঐ ফল প্রসব করে, তাহা বরং অধিকতর যুক্তি সঙ্গত। অপিচ সবংশ বিবাহ করিবার নিয়মে ব্যাভিচারাদি অন্যরূপ অনর্থও ঘটে, এজন্যও বিপ্রগণ উহা পরিবর্জ্জন করিয়াছেন। যাহাই হউক, বিশাল আর্য্যধর্ম্ম-শাস্ত্র যাহাকে নিষিদ্ধ বলেন, তৎসম্বন্ধে ভ্রম প্রতিপাদন করিতে অগ্রসর হওয়া আমাদিগের পক্ষে ধৃষ্টতামাত্র। যাঁহারা পাশ্চাত্য জ্ঞান তরঙ্গে দোলায়মান, তাঁহারা বুঝিতে পারিবেন যে, উনবিংশ শতাব্দীর আচার্য্য জার্ম্মণ বা 'শর্ম্মণগণ' কি বলিতেছেন।

গ্রন্থকার বলেন যে সগোত্র বিবাহ ব্রাহ্মণের পক্ষেই সর্ব্বথা নিষিদ্ধ। কেন না, ব্রাহ্মণের গোত্র ও বংশ অভিন্ন ও এক। ক্ষত্রিয় বৈশ্যের সেরূপ নহে। সুতরাং ইহাদিগের সগোত্র বিবাহ নিষিদ্ধ নহে। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয়, মনু ও শাতাতপ বচনে দ্বিজাতি শব্দের উল্লেখ দৃষ্টে, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য সম্বন্ধে উক্তরূপ বিবাহ নিষিদ্ধ বলিয়াছেন। ইহার মতে কেবল শূদ্রের সগোত্র বিবাহ দূষণীয় নহে। কিন্তু সপিণ্ড ও সমানোদক সম্বন্ধে দ্বিজাতি ও শূদ্রের কোন বিশেষ নাই।

বঙ্গীয় স্মার্ত্তদিগের মতে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি নাই। কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও পাতিত্য নিবন্ধন শূদ্রবৎ ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছেন। কিন্তু তাহা হইলেও, কায়স্থগণ আর্য্যবংশীয় নিবন্ধন, শূদ্রের ন্যায় সপিণ্ড ও সমানোদক বর্জ্জন করিয়া সবংশ বিবাহ কোন দিনই করেন না এবং এইরূপ বিবাহ যে সর্ব্বথা দূষণীয় তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে, আমাদিগের গ্রন্থকার আর্য্য অভিমানী হইয়াও সবংশবিবাহ সম্বন্ধে স্বীয় মত ব্যক্ত করিয়াছেন। এই মত পরিব্যক্ত করায়, তিনি কেবল স্বকীয় সমাজে নহেন,সমগ্র কায়স্থ সমাজেই নিন্দিত হইয়াছেন।

বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে বহুকাল যাবৎ সবংশ বিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। বিপ্র জাতির অনুকরণে যে ইঁহারা ঐরূপ প্রথা পরিহার করেন, তাহাতে গ্রন্থকারের আস্থা নাই। তিনি বলেন "ব্রাহ্মণ জাতির অনুকরণ করিলে কেবল সগোত্র নহে সমান প্রবর বিবাহও দূষণীয় হয়। * * * চাকী ও নন্দীবংশের অপ্সার ও নৈধ্রুব প্রবর সমান, বিশেষত নাগ ও সিংহ বংশ ভিন্ন গোত্র হইলেও সমান প্রবর। * * * বারেন্দ্র কায়স্থগণ সগোত্র বিবাহ করিবেন না কিন্তু সমান প্রবর বিবাহ করিবেন, ইহা শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়েরই অনুমোদিত নহে। পরন্তু কোন কোন দেববংশ কাশ্যপ গোত্র আছেন। ইহাদিগের সহিত নন্দীবংশের কন্যা পুত্রের আদান প্রদান হইতেছে। এ স্থলে সগোত্র বিবাহ হইতেছে। শাস্ত্র ও যুক্তি অনুসারে এরূপ দূষণীয় নহে। অসপিণ্ড ও অসমানোদক স্থলে উভয় নন্দীবংশেও বৈবাহিক ক্রিয়া দূষণীয় হয় না।" গ্রন্থকার এই স্থলে স্বীয় বিচক্ষণতা ও পাণ্ডিত্য মলিন করিয়াছেন, এজন্য আমরা দুঃখিত হইলাম। বিপ্র স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্যের আসন অধিকার পূর্ব্বক গুরুতর ব্যবস্থা প্রদান করত তিনি যে প্রগল্ভতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা লজ্জার বিষয় বটে। তিনি সপিণ্ড ও সমানোদক স্থলটী বাদ না দিয়া জার্ম্মণি বা স্কন্দনেবিয়'ন আর্য্যগণের অনুবর্ত্তী হইলেই পারিতেন। ফলে তিনি স্বকীয় ব্যবস্থার অনুগামী হইতে পারেন, কিন্তু তদীয় সমাজ তাহা কখনই গ্রহণ করিবেন না।

অনেকে কায়স্থগণকে বর্ণসঙ্কর রূপে প্রতিপাদন করেন। তাঁহাদিগের উক্ত রূপ সিদ্ধান্ত যে ভ্রান্তিমূলক ও বিদ্বেষজনক তাহা নিরপেক্ষ ভাবে পুরা-

পাদি শাস্ত্রের আলোচনা করিলেই প্রতীয়মান হয়। কায়স্থগণ বর্ণসঙ্কর হই-লেও আর্য্যত্ব নিবন্ধন, এস্থলেও সবংশ বিবাহ করিবার অধিকারী নহেন। আরো একটী কথা এই যে, বঙ্গদেশে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র ভিন্ন জাতি প্রথমাবস্থায় না থাকায় শূদ্রবৎ শাসনাধীন জন্য যে কায়স্থগণ ক্ষত্রিয়ত্ব বা আর্য্যত্ব নষ্ট করিয়া সবংশ বিবাহ করিবেন ইহাও কোনরূপে সঙ্গত সিদ্ধান্ত নহে!

বারেন্দ্র কায়স্থ-সমাজ মধ্যে চাকী ও নন্দীবংশের সমান প্রবর অথবা কোন দেববংশের সহিত নন্দীবংশের সমান গোত্র কিম্বা নাগ ও সিংহবংশের সমান প্রবর থাকিলেও, ইঁহাদিগের বংশ কখনই এক নহে। এই সকল বংশ কর্ত্তার নাম স্বতন্ত্র এবং ব্যক্তিও স্বতন্ত্র ছিলেন। সুতরাং পূর্ব্বরূপ সমান গোত্র বা সমান প্রবর, ইহাদিগের মধ্যে যে বৈবাহিক ক্রিয়া চলিয়া আসিতেছে, তাহা, যে সমান বংশে হয়, একথা কখনই বলা যাইতে পারে না এবং এই জন্যই ঐরূপ ভাবে উক্ত সমাজে কন্যা পুত্রের আদান প্রদান বহুকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। উত্তরকালে, সমান গোত্রীয় কিন্তু বংশে পৃথক, অথচ এক ঔপাধিক কতিপয় ঘর ঐ সমাজে প্রবেশ লাভ করে। এমত স্থলে, ঐ সকল ঘর বংশে যে পৃথক, সামাজিকগণ ইহার বিশদ প্রমাণ না পাওয়া হেতু সমান গোত্রীয় ও এক ঔপাধিক ব্যক্তিগণের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করেন না। এইরূপ ব্যবহারে সামাজিকগণের দূরদর্শিতা ও আর্য্যত্বাভিমানের সবিশেষ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুতরাং আমা-দিগের গ্রন্থকার, বারেন্দ্র কায়স্থ সমাজে সবংশ বিবাহ প্রথা আছে বলিয়া যে বাক্য উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। উক্ত সমাজে রূপরায় নামক এক ব্যক্তি সবংশ বিবাহ করিয়া হীন হইয়াছিলেন। পদ্য ঢাকুর রূপ রায়ের অপকার্য্যের উল্লেখ করিয়া, তাহার অপর ভ্রাতাগণের আচরণ যে শ্রেষ্ঠ তাহা বর্ণন করিয়াছেন। ইহা ব্যতীত সামাজিক জনশ্রুতিও ঐ কথা সপ্রমাণ করে। পূর্ব্বকথিত ভাবে সগোত্র বিবাহ উক্ত সমাজে প্রচলিত থাকায় ঢাকুরে লিখিত "সগোত্র বিবাহ" দ্বারায় সবংশবিবাহই প্রমাণিত হইতেছে। ব্যক্তি বিশেষের কোন সামাজিক কুকীর্ত্তিই, যে কোন চেষ্টাতেও কখনই বিদূরিত হয় না। স্মৃতি তরঙ্গে যাহা উদ্বেলিত হয়, সমাজ মারুতে যাহা বহমান, তাহাকে বিনাশ করিবার আশা করা অসঙ্গত। গ্রন্থকার সদাচারকেই

আর্য্যত্বের কারণ এবং এই সদাচার যে আর্য্যাবর্ত্তের ব্রাহ্মণগণের নিকট শিক্ষণীয়, ইহা উল্লেখ করা সত্বেও যে বংশ-বিবাহ রূপ অসদাচরণের পোষকতা করিয়াছেন, তাহাতে আমরা দুঃখিত।

গ্রন্থকার দাস বংশের বিবরণের টীকাতে, দাস শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া স্বীয় তত্বজ্ঞতার পরিচয় প্রদান করত, যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ হইলাম। ইহার দ্বারায় শাস্ত্রের মর্ম্ম পরিস্ফুট ও সাধারণের ভ্রম অপসারিত হইবেক। গ্রন্থকার বলেন সামাজিক কায়স্থগণ ক্ষত্রিয় হইলেও বঙ্গবাস নিবন্ধন শূদ্রবৎ দাসোপাধি প্রাপ্ত এবং ক্ষত্রিয়ের সংস্কার বর্জ্জিত হইয়াছেন। শূদ্রের দাসোপাধি নিমিত্ত জাতি মাত্রেই দাস্য পরায়ণ নহে। ঋগ্বেদের দাস শব্দের অর্থ শত্রু এবং দাস শব্দ কখনই শূদ্র পরিচায়ক নহে।

পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মত এই যে আর্য্যগণ অন্যত্র হইতে আসিয়া ভারতে উপনিবেশী হয়েন। কিন্তু বিশাল হিন্দুশাস্ত্রে একথার কোন বিন্দু বিসর্গ দৃষ্টিগোচর হয় না। আমাদিগেরও মত এই যে আর্য্যজাতি আর্য্যাবর্ত্তেই জাত এবং আর্য্যত্ব ঐ স্থানেই প্রসূত হইয়াছে। আর্য্যগণ অন্যত্র হইতে আসিয়া ভারতের উপনিবেশী হয়েন, এই অসার ও আজগবী মতের দ্বারা যাঁহাদিগের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, তাঁহারা সমালোচ্য গ্রন্থকারের এই স্থলটী পাঠ করিলে অবশ্যই শিক্ষা লাভ করিয়া প্রকৃতিস্থ হইবেন। কি পরিতাপের বিষয়! আমরা স্বকীয় শাস্ত্রের আলোচনা না করিয়া, বৈদেশিকের অমৌলিক ও ভ্রান্ত মতের অনুসরণ করিতেছি। আমরাও গ্রন্থকারের সহিত বলিতেছি, যে বৈদিক জনগণই আর্য্য এবং ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশই যে আর্য্যজাতির আদি নিবাস স্থান, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

শ্রীকৃষ্ণচরণ মজুমদার।
বরেন্দ্রভূমি।

বৃন্দাবন।

চৈত্র, ১২৯৫।

আমরা রাত্রিশেষ মথুরা ষ্টেসনে পৌঁছিলাম। মথুরা হইতে বৃন্দাবন তিন ক্রোশ। একখানি ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বৃন্দাবন চলিলাম। তখনও প্রভাত হয় নাই; বন, ঝোপ, অট্টালিকাতে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে। ষ্টেসন মথুরার পূর্ব্ব প্রান্তে; বৃন্দাবন যাইতে হইলে সমস্ত সহর ভেদ করিয়া পশ্চিমাভিমুখে যাইতে হয়। সেই অন্ধকারে আমরা অট্টালিকা পরিপূর্ণ মথুরার মধ্য দিয়া চলিলাম। কিছুই দেখিতে পাইতেছি না, যেন কেবল অন্ধকার স্তূপ সকল শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দুই পার্শ্বে দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গাড়ী যে কতবার দিক্ পরিবর্ত্তন করিল অর্থাৎ নূতন রাস্তায় প্রবেশ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। শকট চালকের পার্শ্বস্থিত ব্রজবাসী মহারাজ মধ্যে মধ্যে আমাদিগকে স্থান বিশেষের পরিচয় দিতেছিলেন, কিন্তু সে অন্ধকারে কৌতূহল বৃদ্ধি ভিন্ন তাহাতে আমাদের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। যাহা হউক, সময়ে সময়ে অতি মধুর ধ্বনি আমাদের শ্রুতিগোচর হইতেছিল। স্ত্রীলোকেরা রাত্রিশেষে উঠিয়া গম, যব, দানা ভাঙ্গিতেছে এবং শ্রমলাঘব করিবার জন্য সেই মধুর স্বরে গলা মিলাইয়া গান ধরিয়াছে। সহর প্রায় নিস্তব্ধ; আমরা আগন্তুক বাঙ্গালী পরম কৌতূহলী; আমাদের অদ্ভুত আনন্দের উদ্রেক হইয়াছিল।

মথুরা ছাড়িয়া আসিলে, রাত্রি প্রভাত হইল। সম্মুখে কতকগুলি গরুর গাড়ী দেখিতে পাইলাম। আহা গরুগুলির কিবা রূপ। সুপুষ্ট দেহ, সুন্দর কান্তি, চর্ম্ম অতি মসৃণ, গলায় এক একটী ঘণ্টা বাঁধা। গাড়ীগুলিও ঠিক আমাদের দেশের ন্যায় নহে। চাকাগুলি আরও মজবুত, গাড়ীগুলি দ্বিগুণ ভার ধারণে সক্ষম। গরু সংযুক্ত করিবার প্রণালীও অন্যরূপ। দুইটী তিনটী চারিটী গরুও কোন গাড়ীতে সংযুক্ত রহিয়াছে। তাহারা অনায়াসে সারথি এবং তাঁহার রথস্থিত গুরুভার স্কন্ধে লইয়া মৃদুমন্দ গতিতে ঝুণুঝুণু

শব্দ করিয়া বৃন্দাবনের দিকে চলিয়া যাইতেছে। আমরা মুহূর্ত্ত মধ্যে গাড়ী গুলি ছাড়াইয়া চলিলাম।

ক্রমে বৃন্দাবনের নিকটবর্ত্তী হইলাম। প্রথমেই পথের বাম দিকে জয়পুরের মহারাজার 'মধোবিলাস' নামক দেবমন্দির প্রস্তুত হইতেছে দেখিলাম। পরে বৃন্দাবনের চিরপরিচিত বানরগুলি দেখা দিলেন। তাঁহাদের খর্ব্বাকৃতি বক্তিমাবর্ণ মুখ এবং বিদেশীদের সহিত কৌতুকপ্রিয়তা সকলেই জানেন। তখনও সূর্য্যোদয় হয় নাই। প্রভাতে অন্ধকার বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু সূর্য্যের প্রখর রশ্মি দেখা দেয় নাই। সূর্য্য কিরণের মহৎ দোষ এই যে, ইহা ভাল মন্দ উভয়ই স্পষ্ট ভাবে, চক্ষুর সম্মুখে ধরিয়া দেয়। কিন্তু সে দিন প্রভাতে সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে, কুৎসিত বস্তুও ঐন্দ্রজালিক রূপে নয়ন গোচর হইয়াছিল। আমরা কিছুই কুৎসিত দেখিতে পাই নাই, সকলই যেন মনোহর। কোন অপার্থিব শক্তি যেন রাত্রিকালে যেখানে যাহা কুৎসিত ছিল, স্থানান্তরিত করিয়া গিয়াছে। এইরূপ সময়ে, চিত্রপটস্থ ছবিখানির ন্যায় বৃন্দাবন ধাম গাড়ী হইতে আমাদের নয়ন গোচর হইল। কি চক্ষে বৃন্দাবন দেখিলাম বলিতে পারি না! অট্টালিকার পর অট্টালিকা, ছাদের উপর ছাদ, মাঝে মাঝে এক একটী দেব মন্দিরের চূড়া। চূড়াগুলি কোনটী শ্বেত, কোনটী লাল; গঠন প্রণালীও আমাদের দেশ হইতে বিভিন্ন। বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে আমরা সহরে প্রবেশ করিলাম। সম্মুখেই তৃণাচ্ছাদিত একটী ক্ষুদ্র ময়দান, চতুর্দ্দিকে বিবিধ অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। পশ্চিমে গোবিন্দ জীউর ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লাল মন্দির, উত্তরে শেঠজীর মন্দির, আরও উত্তরে লালাবাবুর মন্দির। শেঠজীর মন্দিরের মধ্যস্থলে সুবর্ণ স্তম্ভ দেখা যাইতেছে। দক্ষিণ পূর্ব্ব কোণে শেঠজীর বাগান, ঠিক দক্ষিণে বৃন্দাবনের বাৎসরিক মেলার গৃহাদি নির্ম্মিত হইতেছে। আমাদের দক্ষিণ পার্শ্বে পুলিষ এবং বামে সহরের অভ্যন্তরে যাইবার সুপ্রস্তত পথ। ঐ পথ দিয়া আমরা সহরে চলিলাম।

বৃন্দাবন স্থানটী ক্ষুদ্র, কিন্তু ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার অনেক আছে। 'বৃন্দাবন' নামটিতেই শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত লীলার কথা জড়িত হইয়া রহিয়াছে। লীলা মনে পড়িলেই বৃন্দাবন মনে পড়ে, বৃন্দাবন মনে পড়িলেই লীলা মনে পড়ে। আর বৈষ্ণব ধর্ম্মে যে সকল মধুর ভাব আছে, অন্য কোথাও না

হউক, বৃন্দাবনে তাহাদের জলন্ত দৃষ্টান্ত দেখিতে পাইব, আমরা এইরূপ আশা করিয়া থাকি। আমরা মনে করি বৃন্দাবন প্রেম, ভক্তি ও আনন্দময়। কুটি-লতা, নিরানন্দ সেখানে স্থান পায় না। কিয়ৎ পরিমাণে এ আশা আমাদের ফলবতী হইয়াছিল।

এখানে লোকে জীবহিংসা করে না। যে দিন হউক, আপনি দেখিবেন, যমুনার তীরে অসংখ্য কচ্ছপ দুটা চানার আশায় ঘাটে আসিয়া জমিয়াছে। আমরা কেশীঘাটের উত্তরে নৌসেতুর নিকটে, জলের ধারে চানা ছড়াইয়া দিলাম, কচ্ছপেরা দল বাঁধিয়া মৃত্তিকার উপর উঠিয়া, আমাদের নিকট চানা খাইতে লাগিল। আমাদিগকে দেখিয়া অণুমাত্র ভীত হইল না। মনুষ্যেরা যে হিংসাপ্রিয়, কচ্ছপ মারিয়া থাকে, তাহাদের আদৌ এ সংস্কার নাই। বাঙ্গালায় পুষ্করণীর মধ্যস্থলে কোন কচ্ছপ জলমধ্য হইতে গ্রীবা উত্তোলন করিলে, দূরে মনুষ্য দেখিয়াই ডুব দেয়। বাঙ্গালায় কচ্ছপ ধরিবার জন্য কত কৌশল করিতে হয়। নদী তীরে গর্ত্ত করিয়া তন্মধ্যে ব্যাধ লুক্কায়িত থাকে এবং তথা হইতে একটী সূত্র জল পর্য্যন্ত অলক্ষ্য ভাবে রাখিয়া দেয়। কচ্ছপ ঐ সূত্রস্থ ফাঁদে পড়িলে তাহাকে টানিয়া তুলিয়া ফেলে। আমাদের যদি কচ্ছপ ধরিবার ইচ্ছা থাকিত, সে দিন বিনা ফাঁদে অনেক কচ্ছপ ধরিতে পারিতাম।

বৃন্দাবনবাসী কোন পরিচিত ভদ্রলোক বলিলেন চড়াই পাখীরা বৃন্দাবনে অসঙ্কোচে গৃহমধ্যে আসে এবং রুটীর টুকরা লইয়া যায়। তাহারাও বৃন্দা-বনে মনুষ্যের ক্রুর স্বভাবের পরিচয় পায় নাই। এমন দেখা গিয়াছে, কোন ব্রজবাসী, বাড়ীতে সর্প বাহির হইলে না মারিয়া দূরে ছাড়িয়া দিয়া গিয়াছেন।

বৃন্দাবনে অতি নীচ জাতীয় হিন্দুরাও মৎস্য মাংস স্পর্শ করে না। শুনিলাম সহরের বহির্ভাগে দুই এক ঘর মুসলমান বাস করেন, তাঁহারা আবশ্যক হইলে মথুরা হইতে মৎস্য মাংস লইয়া আসেন। একজন নাবিক আমাকে বলিয়াছিল, বৃন্দাবনে কেহ জালফেলা ব্যবসায় করে না। সময়ে সময়ে বৃন্দাবনে বানরেরা অতিশয় উপদ্রব করে। বানরকুল ধ্বংস করিবার চেষ্টাও হইয়াছিল, কিন্তু ব্রজবাসীরা এরূপ জীব হত্যার একান্ত বিরোধী হওয়ায় তাহা স্থগিত হইয়াছে। গবর্ণমেণ্টও লোকের এই অহিংসা প্রবৃত্তি

পোষণ করেন। মথুরা হইতে বৃন্দাবন আসিবার পথে, একখণ্ড প্রস্তরে রাজাজ্ঞা ঘোষিত হইয়া রহিয়াছে। ইংরেজ সৈনিক পুরুষেরা বড় শীকার প্রিয়, সেই জন্য আজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে, যদি কোন সৈনিক পুরুষ বৃন্দাবন অথবা চতুঃপার্শ্বস্থ গ্রামে কোন পশু পক্ষী গুলি করিয়া মারেন, তিনি আইনানুসারে দণ্ডনীয় হইবেন *। শুনিলাম মথুরায় একজন মাজিষ্ট্রেট ছিলেন, সংসর্গ গুণে তাঁহার চিত্ত এতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, তিনি মৎস্য মাংসাহার একেবারে ত্যাগ করিয়াছিলেন। একালে এরূপ হিংসা বিরত স্থান আছে ভাবিতেও বিস্ময় হয়। মনে হয়, এই কারণে, বৃন্দাবন অপেক্ষা পুণ্য স্থান পৃথিবীতে আর নাই। বৃন্দাবন বড়ই আনন্দের স্থান। এখানে দশটার সময় চাপকান আঁটিয়া কেরাণী বাবু আফিস্ যাইতেছেন, অন্নচিন্তার সেই ভয়ানক দৃশ্য দেখিতে হয় না †। মথুরা ব্রজমণ্ডলের রাজধানী, আফিসাদি সমস্তই সেইখানে। সাধারণত বৃন্দাবনে তিন শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায়। ব্রজবাসী, প্রবাসী ও যাত্রী। ব্রজবাসীরা চাকরী করেন না। দেশ

* স্বর্গীয় রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুরের চেষ্টায়, এই নিয়ম প্রচারিত হইয়াছে। নবজীবন সম্পাদক।

† লেখক ভক্তির চক্ষে শ্রীবৃন্দাবন ধাম সন্দর্শন ও সমালোচন করিয়াছেন, তাঁহার ভক্তিবাদের আংশিক প্রতিবাদও আপাত দৃষ্টিতে পাষণ্ডকৃতি বলিয়া প্রতীয়মান হইবে, ইহা জানিয়াও আমরা লেখকের বর্ণনার এক অংশের প্রতিবাদে প্রবৃত্ত হইলাম। ভক্তি সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য সন্দর্শন করেন, প্রীতির অশ্রুপাত করেন। করুণা কোথাও কোথাও দেখিতে পান—দুঃখ, তিনি সেই স্থলেই ঘুরিয়া বেড়ান, আর দয়ার অশ্রুপাত করিতে থাকেন। দুই জনের এইরূপ বিভিন্ন প্রকৃতি হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে কিছুমাত্র বিরোধ নাই; পরন্তু করুণা ভক্তির নিতান্ত অনুগতা দাসী। ভক্তিও করুণাকে সহচরী রূপে ভগিনী ভাবে গ্রহণ করেন। আমরা যখন শ্রীবৃন্দাবন ধাম দর্শন করি, তখন ভক্তি সহচরী করুণা আমাদিগকে যাহা দেখাইয়া ছিলেন, তাহা সেই সময়ে আমরা সংবাদ পত্রে বলিয়াছিলাম, এখনও বলিতেছি;—

"এখানে স্ত্রীলোকের ভাগই অধিক। তাহাদের বৃত্তির বন্দোবস্ত নাই, অন্ন কষ্ট বিলক্ষণ আছে। পাঁচ সের গোম ভাঙ্গিলে দুপয়সা পায়; কোন কোন সবল স্ত্রীলোক সমস্ত দিবসে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত খাটিয়া দশ সের ভাঙ্গিতে পারে। মাসে ২ টাকা দিলে, কোন ছত্র হইতে ভোগ পায়। দাতার ইচ্ছার বিপরীতে এখানে ভোগ সচরাচর বিক্রীত হইয়া থাকে!

বিদেশ হইতে যাত্রী লইয়া আসেন, তাঁহাদিগকে বাসা দেন, ঠাকুর দর্শন করান এবং তজ্জন্য দক্ষিণা লয়েন। দক্ষিণা সম্বন্ধে বিশেষ জুলুম দেখিলাম না। তবে গয়ালীদের অনুকরণে ইহাঁরাও 'সফল" দিতে আরম্ভ করিয়াছেন। এবং তদুপলক্ষে দুটাকা আদায়ও করেন। সুতরাং ব্রজবাসীরা বেশ সুখে আছেন। প্রবাসীদিগকে দুই দলে বিভক্ত করা যাইতে পারে। এক দলের দেশ হইতে টাকা আসে, অপর দলে ভিক্ষা করেন। সেখানে ভিক্ষুকের তত লাঞ্ছনা নাই, এক টুকরা রুটী অনেক বাড়ীতে মিলে। অনেক অনাথা বৃদ্ধা স্ত্রীলোক একবারে কোন কুঞ্জে কিছু টাকা দিয়া রাখেন, সেইখানেই তাঁহারা

বৈষ্ণব সমাজের কর্ত্তা নাই নতুবা এগুলির শীঘ্র প্রতিবিধান করা যাইতে পারে।" [১৮৭৭ সাল ১২ই জানুয়ারি, শ্রীধাম হইতে লিখিত এবং ঐ সালের ২১শে জানুয়ারির সাধারণীতে ভ্রমণকারীর পত্রে প্রকাশিত।]

পূর্ব্বে যাহা সংক্ষেপে বলিয়াছিলাম, এখন তাহা বিস্তারে বলিতেছি।

আমি মধ্য ভারত, দাক্ষিণাত্য, উড়িষ্যা, অযোধ্যা প্রদেশ এবং খাস পঞ্জাব দেখি নাই, বঙ্গ, বেহার, উত্তর পশ্চিম, এবং রাজপুতানার অনেক গ্রাম নগর পল্লী দেখিয়াছি। অন্য কোন জনাকীর্ণ জনপদে বা লোক বিরল পল্লীতে, শ্রীবৃন্দাবনের মত প্রাত্যাহিক অন্ন কষ্ট আমি দেখি নাই। কেহ বা বৈষ্ণব ধর্ম্মের আন্তরিক আকর্ষণে, কেহ বা যৌবনের অপবিত্রতা প্রৌঢ় বয়সে ক্ষালনার্থ, নানা কারণে, শত শত দুঃখিনী বাঙ্গালিনী, দুই শত, এক শত টাকা লইয়া শ্রীবৃন্দাবনে বাস করিতে যায়। আছেও। কিন্তু তাহাদের অধিকাংশ পথের কাঙ্গালিনী। ভণ্ড আখড়াধারীরা তাহাদের সর্ব্বস্ব প্রথমে গচ্ছিত রাখিয়া পরে, অপহরণ করে। এ সকল কেবল শুনা কথা নহে। আমরা বৃন্দাবন ধামে তিন দিবসমাত্র বাস করিয়াছিলাম, তাহারই মধ্যে চুচঁড়ার দেপাড়ার ঐরূপ অবস্থাপন্ন দুইটি স্ত্রীলোক আমাদিগকে চিনিতে পারিয়া নিতান্ত কাতরভাবে, তাহাদের দুর্দশার কথা আমাদিগকে বলে, আমরা মঠধারীকে নানাভাবে বুলিয়া কহিয়া স্ত্রীলোকদের ন্যস্ত বস্তুর অধিকাংশ উদ্ধার করত তাঁহাদিগকে অধিকতর বিশ্বাস যোগ্য কুঞ্জে রাখিয়া দিয়াছিলাম। এই কার্য্যের জন্য কাজেই কিছু অনুসন্ধান করিতে হইয়াছিল, সেই অনুসন্ধানের ফলই বলিতেছি।

যে সকল অভাগিনী আখড়া ধারীদের বা অন্য কাহারও প্রতারণায় পথের কাঙ্গালিনী হয়, তাহাদের জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য শ্রীবৃন্দাবন ধামে দ্বিবিধ উপায় মাত্র আছে। (১) ঐ গোম ভাঙ্গা। (২) মাধুকরী বৃত্তি। লেখক বলিয়াছেন, "সেখানে (বৃন্দাবনে) ভিক্ষুকের তত লাঞ্ছনা নাই, এক

প্রসাদ পান, ভিক্ষা করিতে হয় না। প্রবাসীদের ঠাকুর দর্শন করা এবং ভজন সাধন করাই প্রধান কার্য্য। প্রত্যহ প্রাতে ও বৈকালে দেখিতে পাইবেন, অসংখ্য নরনারী পরিক্রমণ অর্থাৎ দেব দর্শনে বহির্গত হইয়াছেন। তাঁহাদের হস্তে হরিনামের থলি, সর্ব্বাঙ্গে তিলক এবং গাত্রে লুই অথবা মোটা চাদর। প্রবাসীদের মধ্যে বাঙ্গালী স্ত্রীলোক অনেক। যাত্রীরা কিছুদিন থাকে, আনন্দ করে, দেশে ফিরিয়া যায়।

ব্রজবাসীদের আনন্দের অভাব নাই। হোলির পূর্ব্ব কয়েক দিন দেখিলাম, ব্রজবাসীরা দলে দলে সং সাজিয়া বাহির হইয়াছেন। একজন পাদ্রী সাহেব সাজিয়া সঙ্গীসহ ধর্ম্ম প্রচার করিতেছেন। অপরে বিবিধ বেশ ভূষা

টুকরা রুটি অনেক বাড়ীতে মিলে।" প্রাত্যাহিক নিয়মিত ভিক্ষুকের পক্ষে জীবন ধারণ জন্য এইরূপ রুটিকা(খণ্ড সংগ্রহ অপেক্ষা আর অধিক লাঞ্ছনা হইতে পারে না। যে রুটীর অন্ততঃ চারি খানা না খাইলে একরূপ ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেই রুটি খানাকে ৩০।৪০ টুকরা করা হয়, এবং তাহাই ভিক্ষা দেওয়া হয়। সুতরাং অন্যূন দেড় শত কুঞ্জ ভ্রমণ না করিলে, আর জীবন ধারণের উপযোগী আহার্য্য সঞ্চয় হয় না। তাহাও কিছু নিকটানিকটি বাড়ীতে ঘুরিলে মিলিবে না। ১নম্বর কুঞ্জ হইতে ভিক্ষুক রুটী টুকরা লইল; দেখিল, ২।৩।৪ নম্বরে ভিক্ষুকের মহা ভীড়; তাহাদের সকলের পশ্চাতে লইতে গেলে সময় থাকে না। কাজেই তাহাকে ৫নং কুঞ্জে যাইতে হইল। এইরূপে দেড় শত কুঞ্জে ভিক্ষার জন্য সহস্র কুঞ্জের পথ পরিক্রমণ করিতে হইবে; তবেই সমস্ত বৃন্দাবন পরিক্রম অর্থাৎ ৫।৬ ক্রোশ পথ পর্য্যটন করিতে হইবে। দুর্ব্বল বাঙ্গালিনীদের পক্ষে প্রত্যহ এই রূপ লাঞ্ছনা কি ভয়ঙ্কর, এখন মনে করুন। আমি বঙ্গদেশের অতি প্রসিদ্ধ দানশীলা মহারাণীর কুঞ্জে অবস্থান করিয়া প্রত্যহ অন্তত দুই শত কাঙ্গালিনীকে অন্ন কষ্টে কাঁদিতে দেখিয়াছি। এই দারুণ দারিদ্রের, আংশিক প্রতীকার করণোদ্দেশে তাঁহার তাৎকালিক প্রধান কর্ম্মচারীকে সেই সমন্ধে জানাইয়াছিলাম ' কোন প্রতীকার হয় নাই।

এক্ষণে ভক্তিমান্ ভাগবতবৃন্দ ভক্তি সহচরী করুণার কাতর কণ্ঠরব শুনিয়া শ্রীধামের এই দারুণ দারিদ্রের প্রতীকারার্থ একটু চেষ্টা করিলেই অনেক সুবিধা হইতে পারে; প্রথম কার্য্য—প্রসাদ বিক্রয় বন্দ করা। নতুবা এখন যেরূপ দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে অন্ন কষ্টের প্রপীড়নে ও প্রসারণে ভক্তির প্রধান পাট টলমল করিতেছে; রসেশ্বরের রাসমণ্ডল ক্ষুধাতুরের উষ্ণ অশ্রুপাতে এবং অস্ফুট হাহাধ্বনিতে—সম্পূর্ণ বিভীষিকাময়! হরি হে তোমার ইচ্ছা!

নবজীবন সম্পাদক।

করিয়া দল বাঁধিয়া নৃত্য গীত করিয়া বেড়াইতেছেন। সকলেই যেন সদানন্দ; হোলির দিন ব্রজবাসীদের আনন্দের সীমা নাই। প্রতি গৃহস্থ বাড়ীতেই, স্ত্রীলোকেরা নৃত্যগীত করিতেছে, তাঁহাদের মধুর কণ্ঠধ্বনি দূর হইতে শুনা যাইতেছে। লাল ফাকে পথ লাল হইয়া গিয়াছে, কোন পথিকেরই অব্যাহতি নাই। শুনিলাম এই উপলক্ষে অনেক কুরীতি প্রচলিত আছে, সৌভাগ্য ক্রমে কিছুই আমাদের চক্ষে পড়ে নাই।

হোলির সময় শেঠেদের মেলা হয়। এই সময় বৃন্দাবনের বাৎসরিক মেলাও হয়। অনেক লোকে আসিয়া থাকে। প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রে শেঠেদের ঠাকুর রঙ্গলাল জীউ মন্দির হইতে শেঠেদের উদ্যানে মহাসমারোহে গমন করেন এবং কিছুক্ষণ পরে ফিরিয়া আসেন। ঠাকুর প্রত্যহ নূতন যানে গমন করেন। কয়েক দিন রাত্রে অনেক টাকার বাজীও পুড়িয়া থাকে। বৃন্দাবনে ঝুলনেই সর্ব্বাপেক্ষা আমোদ হয়।

বৃন্দাবন বড় আনন্দের স্থান, সেখানে জীবহিংসা নাই, ইহাতে মনে করিবেন না, বৃন্দাবনে কোন পাপ নাই। ততদূর আত্মসংযমের ক্ষমতা মনুষ্যের আর নাই। অধিকন্তু বৃন্দাবনের ব্যভিচারের কথা শুনিলে সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠে। কিন্তু এত সুন্দর জিনিষ থাকিতে আমাদের পাপের দিকে দৃষ্টি করার আবশ্যক কি? একটী বাঙ্গালী যুবকের সহিত আমাদের আলাপ হইয়াছিল, তিনি বৃন্দাবনের পাপের খবর অনেক রাখেন, কিন্তু বৃন্দাবনের একটীও সৌন্দর্য্য তিনি দেখিতে পান নাই; মনুষ্যের রুচি বিভিন্ন।

কিছুদিন পশ্চিমে ভ্রমণ করিলেই সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে বোধ হয় আমাদের একটু মতান্তর উপস্থিত হয়। পশ্চিমে পুরুষদের লম্বাকৃতি, প্রশস্ত বক্ষঃস্থল এবং তেজোসম্পন্ন মুখশ্রী দেখিলে, তাঁহাদিগকে যেন বল বীর্য্যের আধার বলিয়া মনে হয়। পুরুষের মুখশ্রীতে মধুরতার সহিত তেজোভাবের যোগ না হইলে, যে যথার্থ সুন্দর দেখায় না, এই সকল স্থান ভ্রমণে আমাদের তাহা উপলব্ধি হয়। বাঙ্গালার কোন সুন্দর পুরুষের মুখশ্রীতে যেন কেবলই মধুরতা; মধুরতায় যেন তাঁহার পুরুষত্বের লোপ করিয়াছে। আর পশ্চিমে স্ত্রীলোকের মুখশ্রীতে কেমন কোমলতার সহিত দৃঢ়তা মিশিয়াছে। প্রস্ফুটিত পদ্মটী কোমলতার আদর্শ। কোমলতা মধুরতা ভিন্ন তাহাতে আর কিছুই নাই। আর কিছুই

থাকিবার আবশ্যকও নাই। কারণ সেটী পুষ্প, পুষ্পটী যথার্থই সুন্দর। কিন্তু মনুষ্যের রক্ত মাংসের শরীর, কেবল কোমলতা থাকিলে সুন্দর দেখাইবে কেন? রক্তমাংসে বল উৎপন্ন করে, মনুষ্য শরীরে বলেরও চিহ্ন চাই। স্ত্রী অপেক্ষা পুরুষ বলীয়ান্, পুরুষের শ্রীতে বল অথবা তেজের স্ফূর্ত্তি পাওয়া আবশ্যক। স্ত্রী, পুরুষ অপেক্ষা হীন বল, কিন্তু পুষ্প নহে। স্ত্রী শরীরেও কিছু দৃঢ়তার পরিচয় আবশ্যক। সেই জন্য কৃশাঙ্গিনীকে আমাদের তত ভাল লাগে না। বাঙ্গালার স্ত্রীলোকদিগের কোমলতা অতিশয় হওয়াতে, যেন দোষে পরিণত হইয়াছে। বৃন্দাবনে পুরুষেরা যে সুন্দর, একথা বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহাদের অনেকেই বলিষ্ঠ। ব্রজমায়ীরা গৌরাঙ্গী, স্থূলাঙ্গী ও লাবণ্যময়ী। তাঁহাদের পায়ে মোটা মল, হাতে কঙ্কণ, পরিধানে কোর্ত্তা ও ঘাঘরী, তদুপরি একখানি ওড়না বদনমণ্ডল ও গাত্র আবরণ করিয়া রহিয়াছে। আমাদের দেশে যদিও কোর্ত্তা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, কিন্তু তাহা 'বডি' রূপে পরিণত হইয়া বিলাস সামগ্রী হইয়াছেমাত্র। যতদিন কোর্ত্তা অবশ্য পরিধেয় মধ্যে পরিগণিত না হইবে, ততদিন এইরূপ অপব্যবহার হইবারই সম্ভাবনা। ঐ বেশে ব্রজমায়ীদিগকে মন্দ দেখায় না, কিন্তু এত পোষাকের বোঝা বহন করিতে বাঙ্গালী স্ত্রীলোকেরা অক্ষম। ব্রজমায়ীদিগকে দুই তিনটী জলপূর্ণ কলস মস্তকে করিয়া যাইতে দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পদতলে নূপুর বাজিতেছে, তাঁহারা স্থির মস্তকে কোন দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া, ওড়নায় মস্তক আবৃত করিয়া গম্ভীরভাবে চলিয়া যাইতেছেন। ভার-জনিত ক্লেশের কোন লক্ষণই নাই।

শুনিলাম নববধূরা শাশুড়ী ঠাকুরানীর সম্মুখেও নৃত্যগীত করিতে লজ্জা বোধ করেন না, কিন্তু গুরু জনের সমক্ষে বদন অনাবৃত করিতে ও আহার করিতে তাঁহাদের বিশেষ আপত্তি। ইংরেজেরা যেরূপই ভাবুন, স্ত্রীলোক-দিগকে গুরু জনের সম্মুখে আহার করিতে দেখিলে আমাদের চক্ষুঃশূল হয়। স্ত্রীসুলভ নম্রতার বিরোধী কার্য্য বলিয়া মনে হয়। হোলির দিবস অনেক স্ত্রীলোককে দল বাঁধিয়া ফাক্ ছড়াইয়া রাজপথে গান করিয়া বেড়াইতে দেখিলাম। দুই একটী প্রাচীনা ভিন্ন সকলেরই মুখ অবগুণ্ঠন দ্বারা আবৃত। একদিন মথুরায় কতকগুলি স্ত্রীলোক শস্যের বোঝা মাথায় করিয়া, সন্ধ্যাকালে

ঠিক গোধূলি লগ্নে মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছিল, তাহারা মনের আনন্দে মধুর স্বরে গান ধরিয়াছিল। একে সন্ধ্যাকাল, তাহাতে এই অভিনব দৃশ্য। আমাদের মনেও আনন্দের উচ্ছ্বাস উঠিল। গানটী কি বুঝিতে পারিলাম না, কিন্তু সে স্বর এখনও আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হইতেছে।

আর এক কারণে নব্য বৃন্দাবন অতি মনোহর হইয়াছে। ইহাকে প্রাসাদ পুরী বলা যাইতে পারে। যত হিন্দু রাজা আছেন, প্রায় সকলেই বৃন্দাবনে একটী কুঞ্জ অথবা মঠ স্থাপনা করিয়াছেন। সেখানে প্রত্যহ ঠাকুরের সেবা হয় এবং অতিথি অভ্যাগতেরা প্রসাদ পায়। রাজারা কেহই মঠ নির্ম্মাণ সম্বন্ধে সাধ্যানুসারে ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হয়েন নাই এবং দৈনিক সেবারও যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছেন। বৃন্দাবন রাজা মহারাজাদের কীর্ত্তি স্থান।

বৃন্দাবনের পথগুলি পাথরের। কলিকাতায় যেরূপ কুচা পাথর দিয়া পথ বাঁধান হয়, সেখানেও তাহাই, কিন্তু গাড়ী ঘোড়া বেশী না থাকায় এত কাদা হয় না। ২।১টী পথ পাথরের ইট দিয়া বাঁধান। বৃন্দাবনে মিউনিসিপালিটী আছে, কিন্তু শুনিলাম গৃহস্থকে মিউনিসিপাল টেক্স দিতে হয় না। আমদানি দ্রব্যজাত কর হইতে মিউনিসিপালিটীর খরচ চলে। বাঙ্গালার ন্যায় বৃন্দাবনে খড়ের চাল নাই। দরিদ্র লোকেরা মৃত্তিকার প্রাচীর দিয়া, তাহার উপর কাষ্ঠ বিছাইয়া, মৃত্তিকার ছাদ তৈয়ার করিয়া ঘর করিয়াছে। মাটীর ঘরের সংখ্যা বৃন্দাবনে অতি অল্প। সহরের ভিতরে আদৌ নাই।

আপনি যদিও তীর্থযাত্রী না হয়েন, একবার বৃন্দাবনে যাইলে আপনার দর্শনস্পৃহা অনেকটা তৃপ্ত হইবে। আমরা বাঙ্গালী, সামান্য গৃহে বাস করি, আমাদের পক্ষে সে মঠগুলি যে কি অপূর্ব্ব সামগ্রী তাহা আর কি বলিব! আপনি যে রাস্তায় যাইবেন, কোন মহারাজার একটী কুঞ্জ দেখিতে পাইবেন। সম্মুখেই উচ্চ দরজা। দরজার উপরেই নহবৎখানা। নহবৎখানাগুলি সমস্তই এক রকমের। যেন তিনখানি প্রকাণ্ড চতুর্দ্দোল পাশাপাশি সাজান রহিয়াছে। দরজার নিম্নদেশ হইতে, নহবৎখানার উপর পর্য্যন্ত কারুকার্য্যে পরিপূর্ণ। ভাস্কর বুঝি দেব সেবার জন্য তাঁহার সমস্ত বিদ্যা বুদ্ধি খরচ করিয়াছেন। কোথাও ফুলগুলি ফুটিয়াছে, পুষ্প পত্রগুলি গণনা করা যাইতেছে। কোথাও

ফুলগুলি অর্দ্ধ বিকশিত হইয়া আপন ভরে নিম্নমুখ হইয়া রহিয়াছে। দরজা দিয়া প্রবেশ করিয়াই প্রস্তর দিয়া বাঁধান প্রাঙ্গণ। তাহার চতুর্দ্দিকে ঘর। কোন কুঞ্জের প্রাঙ্গনে নাটমন্দিরও আছে। তাহার সম্মুখেই ঠাকুরঘর। সমস্তই কারুকার্য্য মণ্ডিত। একটী কুঞ্জে কাল ও সাদা প্রস্তরের কয়েকটী ক্ষুদ্র হস্তী ও ময়ূর দেখিয়া পরিতৃপ্ত হইলাম। গোয়ালিয়রের মহারাজা তাঁহার গুরুজীর নিমিত্ত একটী কুঞ্জ করিয়া দিয়াছেন, সেটীও অতি সুন্দর।

শেঠেদের মঠ সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ। শেঠেদের মথুরায় বাস; ইঁহাদের অতুল ঐশ্বর্য্য। গুরুর উপদেশানুসারে এই মঠ প্রস্তুত করিয়াছেন। মঠে রঙ্গলাল জীউর সেবা আছে। মঠে প্রবেশ করিতে চারিটা দরজা। পূর্ব্ব মুখ হইয়া প্রথম দরজায় প্রবেশ করিতে হইলে, বাম দিকে একটী রথ রহিয়াছে দেখিতে পাইবেন। প্রথম দরজার উপরে নহবৎখানা নাই। ফটক দিয়া প্রবেশ করিলেই দুই পার্শ্বে অনেক গুলি ঘর দেখিবেন। দ্বিতীয় ফটকটী অতিশয় উচ্চ, উপরের নহবৎখানাটিও বিচিত্র। তাহার পর তৃতীয় ফটক। ইহার উপর নহবৎখানা নাই। রথের চূড়ার ন্যায় একটী অতি উচ্চ চূড়া, দেখিলে বৌদ্ধ কারখানা বলিয়া ভ্রম হয়; ইহাকে গোপোদা বলে। তৃতীয় ফটকের সম্মুখেই চতুর্থ দরজা, ইহার চূড়াও তৃতীয় দরজার ন্যায়। তৃতীয় দরজা পার হইয়া আপনি চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতে পারেন। দেখিবেন দুই পার্শ্বেই প্রাচীর, একটী বাহিরের প্রাচীর, অপরটী চতুর্থ দরজার সহিত সংলগ্ন ভিতরের প্রাচীর। এই প্রাচীর দ্বারা ঠাকুর বাড়ীকে বহির্বাটীর সহিত পৃথক্ করা হইয়াছে। মন্দিরের পূর্ব্বদিকে, এই দুই প্রাচীরের মধ্যে, একটী প্রস্তর-দ্বারা-বাঁধান পুষ্করণী ও একটী বাগান আছে। বোধ হয় রাসের সময় রঙ্গলাল জীউর এই পুষ্করিণীতে নৌকা বিহার হইয়া থাকে। পশ্চিম মুখ হইয়া ঠাকুর বাড়ীতে প্রবেশ করিলেই সম্মুখে সুবর্ণস্তম্ভ দেখিতে পাইবেন। স্তম্ভটী মন্দিরের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে, দেড়তালা সমান উচ্চ হইবে। একটী তাল গাছের ন্যায় মোটা। ভিতরে কাষ্ঠ, উপরে স্বর্ণের পাত দ্বারা মণ্ডিত। লোকে ইহাকে সোণার তালগাছ বলে। স্তম্ভটীতে অনেক টাকার সোণা লাগিয়াছে। স্তম্ভের সম্মুখেই নাটমন্দির এবং তাহার সহিত সংলগ্ন রঙ্গলাল জীউর মন্দির। শেঠজীর মঠ প্রস্তুত করিতে বোধ হয় একটী গোটা পাহাড়

লাগিয়াছে। বাহির হইতে এই মঠের চূড়াগুলি ও স্বর্ণস্তম্ভ দেখিতে অতি সুন্দর। শেঠেদের মন্দিরের নিকটেই লালাবাবুর মন্দির। মন্দিরের চূড়াটী অতি উচ্চ। মন্দিরস্থ বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণজী ৩। ৪ বৎসরের শিশুর ন্যায় উচ্চ হইবেন। এখানে সেবার উত্তম বন্দোবস্ত আছে। মন্দিরটী যমুনা পুলিনের সন্নিকট।

নূতনের মধ্যে আর দেখিবার উপযুক্ত 'সা'জীর মন্দির। দরজাটী অতি উচ্চ এবং নূতন ধরণের। এই মন্দিরের অভ্যন্তর অতি সুন্দর শ্বেত ও কাল মর্ম্মর প্রস্তর দ্বারা বাঁধান। থামগুলি শ্বেত মর্ম্মর প্রস্তরের, স্ক্রুর ন্যায় বক্রোকৃতি হইয়া উর্দ্ধে উঠিয়াছে। মন্দিরের দেয়ালে কয়েকটী মূর্ত্তি আছে। প্রথম দেখিলেই মনে হয়, মূর্ত্তিগুলি চিত্রিত, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কাল এবং অন্যান্য বর্ণের প্রস্তর সন্নিবেশিত করিয়া এই সকল মূর্ত্তি অঙ্কিত হইয়াছে। বর্ত্তমান সাজী লক্ষ্ণৌয়ের বড়ই একজন ধনী মহাজন।

পুরাতনের মধ্যে মদনমোহনের পুরাতন মন্দির এবং গোবিন্দজীর লাল মন্দির বিশেষ দ্রষ্টব্য। মদনমোহনের মন্দির সহরের দক্ষিণ পশ্চিম প্রান্তে, যমুনার সন্নিকট। শুনিলাম একজন বণিক, তাঁহার মানস পূর্ণ হওয়ায় এই মন্দিরটী প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। মন্দিরটী লাল প্রস্তরের, দেখিতে অনেকটা বৌদ্ধ ধরণের। চূড়াটী উচ্চ, কিন্তু মধ্যভাগ স্ফীত নহে এবং অগ্রভাগ চ্যাপটা! মন্দিরটী একটী অতি উচ্চ স্থানে অবস্থিত। এক্ষণে ইহার ভগ্ন দশা। পার্শ্বস্থ একটী নূতন মন্দিরে এক্ষণে মদনমোহন জীউ আছেন।

গোবিন্দজীর লাল মন্দির, জয়পুরের রাজা মানসিংহ প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিলেন। কাশীর মানমন্দিরও এই রাজার কীর্ত্তি। ইহার চূড়া এত উচ্চ ছিল, যে আগ্রার তাজমহল হইতে দেখা যাইত। দিল্লীর সম্রাট বাহাদুর এই অপরাধে চূড়াটী ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন এবং শুনিলাম অত্যাচারের চূড়ান্তও করিয়াছিলেন। মন্দিরের উপরে গোহত্যা করা হইয়াছিল, এবং একটী মুসলমানকে গোর দিয়া রাখা হইয়াছিল। মুসলমানেরা এইরূপ দৌরাত্ম্য করায় গোবিন্দজীকে মহারাজা জয়পুর লইয়া গিয়াছিলেন। সে চূড়াটী আর কেহই প্রস্তুত করিয়া দেন নাই। মধ্যে মন্দিরের বড়ই জীর্ণদশা হইয়াছিল, গবর্ণমেণ্ট নিজ ব্যয়ে অনেক মেরামত করিয়া দিয়াছেন। বর্ত্তমান মন্দিরটী চারিতালা, আমরা সর্ব্বোপরি উঠিয়াছিলাম। ছাদ হইতে মথরা

দেখা যায়। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটী লম্বা হল, তাহার এক প্রান্তে ঠাকুর ঘর এবং অন্য তিন দিকে তিনটী বারান্দা বাহির হইয়াছে। সমস্তই লাল প্রস্তরের। চূড়াটী হলের উপর হইতে উঠিয়াছিল বোধ হয়। দেখিতে অতীব সুন্দর। সেরূপ ধরণের মন্দির আর কোথাও দেখি নাই। নিকটস্থ একটী মন্দিরে এক্ষণে বৃন্দাবনের গোবিন্দজী আছেন। হোলির সময় দর্শন করিলাম। আমার যথার্থ ভক্তি হইল। এত রূপ আমি কখন দেখি নাই!

একদিন আমরা জয়পুরের রাজার নূতন মন্দির দেখিতে গিয়াছিলাম। ভরতপুরের পাহাড় হইতে বিস্তর লাল পাথর আনয়ন করা হইয়াছে। অনেক ভাস্কর খাটিতেছে। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, যাহারা সূক্ষ্ম ভাস্কর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশই মুসলমান এবং বাস আগ্রার নিকটে। আগ্রা, জয়পুর, ভরতপুর ও দিল্লীতে যেরূপ ভাস্কর পাওয়া যায়, এরূপ আর কুত্রাপি মেলে না। এখনও একতালা সম্পূর্ণ হয় নাই, ইতিমধ্যে কয়েক লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে।

বৃন্দাবনের অধিকাংশ বাড়ী প্রস্তর নির্ম্মিত। এদেশের লোকের সক আছে। সামান্য দরজাতেও দেখিবেন, পাথরের উপর কত লতাপাতা কাটা। লতা পাতাগুলি অতি পরিষ্কার।

যমুনা বৃন্দাবনের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ব্ব দিক বেষ্টন করিয়া মথুরাভিমুখে চলিয়াছে। যমুনা প্রশস্ত অধিক নহে, কিন্তু গভীর। যমুনার উপর অনেক ঘাট বাঁধা আছে, এক ঘাট হইতে অন্য ঘাটে যাইবার পথ আছে, সুতরাং ঘাটে ঘাটে বৃন্দাবনের পশ্চিমদিকস্থ সমস্ত যমুনাকূলই ভ্রমণ করা যায়। আমরা একদিন রাত্রে যমুনা কূলে গিয়াছিলাম। রাত্রি জ্যোৎস্নাময়ী। প্রস্তর নির্ম্মিত সোপান শ্রেণী জলমধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। প্রতি সোপান শ্রেণীর দুই পার্শ্বে দুইটী উচ্চ অলিন্দ। প্রতি আলিন্দার উপর থাম বিশিষ্ট একটী বিশ্রাম স্থান। সোপানের দুই পার্শ্বে আলিন্দার গায়, সাধু সন্ন্যাসী-দের বসিবার স্থান, তাহাও ভাস্করদিগের গুণপণার পরিচয় দিতেছে। ঘাটের উপর এক একটী বৃক্ষ। বৃক্ষ পত্রের মধ্য দিয়া চন্দ্রালোক সোপানে ও চতুঃপার্শ্বে শতধা বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। যমুনাস্রোত আলিন্দায় বাধা প্রাপ্ত হইয়া বর্দ্ধিত বেগে শব্দ করিয়া বহিয়া যাইতেছে। অধিকাংশই এইরূপ।

মদন-মোহনের পুরাতন মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তর হইতে কেশীঘাট ঘাট পর্য্যন্ত এইরূপ বাঁধা ঘাট চলিয়া গিয়াছে। কিঞ্চিদধিক একপোয়া পথ হইবে। মধ্যে মধ্যে এক একটী বৃহৎ অট্টালিকা ব্যবধান আছে। কোনটী দ্বিতল, কোনটী ত্রিতল, কোনটী চৌতল। নিম্নতলের ভিত্তি জলমধ্যে প্রোথিত। চৈত্র মাসেও দেখিলাম ভিত্তির অধিকাংশ যমুনা গর্ভে নিমগ্ন রহিয়াছে। বোধ হইতেছে যেন বাড়ীগুলি জলমধ্য হইতেই উঠিয়াছে। অট্টালিকাগুলি হিন্দু রাজাদিগের বৃন্দাবনের বাসস্থান। উচ্চ দ্বিতল, ত্রিতল, চতুর্থতল হইতে ঠিক জলের উপর বারান্দা বাহির হইয়াছে। সেই বারান্দায় বসিয়া রাজপুরুষগণ সান্ধ্য সমীরণ সেবন ও যমুনা মায়ীর শোভা সন্দর্শন করেন। পশ্চিমে হিন্দুরা যমুনাকে অতি পবিত্র জ্ঞান করেন। যমুনা স্নান তাঁহাদের অতি পুণ্য কার্য্য। রাজমহিষীদের স্নানের জন্য সোপান শ্রেণী অন্দর হইতে যমুনা গর্ভে অবতরণ করিয়াছে। পাছে নৌকাযাত্রীরা সেই অর্যম্প্যশ্যা রমণীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, এই ভয়ে, সছিদ্র প্রস্তর ফলকের দ্বারা একটী অন্দরের ঘাট ঢাকিয়া দেওয়া হইয়াছে, দেখিলাম। সেই ছিদ্র দিয়া যমুনাবারি ভিতরে প্রবেশ করে, সেইখানে তাঁহারা স্নান করেন। এইরূপে সমস্ত ঘাট বেড়াইয়া আমরা কেশী ঘাটের অলিন্দার উপর বসিলাম।

স্থান বৃন্দাবন, তাহাতে কত স্বাভাবিক ও কৃত্রিম সৌন্দর্য্যের সমাবেশ হইয়াছে দেখুন। নিম্নে যমুনা, উপরে লছমী রাণীর প্রাসাদ, সম্মুখে ঘাটের পর ঘাট চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রের জ্যোৎস্না পড়িয়া সকলই যেন সুন্দর হইতে সুন্দরতম দেখাইতেছে। আমরা পুষ্করিণীতে দুই একটী বাঁধা ঘাট দেখিতে পাই, নদীতে বাঁধা ঘাট নাই বলিলেও দোষ হয় না। একটী বৃহৎ অট্টালিকা দেখিলে, আমাদের মনে হয় কতকগুলি টাকা অপব্যয় করা হইয়াছে। এক্ষণে আমার সে ভ্রম ঘুচিল। যে অতুল আনন্দ অনুভব করিলাম, তাহাতে মনে হইল যদি সহস্র মুদ্রা খরচ করিয়াও আসিয়া থাকি, সমস্তই সার্থক হইয়াছে। কোন ইংরেজ দার্শনিক বলিয়াছেন যে পূর্ব্বস্মৃতিই সৌন্দর্য্যের কারণ। কোন বস্তু দেখিলে যদি আমাদের কোন মনোরম ভাব বা প্রিয় কথা মনে পড়ে, সেই বস্তুকেই আমরা সুন্দর বলি। সে মুহূর্ত্তে আমার চতুর্দ্দিকে কত যে মনোহর ভাব উদ্দীপক পদার্থ ছিল, বলিতে পারি না।

প্রথমত লছমী রাণী। 'রাজা' 'রাণী' এই দুইটী কথার সহিত আমাদের কত মনোহর ভাব জড়িত রহিয়াছে। বাল্যকাল হইতে আমরা কত রাজা রাণীর গল্প শুনিয়া আসিতেছি। মনুষ্য শরীরে যাহা কিছু সুন্দর, সমস্তই আমরা রাজা রাণীতে দেখিতে পাইব, আশা করি। ঐশ্বর্য্য সম্পদে যাহা কিছু মহত্ত্ব উৎপন্ন করে, সমস্ত রাজা রাণীতেই সম্ভবে। সেই জন্য রাজারা নরদেবতা। তাহার পর কত রাজা রাণীর কথা ইতিহাসে পড়িয়াছি, সেগুলি মনে পড়িল। যুধিষ্ঠির রাজা হইয়া রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন, দ্বার ভ্রমে দুর্য্যোধনের মস্তক দর্পণে আহত হইয়াছিল, তাহাও মনে পড়িল। তাঁহারা কত বড় রাজা ছিলেন, তাঁহাদের প্রাসাদই বা কি অপরূপ ছিল! তাঁহারা এক্ষণে কোথায় গিয়াছেন, সে প্রাসাদগুলিই বা কোথায়! ভাবিয়া মন বড় চিন্তিত হইয়া পড়িল।

তাহার পর লছমী রাণীর প্রাসাদ। প্রাসাদটী যত উচ্চ,প্রশস্তও তদনুরূপ। যেন কোন মহাবীর যমুনা তীরে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। গাম্ভীর্য্যের কি সুন্দর উদাহরণ স্থল। আবার চন্দ্র কিরণ পড়িয়া প্রাসাদটী কি মনোহর দেখাইতেছে। গাম্ভীর্য্যের সহিত মধুরতা মিশিয়াছে। রাজা রাণীর উপযুক্ত প্রাসাদই বটে।

নদীকূলে ঐরূপ সোপান শ্রেণী দেখিলে আমাদের একটী আনন্দের কারণ হয়। উহাতে প্রকৃতির উপর মনুষ্যের প্রভুত্ব স্থাপন করিতেছে। যে নদীস্রোত কত বড় বড় রাজ্য, নগর, জীব গ্রাস করিয়াছে, তাহাতে নামিবার জন্য মনুষ্য মহা গর্ব্বে এই উপায় করিয়া রাখিয়াছে, ইহাতে আনন্দ হইতেই পারে। আর এ সোপানগুলিই বা কি অপূর্ব্ব, দুই পার্শ্বে অলিন্দ, উপরে সুন্দর বসিবার স্থান। যমুনা বৃথা রোষভরে সোপানে আস্ফালন করিয়া বহিয়া যাইতেছেন। মনুষ্যের বাহাদুরী বটে আমাদের সোপান! দেখিয়াই পুষ্করণী মনে হইল। পুষ্করিণীতে পদ্ম ফুটে। জলের উপর পত্র বিছাইয়া ঊর্দ্ধ মুখে পদ্মগুলি ফুটিয়া থাকে। মধ্যে মধ্যে মৃদু বাতাস কাণে কাণে কি বলিতে থাকে, পদ্মেরা অঙ্গ দোলাইয়া কত রঙ্গ করে। সে দৃশ্যটী মনে পড়িল। আর মস্তকোপরি চন্দ্র শোভা পাইতেছেন। পদ্মের অপেক্ষা তাঁহার ছবি আরও সুন্দর, পদ্মের মধু অপেক্ষা তাঁহার কিরণ আরও

সুমিষ্ট। আবার সম্মুখে ঐ ঘাটে রাজমহিষীরা স্নান করেন। তখন মনে হইল যেন কোন সরোবরে বিবিধ পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে, তাহার অপূর্ব্ব সোপানে রাজমহিষীরা অবতরণ করিয়াছেন, চন্দ্র অনিমিক লোচনে তাকাইয়া রহিয়াছেন এবং অনবরত অমৃত বর্ষণ করিতেছেন। সে শোভা ভাবিয়া মন আনন্দে আপ্লুত হইল।

নিম্নে যমুনা। যদি সেখানে কেবল যমুনা থাকিত, ভাবের কোন অভাব হইত না। ইহার প্রত্যেক তরঙ্গ এক একটী প্রলয় উপস্থিত করিতে পারে। এই যে কুল্ কুল্ শব্দ, ইহা কি শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অনুকরণ? ঐ যে সম্মুখে কদম্ব বৃক্ষযুক্ত ঘাট, ঐ স্থানে তিনি কি গোপীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়াছিলেন? দূরে যে কালিন্দী ঘাট, ওখানে কি হইয়াছিল? হরি হরি! আমি কোথায় বসিয়া রহিয়াছি?

এইরূপ আত্মহারা হইয়া আমি কত কথা ভাবিতেছিলাম। সঙ্গীগণ ডাকিলেন, আমি জাগরূক হইয়া, বাসায় ফিরিয়া আসিলাম।

সৌন্দর্য্য ও প্রেম।

যাহা প্রকৃত সুন্দর তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর। তবে যে "রূপ চক্ষে" কথাটা একেবারে অসঙ্গত, তাহাও বলিতেছি না, স্থান বিশেষে ও ব্যক্তি বিশেষে বরং উহাই প্রযুজ্য। কিন্তু ঐ সৌন্দর্য্য প্রকৃত সৌন্দর্য্য পদবাচ্য নহে; ইহা অতি সঙ্কীর্ণ এবং ইহার স্থায়িত্বকালও অতি অল্প। সহজ কথায়, ইহাকে 'রূপ' না বলিয়া 'রূপজ মোহ' বলিলেই সমস্ত গোলযোগ মিটিয়া যায়। কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করা যাইতেছে।

প্রধানত স্ত্রী পুরুষের মধ্যেই ঐ কথাটা ব্যবহৃত হইয়াছে। একজন আর একজনের রূপে মোহিত হইল, তাহাকে দেখিয়া প্রাণ আকৃষ্ট হইল, অথচ তোমার আমার জগৎ-সাধারণের চক্ষে সে কিছুই নহে—বৎ কুৎসিত মাত্র। ইহাতে কি বুঝা গেল?—বুঝা গেল এই যে, সে তাহার শিক্ষা,

রুচি ও হৃদয়ের ভাব অনুসারে তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়াছে, বা তাহার একটি বিশেষ গুণ দেখিয়া তাহাতে আকৃষ্ট হইয়াছে। কিন্তু এ সৌন্দর্য্যে উদারত্ব ও সার্ব্বভৌমিকত্ব ভাব কিছুই নাই—ইহা অতি সঙ্কীর্ণ, অনুদার ও ক্ষণস্থায়ী। ব্যক্তি বিশেষ, জাতি বিশেষ বা স্থান বিশেষের যে সৌন্দর্য্য সাধারণ নিয়মে খাটে না—প্রকৃতির আদর্শস্থানীয়ও হইতে পারে না। কোন রূপ বিশেষত্ব দেখিয়া, ভাল মন্দ গুণাগুণ বিচার করিয়া, যে সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার মূলে আকাঙ্ক্ষা, লক্ষ্য ও স্বার্থের ছায়া বিদ্যমান থাকে,—তাহা অতি সঙ্কীর্ণ, সীমাবদ্ধ ও পরিমিত গণ্ডীর মধ্যে অবস্থিতি করে। উহার উদ্দেশ্য সাধিত হইলেই, বা মধ্যে কোন অন্তরায় উপস্থিত হইলেই, এ সৌন্দর্য্য আপনা হইতেই অন্তর্হিত হয়—তখন সেই রূপ বা গুণের আর কোন বিশেষত্ব থাকে না—উহার অস্তিত্ব এককালে লোপ পায়—মোহ ভাঙ্গিলেই সেই রূপ-পিপাসা মিটিয়া যায়। কিন্তু যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষে সকল সময়ে সুন্দর বোধ হইবে। এ সৌন্দর্য্যের লক্ষ্য অনন্ত এবং ইহার স্থায়িত্বকালও অনন্ত। ইহাতে ব্যক্তিগত, জাতিগত, স্থানগত কোন একটি নির্দ্দিষ্ট বিশেষত্ব নাই, তবে ইহাতেও শিক্ষা, রুচি, ও হৃদয়ের ভাব অনুযায়ী ফল মিলিয়া থাকে। এ সৌন্দর্য্য আদর্শ স্থানীয় ও ভাবমূলক (Ideal)। ভাব-চক্ষে এ সৌন্দর্য্য দেখিতে পারিলে, অতি মনোহর ও অনির্ব্বচনীয় বোধ হয়। বহিশ্চক্ষে যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় না, তাহা বলিতেছি না—তবে ততটা নহে। অনন্ত সৌন্দর্য্যের আধার স্বরূপ আদর্শ বস্তু দেখিতে হইলে, ভাব চক্ষে দেখাই প্রশস্ত।

ভাব-চক্ষু লাভ করিতে হইলে প্রেম-সাধনার আবশ্যক হয়। প্রেম লাভ না করিতে পারিলে, আদর্শ সৌন্দর্য্য সম্যক্‌রূপে দেখিতে পাওয়া যায় না—হৃদয়ে সে ভাবও উপলব্ধি হয় না। যেখানে সৌন্দর্য্য-বোধ, সেই খানেই অগ্রে প্রেম,—যেখানে প্রেম, সেইখানেই সৌন্দর্য্য। একের অভাব হইলে আর একটি মলিন হয়—তাহার পূর্ণস্ফূর্ত্তি থাকে না। সৌন্দর্য্যের পরাকাষ্ঠা—প্রেমে, প্রেমের পরিচয়—সৌন্দর্য্য-বোধে। দুয়ের সংযোগ না হইলে কোনটিরও পূর্ণ বিকাশ হয় না। অতএব সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে প্রেমের আবশ্যক হয়, প্রেমলাভ করিতে হইলে সৌন্দর্য্য দেখিবার শিক্ষা আবশ্যক করে।

সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি নানাপ্রকার, প্রেমের স্ফূর্ত্তিও নানাভাবে বিকশিত। সৌন্দর্য্য ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্রই—প্রেম ও অন্তরে প্রকাশ্যে বিরাজিত। প্রেমের স্ফূর্ত্তি, সৌন্দর্য্যে, সাকার মূর্ত্তি ধারণ করে,—সৌন্দর্য্য-বোধও প্রেমে মিলিয়া সংসারে স্বর্গরাজ্যের প্রতিষ্ঠা করে। সৌন্দর্য্য প্রেমের সাহায্য করে,—প্রেম সৌন্দর্য্যের স্থান অধিকার করিয়া থাকে। যেন দুয়ের প্রাণ এক হয়, দুয়ের প্রাণই যেন মহামিলনে একীভূত হইয়া যায়। এ এক মহা-যোগ; ইহার উপরেও সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আর একটি স্তর আছে, সে কথা ক্রমে বলিতেছি।

জড় রাজ্যে যেমন সৌন্দর্য্য আছে, মনোরাজ্যেও তেমনি সৌন্দর্য্য বিরাজিত। জড়-জগতের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে যেমন প্রেমের আবশ্যক হয়, মনোজগতের সৌন্দর্য্য দেখিতেও সেই মত প্রেমের সাহায্য আবশ্যক করিয়া থাকে। তবে ইহাতে প্রভেদ এই, জড়-জগৎ—রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ, দর্শন-স্মৃতি-বুদ্ধি-যুক্ত, আকার-বিশিষ্ট, সাকার-মূর্ত্তি—আর অন্তর্জগৎ নির্গুণ, নির্ব্বিকার, নিরাকার-মূলক, ভাবযুক্ত। একটিতে সাকার, সগুণ, সকামভাব বিদ্যমান,—অন্যটিতে নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্কাম ভাব নিহিত। একটি ত্রিগুণাত্মক—সৃষ্টি-স্থিতিপ্রলয় ভাবাপন্ন,—অন্যটি ত্রিগুণাতীত, সচ্চিদানন্দ ভাবে বিভোর। একটি জগদীশ্বর,—অন্যটি ব্রহ্ম। একের ভাব,—এই কার্য্য কারণ সংযুক্ত লীলা-বৈচিত্র্য,—অন্যের ভাব,—বিশুদ্ধং শান্তং শিব মদ্বৈতং; অনন্ত বিশাল বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড আভাসমান থাকিতেও যে ভাব, বিশ্ব বিধ্বংসী মহাপ্রলয়ের সময়ও ব্রহ্মের সেই ভাব।

বৈষ্ণবের বৈকুণ্ঠে, গোলোকে রাসমণ্ডলে, সৌন্দর্য্য ও প্রেমের মহামিলন। রাসেশ্বর, সুন্দর পুরুষ, হ্লাদিনী রাধা প্রেমময়ী প্রকৃতি; রাধা কৃষ্ণের যুগল মিলনে, প্রেম সৌন্দর্য্যের মহামিলন। রাধা পদানুসরণে কৃষ্ণ মিলে; অর্থাৎ মহা প্রেমে মহা সৌন্দর্য্যের উপলব্ধি হয়। একটা হ'লে, আর একটা জিনিস পাওয়া যায়, এ দুটার কোনটা বড়? কৃপণ বলিবেন টাকাই বড়, পেটুক বলিবে, সন্দেশই বড়। শুক বলে কৃষ্ণ বড়, সারী বলে, রাধা বড়। শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদনমোহন, সারী বলে, আমার রাধা বামে যতক্ষণ, নহিলে শুধুই মোহন। প্রশ্নের এই একরূপ উত্তর। আর এক রূপ উত্তর

নন্থুর মুখে। নন্থুর পিতা মাতা বসিয়া আছেন, নন্থু খেলা করিতেছে; হঠাৎ নন্থুর মাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ রে নন্থু তুই তোর বাপকে বেশী ভাল বাসিস্, না মাকে বেশী ভাল বাসিস্?" নন্থু বড় গোলে পড়িল, মায়ের মুখের দিকে তাকাইল, দেখিল, মা টিপি টিপি হাসিতেছেন; মায়ের বসনাচ্ছাদিত স্তনের দিকে তাকাইল, দেখিল, স্তনদুটী কাঁপিতেছে; তাহার পর বাপের দিকে তাকাইল, দেখিল পিতা এক দৃষ্টিতে হাস্য বদনে তাহাকে লক্ষ্য করিতেছেন; তখন সাহস পাইয়া মায়ের স্তনে বাম হাতের চড় মারিয়া, দক্ষিণ হস্তে পিতার গোঁফ ধরিয়া টানিল, আর মাসীকে উত্তর দিল—"দুজনকেই।"

সৌন্দর্য্যের মূর্ত্তি নানা প্রকার। এই জড়-জগৎ ও অন্তর্জগতের সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য বিরাজিত। ফলে ফুলে, জলে স্থলে, অনলে অনিলে, চন্দ্রে সূর্য্যে, গ্রহে উপগ্রহে, সমুদ্রে ব্যোমে সর্ব্বত্রই সৌন্দর্য্য। প্রকৃতি সৌন্দর্য্যময়ী— অনন্ত সৌন্দর্য্যের ভাণ্ডার। নিত্য নূতন সৌন্দর্য্যের উৎস —জীব জন্তু, পশু পক্ষী, কীট পতঙ্গ প্রাণী মাত্রেরই প্রাণে অবিরাম গতিতে বহিতেছে। প্রেমের মন্দাকিনী ধারা এই সৌন্দর্য্যের সহিত মিশিয়া একই উদ্দেশ্যে—চরম-লক্ষ্যে খরতর বেগে ছুটিতেছে। প্রকৃতির সন্তান সে সুধা পান করিয়া অমর হইতেছে। এই প্রভাত হইল, মৃদুল মলয় বায়ু ধীরি ধীরি বহিতে লাগিল, বিহঙ্গমকুল ললিতস্বরে প্রভাতীগানে অনন্ত জগৎ মাতাইয়া তুলিল, মধুকর দল গুন্ গুন্ রবে প্রস্ফুটিত কুসুমের মধুপানে মত্ত হইল, দিনকর স্বর্ণকর ঢালিয়া আরক্তিম লোচনে চাহিতে লাগিলেন, অনন্ত সুনীল আকাশ দেখিতে দেখিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিল, চারিদিক কোলাহল-পূর্ণ হইতে লাগিল। আবার মধ্যাহ্নে সে ভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তন; এখন আর প্রকৃতির সে স্ফূর্ত্তি নাই, বৃক্ষরাজী, তরুলতার এখন আর সে হাস্যময় ভাব নাই—এখন জীব জন্তু, পশু পক্ষী সকলেই যেন ক্লান্ত সকলেই যেন অবসন্ন, মার্ত্তণ্ডের খর কিরণে সকলেই যেন এক্ষণে বিশ্রামভাবে লালায়িত। গোধূলি সমাগমে, আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন। সুনীল আকাশ এখন বিচিত্ররূপ ধারণ করিয়াছে। চারি দিক নীল, পীত, শ্বেত, লোহিত, কৃষ্ণ, ধূসর নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে, তটিনী কুল কুল স্বরে আপন মনে বহিতেছে, পশু পক্ষী স্ব স্ব বৃক্ষ-নীড়ে ফিরিতে লাগিল। দেখিতে

দেখিতে সন্ধ্যাদেবী তিমির বসন পরিধান করিয়া ধরা উদ্যানে বিচরণ করিতে আসিলেন। আকাশে অসংখ্য নক্ষত্ররাজী ফুটিয়া তাঁহার মস্তকে হীরক খণ্ডের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল, চাঁদ উঠিল, চকোর চকোরী চাঁদের সুধাপান করিতে লাগিল, চাঁদের আলোয় দিক আলো হইল। বিমল জ্যোৎস্না একটু একটু করিয়া ফুটিতে লাগিল। ক্ষণপরে আবার সে দৃশ্যের পরিবর্ত্তন। স্থির, গম্ভীর, প্রশান্ত পৃথিবী ক্রমেই অধিকতর প্রশান্ত হইতে লাগিল। গভীর নিস্তব্ধ ভাবের মধ্যে কেমন এক সুমৃদু গম্ভীর ঝিম্ ঝিম্ রব শ্রুত হইতে লাগিল; নিদ্রার বিশ্রাম ক্রোড়ে সকলেই সুপ্ত— কোথাও কিছু সাড়া শব্দ নাই, মধ্যে মধ্যে সুদূর আকাশ হইতে দেব দেবীর পূজোপকরণ অপূর্ব্ব ঘণ্টার মৃদু মধুর রব ভক্তের মন প্রাণ বিমুগ্ধ করিতে লাগিল; সংসারের পাপী তাপী, দীন দুঃখী, অনুতপ্ত জন, সন্তপ্ত অশ্রু ফেলিয়া স্ব স্ব ভারবহ জীবন লঘু করিতে লাগিল; দেখিতে দেখিতে আবার সে ভাবের পরিবর্ত্তন,—এই বার সুখময়ী উষাদেবীর আবির্ভাব হইল। এইরূপে অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী প্রকৃতি আবাহমানকাল আপনার অনন্ত সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। গ্রীষ্মের দুর্দ্দমনীয় উত্তাপ, বর্ষার অবিশ্রান্ত জলধারা, শরতের মেঘ রাশি, হেমন্তের নীহার, শীতের শৈত্য, বসন্তের মলয় বায়ু—ষড় ঋতুর পর্য্যায়ক্রমে আবির্ভাব অন্তর্ধানে প্রকৃতি রাজ্য নিত্য নূতন শোভায় শোভিত হইতেছে—অনুক্ষণ সৌন্দর্য্যের ডালি মাথায় লইয়া প্রকৃতি দূতি জীব জগতকে উপহার দিতেছেন। এ সৌন্দর্য্য সকলকেই মোহিত করে—সকলের হৃদয়ে আনন্দ বর্দ্ধন করে। এ সৌন্দর্য্যের মূলে প্রেম নিহিত;—প্রেমই সুখ। হৃদয়ের প্রবণতানুসারে এ সুখ সকলেরই উপভোগ্য হয়। তারপর অন্তর্জ্জগতের সৌন্দর্য্যের কথা। দয়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, শান্তি, প্রীতি, স্নেহ, ভাল বাসা প্রভৃতি কমনীয় গুণ সমষ্টিতে এ সৌন্দর্য্যের উৎপত্তি। প্রেমই ইহার মূলাধার, ভালবাসাই ইহার প্রাণ। এ সৌন্দর্য্য হৃদয়ে উপলব্ধি করিতে পারিলে, মানুষের দেবত্ব লাভ হয়। বহির্জ্জগতের ন্যায় ইহার জড়রূপ নাই, ইহার রূপ, বাসনায়। বাসনায় মূর্ত্তি গড়িয়া এ জগৎ সৃষ্টি করিতে হয়। এ জগৎ সৃষ্টির ক্ষমতা জন্মিলে মানুষ অসাধ্য সাধন করিতে পারে—সৌন্দর্য্য ও প্রেমের প্রতিভায় ধরায় স্বর্গরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হয়।

কিন্তু প্রেম ভিন্ন জড়-জগতের সৌন্দর্য্যও সম্যক উপলব্ধি করা যায় না। প্রকৃতি রাজ্যেই ইহার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। আকাশ, সমুদ্র, পর্ব্বত, নদী, অরণ্য, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, তোমার আমার চক্ষে একরূপ বোধ হইবে, আবার একজন প্রেমিক, ভক্ত, সাধক বা কবির চক্ষে ভিন্ন রূপ বোধ হইবে। তুমি আমি সহজ দৃষ্টিতে যাহা দেখিবার তাহাই দেখিব, কিন্তু ইঁহারা সাধনার অন্তর্দৃষ্টিতে অনেক অধিক ও উচ্চ ভাব দেখিতে পাইবেন। ইহাতে এই বুঝা যাইতেছে যে, শিক্ষা, রুচি ও মনের উদার অনুদার ভাব অনুসারে, সৌন্দর্য্য দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু কেহই নিরাশ হইবে না—অবিনশ্বর অনন্ত-সৌন্দর্য্য সকলকেই একটু না একটু দেখা দিবে। অল্প হৌক, বিস্তর হৌক সাধনা সকলেরই আছে। তাহাতেই বলিতেছিলাম, যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর বোধ হইবে।

প্রকৃতি-রাজ্য ছাড়িয়া আরও সহজ পথে অগ্রসর হইতেছি। একখানি সুবৃহৎ অতি শিল্প নৈপুণ্যযুক্ত বিচিত্র ও মনোহর চিত্রপট দর্শন কর,—নানা বর্ণে রঞ্জিতে বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদ, নদী, পাহাড়, পর্ব্বত, অরণ্য, সমুদ্র, আকাশ প্রভৃতি অঙ্কিত রহিয়াছে,—চিত্রকরের দক্ষতা গুণে চিত্রখানি বড়ই সুন্দর ফুটিয়াছে। তুমি আমি সকলেই এক দৃষ্টে দেখিতেছি, দেখিয়া মুগ্ধ হইতেছি ও মুক্ত অন্তরে চিত্রকরের ক্ষমতার ভূয়সী প্রশংসা করিতেছি। তুমি আমি, চিত্রপটের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যে মোহিত হইতেছি, বিবিধ বর্ণের চাকচিক্যময় বৃক্ষ লতা, অরণ্য প্রভৃতি দেখিয়া স্থির দৃষ্টে হাঁ করিয়া তাহার প্রতি চাহিয়া আছি—কিন্তু ভিতরের ভাব কিছুই বুঝিতে পারি নাই, হয়ত তাহার বিশেষ দোষ গুণ বিচার করিতে পারিতেছি না, অথচ কিছু না কিছু সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইতেছি। কিন্তু সেই চিত্রকরের সমকক্ষ আর একজন চিত্র-সমালোচক যদি সেই চিত্রপট খানি দর্শন করেন, তবে তিনি তন্ন তন্ন করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সেই চিত্র দর্শন করিয়া কতই না সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন। এই স্থলে শিক্ষার উপর এই সৌন্দর্য্য-দর্শন নির্ভর করিতেছে।

গান সকলেই শুনে, মিষ্ট লাগিলে সকলেই "আহা মরি" করে; কিন্তু প্রকৃত সুর, তান, লয় বুঝে কয়টা লোকে? মহাকাব্য সকলেই পড়ে, কিন্তু প্রকৃত রস বিচার বোধ কয়জনের আছে? গ্রন্থ লিখে অনেকে, পাঠযোগ্য

হয় কয় খানা? এ সকল বিষয়ের সৌন্দর্য্য দেখিতে হইলে সংশিক্ষার আবশ্যক করে; তারপর রুচিও কতকটা পরিমার্জ্জিত হওয়া আবশ্যক।

সাহিত্য ও কাব্য জগতের সৌন্দর্য্যও বড় একটা সহজ ব্যাপার নয়। স্থূল জগৎ ছাড়িয়া অন্তর্জগৎ সৃষ্টি করা, বড় প্রতিভাবান্ ব্যক্তির কাজ। যখন তখন সে শ্রেণীর লোকও বড় একটা জন্মগ্রহণ করে না। সাহিত্য জগতের অমর কবি বাল্মীকির রামায়ণ, ব্যাসের ভারত—রসের সপ্ত সমুদ্র বিশেষ। মানব-চরিত্রের বিশ্লেষণ ও ঘটনা পরম্পরার এমন সুকৌশল সংযোগ অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কালিদাসের অভিজ্ঞান-শকুন্তল প্রভৃতিও রত্ন বিশেষ। কিন্তু এ সকল কাব্যের সৌন্দর্য্য দেখিতে জানে কয় জন? সেক্ষপিয়রের গ্রন্থ ত অনেকেই পড়ে, কিন্তু হ্যামলেট, ম্যাকবেথ্ ওথেলো নাটকের সৌন্দর্য্য বুঝিতে পারে কয়জন? আর আজ বাঙ্গালী লেখকের শীর্ষ-স্থানীয় প্রতিভাবান্ বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসাবলী পঠিত হয় ত বাঙ্গালার ঘরে ঘরে—স্ত্রী পুরুষ, বালক বৃদ্ধাদিরও মধ্যে—কিন্তু কপাল কুণ্ডলার সৌন্দর্য্য বুঝিয়াছে কয়জন? সেইজন্যই বলিতেছিলাম, কাব্য-জগতের সৌন্দর্য্যও বড় একটা সহজ জিনিষ নয়। প্রভূত প্রতিভা-শক্তি না থাকিলে আদর্শ চরিত্রের অঙ্কনে কৃতকার্য্য হওয়া যায় না—সৌন্দর্য্য পূর্ণ মাত্রায় প্রস্ফুটিত হয় না। কার্লাইল্ বলেন, কোন বিশেষ উদ্দেশ্যে অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিবার প্রবৃত্তির নাম প্রতিভা (genius); আমরা বলি তাহারই নাম প্রেম। প্রতিভায় শক্তির স্ফূর্ত্তি। প্রেমে প্রতিভার স্ফূর্ত্তি।

আদর্শ চরিত্রের পূর্ণ সৌন্দর্য্য বিকশিত করাই প্রতিভা সম্পন্ন ব্যক্তির কাজ—কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রকৃত চিত্র অঙ্কনে সে ক্ষমতার প্রয়োজন হয় না—এমন কথা বলিতেছি না। আপাত দৃষ্টিতে যাহাকে আমরা প্রকৃত বলিতেছি, সময়ে তাহাই পরাকৃত হয়,—আবার উপস্থিত যাহা পরাকৃত মনে হইতেছে, প্রত্যক্ষ ঘটনায় তাহাই আবার প্রকৃত দেখিতে পাই। অতএব প্রকৃত পরাকৃতের বিশেষ মীমাংসা ঠিক হয় না। তবে এই অবধি বলিতে পারা যায়, প্রকৃত হোক আর পরাকৃত হোক—এ উভয় চিত্র অঙ্কিত করিতেই প্রভূত প্রেমের প্রয়োজন।

যাহা প্রতিনিয়ত দেখিতেছি, শুনিতেছি, বলিতেছি, লিখিতেছি, পড়ি-

তেছি, অনুভব করিতেছি, তাহাই প্রকৃত প্রত্যক্ষ-সত্য। ইহাতে যে সৌন্দর্য্য নাই, এমন কথা কে বলিবে? তবে কথা এই, যে জিনিসটা অনায়াস-লভ্য, আমাদের নিকট তাহার আদর কম। সংসারের এই গতিই কেমন। যাহা বহু আয়াস-লব্ধ—সংসারে সচরাচর মিলে না, আমরা তাহারই অধিক আদর করিয়া থাকি। মানুষের স্বভাব, শিক্ষা ও রুচি অনুসারে সৌন্দর্য্য দর্শনের তারতম্য হয়। সুতরাং যে বস্তু বা যাহাকে প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, তাহার প্রতি তত আস্থা বা ভক্তি শ্রদ্ধা নাই; কেননা, তাহাতে "লুকান ছাপান কোন না কোন খুঁত থাকিতে পারে।" তুমি সমস্ত সৎগুণের আধার স্বরূপ হইলেও, লোকে আর একজনকে আশীর্ব্বাদ করিবার সময়, তোমার আদর্শ দেখাইবে না,—যাহা সৌন্দর্য্যের শীর্ষস্থানীয়, এমন আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিবে। তুমি আজ হয়ত ভাল আছ, কাল হয়ত না থাকিতে পার, দুই দশ দিনে বা দশ বৎসরে হয়ত তোমার কিছু না কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিতে পারে—তোমার চরিত্রে একটু না একটু কলঙ্কের দাগস্পর্শ করিতে পারে, সুতরাং কাহাকেও আশীর্ব্বাদ করিবার সময় লোকে বলিবে,—"রামচন্দ্রের মত সত্য-নিষ্ঠ ও পিতৃ-ভক্ত হও,—যুধিষ্ঠিরের মত ধর্ম্ম-পরায়ণ হও।" যদি স্ত্রীলোক হয়, ত বলিবে,—"এস মা, সীতা সাবিত্রীর মত পতিব্রতা হও।" এখানে এ আদর্শ চরিত্রের উল্লেখ করিবার কারণ এই "ইঁহারা পরাকৃতি; ইঁহাদের চরিত্রে ত খুঁৎ থাকিতে পারেনা;—আর পরিবর্ত্তন—তাহাও অসম্ভব'। তাহাতেই বলিয়াছি যে, আদর্শ-সৌন্দর্য্যই প্রকৃত সৌন্দর্য্য। প্রেমেই তাহার সৃষ্টি, প্রেমেই তাহার অনুভাবনা।

সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ব্যভিচার—রূপজ-মোহ যে কিছুই নয়, এক্ষণে তাহাই বলিতেছি। একটি পরম লাবণ্যবতী অসমা সুন্দরী বারাঙ্গনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া পাঁচজনের মনে পাঁচ রকম ভাবের উদয় হইল। যে ইন্দ্রিয়পরায়ণ, সে তাহাকে দেখিয়া কেবলই পশুবৃত্তির উত্তেজনায় অন্ধ হইল;—দ্বিতীয় ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া কেবলই "আহা মরি" বলিয়া তাহার রূপের ও অঙ্গ সৌষ্ঠবের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল;—তৃতীয় ব্যক্তি তাহাকে দেখিয়া "আহা, এমন সৌন্দর্য্য-প্রতিমা এ কলুষিত স্থানে কেন আসিল?" বলিয়া তাহার ঘৃণিত বেশ্যা-জীবনের জন্য দুঃখ করিতে লাগিল। চতুর্থ ব্যক্তি

তাহার সৌন্দর্য্য দেখিয়া প্রেম বিগলিত নেত্রে জগদীশ্বরের মহিমা চিন্তা করত কহিলেন,—"আহা, বিধাতার কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি! এমন রূপের প্রতিমা গড়া কেবলই তাঁহাকেই শোভা পায়!" পঞ্চম ব্যক্তি সৌন্দর্য্য ও প্রেমে আত্মহারা,—তিনি ভাবের পূর্ণোচ্ছাসে বিভোর হইয়া কহিলেন,—"আহা, কি অপরূপ রূপ! কি কমনীয় মূর্ত্তি! এ হেন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-প্রতিমাকে যিনি সৃজন করিয়াছেন, না জানি তিনি কতই সুন্দর।"

এখন রূপজ-মোহে এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের দৃষ্টিতে কত প্রভেদ দেখিলে? এখন জানিলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য ও প্রেম কি? এখন স্পষ্টরূপে দেখান হইল যে, যাহা প্রকৃত সুন্দর, তাহা সকলের চক্ষেই সুন্দর বোধ হইবে। বারাঙ্গনার সৌন্দর্য্য কাহাকেও বঞ্চিত করিল না। যাহার হৃদয়ে যে ভাব, যেমন রুচি, যেরূপ শিক্ষা, সে, সেই ভাবেই তাহাকে দেখিল—তাহার সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিল।

যাহারা রূপে মজিয়া সৌন্দর্য্যের কল্পনা করে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য তাহারা দেখিতে পায় না। প্রেমের পূজা না করিলে প্রকৃত সৌন্দর্য্য দেখা দেয় না। মনের কালিমা না ধুইলে জ্ঞান চক্ষু ফুটে না। সত্য, ন্যায় ও ধর্ম্মের মহিমা হৃদয়ে উপলব্ধি না করিলে, প্রকৃত সৌন্দর্য্য বহু দূরে অবস্থিতি করে। সৌন্দর্য্যের পূর্ণ বিকাশ—প্রেমে, আর প্রেমের পূর্ণস্ফূর্ত্তিই সেই সৌন্দর্য্য বোধ। সত্য অপেক্ষা সৌন্দর্য্যময় ও প্রেমময় বস্তু আর কিছুইনাই—সুতরাং সত্যই সৌন্দর্য্য ও সত্যের ধারণাই প্রেম। ধর্ম্ম অপেক্ষা সত্য আর কিছুই নাই—সুতরাং ধর্ম্মই সৌন্দর্য্য ও ধর্ম্মের ধারণাই প্রেম।

রূপজ-মোহে মানুষকে আদর্শ-পথে লইয়া যাওয়া দূরের কথা—তাহাকে অধঃপথে নরকের দিকে আকর্ষণ করে, ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। সাধ্বী সতী সুন্দরী রমণীর দীর্ঘশ্বাসে এবং সৌন্দর্য্য ও প্রেমের অমানুষী মহিমায় অতি শীঘ্রই আক্রমণকারী পশুকে চিরদিনের মত ইহ সংসার ত্যাগ করিতে হয়। ইতিহাস স্বর্ণাক্ষরে উজ্জ্বলরূপে ইহার সাক্ষ্য দিতেছে। যে রূপের আগুনে পুড়িয়া ট্রয় নগর এককালে ভস্মীভূত হইয়াছিল, রোমের সাধারণ বিচার-তন্ত্র সংস্কৃত হইয়া রোমবাসীর হৃদয়ে একতা ও সহানুভূতির বীজবদ্ধমূল করিয়া- লুক্রিশিয়া নাম অক্ষয় অক্ষরে খোদিত করিয়াছে—ইহা সেই সতী-

বিক্রম; যাহার জন্য প্রবল-পরাক্রমশালী, প্রচণ্ড তেজা, লঙ্কাধিপতি দশানন সবংশে নিহত হইয়াছিল, বিপুল কুরুকুল যে কারণে এককালে নির্মূল হয়, যে আগুণের অলৌকিক তেজে সর্ব্ববিধ্বংসী মহাকালও বিকম্পিত হইয়াছিল—সত্যবানের দেহ স্পর্শ করিতেও সাহসী হয় নাই, তাহা কেবল প্রেমের মহিমা, সতীত্বের সৌন্দর্য্য।

কিন্তু সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এই চরম অবস্থা ইহ সংসারে অতি বিরল। ঈশ্বরের কৃপা ভিন্ন এ সৌভাগ্য কেহ লাভ করিতে পারে না। সৌন্দর্য্য ও প্রেমের পূর্ণ অধিকারী হইতে পারিলে, মানুষের দেবত্ব লাভ হয়। তখন শত্রু মিত্র,—পণ্ডিত, মূর্খ—ধনী, দরিদ্র—পাপী তাপী,—সকলকেই ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন করিতে প্রাণ ব্যাকুল হয়, ইহ সংসারে আর কোন বিষয়ের ভেদাভেদ জ্ঞান থাকে না। নব চক্ষে সৌন্দর্য্য ও প্রেমের এ গম্ভীর উদার ভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। চর্ম্ম চক্ষু বিনষ্ট হইয়া যখন মানুষের মনশ্চক্ষু প্রস্ফুটিত হইতে থাকে, তখনই এ ভাব উপলব্ধি হয়। তখন প্রেমময় ভগবানের প্রেমচ্ছবি সর্ব্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়। জলে স্থলে, অনলে অনিলে, গৃহে বনে, পর্ব্বতে অরণ্যে, শত্রুপুরে কারাগারে, সম্মুখে পশ্চাতে, বামে দক্ষিণে, উর্দ্ধে নিম্নে—সর্ব্বত্রই সকল স্থানেই মূর্ত্তিমান ঈশ্বরের বিরাট সাকার মূর্ত্তি এই পরিদৃশ্যমান্ জগতের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। চরাচর অনন্ত বিশ্ব তখন সর্ব্বদা আনন্দের পূর্ণ বিকাশে আলোকিত হইয়া উঠে। বিশাল ব্রহ্মাণ্ড তখন সৌন্দর্য্য ও প্রেমের ভাণ্ডার হয়। সৌন্দর্য্যের অন্ত নাই, সে প্রেমেরও অন্ত নাই। তাহা অনন্ত—অক্ষয়। এই প্রেমের সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব "হরিবোল হরিবোল" রবে এক দিন ভারত মাতাইয়াছিলেন; মহামতি শাক্যসিংহ এই ভাবে বিভোর হইয়া একদিন জীবের মুক্তির উদ্দেশে "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" প্রচার করিয়াছিলেন; বৈদিক কর্ম্মকাণ্ড ও হিন্দু ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য অদ্বৈতবাদী ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য একদিন এই প্রেমে উন্মত্ত হইয়া সুদূর হিমালয় হইতে কন্যাকুমারী পর্য্যন্ত "সচ্চিদানন্দ রূপ শিবোহং শিবোহং" রবে ধর্ম্ম জগৎ বিকম্পিত করিয়াছিলেন; আর ধ্রুব প্রহ্লাদ এই আলোকে হৃদয় আলোকিত করত মরণভয় তুচ্ছ করিয়া স্ব স্ব গন্তব্য লক্ষ্য পথে ছুটিয়াছিলেন। এই সৌন্দর্য্য

ও প্রেমের অপূর্ব্ব প্রতিভায় অনুপ্রাণিত হইয়া খ্রীষ্ট ক্ষমা গুণের অসাধারণ মহত্ত্ব দেখাইয়াছিলেন; মহাত্মা সক্রেটিস্ এই সত্যের মহিমায় বিষপান করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই; মিবাররাজ মহারাণা প্রতাপ এই সৌন্দর্য্য প্রেমে বিমোহিত হইয়া স্বাধীন হৃদয়ের আদর্শ স্থানীয় হইয়াছেন। আর সেই ভক্তি তীর্থ বৃন্দাবনে ভক্তের মেলায় স্ত্রী পুরুষ সকলেই একদিন এই প্রেম লাভ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন; স্রোতস্বতী যমুনা একদিন এই সৌন্দর্য্য ও প্রেমের আকর্ষণে তাহার স্বভাব গতিও রোধ করিত; সৌন্দর্য্য ও প্রেমের পূর্ণ অবতার—যখন সেই মোহন বাঁশরী মোহন করে লইয়া অনন্ত প্রেমের মহিমা আলাপ করিতেন, কুলবধূ তখন কুল ত্যাগ করিতে সঙ্কুচিত হইত না, সতী রমণী পতিকে ছাড়িয়া আসিত, জড় জগতেরও তখন স্বাভাবিক বিপর্য্যয় ঘটিত। এই ত সৌন্দর্য্য—এই ত প্রেম। এই ত পরিণাম, এই ত জড়জীবের প্রাণ। ইহা জগতের সার—ইহা চরাচর বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সার্ব্ব-ভৌমিক ধর্ম্ম।

শ্রীহারাণচন্দ্র রক্ষিত।

মাকবেথ্ ও হামলেট্।

দ্বিতীয়াংশ।

বহুকাল পরে আমরা শেক্সপীয়রের অদ্বিতীয় নাটকদ্বয় সমালোচনার দ্বিতীয়াংশে হস্তক্ষেপ করিতেছি। মাকবেথ নাটকের সমালোচনা শেষ হইয়াছে, হামলেট সমালোচনা আরম্ভ করিতেছি। পাঠক হয়ত এতদিনে, আমাদের কর্তৃক ঐ দুই নাটকের মজ্জা সমালোচন ভুলিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এই স্থলে সেই সকল কথার পুনরুল্লেখের প্রয়োজন।

১। মাকবেথ—মহাপাপ; হামলেট—মহাদুঃখ।

২। লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু।

৩। লোভের মধ্যে কামজ লোভ অতি ভয়ঙ্কর।

৪। কামজ পাপের পরিণাম সংক্রামক।

৫। দুরাকাঙ্ক্ষা ও প্রবৃত্তি পাপের ধাত্রী ও পোষয়িত্রী।

৬। ভক্তিহীন চিন্তা দুঃখের ধাত্রী ও পোষয়িত্রী।

৭। পাপে দুঃখে বড় ঘনিষ্ঠতা।

৮। কামজ পাপে অন্যকে দারুণ দুশ্চিন্তায় পতিত করিয়া মহাদুঃখী করে, সেই দুঃখে আবার পাপের উৎপত্তি, সেই পাপে ক্রমে মহাদুঃখ।

মাকবেথ নাটকে শেক্ষপীয়র বলেন, পাপ পাপীকে পোড়ায়। হাম্‌লেট্ নাটকে বলেন, তাত পোড়ায়ই, সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ বিস্তার করিয়া পাপ ছড়াইয়া, চতুষ্পার্শ্বস্থ পাপী ও নিষ্পাপকে সমানে দগ্ধ করিয়া ফেলে।

দুই খানি নাটক একটি নক্সায় এইরূপে দেখান যাইতে পারে;—

মাক্‌বেথ

পাপের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আধিপত্য, দুঃখজনকতা, সংক্রমণ, পরিণাম।

হ্যাম্‌লেট্

পাপের পরিণাম প্রদর্শন উভয় নাটকেরই মুখ্য উদ্দেশ্য। মাক্‌বেথ নাটকে পাপের উৎপত্তি, পরিপুষ্টি, আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে দেখান হইয়াছে; দুঃখজনকতা গৌণ ভাবে আছে। হ্যামলেট্ নাটকে পাপের আধিপত্য, দুঃখজনকতা, সংক্রমণ বিশেষরূপে দেখান হইয়াছে—পরিপুষ্টি গৌণভাবে আছে। আধিপত্য উভয়েই সমান, পরিণাম একরূপ হইয়াও,—স্বতন্ত্র।

উভয় নাটকেই আদিতে বিদেশী রাজা কর্তৃক স্বদেশ আক্রমণের কথা আছে। উভয়ত্রই নরওয়ে রাজ আক্রমণকারী। মাক্‌বেথ নাটকে নরওয়ে রাজকে পরাভূত করিয়াই মাকবেথের মনে দুরাকাঙ্ক্ষার উদয় হয়, তাহাতেই পাপের সূত্রপাত—কিন্তু পরিণামে স্কটলণ্ডের সিংহাসনে প্রকৃত উত্তরাধিকারী মাল্‌কোম অধিষ্ঠিত; দেশে শুভকর শান্তি বিরাজিত। হ্যামলেটের আরম্ভে নরওয়ে রাজের আক্রমণ সূচনা; পরিণামে সেই নরওয়ে রাজ কর্তৃক দিনামার ভূমির অধিকার; দিনামারগণের স্বাধীনতা চ্যুতি। ক্লডিয়সের পাপ সংক্রামক বলিয়া সেই পাপের পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর।

হামলেট্ নাটকে রাজহত্যা, অগ্রজ হত্যা, সুপ্তহত্যা, গুপ্তহত্যা প্রভৃতি মহাপাপের সহিত গুর্ব্বিনী গমন রূপ আর একটি মহাপাপ মিলিত হইয়াছে। সেই মহাপাপের সংক্রামকতা অতি ভয়ঙ্কর। পিতৃহন্তা অবাধে পিতৃবৈভব অধিকার করিয়াছে, বিষয়ী লোকের পক্ষে এদুঃখ মহাদুঃখ সন্দেহ নাই কিন্তু এ ক্ষতির আংশিক পূরণ হয়। পিতাকে পাওয়া যায় না, কিন্তু পিতৃবৈভব পাওয়া যাইতে পারে; আর পিতৃ হন্তাকে দণ্ডিতও করা যায়। কিন্তু সেই পিতৃহন্তা বৈভবাপহারী আবার মাতাকে স্বীয় শয্যাভাগিনী করিয়াছে;—এই শেষ ক্ষতির কি কিছু পূরণ আছে গা! মাতা দুশ্চারিণী বলিয়াই ধীর, স্থির, গম্ভীর প্রকৃতির হামলেট দুশ্চিন্তায় অবসন্ন। পিতৃব্যের দুষ্কৃতি ও মাতার দুশ্চরিত্র ভাবিয়া ভাবিয়া হামলেট্ পাগল বল, চিন্তাপ্রিয় বল, দার্শনিক বল, কবি বল, পাপী বল, অকর্ম্মণ্য বল, mystic বল, দুজ্ঞেয় বল, বিশ্বাসহীন বল, যাহা বল, তাহাই হইয়াছেন।

মহাপাপের পরিণাম সর্ব্বত্র একরূপ হইলেও, মূলের বিভিন্নতা বশত প্রসরে ও বিস্তারে পরিণামের বিভিন্ন মূর্ত্তি হয়। এই কথাটি বুঝাইবার জন্য শেক্‌স্‌পীয়র একই রূপ কাহিনী লইয়া দুই খানি পৃথক্ নাটক লিখিয়াছেন।

ম্যাক্‌বেথ ও হামলেট নাটকের একই মূল কথা—রাজ্যলোভে রাজহত্যা। ম্যাক্‌বেথ সমালোচনায় দেখাইয়াছি, যে মূল কাহিনীতে আরও ঐক্য ছিল, শেক্সপীয়র তাহা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আদি কাহিনীদ্বয়ের মূল কথা—রাজ্য লোভে রাজহত্যা, পরে কাম মোহে গুর্ব্বিণীগমন। * কিন্তু ম্যাকবেথ নাটকে কবি এই শেষ ভাগ পরিত্যাগ করিয়াছেন। মূলে বিভিন্ন করিয়াছেন, কাজেই পরিণাম বিভিন্ন হইয়াছে। একটী কথা ভাগাভাগী করিয়া দুই নাটকে দেখান হইয়াছে।

এক ভাগ দেখাইয়াছি, আর এক ভাগের কথা বলিব। পূর্ব্বে বলিয়াছি, পাপের উৎপত্তি ও পরিপুষ্টির বিবরণ হামলেট নাটকে মুখ্যভাবে দেখান হয় নাই, গৌণভাবে হইয়াছে। অনুগৃহীত অনুজ রাজ্যের উপর

---

* ৪র্থ ভাগ নবজীবনে ৩৫৪ পৃষ্ঠা।

লোভ পরবশ হইয়া, রাজ মহিষীর উপর কাম পরবশ হইয়া অগ্রজ সহোদর রাজাকে সুপ্তাবস্থায় হত্যা করিয়া রাজ্য করগত এবং রাজমহিষীকে শয্যা-ভাগিনী করিল। সেই সাঙ্গোপাঙ্গ পূর্ণাবয়ব পাপ দিনামার ভূমির রাজ-মূর্ত্তিতে সিংহাসন অধিষ্ঠিত হওয়ার পরে, হামলেট নাটকের আরম্ভ।

মাক্‌বেথ নাটকের প্রথমেই তিনটা ডাকিনী বা প্রেতিনীর আবির্ভাব। সেই গুলাকে আমরা মাক্‌বেথের মূর্ত্তিমতী দুরাকাঙ্ক্ষা বলিয়া বুঝিয়াছি, হামলেট্ নাটকের ঠিক প্রথমেই না হউক, প্রথমাঙ্কের প্রথম দৃশ্যেই প্রেতের আবির্ভাব।—কি বালাই!

ভূত প্রেত,—কুসংস্কারাবিষ্টা, বর্ণজ্ঞান-বিরহিতা, একমাত্র বস্ত্রা, বর্ব্বর-জননী ঠাকুরমার—গল্পেই থাকিবে, অজ্ঞান অন্ধকারাচ্ছন্ন বঙ্গপল্লীর শ্মশান নিকটস্থ বটতলায়—থাকিবে, মহামতি মেকলে কর্ত্তৃক বিশদ বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় প্রমাণীকৃত অধম যে বাঙ্গালী, তাহাদিগের অন্ধ বিশ্বাসে—থাকিবে,—এ হেন সুসভ্য ইংরাজ জাতি যে শেক্‌সপীয়রের এখনও গৌরব করেন, আপনাদের জাতীয় ধন বলিয়া যাহার নাটকের পরিচয় দেন, সেই শেক্সপী-য়রের মহামহা নাটকের গোড়াতেই ভূত প্রেতের কাণ্ড—কি বালাই গা—লজ্জা করে যে ;—

তা লজ্জা হইলে, আর কি করা যায়, ভূতের কথা, প্রেতের আবির্ভাব যখন শেক্সপীয়রের নাটকে রহিয়াছে, তখন সেই গুলার বিষয় আমাদের ভাবিয়া চিন্তিয়া দেখিতেই হইতেছে।

প্রথম ভাবনা—যে সকল ভূত প্রেত ডাকিনীর কথা শেক্সপীয়রের নাটকে আছে—সে গুলা কি কেবল আধ্যাত্মিক পদার্থ (Merely subjective) বা তাহাদের মধ্যে আধিভৌতিকতাও (Objectivity) আছে? অন্য নাটক-গুলি এখন বাদ দিয়া যে দুই খানি লইয়া আমরা এখন বিব্রত, সেই দুই খানি হইতেই ঐ প্রশ্নের মীমাংসা করিবার চেষ্টা করা যাউক।

দেখা যায়, যে সমালোচ্য নাটক দুই খানিতে শেক্সপীয়র প্রধানত দুই ভাবে ভূত প্রেতের আবির্ভাব করিয়াছেন ;—

(১) যেমন বাঙ্কোর ভূত। এই প্রেতমূর্ত্তি কেবল মাকবেথ চক্ষেই দৃশ্যমান। কথা কহে না, কোন কার্য্যই করে না—হয়ত কেবল ঘাড় নাড়ে। কিন্তু সমস্তই কেবল মাক্‌বেথের দৃষ্টিপথে; উপস্থিত অন্য সকলে কিছুই দেখিতে পায় না।—কাজেই

যে ভূত দেখিতে পাইতেছে, সে খেয়াল দেখিতেছে মনে করে। এইরূপ দৃশ্য সম্বন্ধে আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি—বিশেষ পুণ্যাত্মাগণ এবং অতি বড় পাপাত্মারা অলৌকিক ভাবে চক্ষুষ্মান হন। একের পক্ষে অলৌকিক দৃশ্য সকল, পুণ্যের পরিণাম এবং সুখের আবহ। অন্যের পক্ষে সেইরূপ ঐ সকল দৃশ্য—পাপের পরিণাম এবং যাতনার বিভীষিকা। এই সকল অলৌকিক দৃশ্য, তোমরা খেয়াল বলিতে চাও, কল্পনা বলিতে চাও, বল, কিন্তু কিছু নয় বলিও না। স্পষ্টত বিশেষ পুণ্যে বা পাপে যাহার উৎপত্তি এবং পুরস্কার বা দণ্ডদানের জন্য যে সকলের বিধান, সে গুলি কিছুই নয় কেমন করিয়া বলিব! পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাহার দণ্ডবিধান আছে। বাঙ্কোর ঐ প্রেতমূর্ত্তি সেই দণ্ড বিধানের অঙ্গীভূত; উহা যে কিছুই নয়, তাহা কেমন করিয়া বলিব? এই সকল দৃশ্য, সকলের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য নয় বলিয়া তোমরা যদি ঐ গুলি আধিভৌতিক (objective) নহে, বলিতে চাও, বল, কোন বিশেষ ব্যক্তির ভাল বা মন্দ আবেগ হইতে উদ্ভূত মনে করিয়া, এবং তাহারই মনের উপর সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কার্য্য করে, ইহা দেখিয়া ঐ গুলিকে আধ্যাত্মিক (subjective) বলিতে হয় বল; অথবা পাপ পুণ্যের দণ্ড পুরস্কারের দৈববিধানের অঙ্গীভূত বুঝিয়া ঐ গুলিকে আধিদৈবিক (divine dispensation) বলিতে হয় বল, কিন্তু ও গুলি যে বিশেষ কিছু, তাহা বলিতেইহইবে।

(২) যেমন হামলেটের পিতার প্রেতমূর্ত্তি। তাহা বিশেষ সময়ে বিশেষ স্থানে আবির্ভূত হয়, কথা কহে, চোখ রাঙ্গায়, হাতছানি দিয়া ডাকে, নিভৃতেআলাপ করে এবং এ গুলি সকলেই দেখিতে পায়। ইহাকে যদি আধিভৌতিক না বলিবে, তবে তোমার আমার ভিতরেও আধিভৌতিকতা নাই। এইরূপ ভূতের ব্যাপার ও ব্যাখ্যা হামলেট নাটকের সমালোচনায় আমাদিগকে সবিস্তারে বলিতে হইবে; এখন কেবল একটী কথা বলিয়া রাখি; এই প্রত্যক্ষ পরিদৃশ্যমান ভূতই আবার তৃতীয় অঙ্কের চতুর্থ দৃশ্যে হামলেটের মাতার ইন্দ্রিয়গোচর নহে; তিনি সে ভূত দেখিতে পান না—তাহার কথাও শুনিতে পান না—কেন এই রূপ হইয়াছে, তাহা সেই স্থলে বুঝিবার চেষ্টা করা যাইবে।

এই দুই প্রকারের মধ্যবর্ত্তী আর এক রূপ ব্যাপারও শেক্সপীয়রে দেখিতে পাওয়া যায়। যেমন ম্যাকবেথ নাটকের ডাকিনীগুলা—আমরা বলিয়াছি, সে গুলা মূর্ত্তিমতী দুরাকাঙ্ক্ষা। আর ম্যাকবেথ ও বাঙ্কো সমধর্ম্মী বলিয়াই, তাহাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল, কিন্তু তাহাদের ভবিষ্যদ্বাণীও কি কেবল দুরাকাঙ্ক্ষার ফল,? তাহা কে বলিবে?

উহাদের মুখ নিঃসৃত ভবিষ্যদ্বাণীর কথা ভাবিলে, ঐ গুলাকে কিয়ৎ পরিমাণে দৈবশক্তি সম্পন্ন বলিয়াই বোধ হয়; এবং সে হিসাবে উহারা আধিদৈবিক পদার্থ বলা যাইতে পারে। এইরূপ শ্রেণী বিভাগে ভূতপ্রেতিনী তিন রূপ হইল—সেই সাবেক দার্শনিক বিভাগ—আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। এইরূপ দার্শনিক নাম করণ হইল বলিয়া কেহ যেন মনে না করেন, যে যাহাকে আমরা আধ্যাত্মিক ভূত বলিতেছি, তাহাতে আধিভৌতিকতা নাই, অথবা আধিভৌতিক ভূতে আধ্যাত্মিকতা নাই। সকল ভূতই দেখা যায়, বা দেখা না গেলেও তাহাদের কথা শুনা যায়, সুতরাং সে হিসাবে সকল ভূতই আধিভৌতিক। অমনই করিয়া বুঝিলে, সকল ভূতই আধ্যাত্মিক এবং হয়ত আধিদৈবিকও হয়। বিশেষ প্রকৃতি দেখিয়া নাম করণ হয়—সামান্য ভাবে সকলই এক—পৃথক্ নাম করণ হয় না। বারাসতের শ্রীযুক্ত কালিকৃষ্ণ মিত্র একটি আধ্যাত্মিক লোক বলিলে এমন বুঝায় না তাঁহার ভৌতিক দেহ নাই—এই বুঝায় যে আধ্যাত্মিকতা তাঁহাতে খুব বেশী। ভাষার ব্যবহার এই রূপেই হইয়া থাকে।

শেক্সপিয়ারের আধিভৌতিক ভূতের ব্যাখ্যা শেক্সপিয়র স্বয়ং করিয়াছেন—আমাদিগের মত পাণ্ডিত্যাভিমানী ভূয়োদর্শন-বিহীন মূর্খদিগের জন্য। সে এক বড় বিচিত্র মুন্সীয়ানা। নাটকের ঘটনা স্রোত চলিয়াছে—তাহাতে নাটকোপযোগী চরিত্র গঠিত হইতেছে,—আর এই মহা নাটকের মহোপকরণ আধিভৌতিক ব্যাপারের অল্প অল্প ব্যাখ্যা হইতেছে—অথচ ব্যাখ্যা যে চলিয়াছে তাহা ধরা যায় না।

সকল ব্যাখ্যার সার কথা প্রথমাঙ্কের শেষ ভাগে আছে;—

There are more things in heaven and earth, Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy.

স্বর্গে মর্ত্তে কত বস্তু দেখ বিদ্যমান,
স্বপ্নেও বিজ্ঞান তার না পায় সন্ধান।

যে philosophy, দর্শনই বল, আর বিজ্ঞানই বল, যে অপরা বিদ্যাকে লক্ষ্য করিয়া ঐ কথা বলা হইয়াছে, আমাদের মত লোকে যাহারা সেই বিদ্যার অভিমানী, তাঁহাদের পক্ষে মহাদার্শনিক শেক্ষপিয়রের ঐ গভীর উপদেশ নিত্য জপের মন্ত্র হওয়া উচিত। সমস্ত অপরা বিদ্যাই মোহজড়িত, অভিমানের আশ্রয়স্থলী, অহঙ্কারের সরণি। তাহার উপর য়ুরোপীয় নীতি মিশ্রিত য়ুরোপীয় দর্শনবিদ্যা, অভিমানের, অহঙ্কারের, বাচালতার, চঞ্চলতার মায়াময়ী ধাত্রী। আমরা এই ধাত্রীর নিকট নাই পাইয়া, এখন এমনই বিগড়িয়া উঠিয়াছি, যে এখন স্বয়ং মাতা ক্রোড়ে করিতে চাহিলে, তাঁহার কাছে যাইতে চাহি না, ধাই মায়ের গলা জড়াইয়া কাঁদিতে থাকি, মাকে গালি দি, পা ছুড়িয়া মারিতে যাই। কিন্তু মার চেয়ে যে ভালবাসে তারে বলি ডাইন। এই ডাইনের ক্রোড় হইতে আমাদিগকে ক্রমে সরিয়া পড়িতে হইবে। কিন্তু যেমন ডাইন তাহার তেমনই ওঝা যাই। য়ুরোপীয় দর্শনের মায়া মোহ, য়ুরোপীয় কাব্য নাটকের গভীর উপদেশে, বোধ হয় কিছু কমিতে পারে। বোধ হয়, পাঠক এতদিনে ধরিতে পারিয়াছেন, যে শেক্ষপিয়রের নাটকের উপলক্ষ্য করিয়া, আমরা বিলাতী ওঝার সাহায্যে বিলাতী ডাইনের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার চেষ্টায় আছি। চেষ্টাটা যদি ভাল হয়, আমাদের বিশ্বাস, তাহাতে কখন না কখন ভাল ফল ফলিবেই।

আপাতত সেক্ষপিয়রের ঐ মূলমন্ত্র মনে রাখিলে আমরা য়ুরোপীয় দর্শনবিদ্যা রূপিনী ডাইনীর রক্ত শোষণ হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা পাইতে পারি।

মন্ত্রটি আবার বলি,—

স্বর্গে মর্ত্তে কত বস্তু দেখ বিদ্যমান,
স্বপ্নেও বিজ্ঞান তার না পায় সন্ধান।

নবজীবন।

৫ম ভাগ। | ভাদ্র ১২৯৬ সাল। | ১২শ সংখ্যা।

পাতঞ্জল যোগসূত্রম্।

বিতর্ক বাধনে প্রতিপক্ষভাবনং ॥ ৩৩ ॥

পদচ্ছেদঃ। বিতর্ক—বাধনে, প্রতিপক্ষ ভাবনং।

পদার্থঃ। বিতর্ক্যন্তে ইতি বিতর্কাঃ হিংসাদয়ঃ, তৈর্বাধনে সতি প্রতিপক্ষ-ভাবনং উত্তরসূত্রে বক্ষ্যমাণং।

অন্বয়ঃ। বিতর্ক বাধনে (সতি) প্রতিপক্ষভাবনং কুর্য্যাদিতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদা বিতর্কা হিংসাদয়ো বাধেরন্ তদা বক্ষ্যমাণরীত্যা প্রতিপক্ষভাবনং কুর্য্যাৎ।

অনুবাদ। হিংসাদি বিতর্ক দ্বারা বাধা উপস্থিত হইলে, পর সূত্রোক্ত প্রতিপক্ষভাবন করিবে।

সমালোচন। যখন যোগার্থীর হিংসাদি দ্বারা বাধা উপস্থিত হয় অর্থাৎ যখন তাহার মনে হয় আমি অবশ্যই আপনার স্বার্থ সিদ্ধির জন্য জীবহত্যা করিব, মিথ্যা কথা বলিব, পরের দ্রব্য অপহরণ করিব, পরস্ত্রীর সহিত ব্যভিচার করিব, পরের নিকট হইতে উত্তম উত্তম ভোগ্য বস্তু গ্রহণ করিব, "পরের ধনে বরের বাপ" হইয়া বসিব,—এইরূপে যখন অত্যন্ত প্রবল হিংসাদির মোহিনী শক্তি দ্বারা চিত্ত বিমোহিত হওয়ায় উন্মার্গগমনে প্রবৃত্তি হইতে থাকে,

তখন আত্মরক্ষার্থ হিংসাদির প্রতিপক্ষের চিন্তা করিবে অর্থাৎ তখন মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিবে যে, "ওঃ আমি কি নরাধম! আমি এই ঘোর সংসারাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া হিংসাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বভূতের অভয়প্রদ যোগধর্ম্মের শরণ লইয়াছি, আজ আবার হিংসাদিকে ভাল বিবেচনা করিয়া তাহাদের সেবায় প্রবৃত্ত হইয়াছি! তবে আমাতে আর কুক্কুরে ভেদ কি? কুক্কুরেরা যেমন উদ্গার করিয়া উদ্গীর্ণ বস্তুর পুনঃ আস্বাদন করে, আমার এই কার্য্যটি ঠিক সেইরূপ হইতেছে।" মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিলে প্রতিপক্ষ ভাবন হয়। অথবা প্রতিপক্ষভাবন কিরূপে হয়, তাহা গ্রন্থকার স্বয়ং পরসূত্র দ্বারা ব্যক্ত করিতেছেন।

বিতর্কা হিংসাদয়ঃ কৃতকারিতানুমোদিতা লোভক্রোধ-মোহপূর্ব্বকা মৃদুমধ্যাধিমাত্রা দুঃখাজ্ঞানানন্তফলা ইতি প্রতি-পক্ষভাবনম্। ৩৪॥

পদচ্ছেদঃ। বিতর্কাঃ, হিংসাদয়ঃ, কৃতাঃ-কারিতা-অনুমোদিতাঃ, লোভ-ক্রোধ-মোহপূর্ব্বকাঃ, মৃদু-মধ্য-অধিমাত্রাঃ, দুঃখ-অজ্ঞান-অনন্তফলা, ইতি প্রতিপক্ষভাবনং।

পদার্থঃ। বিতর্কাঃ বিতর্কশব্দপ্রতিপাদ্যাঃ কে তে ইত্যাহ হিংসাদয়ঃ হিংসা আদির্যেষাং তে, তেহি ত্রিবিধাঃ কৃতাঃ, স্বয়ংকৃতাঃ, কারিতাঃ প্রয়োজকভাবেন, নিষ্পাদিতাঃ, অনুমোদিতাঃ অন্যেন ক্রিয়মাণাঃ সাধুসাধ্বিত্যঙ্গীকৃতাঃ, লোভ-স্তৃষ্ণা, ক্রোধঃ কৃত্যাকৃত্যাবিবেকোন্মূলক জ্বলনাত্মকশ্চিত্তস্য ধর্ম্ম বিশেষঃ, অজ্ঞানং, মোহঃ তৎপূর্ব্বিকাঃ তৎকারণকাঃ, মৃদবোমন্দাঃ, মধ্যা ন মন্দা ন তীব্রা, অধিমাত্রা তীব্রা, তথা দুঃখাজ্ঞানান্তর্ফলা, দুঃখং প্রতিকূলতয়া বেদনীয়োরাজসশ্চিত্তধর্ম্মঃ অজ্ঞানং ভ্রান্তিঃ, তএব অনন্তংর্ফলং যেষাং তে, ইতি অনেন প্রকারেণ প্রতিপক্ষভাবনং বিপরীত চিন্তা।

অন্বয়ঃ। কুর্য্যাদিতি শেষঃ।

অনুবাদ। বিতর্ক হিংসাদি, তাহারা তিন প্রকার স্বয়ংকৃত, অন্যদ্বারা কারিত এবং অনুমোদিত, লোভ, ক্রোধ এবং মোহ এই তিন প্রকার কারণ হইতে উৎপন্ন, তাহাদের প্রকারও ত্রিবিধ মৃদু, মধ্য এবং তীব্র; তাহাদের

মুল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান;—এইরূপে চিন্তা করত হিংসাদি হইতে নিবৃত্ত হইয়া অহিংসাদির স্মরণের নাম প্রতিপক্ষভাবন।

সমালোচন। প্রতিপক্ষ ভাবন—বিরোধীর চিন্তা; যখন হিংসাদি আসিয়া চিত্তকে অধিকার করিবে, তখন হিতার্থী ব্যক্তি উহাদিগের হাত হইতে রক্ষা পাইবার নিমিত্ত উহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদের বিপক্ষের স্মরণ করিবে। কোন বস্তু পরিত্যাগ করিতে হইলে তাহার দোষ দর্শন করিতে হয়, বস্তুর দোষ দর্শন করিলে তাহার উপর বিরক্তি হয় কাযেই সহজে উহা পরিত্যাগ করা যায়। এই নিমিত্ত প্রথমে চিন্তা করিবে, হিংসাদি কত রকমে হইতে পারে, তাহার পর ঐ হিংসাদিই বা কত প্রকার, তাহার পর উহাদের কারণ বা মুল কি? পরিশেষে তাহাদের ফলের বিষয় চিন্তা করিবে। এইরূপ চিন্তায় যদি তাহারা হেয় বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, তবে তাহাদের বিপক্ষের চিন্তন সহজেই হইয়া উঠে। হিংসাদি সামান্যত স্বহস্তে অনুষ্ঠান, পরকে প্রেরণ, অথবা অপরের হিংসাদির অনুমোদন—এই তিন রকমে হইতে পারে, কেবল নিজে মাছ ধরিলে যে হিংসা হইবে তা নয়, জেলের দ্বারা মাছ ধরাইলেও হিংসা হইবে, অথবা কাহাকে একটা বড় মাছ ধরিয়া তুলিতে দেখিয়া সাবাস বলে বাহবা দিলেও হিংসা হইবে। হিংসাদির প্রকারও ত্রিবিধ—মৃদু (অল্প), মধ্য এবং অধিমাত্র (অধিক বা তীব্র)। কেহ কেহ বলেন ইহাদের প্রত্যেকে আবার মৃদু, মধ্য, অধিমাত্র, ভেদে তিন প্রকার অর্থাৎ মৃদু মৃদু, মৃদুমধ্য, মৃদু অধিমাত্র, মৃদুমধ্য, মধ্য মধ্য, অধিমাত্র মধ্য, মৃদু অধিমাত্র, মধ্য অধিমাত্র এবং অধিমাত্র অধিমাত্র। ফল কাল দেশ, পাত্র অনুসারে কার্য্যমাত্রেরই অবস্থা নানাবিধ হইতে পারে। এক্ষণে দেখ ঐ হিংসাদি যে রকমেই অনুষ্ঠিত হউক, আপনার দ্বারা, পরের দ্বারা, অথবা অনুমোদন করিয়া, ইহারা কখন সদভিপ্রায় মুলক নহে; উহারা নয় লোভমুলক, নয় ক্রোধ মুলক, না হয় অজ্ঞান মুলক; যেখানে হিংসা, মিথ্যা-কথা, পর-দ্রব্য-অপহরণ ইত্যাদি কার্য্য অনুষ্ঠিত হইতে দেখিবে, সেই খানেই জানিবে, সেই সেই কার্য্যের অনুষ্ঠাতা হয় প্রবল বিষয় তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া, কিম্বা অত্যন্ত প্রদীপ্ত ক্রোধে অধীর হইয়া, না হয় ঘোর অজ্ঞানে অভিভূত হইয়া, ঐরূপ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেছেন। তিনি কখন সৎ অভিপ্রায় বা বুদ্ধির বশীভূত হইয়া এরূপ কার্য্যের

অনুষ্ঠান করিতেছেন না। এক্ষণে দেখা গেল, যখন নিন্দনীয় লোভাদি বৃত্তির বভূশীভূত মনুষ্যই হিংসাদির অনুষ্ঠান করে, তখন হিংসাদিও নিন্দনীয় কার্য্য সে বিষয় সন্দেহ নাই। দেখা যাউক উহাদের ফল কি? ফল অনন্ত দুঃখ এবং অনন্ত অজ্ঞান। এইরূপ আলোচনা দ্বারা হিংসাদিকে পরিত্যাগ করিয়া উহাদের প্রতিপক্ষ অহিংসাদির অনুষ্ঠান করা উচিত,—এইরূপ বিবেচনার নাম প্রতিপক্ষভাবন।

অহিংসা প্রতিষ্ঠায়াং তৎসন্নিধৌ বৈরত্যাগঃ। ৩৫ ॥

পদচ্ছেদঃ। অহিংসা-প্রতিষ্ঠায়াং, তৎ-সন্নিধৌ, বৈর-ত্যাগঃ।

পদার্থঃ। অহিংসা উক্তরূপা, তস্যাঃ প্রতিষ্ঠায়াং স্থিরতায়াং সত্যাং তৎসন্নিধৌ অহিংসা প্রতিষ্ঠাসমীপে বৈরত্যাগঃ সহজকৃত্রিমোভয়বিধশত্রুতা পরিহারঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

অনুবাদ। অহিংসার স্থিরতা হইলে শত্রুতার উন্মূলন হয়।

সমালোচন। আমাদের চিত্তে যতক্ষণ হিংসা বৃত্তির প্রবলতা থাকে, ততক্ষণ শত্রুতাও প্রবল থাকে। এমন কি বিনা কারণেও শত্রুতা উৎপন্ন হয়। পরে হিংসার নিবৃত্তি হইয়া অহিংসা স্থিরতা লাভ করিলে, শত্রুতা আপনা হইতেই উন্মূলিত হয়।

সত্যপ্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়াফলাশ্রয়ত্বং। ৩৬ ॥

পদচ্ছেদঃ। সত্য-প্রতিষ্ঠায়াং ক্রিয়া-ফল-আশ্রয়ত্বং।

পদার্থঃ। সত্যশ্চ পূর্ব্বোক্তস্বরূপস্য প্রতিষ্ঠায়াং স্থৈর্য্যে সতি ক্রিয়াধর্ম্মঃ তস্যাঃ ফলং স্বর্গাদিঃ তয়োরাশ্রয়ত্বং।

অন্বয়ঃ। সর্ব্বপ্রাণিনাং সত্যনিষ্ঠস্য বচনাদ্ভবতীতি শেষঃ।

অনুবাদ। সত্য স্থিরতা প্রাপ্ত হইলে ক্রিয়ার সফলতা হয়।

সমালোচন। পতঞ্জলির ভাষ্যকার এবং বৃত্তিকার (ভোজরাজ) এই সূত্রের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা করেন। আমরা ভাষ্যকারের ব্যাখ্যা অনুসারে পদার্থাদি দেখাইলাম; ভাষ্যকার বলেন, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্য অনুসারে লোক ক্রিয়া বা তাহার ফল প্রাপ্ত হয়, তিনি যাহাকে বলেন, 'তুমি ধার্ম্মিক হও' অমনি সে

ধার্ম্মিক হয়, তিনি যাহাকে বলেন 'তুমি ধর্ম্মের ফল স্বর্গাদি প্রাপ্ত হও' অমনি সে স্বর্গাদি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্য অব্যর্থ হয়। বৃত্তি-কার বলেন ক্রিয়া শব্দের অর্থ যজ্ঞাদি, তাহার ফল স্বর্গাদি সত্যনিষ্ঠ মনুষ্য নিজে কোন কার্য্য না করিলেও, তাহার ফল প্রাপ্ত হয়।

আমরা বলি, এখানে যদি ক্রিয়া শব্দের অর্থ বাক্য উচ্চারণ ক্রিয়া বলা যায় তাহা হইলে অর্থটি অতি বিশদ হয় অর্থাৎ তাহার বাক্য উচ্চারণ ক্রিয়া ফলবতী হয়, সে যাহা বলে তাহাই সিদ্ধ হয়। ভাষ্যকারও পরিশেষে, এইরূপ ব্যাখ্যা যে তাঁহার সম্মত, তাহার আভাসও দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন "অমোঘা চাস্য বাগ্ ভবতীতি।" তাহার বাক্য অব্যর্থ হয়। আর এইরূপ ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত সঙ্গত, কারণ সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তির বাক্যের সফলতা লাভই মুখ্য ফল, তবে সফলতা জন্য ধার্ম্মিকতা বা স্বর্গাদি লাভ নিজের ও পরেরও হইতে পারে। তিনি ক্রিয়া অনুষ্ঠান ব্যতীত নিজের বা পরের জন্য যেরূপ ফল কামনা করিবেন, তাহাই সিদ্ধ হইবে।

অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং সর্ব্ব রত্নোপস্থানম্। ৩৭॥

পদচ্ছেদঃ। অস্তেয় প্রতিষ্ঠায়াং, সর্ব্ব রত্ন উপস্থানম্।

পদার্থঃ। অস্তেয়স্য উক্ত রূপস্য প্রতিষ্ঠায়াং স্থৈর্য্যে সতি সর্ব্বেষাং রত্না-নাং উপস্থানং উপস্থিতির্ভবতি। অথবা সর্ব্বাভ্যাদিগ্‌ভ্যো রত্নান্যস্যোপ তিষ্ঠন্তে ইতি সর্ব্ব রত্নোপস্থানং।

অন্বয়ঃ। ভবতীতিশেষঃ।

অনুবাদ। অস্তেয় স্থিরতা লাভ করিলে, সকল দিক্ হইতে রত্নেরা আপনিই উপস্থিত হয়।

সমালোচন। কি ভাষ্যকার কি বৃত্তিকার, সকলেই এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন;—অভ্যাস বশত যোগী যখন অস্তেয়ে স্থিরতা লাভ করেন, আর কখনই স্তেয়ের দিকে তাঁহার মন ধাবিত হয় না, তখন তাঁহার নিকট সকল দিক্ হইতে রত্ন সকল আসিয়া উপস্থিত হয়। বাস্তবিক কি তাই? আমাদের বোধ হয়, ইহা একটু রূপকে বলা হইয়াছে; অস্তেয়ের দিকে মন না যাওয়া— এক প্রকার তৃষ্ণা শূন্য হওয়া; কারণ যতক্ষণ বিষয় তৃষ্ণা বলবতী থাকিবে, ততক্ষণ

ছলে বলে কৌশলে, কোন না কোন রূপে, পরের বস্তু আত্মসাৎ করিতে ইচ্ছা হয়ই হয়। আমরা ইহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, একজন পরম ধার্ম্মিক বলিয়া প্রসিদ্ধ লোকের আমাদের একটা জমির পার্শ্বে খানিকটা ভূমি আছে। তিনি নিজের ভূমি খণ্ডে সর্ব্ব ভূত হিতার্থে একটি জলাশয় খনন করিতে অভিলাষী হইয়া, আমাদিগকে বলেন, যে ঐ পুষ্করিণী হইতে যে মাটী উঠিবে তাহা তোমাদিগের ভূমিতে নিঃক্ষেপ করিলে, তোমাদিগের ভূমির উৎপাদনী শক্তির বৃদ্ধি হইবে; আমরা তাহাতে সম্মত হইলাম এবং ঐ কার্য্যের সুবিধার জন্য উভয় ভূমির মধ্যস্থিত বেড়া উঠান আবশ্যক হওয়ায় তাহাও উঠান হইল। তিনিও কিছু মাটী ফেলিলেন বটে, তাহা আবার নিজের প্রয়োজন বশত উঠা-ইয়া লওয়াও হইল; তবে উভয় জমীর সীমা নির্দ্দেশ চিহ্ন গুলি একেবারে বিলুপ্ত রহিল। কাযেই মধ্যস্থিত বেড়া, যাহা তিনি নিজেই দিয়া ছিলেন পুনর্ব্বার দেওয়া হইল, তখন আমরা স্পষ্টই বুঝিলাম যেন উহা ঠিক্ মধ্যস্থলে দেওয়া হইল না, ৩।৪ অঙ্গুলি আমাদের স্কন্ধে চাপিল। আমরা বিশ্বাস করি, তিনি স্তেয় করিবার লোক নন এবং ইচ্ছা পূর্ব্বক যে আমাদের ঐ ৪ অঙ্গুলি জমী অপহরণ করিয়াছেন, তাহাও নহে, তবে প্রবল বিষয় তৃষ্ণার অনুরোধে এইরূপ ভ্রম ঘটিয়াছে। বিষয় তৃষ্ণা থাকিতে স্তেয়ের হাত হইতে পরিত্রাণ পাওয়া দুষ্কর। স্তেয়ের নিবৃত্তি হইলে বিষয় তৃষ্ণারও নিবৃত্তি হয়। তৃষ্ণা নিবৃত্তি হইলে সন্তোষ। সকল দিক্ হইতে সকল প্রকার রত্ন সর্ব্বদা হস্তে আসিলে, যেরূপ আনন্দ, তৃষ্ণা নিবৃত্তি জন্য সন্তুষ্ট চিত্তের বরং তদপেক্ষা অধিক আনন্দ। তাই সূত্রকার এখানে রূপক করিয়া বলিলেন, অস্তেয়ের স্থিরতা হইলে, সকল দিক্ হইতে রত্নের উপস্থিতি হয়। এই সূত্রের এইরূপ অভিপ্রায়ও প্রকাশ করা যাইতে পারে, যে যাহারা স্তেয় হইতে একেবারে নিবৃত্ত, তাহাদের দ্বারা আর প্রবঞ্চনা বা প্রতারণা হইবার ভয় নাই। তাহারা সকলের বিশ্বাস পাত্র হয়, সকলেই সকল প্রকার ধন তাহাদের নিকট গচ্ছিত রাখে। এরূপ নানাবিধ ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। যাহা হৌক রূপক অর্থ যে সর্ব্বাপেক্ষা রুচি কর এবং যুক্তি সঙ্গত সে বিষয় কোন সন্দেহ নাই। কারণ স্তেয় পরায়ণ প্রবল তৃষ্ণায় অভিভূত হইয়া সর্ব্বদা সকল দিক্ হইতে সকল প্রকার উপায় দ্বারা সর্ব্ববিধ

রত্ন আত্মসাৎ করিতে কামনা করিতে ছিল। তাহার সঙ্কল্প পৃথিবীর যাবতীয় রত্ন আত্মসাৎ করিতে পারিলেই সুখ লাভ হইবে। স্তেয় হইতে একেবারে নিবৃত্তি হইলে, তাহার সেই কামনানল একেবারে নির্ব্বাপিত হয়, সকল দিক্‌ হইতে সকল প্রকার রত্নের যুগপৎ সমাগম হইলে, যে আনন্দ হইত, কামনার নিবৃত্তিতে ও সেই রূপ আনন্দ হয়।

ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং বীর্য্যলাভঃ। ৩৮ ॥

পদচ্ছেদঃ। ব্রহ্মচর্য্য প্রতিষ্ঠায়াং, বীর্য্য লাভঃ।

পদার্থঃ। উক্ত রূপচ ব্রহ্মচর্য্যাচ প্রতিষ্ঠায়াং স্থৈর্য্যে সতি বীর্য্যশ্চ সামর্থ্যশ্চ তয়োর্লাভঃ প্রাপ্তিঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যঃ কিল ব্রহ্মচর্য্যং অভ্যস্যতি তস্য তৎ প্রকর্ষান্নিরতিশয়ং বীর্য্যং শক্তি বিশেষঃ আবির্ভবতি। ইতি ভাবঃ

অনুবাদ। ব্রহ্মচর্য্যের স্থিরতা হইলে বীর্য্যোৎকর্ষ উৎপন্ন হয়।

সমালোচন। ব্রহ্মচর্য্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। যে কার্য্যে বীর্য্য ক্ষয়ের অববোধ হয়, তাহার নাম ব্রহ্মচর্য্য। বীর্য্যই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব সম্পাদক। বীর্য্যই শারীরিক শক্তির পুষ্টি করে এবং মানসিক জ্ঞানের উন্নতি করে। এই জন্য ভাষ্যকার বলেন, ব্রহ্মচর্য্য স্থির হইলে বীর্য্য লাভ হয়। ঐ বীর্য্য আমাদের জ্ঞান ও ক্রিয়া শক্তির উৎকর্ষ সাধন করে। ব্রহ্মচারী যে নিজেই জ্ঞানী হন এমন নহে, তিনি নিজের দৃষ্টান্তে অপরকেও জ্ঞানী করেন। এ কথা সহৃদয় মাত্রেই জ্ঞাত আছেন সুতরাং অধিক আলোচনার আবশ্যক নাই। তবে এই টুকু বলা আবশ্যক ব্রহ্মচারী বলিতে হঠাৎ যে কষায় বস্ত্র পরিধানে দাড়ি গোঁপধারী, রুক্ষ কেশ, খড়ম পেয়ে, চিমটা হস্তে এইরূপ একটা বিকটাকার মানুষ মনে হইতে পাবে, এখানে তাহাদের কথা বলা হয় নাই। এখানে বাহ্যাড়ম্বর শূন্য, বিনম্র, বিনয়ী ও জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিকে ব্রহ্মচারী বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

অপরিগ্রহ স্থৈর্য্যে জন্ম কথন্তাসম্বোধঃ। ৩৯ ॥

পদচ্ছেদঃ। অপরিগ্রহ-স্থৈর্য্যে, জন্মকথন্তা-সম্বোধঃ।

পদার্থঃ। উক্ত পূর্ব্বস্থ অপরিগ্রহস্য স্থৈর্য্যে স্থিরতায়াং সত্যাং কথং মিত্যস্থভাবঃ কথন্তা, জন্মনঃ পূর্ব্বজন্মনঃ কথন্তা তস্যাঃ সম্বোধঃ সম্যগ্ জ্ঞানং।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি।

ভাবার্থঃ। অপরিগ্রহাভ্যাসবন্তো জন্মান্তরে কোহমাসং কীদৃশঃ ইত্যাদি জিজ্ঞাসায়াং সর্ব্বমেব প্রতিভাতং ভবতি। ইতিভাবঃ।

অনুবাদ। অপরিগ্রহের স্থিরতা হইলে পূর্ব্ব জন্মের অবস্থাদির বিষয় সম্যক্ উদ্বোধ হয়।

সমালোচন। ভাষ্যকার বলেন অপরিগ্রহের স্থিরতা হইলে, কেবল পূর্ব্ব জন্মে আমি কিরূপ ছিলাম, কেনইবা ছিলাম, সেইরূপ জ্ঞান হয় এমন নহে, বর্ত্তমান জন্মে কি হইয়াছি এবং কেনইবা একপ হইয়াছি, ভবিষ্যতে কি হইব কেনই বা সেরূপ হইব, এসকল বিষয়েরও সম্যক্ জ্ঞান হয়। কেন যে ওরূপ হয়, সে কথা তিনিও বলেন নাই, আমরাও বুঝি নাই সুতরাং এ সূত্রের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় আমরা অপারগ হইলাম। তবে বিজ্ঞান ভিক্ষু বলেন চিত্ত যদিও স্বভাবত সর্ব্বার্থগ্রহণে সমর্থ, তথাপি পরিগ্রহ সঙ্গবশত উহার সে শক্তি থাকেনা। পরিগ্রহের নিবৃত্তি হইলে পুনর্ব্বার সেই শক্তির যোগ হয়। ফল যাচ্ঞা করিয়া হউক, অমনিই হউক, দান গ্রহণ করিলে চিত্তের যে কিয়ৎপরিমাণে সঙ্কোচ হয়, ইহা আমরা বুঝিতে পারি, দান গ্রহণ না করিলে চিত্তের যে স্ফূর্ত্তি থাকে, তাহাও বুঝিতে পারি, এতদ্ভিন্ন আমরা আর কিছুই বুঝিতে পারি না।

যমের কথা বলা হইল এক্ষণে নিয়মের কথা বলিতেছেন।

শৌচাৎ স্বাঙ্গজুগুপ্সা পরৈর সংসর্গঃ। ৪০॥

পদচ্ছেদঃ। শৌচাৎ, স্ব-অঙ্গ-জুগুপ্সা, পরৈঃ, অসংসর্গঃ।

পদার্থঃ। শৌচাৎ পূর্ব্বোক্তরূপাৎ স্ব স্ব অঙ্গেষু অবয়বেষু জুগুপ্সা ঘৃণা তথা পরৈঃ অন্যৈশ্চ কায়বদ্ভিঃ অসংসর্গঃ সম্পর্কাভাবঃ সংসর্গপরিবর্জ্জন মিতিযাবৎ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। যঃ কিলশৌচং অভ্যস্যতি স স্বমেবকায়ং জুগুপ্সতে তত্তদবদ্য দর্শনাৎ পরকীয়ৈস্তমাভূতৈঃ কায়ৈঃ সংসর্গমনুভবেৎ, ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। শৌচ অভ্যাস হইলে, আপনার অঙ্গে ঘৃণা হয় এবং পরের সঙ্গে সংসর্গ করিতে ইচ্ছা হয় না।

সমালোচন। সহৃদয়মাত্রেই অনুভব করিয়া থাকেন, যখন আমরা গাত্র মার্জ্জন পূর্ব্বক সমুদয় শারীরিক মল প্রক্ষালন করণান্তর স্নান করিয়া ধৌতবস্ত্র পরিধান করি এবং পবিত্র স্থানে বাস করি, তখন মনে স্ফূর্ত্তি হয়, বিকাশ হয় এবং এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় আনন্দের অনুভব হয়। আর যখন আমাদের শরীর মলযুক্ত থাকে, চোখে পিঁচুটি, মুখে লাল, গায়ে ফোঁড়া, তাদিয়ে হয়ত রসগড়ায়, কাল কাপড় পরিধান করিয়া অপবিত্র স্থানে বাস করি, তখন মন স্ফূর্ত্তি হীন, মলিন এবং এক প্রকার দুঃখ অনুভব করে। যে ব্যক্তি সর্ব্বদা শৌচের অভ্যাস করে, তাহার শৌচেই আনন্দ; সে ক্ষণকালের জন্যও অল্পমাত্র অশুচি হইতে বা অশুচি বস্তু দেখিতে ভালবাসে না। সুতরাং তাহার নিজের শরীরের উপর ঘৃণা হয়, কারণ মনুষ্য শরীরের নাম পুদ্গাল, উহাকে হাজার ধৌত কর, হাজার পবিত্র কর, ক্ষণকাল অতীত হইতে না হইতে, উহা আপনা হইতেই মলিন হয়; হয় কফ বাহির হইল, নয় গয়ার উঠিল, নয় খানিকটা লাল পড়িল, নয় কোন ঠাঁই দিয়া রস গড়াইল, এতদ্ভিন্ন মল, মূত্র পিঁচুটি নির্গমন ত আছেই। যাহারা শৌচের মর্ম্ম বুঝিয়াছে, শৌচের অনুষ্ঠান করিতে শিখিয়াছে, তাহাদের নিকট এরূপ শরীর কেবল ঘৃণাস্পদ হইবে না ত আর কি হইবে? এক্ষণে দেখ শৌচাভ্যাসী মনুষ্য সর্ব্বদা প্রক্ষালন ও ঘসামাজা করিয়া ও আপনার দেহের স্বাভাবিক অশুচিতা দেখিয়া তাহার উপর ঘৃণা করে ও তখন অপরের দেহ যাহা তাদৃশ নিয়মিতরূপে ঘৃষ্ট বা মার্জ্জিত হয় না, তাহা দেখিয়া যে তাহার সঙ্গ হইতে দূরে থাকিতে ইচ্ছা করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? আমরা এখানে আর এক কথা বলিব। ভারতবর্ষে বিশেষত বঙ্গদেশে কতগুলি লোক 'শুচিবেয়ে'। তাহাদিগকে বাস্তবিক শুচি বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে না; কারণ তাহারা শুচি হইব এই বাতিক বশত কখন শুচি বস্তুকে অশুচি করে এবং অশুচি বস্তুকেও শুচি বলিয়া বিবেচনা করে; ফল, তাহারা বাস্তবিক শুচি বা

বাস্তবিক অশুচি কাহাকে বলে, তাহা জানে না; কেবল শুচি হইব এইরূপ বাতিক বশে চালিত হয় মাত্র।

শৌচাভ্যাস করিলে আর আর কি কি হয় তাহা সূত্রকার বলিতেছেন।

সত্ত্বশুদ্ধি সৌমনস্যৈকাগ্র্যেন্দ্রিয় জয়াত্মদর্শন যোগ্যত্বানি।৪১॥

পদচ্ছেদঃ। সত্ত্ব, শুদ্ধি, সৌমনস্য, ঐকাগ্র্য, ইন্দ্রিয়, জয়, আত্মদর্শন, যোগ্যত্বানি।

পদার্থঃ। সত্ত্বং প্রকাশসুখাদ্যাত্মকং তস্য শুদ্ধিঃ রজস্তমোভ্যামনভিভবঃ। সৌমনস্যং খেদানমুভবেন মানসী প্রীতিঃ। ঐকাগ্র্যং নিয়তেন্দ্রিয়বিষয়ে চেতসঃ স্থৈর্য্যং, ইন্দ্রিয়জয়ঃ বিষয়-পরাঙ্মুখীকৃতানাং ইন্দ্রিয়াণাং স্বাত্মন্যবস্থানং আত্মদর্শনযোগ্যত্বং আত্মদর্শনে বিবেকখ্যাতিরূপে যোগ্যত্বং সত্ত্বশুদ্ধিশ্চ, সৌমনস্যঞ্চ, ঐকাগ্র্যঞ্চ, ইন্দ্রিয়জয়শ্চ, আত্মদর্শনযোগ্যত্বঞ্চেতি দ্বন্দ্বঃ।

অন্বয়ঃ। ক্রমেণ ভবন্তীতি বাক্য শেষঃ।

ভাবার্থঃ। শৌচাভ্যাসবশত এতে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদয়ঃ ক্রমেণ প্রাদুর্ভবন্তি। তথাহি শৌচাত্ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধেঃ সৌমনস্যং, সৌমনস্যাদৈকাগ্রং, ঐকাগ্র্যাদিন্দ্রিয়জয়ঃ ইন্দ্রিয়-জয়াদাত্মদর্শনযোগ্যত্বং ইতি। ক্বচিদৈকাগ্র্য মিত্যত্র একাগ্রতেতি পাঠঃ।

অনুবাদ। শৌচ হইতে যথাক্রমে সত্ত্বশুদ্ধি, সৌমনস্য, ঐকাগ্র্য, ইন্দ্রিয়জয় এবং আত্মদর্শনে যোগ্যত্ব হইয়া থাকে।

সমালোচন। আমরা পূর্ব্বে দুইপ্রকার শৌচ বলিয়াছি, বাহ্য এবং আন্তর; উহাদের মধ্যে বাহ্য শৌচ আন্তর শৌচের উৎকর্ষকারকমাত্র, ঠিক্ সাধক নয়, কারণ বাহ্য শৌচ না থাকিলেও আন্তর শৌচ হইতে পারে। আন্তর শৌচ অভ্যাস করত চিত্তের মালিন্য দূর হইলে প্রথমে সত্ত্বশুদ্ধি হয় অর্থাৎ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়, বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের উদ্রেক হইলে সৌমনস্য অর্থাৎ প্রীতি স্বাভাবিক একটি সদানন্দত্ব উৎপন্ন হয়; ঐ আনন্দ উৎপন্ন হইলে চিত্তের ঐকাগ্র্য অর্থাৎ একাগ্রতা হয়। আমাদের চিত্ত যে সর্ব্বদা চঞ্চল

তাহার প্রতি কারণ একমাত্র অসন্তোষ। ইহাতে সুখ হইবে, ইহাতে সুখ হইবে, এই ভাবিয়াই চিত্ত সর্ব্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে কিন্তু সেই অভিলষিত সন্তোষ কোন স্থানে পায় না, কাযেই চিত্তেরও স্থিরতা নাই, কিন্তু সন্তোষ উৎপন্ন হইলে কামনা উন্মূলিত হয় সুতরাং চিত্ত যে কোন এক বিষয়ে স্থির হইয়া থাকে। চিত্তের একাগ্রতা হইলে ইন্দ্রিয় জয় হয়; ইন্দ্রিয় সকল বিষয় হইতে পরাঙ্মুখ হইয়া নিষ্ক্রিয় অবস্থায় স্থিত হয়। ইন্দ্রিয়গণ যে স্ব স্ব বিষয় অভিমুখে ধাবিত হয়, তাহার প্রতি কারণ কামনা বা বিষয়াভিলাষ কর্ত্তৃক প্রেরণ। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চিত্তের একাগ্রতা হইলে সে কামনা বা বিষয়াভিলাষ উন্মূলিত হয়, ইন্দ্রিয়গণ পরিচালক শূন্য হয় সুতরাং স্থিরভাব আশ্রয় করে। ইন্দ্রিয় জয় হইলে আত্মদর্শনে অর্থাৎ পূর্ব্বোক্ত বিবেকখ্যাতি লাভে যোগ্যতা জন্মায়; জিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিই সমাধি প্রভাবে ক্রমশ প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ জানিতে সক্ষম হয়।

সন্তোষাদনুত্তমসুখলাভঃ। ৪২ ॥

পদচ্ছেদঃ। সন্তোষাৎ-অনুত্তম-সুখলাভঃ।

পদার্থঃ। সন্তোষাৎ তৃষ্ণাক্ষয়রূপস্য সন্তোষস্য উৎকর্ষাৎ অনুত্তম সুখলাভঃ; নাস্তি উত্তমং সুখং যস্মাৎ তৎ অনুত্তম সুখং তস্য লাভঃ প্রাপ্তিঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। সংতোষাদ্যোগিনস্তথাবিধমান্তরং সুখমাবির্ভবতি যস্য বাহ্যং বিষয় সুখং শতাংশেনাপি সমানংন্যভবতি। তথাহি—

যচ্চ কাম সুখং লোকে যচ্চদিব্যং মহৎ সুখং।
তৃষ্ণাক্ষয়সুখস্যৈতে নার্হতঃ ষোড়শীং কলাম্ ॥

অনুবাদ। সন্তোষ হইতে সর্ব্বাপেক্ষা উত্তম সুখলাভ হয়।

সমালোচন। বিষয় তৃষ্ণার বিরামের নাম সন্তোষ। এই সন্তোষ উৎপন্ন চিত্তে এমনি একটি অনির্ব্বচনীয় সুখ হয় যে পার্থিব সুখেরত কথাই নাই, স্বর্গীয় সুখও তাহার ষোড়শাংশের তুল্য হয় না। কারণ, কি স্বর্গীয় সুখ, কি পার্থিব সুখ, উভয় সুখই কামনা মূলক সুতরাং তাহারা চরমসীমা প্রাপ্ত হইতে পারে না, কারণ কামনার অন্ত নাই।

কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধির শুদ্ধিক্ষয়াৎতপসঃ। ৪৩॥

পদচ্ছেদঃ। কায-ইন্দ্রিয় সিদ্ধিঃ অশুদ্ধি-ক্ষয়াৎ-তপসঃ।

পদার্থঃ। কায়ঃ শরীরং, ইন্দ্রিয়ং চক্ষুরাদি, কায়শ্চ ইন্দ্রিয়াণিচ তেষাং-সিদ্ধিঃ উৎকর্ষঃ, অশুদ্ধিঃ ক্লেশঃ তস্যাঃ ক্ষযাৎ হেতোঃ, তপসঃ তপশ্চরণাৎ।

অন্বয়ঃ। তপসঃ অশুদ্ধিক্ষযাৎ কায়েন্দ্রিয়সিদ্ধিঃ ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। চান্দ্রায়ণাদি তপশ্চরণাৎ চিত্তক্লেশক্ষয়ঃ, তৎক্ষয়াদিন্দ্রিয়াণাং সূক্ষ্মব্যবাহিতবিপ্রকৃষ্ট দর্শনাদি সামর্থ্যমাবির্ভবতি কাযস্য যথেচ্ছ মণুমহত্ত্বাদীনি।

অনুবাদ। তপস্যা আচরণ দ্বারা অশুদ্ধির ক্ষয় হইলে শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের সিদ্ধি হয়।

সমালোচন। আত্মার শক্তি অতি বিস্তৃত এবং জ্ঞানও অসীম; কেবল অজ্ঞানরূপ মলদ্বারা ঐ শক্তি ও জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া থাকে। চন্দ্রায়ণ প্রভৃতি ব্রতের অনুষ্ঠান আরম্ভ করিয়া ক্রমশ যত কঠোর তপস্যার আচরণ করিতে থাকে, ততই অজ্ঞানরূপ মলের ক্ষয় হইয়া আধ্যাত্মিক শক্তি ও জ্ঞানের বিকাশ হইতে থাকে, এমন কি পরিশেষে আত্মা আপন ইচ্ছামত অতি সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর এবং অতি মহৎ হইতে মহত্তর রূপ ধারণ করিতে পারে। কখন কীটাণু, কখন বা মহাবিরাট মূর্ত্তিধারণ করিতে পারে। ইহার নাম কায় বা শরীর সিদ্ধি। জ্ঞানের বিকাশ হওয়ায় ক্রমশ সর্ব্বজ্ঞত্ব জন্মে। অতি-দূরস্থিত এবং ব্যবহিত বস্তুর দর্শন শ্রবণাদি হইতে ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটিবে বা ঘটিতে পারে, তাহা সকলই নখ দর্পণের মত প্রত্যক্ষ হয়; ইহার নাম ইন্দ্রিয় সিদ্ধি।

স্বাধ্যায়দিষ্টদেবতা সম্প্রযোগঃ। ৪৪॥

পদচ্ছেদঃ। স্বাধ্যায়াৎ ইষ্টদেবতা-সম্প্রয়োগঃ।

পদার্থঃ। অভীষ্ট মন্ত্র জপাদিঃ স্বাধ্যায়ঃ তস্মাৎ তদভ্যাসপ্রকর্ষাৎ ইষ্টা অভিমতা যা দেবতা, তাসাং সম্প্রয়োগঃ সম্যক্ দর্শনাদি সহকারিত্বং।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। স্বাধ্যায় শীলস্য ইষ্টদেবতা দর্শনাদি ভবতীতি ভাবঃ।

অনুবাদ। স্বাধ্যায় অভ্যাস করিলে অভীষ্ট দেবতার সাক্ষাৎকারাদি লাভ হয়।

সমালোচন। স্বাধ্যায় শব্দে মন্ত্রের জপ বা নিয়মিত পাঠ প্রভৃতি অভ্যাস বলে। উহাতে প্রকর্ষ লাভ করিলে, যে দেবতার উদ্দেশে ঐ মন্ত্রের জপ বা নিয়মিত পাঠ করা যায়, তাহার সাক্ষাৎকার ও আপনার অভিমত কার্য্যে সহায়তা লাভ হয়। ভাষ্যকার বলেন দেবতা শব্দের অর্থ এখানে কেবল দেবতা নয় ঋষি, সিদ্ধ পুরুষ প্রভৃতিও বুঝিতে হইবে।

সমাধিসিদ্ধিরীশ্বরপ্রণিধানাৎ। ৪৫ ॥

পদচ্ছেদঃ। সমাধি-সিদ্ধিঃ, ঈশ্বর-প্রণিধানাৎ।

পদার্থঃ। সমাধিঃ উক্তলক্ষণঃ তস্য সিদ্ধিঃ আবির্ভাবঃ, ঈশ্বর প্রণিধানাৎ ঈশ্বরপ্রণিধাণক্তোক্তং।

অন্বয়ঃ। ঈশ্বর প্রণিধানাৎ সমাধিসিদ্ধি র্ভবতি ইতিশেষঃ

ভাবার্থঃ। ঈশ্বর প্রণিধাণং নাম ঈশ্বরে সর্ব্বকর্ম্ম সমর্পণং তস্মাৎ স ভগবান্ ঈশ্বরঃ প্রসন্নঃ সন্ অন্তরায়রূপান্ ক্লেশান্ পরিহৃত্য সমাধিমুদ্বোধয়তি, ইতিভাবঃ।

অনুবাদ। ঈশ্বর প্রণিধান প্রভাবে সমাধি সিদ্ধি হয়।

সমালোচন। ঈশ্বর প্রণিধান শব্দের অর্থ পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। আত্ম-বিস্মৃত হইয়া পরমেশ্বরে সমুদয় ভাবের সমর্পণের নাম ঈশ্বর প্রণিধান, যে ব্যক্তি এইরূপ করে তাহার উপর ঈশ্বরেরও অনুগ্রহ হয়, সেই ঈশ্বরানুগ্রহ অনায়াসে তাহার সমাধির সিদ্ধির কারণ হয়; ঈশ্বরানুগ্রহে তাহার অজ্ঞান রূপ আবরণ দূর হইয়া যায়, সে অতি দূরস্থিত ধ্যেয় বস্তুর ও প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারে।

প্রথম যম ও নিয়মের বিষয় বলিয়া এক্ষণে আসনের বিষয় বলিতেছেন।

স্থির সুখ মাসনম্। ৪৬ ॥

পদচ্ছেদঃ। স্থির সুখং, আসনম্।

পদার্থঃ। স্থিরং নিষ্কম্পং সুখং সুখকরং চ যৎ তৎ আস্যতেহনেনেতি আসনং।

অন্বয়ঃ। আসনং স্থিরসুখং ভবতীতিশেষঃ।

অনুবাদ। আসন—স্থিরতা সম্পাদক এবং সুখকর।

সমালোচন। আসন বলিতে অবস্থানের প্রকার। ধ্যেয় বস্তুর প্রগাঢ় চিন্তার নাম যোগ। কোন চিন্তাই যাইতে যাইতে হয় না; একস্থানে অবস্থান না করিলে আর কোন বিষয় প্রগাঢ় চিন্তা হয় না; ঐ অবস্থান যতই স্থিরভাবে অর্থাৎ হস্ত পদাদি অঙ্গের বিক্ষেপ শূন্য হইবে এবং কোন পীড়া দায়ক না হইবে, ততই চিন্তার প্রগাঢ়তা বৃদ্ধি পাইবে। যেরূপ অবস্থান করিলে হস্ত পদাদি অঙ্গ ক্রিয়া শূন্য হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে এবং কোন রূপে পীড়িত না হয় (হস্ত পদাদি অঙ্গের পীড়া হইলে দুঃখ হয়, অধিক ক্ষণ অবস্থান করা যায় না) অর্থাৎ যেরূপ অবস্থানে শরীর স্থির হয় এবং কোন রূপ ক্লেশের অনুভব হয় না, সেইরূপ অবস্থানের নাম আসন। আসন এই নিমিত্তই যোগের উপযোগী। আসন অনেক প্রকার আছে, তাহার মধ্যে ভাষ্যকার এই গুলির উল্লেখ করিয়াছেন—পদ্মাসন, বীরাসন, ভদ্রাসন, স্বস্তিক, দণ্ডাসন, সোপাশ্রয়, পর্য্যঙ্ক, ক্রৌঞ্চ নিষদন, হস্তিনিষদন, সমসংস্থান, ইত্যাদি। এস্থলে এসমুদয়ের লক্ষণ নির্দ্দেশে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধিমাত্র হইবে এবং প্রক্রিয়া না দেখিয়া কেবল বাক্য দ্বারা উহাদের স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য।

প্রযত্ন শৈথিল্যানন্ত সমাপত্তিভ্যাম্। ৪৭॥

পদচ্ছেদঃ। প্রযত্ন-শৈথিল্য-অনন্ত-সমাপত্তিভ্যাম্।

পদার্থঃ। প্রযত্নো নাম শারীরঃ ব্যাপারঃ তস্য শৈথিল্যং উপরমঃ, অনন্তে সমাপত্তিঃ চেতসস্তাদাত্ম্যতয়া অবধানং তাভ্যাং—

অন্বয়ঃ। আসনং ভবতীতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। যদা যদা আসনং বধ্নামীতি ইচ্ছাং করোতি তদাপ্রযত্নশৈথিল্যে সতি অক্লেশেনৈবাসনং ভবতি তথা আকাশাদিগতে অনন্তে চেৎ চেতসঃ সমাপত্তিঃ অবধানেন তাদাত্ম্যং ক্রিয়তে তদাদেহাহঙ্কারা ভাবাদাসনং দুঃখ জনকং ভবতি। ইতি ভাবঃ।

অনুবাদ। শারীরিক ক্রিয়ার উপরম এবং অনন্ত বস্তুতে তদাকারে চিত্তের সন্নিবেশ এই দুইটী ক্রিয়া দ্বারা আসন সিদ্ধ হয়।

সমালোচন। শরীরের কোন রূপ ব্যাপার থাকিলে আসন হয় না, এই নিমিত্ত আসন করিতে হইলে, শরীরের ব্যাপার সকলের একেবারে নিরোধ করা আবশ্যক। শরীরের ব্যাপারের নিরোধ করিলে স্থিরভাবে কিছুকাল অবস্থান করা যায় বটে কিন্তু কিছু কাল সেইরূপে অবস্থান করিলে, হয়ত পা ব্যথা, হাত ব্যথা কি মনে কোনরূপ একটা দুশ্চিন্তা জন্য ক্লেশের অনুভব হইলে আর স্থির হইয়া অবস্থান করা যায় না এই জন্য মনের সহিত শরীরের সম্বন্ধ পরিহার পূর্ব্বক স্থিরতা সম্পাদন করা উচিত; সেইরূপ করিতে হইলে মনকে আকাশাদি কোন অন্য বস্তুতে তদাকারে পরিণত করিয়া সন্নিবেশ করা উচিত। কোন বস্তুতে সেই বস্তুর সহিত একাকার করিয়া মনের সন্নিবেশের নাম সমাপত্তি। অনন্তর, সেই বস্তুতে মনের সমাপত্তি হইলে মনের আর শরীরের সহিত কোন সম্বন্ধ থাকে না এবং স্থিরতা ও হয়, সুতরাং তখন হাত ব্যথা, পা ব্যথা বা অন্য চিন্তা জন্য ক্লেশের অনুভব হয় না; আসনও স্থায়ী হয়।

ততো দ্বন্দ্বানভিঘাতঃ। ৪৮॥

পদচ্ছেদঃ। ততঃ দ্বন্দ্ব-অনভিঘাতঃ।

পদার্থঃ। ততঃ আসন প্রকর্ষাৎ দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীনি তৈঃ অনভিঘাতঃ অবাধম্।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষ।

অনুবাদ। আসন অভ্যাস করিলে শীতোষ্ণাদি জন্য ক্লেশের উদ্বোধ হয় না।

সমালোচন। বাহ্যবস্তুজ্ঞান থাকাতেই আমরা শীতোষ্ণাদি জন্য ক্লেশ অনুভব করি। কিন্তু চিত্ত যখন বাহ্য বস্তু, এমন কি আপনার শরীরের সহিত সম্বন্ধ বিস্মৃত হইয়া স্থিরতা প্রাপ্ত হয়, তখন শীত উষ্ণ কি সহস্র বজ্রপাতেও আর ক্লেশের উদ্বোধ হয় না।

তস্মিন্ সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতিবিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ। ৪৯॥

পদচ্ছেদঃ। স্পষ্টঃ।

পদার্থঃ। তস্মিন্ আসনে সতি শ্বাসঃ বাহ্যস্য বায়োরাচমনং প্রশ্বাসঃ কৌষ্ঠস্য বায়ো নিঃসরণং তয়োঃ-গতিঃ প্রবাহঃ তস্যাবিচ্ছেদঃ অভাবঃ প্রাণায়ামঃ তন্নামকযোগাঙ্গবিশেষঃ।

অন্বয়ঃ। কথ্যতে ইতিশেষঃ।

ভাবার্থঃ। আসনে সতি তন্নিমিত্তকঃ প্রাণায়ামো নাম যোগাঙ্গবিশেষো অনুষ্ঠেয়ো ভবতি। স চ শ্বাস-প্রশ্বাসয়োরেচকপূরকদ্বারেণ বাহ্যাভ্যন্তরেষু স্থানেষু গতেঃ প্রবাহস্য বিচ্ছেদঃ অভাবরূপ। ইতিভাবঃ।

অনুবাদ। বদ্ধাসন ব্যক্তি শ্বাস এবং প্রশ্বাসের প্রবাহ রোধ করিয়া প্রাণায়াম করিবে।

সমালোচন। উক্তরূপ আসন দ্বারা হস্তপদাদির ক্রিয়া রোধ হয়, শরীরও কিছু পরিমাণে স্থির হয় বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ স্থিরতা লাভ করিতে পারে না; কারণ তখন স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাসের প্রবাহ থাকায় হৃদয়াদির কম্পন হয়, আর শরীর সম্পূর্ণ স্থির না হইলে মনও সম্পূর্ণ স্থির হইতে পারে না সুতরাং শরীর সম্পূর্ণ স্থিরতা সম্পাদন করিতে হইলে ঐ শ্বাস এবং প্রশ্বাসের প্রবাহ রোধ করা আবশ্যক। শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রবাহ-রোধের নাম প্রাণায়াম। বাহ্য বস্তুর অভ্যন্তরে প্রবেশের নাম শ্বাস, এবং আন্তর বায়ুর বহির্নিঃসারণের নাম প্রশ্বাস। যে ক্রিয়া দ্বারা বাহ্য বায়ুর অন্তরে প্রবেশ রুদ্ধ হয়, তাহার নাম রেচক এবং যে ক্রিয়া দ্বারা আভ্যন্তর বায়ুর বহির্নির্গমন রোধ করা হয় তাহার নাম পূরক; এই উভয় ক্রিয়া রোধ করিয়া অন্তরে বায়ু ধারণের নাম কুম্ভক। রেচক, পূরক, কুম্ভক, এই তিনটিকেই প্রাণায়াম বলে। কেহ কেহ কেবল কুম্ভককেই প্রাণায়াম বলিয়াছেন। এক্ষণে ঐ প্রাণায়াম কত প্রকার হইতে পারে তাহাই বলিতেছেন।

বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভবৃত্তির্দেশ কাল সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টো দীর্ঘ সূক্ষ্মঃ। ৫০॥

পদচ্ছেদঃ। বাহ্য,অভ্যন্তর, স্তম্ভবৃত্তিঃ, দেশ-কাল-সংখ্যাভিঃ, পরিদৃষ্ট দীর্ঘ-সূক্ষ্মঃ।

পদার্থঃ। বাহ্যাভ্যন্তরস্তম্ভা বৃত্তয়ো যস্য স বাহ্যবৃত্তিঃ, অভ্যন্তরবৃত্তিঃ স্তম্ভবৃত্তিশ্চ। দেশঃ নাসাগ্রাৎ দ্বাদশাঙ্গুলিপর্য্যন্তস্থানবিশেষঃ রেচকস্য; পূরকস্যতু আপাদতলমামস্তকবিষয়ঃ, কুম্ভকস্য তদুভয়াবস্থানং বিষয়ঃ, কালঃ ক্ষণাদিঃ, সংখ্যা একদ্ব্যাদিঃ তাভিঃ পরিদৃষ্টঃ উপলক্ষিতঃ দীর্ঘসূক্ষ্মঃ—দীর্ঘসূক্ষ্মসংজ্ঞকঃ।

অন্বয়ঃ। ভবতীতি শেষঃ।

ভাবার্থঃ। প্রাণস্য আযামঃ প্রাণাযামঃ, স চ প্রাণায়ামঃ, প্রথমতস্তাবৎ ত্রিবিধোভবতি বাহ্যবৃত্তিঃ, অভ্যন্তরবৃত্তিঃ, স্তম্ভবৃত্তিশ্চেতি, যত্র প্রাণায়ামে প্রশ্বাসেন রেচকেন গতিবিচ্ছেদো ভবতি স বাহ্যবৃত্তিঃ রেচকোনাম, যত্র শ্বাসেন পূরকেণ গত্যভাবো ভবতি স অভ্যন্তরবৃত্তিঃ পূরকনামা প্রাণায়ামঃ, যত্রোভয়োঃ শ্বাস প্রশ্বাসয়োরভাবঃ স স্তম্ভবৃত্তিঃ কুম্ভকনামা প্রাণায়ামঃ। ইত্যয়ং ত্রিবিধঃ প্রাণায়ামঃ দেশকালসংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্টঃ এতাবদ্দেশেন, এতাবতা-কালেন, এতাবত্যা সংখ্যযা বা ব্যবচ্ছিন্নো ময়া রেচকাদিঃ কর্ত্তব্য ইত্যেবমবধারিতঃ দেশো যথা নাসাগ্রাৎ প্রাদেশদ্বাদশাঙ্গুল-হস্তাদিপরিমিতো বাহ্য-দেশো রেচকস্য বিষয়ঃ, পূরকস্যাপাদতলমামস্তকমাভ্যন্তরস্থানং বিষয়ঃ কুম্ভকস্য রেচকপূরকযোঃ বাহ্যান্তরদেশৌ সমুচ্চিতাবেব বিষয়ঃ। কালঃ ক্ষণঃ তেন পরিদৃষ্টঃ এতাবৎ ক্ষণং রেচকাদিঃ কর্ত্তব্যো ময়েতি নিশ্চিতঃ সংখ্যাভিঃ পরিদৃষ্ট ইয়তো বারান্ কর্ত্তব্য ইতি নিয়মিতঃ সন্ দীর্ঘ, সূক্ষ্মসংজ্ঞকো ভবতীতি ভাবঃ।

অনুবাদ। সেই প্রাণাযাম তিন প্রকার বাহ্যবৃত্তি, অভ্যন্তরবৃত্তি এবং স্তম্ভবৃত্তি—এই তিন প্রকার প্রাণাযাম আবার দেশ, কাল এবং সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত হইয়া দীর্ঘসূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়।

সমালোচন। প্রাণায়াম শব্দের সাধারণ লক্ষণ করিলেন "শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধের নাম প্রাণায়াম" শ্বাস বলিতে নিশ্বাস টানা, প্রশ্বাস বলিতে নিশ্বাস ফেলা; যখন আমরা কেবল নিশ্বাস ফেলি, তখন শ্বাসের গতিরোধ হয় নিশ্বাস টানা বন্ধ হয়, আর যখন আমরা কেবল নিশ্বাস টানি তখন প্রশ্বাসের

গতিরোধ অর্থাৎ নিশ্বাস ফেলা বন্ধ হয়। কেবল নিশ্বাস ফেলার নাম রেচক এবং কেবল নিশ্বাস টানার নাম পূরক। এক্ষণে দেখ শ্বাস প্রশ্বাসের গতি-রোধের নাম প্রাণায়াম, এইরূপ লক্ষণ করাতে কেবল শ্বাসের গতিরোধের নাম প্রাণায়াম, কেবল প্রশ্বাসের গতিরোধের নাম প্রাণায়াম অথবা যুগপৎ উভয় গতিরোধের নাম প্রাণায়াম এই তিনের এক একটি অথবা সমুদয় —বুঝাইতে পারে এইজন্য প্রাণায়ামশব্দের অর্থ নানা জনে নানা রকম করিয়াছেন। কেহ বলেন ক্রমশ শ্বাস প্রশ্বাসের গতিরোধ করিয়া যুগপৎ উভয়ের গতিরোধ করত অন্তরে বায়ু স্তম্ভন করাকে প্রাণায়াম বলে। যুগপৎ উভয়ের গতি রুদ্ধ করিয়া অন্তরে বায়ু স্তম্ভনের নাম কুম্ভক। তাঁহাদের মতে রেচক পূরক এবং কুম্ভক এই তিনটি মিলিত হইয়া একটি প্রাণায়াম হয়। কেহ বা রেচক পূরককে ত্যাগ করিয়া কেবল কুম্ভক করিয়া থাকার নাম প্রাণায়াম বলেন। আর কেহ কেহ রেচক, পূরক এবং কুম্ভক এই তিনটির প্রত্যেককেই প্রাণায়াম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সূত্রকার পতঞ্জলি এই শেষোক্ত মতের পোষণ করিয়াই আমা-দের আলোচ্য সূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। তিনি বলেন প্রাণা-য়াম প্রথমত তিন প্রকার—বাহ্যবৃত্তি, আভ্যন্তর বৃত্তি, এবং স্তম্ভবৃত্তি। যে প্রাণায়ামে রেচক দ্বারা শ্বাসের (নিশ্বাস টানার) গতিরোধ করা হয়, তাহার নাম বাহ্যবৃত্তি বা রেচক প্রাণায়াম বলা যাইতে পারে, যেস্থলে পূরক দ্বারা প্রশ্বাসের (নিশ্বাস ফেলার) গতিরোধ হয় তাহার নাম আন্তরবৃত্তি বা পূরক প্রাণায়াম বলা যাইতে পারে যখন এক প্রযত্নে শ্বাস প্রশ্বাস এই উভয়ের গতিরোধ করিয়া অন্তরে বায়ু ধারণ করা হয়, তাহার নাম স্তম্ভবৃত্তি বা কুম্ভক প্রাণায়াম। একদা উভয় গতির রোধ কিরূপে হয়, তাহা ভাষ্যকার একটি দৃষ্টান্ত দ্বারা বুঝাইয়াছেন তিনি বলেন যেমন কোন তপ্ত বস্তুতে জলক্ষেপ করিলে, তাহার সমুদয় স্থানে জল একেবারে সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ একদা উভয়ের গতিরোধও সম্ভবপর। উপরে একপ্রযত্ন বলিবার তাৎপর্য্য এই যে পর সূত্রে যে প্রাণায়াম উক্ত হইয়াছে, তাহাতে বহুপ্রযত্ন আবশ্যক, অতএব তাহা হইতে পৃথক্ করিবার জন্য একপ্রযত্ন বলা হইল।

এই ত্রিবিধ প্রাণায়াম দেশ, কাল এবং সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত হইয়া দীর্ঘ

সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়। দেশ দ্বারা নিয়মিত,—যেমন আমি এতদূর অবধি রেচক করিব, এতদূর অবধি পূরক করিব, এতদূর রেচক, এতদূর পূরকের পর কুম্ভক করিব; কাল দ্বারা নিয়মিত—যেমন আমি এতক্ষণ রেচক করিব, এতক্ষণ পূরক করিব এবং এতক্ষণ কুম্ভক করিব; সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত যথা আমি এতবার রেচক এতবার পূরক এবং এতবার কুম্ভক করিব। রেচকের দেশ নাসাগ্র হইতে প্রাদেশ, দ্বাদশাঙ্গুল, অথবা হস্তাদি পরিমিত বাহ্যদেশ কেহ বলিতে পারেন আমি রেচক দ্বারা নাসাগ্র হইতে এক প্রাদেশ দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিব, কেহ বা দ্বাদশাঙ্গুল পরিমিত দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিব আর কেহ বা একহস্ত পরিমিত দূর পর্য্যন্ত নিশ্বাস ফেলিব এইরূপ নিয়ম করিতে পারেন। পাদতল হইতে মস্তক পর্য্যন্ত আন্তর প্রদেশ—পূরকের বিষয়। ইহাতেও কেহ বলিতে পারেন আমি পাদতল হইতে এতটুকু পর্য্যন্ত বায়ু আকর্ষণ দ্বারা পূরিত করিব, কেহ বা তাহা হইতে কিছু অধিক এইরূপে মস্তকাগ্র পর্য্যন্ত বাহ্য বায়ুর আকর্ষণ করিয়া পূরণ হইতে পারে। রেচক ও পূরক এই উভয়ের দেশ কুম্ভকের বিষয় কেহ বলিতে পারেন। এতদূর রেচক করিয়া এতটুকু পর্য্যন্ত পূরণ করিয়া কুম্ভক করিব ইত্যাদি। এতদূর পর্য্যন্ত রেচক করিলাম, ইহার নিশ্চয় তুলার ক্রিয়া দৃষ্টে হইতে পারে অর্থাৎ মনে মনে যতদূর রেচক করিব স্থির করা হইবে, নাসার অগ্র হইতে ততদূরে তুলা রাখিতে হইবে, যদি রেচক করিবার পর ঐ তুলা উড়ে যায়, বা নড়ে উঠে, তাহা হইলে নিশ্চয় হইল যে আমার ততদূর অবধি রেচক হইয়াছে। পূরকের নিশ্চায়ক পিপীলিকা স্পর্শে যেমন শিস্‌সিড়ী হয় সেইরূপ শিস্‌সিড়ী হওয়া অর্থাৎ আমি যতটুকু অবধি পূরক করিব স্থির করিয়াছি আমার পূরক ক্রিয়ার পর যদি পাদতল হইতে ততটুকু অবধি শিস্‌সিড় করিয়া উঠে তাহলে নিশ্চয় হইল, যে আমার পূরক ঠিক হইয়াছে। কুম্ভকে রেচক পূরক এই উভয়ের গতির রোধ হয়, যখন কুম্ভক করিবার পর উক্তরূপ তুলার ক্রিয়া এবং শিস্‌সিড়ী বোধ না হয়, তখন নিশ্চয় করিতে হইবে, যে আমার কুম্ভক ঠিক হইয়াছে।

কালদ্বারা নিয়মিত রেচকাদি যথা কাল বলিতে—ক্ষণ। চক্ষুর নিমেষ পড়িতে যে সময় লাগে তাহার চারিভাগের একভাগ সময়ের নাম ক্ষণ, আমি

এতক্ষণ অবধি রেচক এতক্ষণ অবধি পূরক এবং এতক্ষণ অবধি কুম্ভক করিব এইরূপ স্থির করার নাম, কাল দ্বারা নিয়মিত। সংখ্যা বলিতে মাত্রার সংখ্যা। একটি লঘু অক্ষর উচ্চারণ করিলে এক মাত্রা হয়। আমি দ্বাদশ মাত্রা পর্য্যন্ত রেচক, পূরক বা কুম্ভক করিব ইত্যাদিরূপ স্থির করার নাম সংখ্যা-নিয়মিত। এত মাত্রা পর্য্যন্ত পূরক, এত মাত্রা পর্য্যন্ত কুম্ভক এবং এত মাত্রা পর্য্যন্ত রেচক, এইরূপ। পূরক দ্বারা বায়ুর প্রথম নিরোধ হয়, কুম্ভক দ্বারা দ্বিতীয় এবং রেচক দ্বারা তৃতীয় নিরোধ হয়।

ঐ মাত্রা ভেদে পূরকাদি মৃদু মধ্য এবং তীব্র হইয়া থাকে। এস্থলে ইহাও বক্তব্য যে যদি সূত্রে প্রথমে রেচক, তাহার পর পূরক এবং তাহার পর কুম্ভকের কথা বলা হইল কিন্তু ব্যবহারে প্রথমে পূরক, তাহার পর কুম্ভক এবং তাহার পর রেচক হইয়া থাকে। এই জন্য বিজ্ঞান ভিক্ষু বলিয়াছেন সূত্রে যে প্রাণায়ামের ক্রম বলা হইয়াছে, উহা গ্রহণ করা উচিত নয়, কারণ উহা ব্যবহার এবং পুরাণাদির বিরুদ্ধ, পুরাণাদিতে প্রথমে পূরক তাহার পর কুম্ভক এবং তাহার পর রেচক এইরূপে প্রাণায়ামের ক্রম উক্ত হইয়াছে। এবং ভাষ্যকারও সেই অনুসারে পূরকের সময় বায়ুর প্রথম উদ্ঘাত বা নিরোধ কুম্ভকের সময় দ্বিতীয় উদ্ঘাত বা নিরোধ এবং রেচকের সময় তৃতীয় উদ্ঘাত বা নিরোধ হয় বলিয়াছেন। এইরূপে দেশাদি নিয়মে অভ্যস্ত প্রাণায়াম দীর্ঘ সূক্ষ্ম নামে অভিহিত হয়, দীর্ঘকাল ব্যাপী হওয়ায় দীর্ঘ এবং বায়ু সঞ্চার অতি সূক্ষ্মরূপে হয় বলিয়া সূক্ষ্ম।

বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ। ৫১॥

পদচ্ছেদঃ। বাহ্য-অভ্যন্তর-বিষয়-আক্ষেপী, চতুর্থঃ।

পদার্থঃ। বাহ্যবিষয়ঃ নাসা দ্বাদশাঙ্গুলহস্তাদিঃ অভ্যন্তরো বিষয়ঃ হৃদয় নাভিচক্রাদিঃ তৌ দ্বৌ বিষয়ৌ আক্ষিপতীতি বাহ্যাভ্যন্তরবিষয়াক্ষেপী চতুর্থঃ পূর্ব্বোক্তাৎ তৃতীয়াৎ কুম্ভকাদন্যঃ।

অন্বয়ঃ। বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়ৌ আক্ষিপ্য পর্য্যালোচ্য যঃ স্তম্ভরূপো গতিবিচ্ছেদঃ স চতুর্থঃ প্রাণায়ামঃ। তৃতীয়স্মাৎ কুম্ভকাখ্যাদয়মস্তি বিশেষঃ, স বাহ্যাভ্যন্তর বিষয়াবপর্য্যালোচ্য সহসা তপ্তোপলনিপতিতজল ন্যায়েন যুগপৎ স্তম্ভবৃত্ত্যা নিষ্পাদ্যতে অস্য তু বিষয়দ্বয়াক্ষেপকোনিরোধঃ।

অনুবাদ। বাহ্য এবং আভ্যন্তর দেশ পর্য্যালোচনা করিয়া শ্বাস প্রশ্বাসের যে নিরোধ হয়, উহাকে চতুর্থ নিরোধ বলা যায়।

সমালোচন। কুম্ভক দুই প্রকার, প্রথম যাহাতে বাহ্য এবং আভ্যন্তর দেশের আলোচনা থাকে না অর্থাৎ এতদূর রেচক এবং এতটুকু পূরকের পর এই কুম্ভক করিলাম এরূপ আলোচনা থাকে না, একেবারে রেচক এবং পূরকের গতিরোধ করা হয়. দ্বিতীয় যাহাতে বাহ্য এবং আভ্যন্তর বিষয়ের আলোচনা থাকে এতদূর রেচক এতদূর পূরকের পর কুম্ভকের অভ্যাস করা হয়। ইহারা দেশ কাল এবং সংখ্যা দ্বারা নিয়মিত হয়।

ততঃ ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণং। ৫২।

পদচ্ছেদঃ। ততঃ, ক্ষীয়তে প্রকাশাবরণং।

পদার্থঃ। ততঃ তস্মাৎ প্রাণায়ামাৎ ক্ষীয়তে ক্ষীণং ভবতি, প্রকাশস্য বিবেকজ্ঞানস্য আবরণং মোহঃ।

অন্বয়ঃ। ততঃ প্রকাশাবরণং ক্ষীয়তে ইত্যন্বয়ঃ।

অনুবাদ। প্রাণায়ামের অভ্যাস বলে প্রকর্ষ হইলে বিবেক জ্ঞানের আবরণ নষ্ট হয়।

সমালোচন। মহামোহ ইন্দ্রজালের মত প্রকাশশীল সত্ত্বগুণকে আচ্ছাদন করিয়া মনুষ্যকে অকার্য্যে নিযুক্ত করে, যাহাতে সাংসারিক কর্ম্ম সকল উৎপন্ন হয় প্রাণায়ামের অভ্যাসদ্বারা ঐ মোহ ক্রমশ দুর্ব্বল হইযা প্রতিক্ষণে ক্ষীণ হয়।

স্ববিষয়াহসম্প্রয়োগে চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইবেন্দ্রিয়াণাম্ প্রত্যাহারঃ। ৫৩।

পদচ্ছেদঃ। স্ব-বিষয়-অসম্প্রয়োগে চিত্তস্য-স্বরূপ অনুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাম্ প্রত্যাহারঃ।

পদার্থঃ। স্বানি ইন্দ্রিয়াণি তেষাং বিষয়ং রূপাদিঃ তেন অসম্প্রয়োগ স্বস্বাভিমুখ্যেনাপ্রবর্ত্তনং তস্মিন্ চিত্তস্য স্বরূপানুকার ইব ইন্দ্রিয়াণাং চক্ষুরাদীনাং প্রত্যাহারঃ বিষয়েভ্যো নিবর্ত্তনং ভবতি

অন্বয়ঃ। ভবতীতিশেষঃ

ভাবার্থঃ। স্ববিষয়া সম্প্রয়োগে চিত্তং যথা স্বরূপমাত্রে অবতিষ্ঠতে ইন্দ্রিয়াণ্যপি তথা চিত্তস্যানুকারং কুর্ব্বন্তীব বিষয়েভ্যঃ প্রতিনিবৃত্য স্বরূপমাত্রে তিষ্ঠন্তীতিভাবঃ।*

অনুবাদ। আপনার ভোগ্য বস্তু অভিমুখে প্রবৃত্তি না থাকায় যেন চিত্তের স্বরূপ অনুকরণ করিয়া ইন্দ্রিয়গণের বিষয় হইতে যে নিবৃত্তি হয়, তাহার নাম প্রত্যাহার।

সমালোচনা। মধুমক্ষিকাগণ যেমন মধুকর রাজের অনুসরণ করে সেই চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে, তাহার সহিত ইন্দ্রিয়গণেরও নিরোধ হয়। ইন্দ্রিয়নিরোধের নাম প্রত্যাহার।

ততঃ পরমাবশ্যতেন্দ্রিয়াণাং। ৫৪ ॥

পদচ্ছেদঃ। ততঃ পরমা, বশ্যতা, ইন্দ্রিয়াণাম্।

পদার্থ। ততঃ অনন্তরং পরমা অত্যর্থং বশ্যতা বশীভূততা ইন্দ্রিয়াণাং

অন্বয়ঃ। ততঃ ইন্দ্রিয়াণাং পরমা বশ্যতা ভবতীতিশেষ,।

অনুবাদ। প্রত্যাহারের পর ইন্দ্রিয়দিগের সর্ব্বোতোভাবে পরাজয় হয়। অর্থাৎ তাহাদিগের উপর যথেষ্ট প্রভুতা করা যাইতে পারে।

পাতঞ্জলযোগ সূত্রের দ্বিতীয় অধ্যায় সম্পূর্ণ হইল।

---

* অনেক পুস্তকে ৫২ সূত্রের পর—ধারণাসুচ যোগ্যতা মনসঃ, এই একটি সূত্র দৃষ্ট হয়; কিন্তু আমাদের আদর্শ পুস্তকে উহা না থাকায় আমরা মূলে উহার উদ্ধার করিলাম না। উহার অর্থ প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে মনের ধারণা ক্রিয়ার যোগ্যতা হয় অর্থাৎ ধারণা করিতে সক্ষম হয়।

আমাদিগের জাতীয় চরিত্র।

জাতীয় চরিত্রের উন্নতি করণ জন্য যে সকল গুণের প্রয়োজন, আমাদিগের বর্ত্তমান বাঙ্গালীদিগের তাহা নাই, ইহাই এখন মিল-মেকলের মন্ত্রশিষ্যদিগের মত। কিন্তু যে জাতির মধ্যে যে বংশে আমাদিগের জন্ম, যে অবিমিশ্র রক্ত স্মরণাতীত কাল হইতে আমাদিগের শিরায় শিরায় প্রবাহিত হইয়া আসিতেছে, সে রক্ত কখনই প্রতিক্রিয়া হীন হইয়া থাকিতে পারে না। আমি বলিয়াছি,—আমাদিগের সকল গুণই আছে, তবে বিধি বিড়ম্বনায়, অদৃষ্টের দোষে, রাজনৈতিক কারণে সে গুলি ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় প্রচ্ছন্ন মূর্ত্তিতে বিরাজ করিতেছে। সকলেই জানেন, যে কোন বিষয়ের অভ্যাস এবং চর্চ্চা না রাখিলে, তাহার উৎকর্ষ সাধিত হয় না বা তাহা সমভাবাপন্ন থাকে না। রাজনৈতিক কারণে আমাদিগের জাতীয় সদ্‌গুণগুলির উৎকর্ষসাধারণে বহুবর্ষ ধরিয়া বিষম ব্যাঘাত ঘটিয়া আসিতেছে। কাজেই এখন আমাদের সেই সকল গুণ নাই বলিয়া বোধ হইতেছে। কিন্তু সময় সুযোগ সুবিধা এবং আদর্শ পাইলে, সেই সকল প্রচ্ছন্ন গুণরাশি অবিলম্বে প্রজলিত হইয়া অকস্মাৎ জগৎকে স্তম্ভিত করিবে, তাহার এক একটী প্রমাণও আমরা মধ্যে মধ্যে প্রদর্শন করিয়া আসিতেছি।

আমরা ভীরু কাপুরুষ বলিয়া গণ্য। কিন্তু একমাস পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল—আমাদের চরিত্রে কলঙ্কদাতাদিগের মধ্যেই বা কে ভাবিয়াছিল যে, সেই ভীরু বাঙ্গালী জাতির একজন ব্রাহ্মণ একাকী বেলুনে উঠিয়া চারি হাজার ফীট উর্দ্ধে শূন্যমার্গে ভ্রমণ করিয়া একাকী নিরাপদে অবতরণ করিবেন? সময় সুযোগ সুবিধা পাইয়াই রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অসম সাহসের পরিচয় দিয়াছেন, কিন্তু আমি বলি, একা রামচন্দ্র নহে, সময় সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে এই বাঙ্গালা হইতে সহস্র সহস্র রামচন্দ্র এই

মত নানা বিষয়ে অসম সাহস দেখাইতে প্রস্তুত। আমরা সাহসহীন দুর্ব্বল বলিয়া গণ্য। য়ুরোপ হইতে ভারতে যখন প্রথম জিমন্যাষ্টিক অভিনেতা আগমন করেন, তখন তাঁহাদিগের সেই অভিনয় দেখিয়া, সাহস দেখিয়া, আমরা স্তম্ভিত হইয়াছিলাম; কিন্তু বিংশতি বর্ষ পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, বঙ্গের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে পঞ্চমবর্ষীয় বালক পর্য্যন্ত, অবিকল সেইমত জিমন্যাষ্টিক বা ব্যায়াম দেখাইয়া সকলকে স্তম্ভিত করিবে? কলিকাতায় যখন ব্যায়াম সারকস্ আসিয়াছিল, তখন আমেরিকান এবং ইংরাজ সারকস অভিনেতাদিগের অশ্বারোহণে ধাবন নর্ত্তন কুন্দন প্রভৃতি দেখিয়া সকলে স্তম্ভিত হইয়া সাহসের উচ্চ প্রশংসা করিতেন, কিন্তু পাঁচ বর্ষ পূর্ব্বে কে ভাবিয়াছিল যে, এই সাহসহীন দুর্ব্বল বাঙ্গালী—কেবল বাঙ্গালী পুরুষ নহে—কোমলাঙ্গ বাঙ্গালী হইতে কোমলাঙ্গিনী বঙ্গ রমণী পর্য্যন্ত অবিকল সেই আমেরিকান এবং ইংরাজদিগের মত অশ্বারোহণে ধাবন, কুন্দন, নর্ত্তন. প্রভৃতি করিয়া কেবল ভারত নহে—সুদূর সুমাত্রা, যাবা, পিনাং পর্য্যন্ত গিয়া সকলকে বিস্মিত করিবে? কেবল সংখ্যাবদ্ধ বঙ্গীয় যুবক যুবতী এই সাহসের পরিচয় দিয়তছেন বটে, কিন্তু শিক্ষা সুযোগ সুবিধা পাইলে হাজার হাজার বঙ্গীয় যুবক যুবতী এইমত সাহসের পরিচয় দিতে পারে না কি? কে ভাবিয়াছিল যে, নির্জীব নগণ্য জঘন্য বাঙ্গালী যুবক সাত সমুদ্র তের নদী পারে গমন করিয়া বিজাতীয় লেখাপড়া শিখিয়া, গণ্যমান্য সভ্য ইংরাজদিগকে. প্রতিযোগিতা পরীক্ষায় পরাস্ত করিয়া আসিবে? সংখ্যাবদ্ধ বাঙ্গালী সিবিলিয়ান ডাক্তার, বারিষ্টার এবং ইঞ্জিনিয়ার হইয়া আসিয়াছেন বটে, কিন্তু আবার বলি, সুবিধা সুযোগ পাইলে হাজার হাজার বাঙ্গালী ছাত্র ইংলণ্ডে গিয়া, ইংরাজদিগের মাতৃভাষায়, প্রতিযোগিতা পরীক্ষায়. ইংরাজদিগকে পরাস্ত করিয়া আসিতে পারে, তাহারা এমত শক্তি রাখে। কে ভাবিয়াছিল, বাঙ্গালী শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া প্রধানতম বিচারালয়ের প্রধান বিচারপতির আসনে বসিয়া আপনার আইনজ্ঞতা এবং বিচারশক্তির চূড়ান্ত প্রমাণ প্রদর্শন করিবে? কে ভাবিয়াছিল যে, ভারতের সকল জাতির অধম বাঙ্গালী জাতি বিজাতীয় ভাষায় শিক্ষা পাইয়া রাজকার্য্যের সকল বিষয়ে সমুচ্চ প্রশংসা পাইবে? কে ভাবিয়াছিল যে, ক্ষীণপ্রাণ বাঙ্গালী জাতি.

আবার ভারতের সকল জাতিকে পশ্চাতে রাখিয়া রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিবে? আমি আবার বলিতেছি, আমাদিগের জাতিগত উন্নতির পক্ষে প্রয়োজনীয় সমস্ত গুণই প্রচ্ছন্নভাবে আছে, কেবলমাত্র সুযোগ সুবিধা পাইলেই, উৎসাহ আদর্শ পাইলেই, সেগুলি বিশেষরূপে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে।

মেকলে বলিয়া গিয়াছেন যে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সমস্ত সেনাদলের মধ্যে একশত জন খাটী বাঙ্গালী আছে কি না সন্দেহ, আর আমি এখন বলিতেছি যে, বর্ত্তমান ব্রিটিস সেনাদলে একটীও বাঙ্গালী সৈন্য নাই। কিন্তু আজি যদি ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত বাঙ্গালিদিগকে সেনাদলে গ্রহণ করিবার বিধি করেন, তাহা হইলে নিশ্চয়ই সহস্র সহস্র বাঙ্গালী সেনাদলে প্রবেশ করিয়া যুদ্ধ বিদ্যায় এরূপ পারদর্শিতা দেখাইবে যে, ব্রিটিস গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য আত্মগৌরবানুভব করিবেন। ইহা কেবল মুখের কথা নহে, দম্ভের কথা নহে। পরীক্ষা ভিন্ন যখন ইহার মীমাংসা হইবার উপায় নাই, তখন কেহই এ সম্বন্ধে এখন সন্দেহও করিতে পারেন না। বাঙ্গালী বলণ্টিয়ার হইবার জন্য সর্ব্বাগ্রে অগ্রবর্ত্তী, কিন্তু গবর্ণমেণ্ট সে কামনা পূর্ণ করিতে নারাজ। কেন নারাজ, তাহা সকলেই জানেন—সেটা জানা অথচ গুপ্ত কথা। বাঙ্গালী দুর্ব্বল সাহসহীন জাতি বলিয়াও গবর্ণমেণ্ট আপত্তি করিতেছেন না, অন্য রাজনৈতিক গুপ্ত কারণ মনে মনে চাপিয়া রাখিয়াছেন। কিন্তু সে কারণটীও ভাল। ইংরাজ রাজপুরুষদিগের ভয় যে, শিক্ষিত বাঙ্গালী বলণ্টিয়ার হইয়া, যুদ্ধ বিদ্যা শিখিয়া, ভারতে বিদ্রোহানল জ্বালাইবে,—ইংরাজকে তাড়াইবে। কিন্তু ইংরাজ জানিবেন যে, বাঙ্গালী জাতি ইংরাজি মতলবে ইংরাজ জাতির অনুগ্রহে স্বজাতির উন্নতিসাধন করিতে যতদূর যত্নবান, অন্য কোন জাতি সেরূপ যত্নবান নহেন। ইংরাজ যতদিন থাকিবেন, বাঙ্গালীর অভ্যুৎকর্ষ সাধনের ততই সুবিধা হইবে। এমন অবস্থায় ইংরাজের অবস্থিতি বাঙ্গালীর পক্ষে মঙ্গলজনক এবং প্রার্থনীয় নয় কি? ইংরাজকে ভারত হইতে তাড়ান বাঙ্গালী জাতির প্রার্থনীয় হইতে পারে কি?

আবার বলি, আমাদিগের আছে সকলই, কিন্তু প্রচ্ছন্নভাবে; অযত্ন

রক্ষিত অব্যবহৃত পদার্থের ন্যায় সেগুলি পড়িয়া আছে। এখন সুযোগ সুবিধা উৎসাহের প্রয়োজন। কতকগুলি বিষয়ে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট সুযোগ সুবিধা উৎসাহের জন্য দাবি করিবার অধিকারী, আবার কতকগুলি বিষয়ে আমরা পরস্পরে সুযোগ সুবিধা উৎসাহ দান করিতে বাধ্য। একপক্ষে গবর্ণমেণ্ট যেমন সকল বিষয়ে সুযোগ সুবিধা উৎসাহ দান করিতে ক্ষান্ত, দুঃখের বিষয় যে, আমরা নিজেও আবার সেইমত পরস্পরের সুযোগ সুবিধা উৎসাহ দানে উপযুক্ত পরিমাণে অগ্রসর নই। সেইটীই আমাদিগের বর্ত্তমানের কলঙ্কের কথা। এ কলঙ্ক মোচন সর্ব্বাদৌ প্রার্থনীয়। আমরা যে সন্ধি স্থলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি, তাহাতে পরস্পরের হাত ধরিয়া একভাবে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে। পরস্পরের হাত ধরাধরি ভিন্ন সহজে এ সন্ধিস্থল পার হইবার উপায় নাই।

এখন এখানে আমাদিগের দুই একটা দোষের কথা না বলা, ভাল দেখায় না। দয়া মনুষ্য শরীরের একটা প্রধান বৃত্তি। দয়ার সঙ্গে ক্ষমার বিশেষ সম্বন্ধ আছে। মনুষ্য সমাজে বাস করিতে হইলে দয়ার বিশেষ প্রয়োজন। কিন্তু আমরা কিছু অতিরিক্ত দয়াশীল, অতিরিক্ত ক্ষমাশীল, হইয়া পড়িয়াছি। দয়ার পাত্রকে দয়া কর, তাহাতে দোষ নাই, কিন্তু অপাত্রে দয়া বিতরণ করিও না, সংসারে যদি বাস করিতে হয়, তাহা হইলে দয়া এবং ক্ষমার দিকে অধিক ঝোঁক দিলে, অনেক সময় অনেক স্থলে নিজের স্বার্থ ক্ষতি হয়। স্বার্থ ক্ষতির সঙ্গে সঙ্গে কুফলও দেখা দেয়। স্বার্থ ত্রিবিধ—ব্যক্তিগত, জাতিগত এবং সমাজগত। যেখানে তোমার ব্যক্তিগত স্বার্থ লইয়া টানা-টানি, সেখানে তুমি দয়ার বশীভূত হইয়া ক্ষমার সহিত সে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পার বটে, কিন্তু যেখানে জাতিগত এবং সমাজগত স্বার্থ লইয়া কথা, সেখানে তুমি সমাজ এবং জাতির এক অংশ স্বরূপে আপন ইচ্ছায়, দয়ার বশে, সে স্বার্থ ত্যাগ করিতে পার না। তোমার জাতিগত রাজনৈতিক স্বার্থ বা স্বত্বটুকু অপরে জোর করিয়া দখল করিয়া রাখিবে, আর তুমি দয়ার বশে দখলকারীর উপর ক্ষমা করিয়া থাকিবে, তোমার সে অধিকার নাই। কিন্তু আমাদিগের যে সেই অধিকার নাই, তাহা এখন ভুলিয়া গিয়াছি। আবার এই অতিরিক্ত দয়ার জন্যই আমরা অলক্ষ্যে সমাজেরও অনিষ্ট

করিয়া থাকি। একজন ইংরাজের একজন চাকর একটা পয়সা চুরি করিলে সে ইংরাজ তদ্দণ্ডেই তাহাকে পুলিশে দিবে। নিজের সমস্ত ক্ষতি স্বীকার করিয়া সমস্ত দিন আদালতে বসিয়া, চোরকে দণ্ড দেওয়াইবে, কিন্তু আমাদের কোন ভৃত্য এক পয়সার স্থলে পাঁচ টাকা চুরি করিলেও আমরা তাহাকে সহজে পুলিশে দিতে চাই না। হয়ত বা কতক মারিয়া ছাড়িয়া দিই। এখানে ইংরাজকে নির্দ্দয় এবং আমাদিগকে সদয় বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু ইংরাজ চোরের দণ্ড দিয়া সমাজের উপকার করিতেছেন, আমরা অলক্ষ্যে সমাজের অপকার করিতেছি। অতিরিক্ত দয়ার বশে এখানে আমরা সমাজের মঙ্গল ভুলিয়া যাই। কেবল চুরি নহে, অনেক বিষয়েই আমরা অতিরিক্ত দয়া প্রকাশ করি, এবং সেই সূত্রে আমাদিগের সমাজগত এবং জাতিগত অনেকটা অমঙ্গল হয়। দয়ার পাত্রকে দয়া কর, অপাত্রে করিও না।

ইংরাজি শিক্ষার গুণে, ইংরাজের বিধান বলে, আমরা এখন ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতা বেশ বুঝিয়াছি। এটা সুখের কথা। এই ব্যক্তিগত স্বত্ব স্বাধীনতা হইতেই আবার জাতিগত স্বত্ব স্বাধীনতা চিনিতে পারা যায়। কিন্তু আমরা ব্যক্তিগত সাম্য স্বাধীনতা বুঝিতে গিয়া একটা বড় ভুল করিতেছি। "অমুক একজন প্রধান বাগ্মী, ভাল, তিনি বাগ্মী আছেন, আমার কি?" "অমুক একজন রাজনীতিজ্ঞ, ভাল, তাতে আমার কি?" "অমুক একজন প্রগাঢ় পণ্ডিত, ভাল তাতে আমার কি?" এই রকম একটা অপ্রার্থনীয় ভাব এখন দেখা গিয়াছে। সকলেই স্ব স্ব-প্রধান হইবার চেষ্টা করিতেছে। এ চেষ্টা অবশ্য ভাল, কিন্তু তাহা বলিয়া কাহাকেও না মানিয়া চলাটা কি ভাল? আমরা সকলেই নেতা হইতে চাই, কিন্তু নেতা হইতে চাহিলে, অগ্রে যে, নেতার অধীনে চলিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। সেই জন্যই শিক্ষিত বাঙ্গালীর মধ্যে প্রকৃত নেতা হইবার সর্ব্বাংশে যোগ্য লোক থাকিলেও আমরা নেতার অনুসরণ করিতে শিখিতেছি না। সকলেই নেতা হইবার উপযুক্ত গুণ সংগ্রহ জন্য চেষ্টা কর, সেই সঙ্গে সঙ্গে একজন নেতার অনুসরণ করিতে থাক। নেতা ভিন্ন এবং সকলের সেই নেতার অনুসরণ ভিন্ন, কোন জাতিই কোন কাজ করিতে

পারে না। সেনাপতি ভিন্ন যেমন যুদ্ধ চলে না, নেতা ভিন্ন সেইমত জাতির কাজ চলে না। আবার প্রত্যেক সৈন্য যেমন সেনাপতির প্রত্যেক আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য, জাতির প্রত্যেক ব্যক্তিও সেইমত নেতার আজ্ঞামত চলিতে বাধ্য!

আমাদিগের ধর্ম্মরাজ্যে বড়ই বিপ্লব উপস্থিত। শিক্ষিতগণ আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিলেও মূল হিন্দুধর্ম্মের সহিত, ক্রিয়া কর্ম্মের সহিত, তাঁহাদিগের সম্বন্ধ বড়ই কম, একথাটা বোধ হয় মিথ্যা নয়। আমরা হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিই, আমাদিগের মধ্যে অনেকেই হিন্দুধর্ম্মের কিছুই জানি না। যে কয়টী প্রতিমা পূজা হয়, তাহাদিগের নাম জানি, কিন্তু সে গুলির উৎপত্তির কারণ জানি না। আমরা অনেকেই বেদবেদান্ত উপনিষদ পদার্থটা কি তাহা জানি না, পুরাণ গুলির মর্ম্ম জানি না, পাঠও করি না, সমাজ সম্বন্ধীয় বিধি গুলির উদ্দেশ্য কি তলিয়া দেখি না। এখন যে ভাবে আমাদিগের প্রাত্যহিক জীবন অতিবাহিত হইতেছে, তাহাতে ধর্ম্মের সঙ্গে আমাদের বড় একটা দেখা শুনা হয় না। আলয়ে বা বিদ্যালয়ে কোথাও দিনের মধ্যে ভ্রমেও একবার ভগবানের নাম করিবার জন্য উপদেশ পাই না। ধর্ম্ম ব্যতীত নৈতিক নির্ম্মলতা এবং পবিত্রতা লাভ করা যায় না। আমরা ধর্ম্মকে বাদ দিয়া কেবল শিক্ষা জ্ঞানের বলে কতকটা নীতিরক্ষা করিয়া চলি মাত্র। ধর্ম্মহীন জীবন অবশ্যই প্রার্থনীয় নহে। শিক্ষাজ্ঞান লাভ করিয়া যদি তোমাদের সাকার মূর্ত্তি পূজা করিতে অভিলাষ না থাকে, যদি নিরাকার সচ্চিদানন্দ হরির আরাধনা করিবার তোমার ক্ষমতা হইয়া থাকে, তাহাই কর, হিন্দুধর্ম্মেও সে ব্যবস্থা আছে, আর্য্য ঋষিগণও তাহাই করিয়া গিয়াছেন। প্রতিমা পূজায় তোমাদের ভক্তি নাই বলিয়া, তুমি হিন্দুধর্ম্ম, হিন্দুসমাজ ছাড়িয়া একটা স্বতন্ত্র দল বাঁধিয়া, স্বতন্ত্র জাতি হইবার চেষ্টা করিও না, সাকার পূজার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইও না। যাহার যাহাতে ভক্তি, তাহার তাহাতেই মুক্তি। তোমার নিরাকারে ভক্তি থাকে, নিরাকারকে চিন্তা করিবার অধিকার হইয়া থাকে, ঘরের ছেলে ঘরে থাকিয়া, সেই নিরাকারের উপাসনা কর; আর যাহাদিগের চিন্তাশক্তি নিরাকার চিন্তা করিতে সক্ষম নহে, তাহাদিগের জন্য সাকার মূর্ত্তির সৃষ্টি হইয়াছে, তাহারা মুক্তির জন্য সেই সাকার মূর্ত্তির উপাসনা করে, করুক না, তাহাতে তোমার ক্ষতি কি?

আমি এমন বলি না যে শিক্ষিত হিন্দু মাত্রেই ধর্ম্ম হীন। অবশ্য হিন্দু শাস্ত্র মত সকল কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন এমত শিক্ষিত হিন্দু আছেন বটে, কিন্তু হিন্দু নামে পরিচয় দানকারী অথচ হিন্দুধর্ম্মের সকল মর্ম্ম, সকল বিধি, সকল উপদেশ জানিতে পারেন নাই বলিয়া তাহা মানেন না, এমন শিক্ষিত হিন্দুই অনেক। আবার সকার বা নিরাকার কোন প্রকার মূর্ত্তির উপাসক নহেন, এখন শিক্ষিত হিন্দুও দেখা দিয়াছেন। ধর্ম্ম রাজ্যের এ বিপ্লব অবশ্যই শোচনীয়। এ শোচনীয় অবস্থা থাকিতে দেওয়া কি উচিত?

আমাদিগের পক্ষে এখন কর্ত্তব্য কি? আমরা যে সন্ধির মুখে আসিয়াছি, তাহাতে আমাদিগকে অতীত এবং বর্ত্তমান দুই দিকেই তীব্র দৃষ্টি রাখিতে হইবে। মুনি ঋষিগণ বহুল চিন্তা, বহুল মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া উন্নতির যে সকল বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন, তাহার মধ্যে যে গুলি এখনও আমাদিগের সমাজের বর্ত্তমান অবস্থার উপযোগী আছে, সেগুলিকে লইতে হইবেই, আবার পাশ্চাত্য জগত হইতে শিক্ষা বিজ্ঞান সভ্যতার দ্বারা যে গুলি আমদানী হইতেছে, তাহার মধ্যে যে গুলি আমাদিগের পক্ষে উপযোগী, সেইগুলি বাছিয়া লইতে হইবে। ঘরে যাহা আছে, তাহা লইবই, পরে যাহা ভাল অথচ উপকারী ও উপযোগী করিয়া দিবে, তাহা লইব না, এ প্রতিজ্ঞা এখন চলিবে না। সময়ের গতির সঙ্গে দৌড় দিতে হইল, সময়ের উপযোগী সাজে সাজিতে হইবে, নতুবা পশ্চাতে পড়িয়া থাকিবে। তবে পাশ্চাত্য জগৎ হইতে আমদানী করা যাহা কিছু দেখিব, তাহাই লইব, এ প্রতিজ্ঞা ভাল নয়। কারণ ইহাতে আমরা গুণগুলির সঙ্গে সঙ্গে দোষগুলিও লইতে পারি এবং কোন কোন কোন বিষয়ে লইতেওছি। তাহা কি প্রার্থনীয়?

এখন মধুময়ী উষার স্নিগ্ধ সুন্দর জ্যোতি দেখা গিয়াছে। এখন সকলকে জাগাইয়া তুল। বিশ্বজয়ী ব্রিটিস সিংহ পথ প্রদর্শকরূপে অগ্রবর্ত্তী হইয়া যাইতেছে, সম্মুখে কোন ভয় নাই। এখন ঐ প্রভাকরের সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে গন্তব্য পথে উন্নতির সৌরভময় কুঞ্জবনে প্রবেশ করিতে হইবে; বেলা থাকিতে থাকিতে পৌছিতে হইবে; সুতরাং আবার বলি, সকলকে জাগাইয়া

তুল; সচ্চিদানন্দ হরি নামের জয়ধ্বনি করিয়া, পরস্পরে ভাই ভাই হাতে ধরাধরি করিয়া, অগ্রসর হও; মাতৃভূমির নামোচ্চারণ করিয়া শুভ যাত্রা কর; আর আমি ব্রাহ্মণ বেদ মন্ত্রে আশীর্ব্বাদ করি—"তোমাদিগের কামনা এক হউক, তোমরা যেন সর্ব্ব প্রকারে সম্যকরূপে একমত হও।"

বোম্বাই পরিদর্শন।

৫।

Parsee Benevolent Institution. আজ কাল ভারতবর্ষে হিন্দু ব্যতীত দেশীয়দিগের মধ্যে পার্শীদের ন্যায় আর দানশীল জাতি নাই। স্যার জেমস্ জি, জি, বাই ও তাঁহার স্ত্রী "আভা" বাই দরিদ্র বালক বালিকা-দিগের শিক্ষার জন্য ও দরিদ্রের ভরণ পোষণের জন্য, বিদ্যালয় ও অতিথি শালা নির্ম্মাণ হেতু (৩০০০০০) তিন লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন; দাতব্য, পার্শীদের মধ্যে অনেকেরই আছে, কিন্তু সে সকল দাতব্য স্বজাতীয়দিগের জন্য। দাতব্য, হিন্দুর নিকট নূতন কথা নহে। ভারতের যথা তথা হিন্দুর দাতব্য কীর্ত্তি এখন দেদীপ্যমান। হিন্দুর দাতব্যে স্বজাতীয় বিজাতীয় সক-লেই উপকৃত হইয়া থাকে। আজ কাল কিন্তু হিন্দুদিগের এরূপ দাতব্য লোপ পাইতেছে। এটুকু ইংরাজী শিক্ষার একটি কুফল।

Fire Temples অর্থাৎ অগ্নিমন্দির। বোম্বাই সহরে সর্ব্বশুদ্ধ ৩৩টি অগ্নি মন্দির আছে, তন্মধ্যে কতকগুলি গৃহস্থের বাটীতে আছে, সেগুলিতে কেবল মাত্র গৃহস্থের পরিবারবর্গ উপাসনা করিতে পারেন, অন্যের প্রবেশের অধিকার নাই এবং আর কতকগুলি সাধারণের জন্য, সেগুলিতে Zoroastrian ধর্ম্মা-বলম্বী সকলেই প্রবেশ করিতে পারেন। পার্শীদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রয়োজকের নাম Zoroaster; আমাদের যেমন মনু, ইঁহাদেরও তেমনি তিনি ছিলেন।

পার্শীদিগের অগ্নি মন্দির সম্বন্ধে বিশেষ বক্তব্য কিছু নাই, ইঁহাদের পুরোহিতেরা এই সকল মন্দিরের তত্ত্বাবধারণ করেন। তাঁহার নিয়মিত কার্য্য এই, যে তিনি গৃহ মধ্যস্থিত অগ্নিতে সুগন্ধ কাষ্ঠাদি দিয়া অনুক্ষণ প্রজ্বলিত রাখিবেন এবং সেই অগ্নি সমক্ষে উপাসনা আদি করিবেন।

পার্শীদিগের মধ্যে যাঁহারা অশিক্ষিত, তাঁহারা যেমন অগ্নি উপাসনা করেন, তেমনি চন্দ্র সূর্য্য তারা প্রভৃতির উপাসনাও করিয়া থাকেন; কিন্তু শিক্ষিত-দল কেবলমাত্র অগ্নি সমক্ষে সর্ব্বশক্তিমান জগদীশ্বরের উপাসনা করেন। ইউরোপীয় কয়েকজন বিখ্যাত পণ্ডিতেরা বলেন, যে পার্শীরা অগ্নি উপাসক নহেন। Dr Hyde তাঁহার পার্শী ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় গ্রন্থে বলিয়াছেন:—"The Persians, from the beginning of their existence as a nation, always believed in only one and the same true and omnipotent God. They believed in all the attributes of the Diety believed by us; and God is called in their own writings, the Doer, the Creator, the Governor, and the Preserver of the world."

শেঠ Dosabhoy Framjee পার্শীদিগের সম্বন্ধে যে গ্রন্থ লিখিয়াছেন তাহাতে তিনি বলিয়াছেন:—"The charge of fire, sun, water and air worship has, however, been brought against the Parsees by those not sufficiently acquainted with the Zoroastrian faith, to form a just opinion. The Parsees themselves repel the charge with indignation. Ask a Parsee whether he is a worshipper of the sun, or fire, and he will emphatically answer—No! This declaration itself, coming from one whose own religion is Zoroastrianism, ought to be sufficient to satisfy the most sceptical. God, according to the Parsee faith, is the emblem of glory, refulgence. and light, and in this view a Parsee, while engaged in prayer, is directed to stand before the fire, or to direct his face towards the sun, as the most proper symbols of the Almighty."

বোম্বাই সহরের পথগুলি সর্ব্বত্রই প্রশস্ত এবং অতি পরিস্কার। রাস্তার দুই ধারে কলিকাতার ন্যায় ফুটপথের উপর গ্যাশের আলো; ট্র্যামওয়ে সর্ব্বদা চলিতেছে, কিন্তু কলিকাতা হইতে বোম্বায়ে ট্র্যামওয়ে অপেক্ষাকৃত অল্প। তাহার কারণ বোম্বাই সহরে পাড়ায় পাড়ায় ট্রেণ চলিতেছে, ট্র্যাম-ওয়ের তত প্রয়োজন নাই; ভাড়াগাড়ি বোম্বায়ে খুব সস্তা। গাড়ীগুলিও ভাল; ⁄৴০, ।০ আনায় বগি, Victoria ফিটন, ব্রুহাম, পাল্কীগাড়ী প্রভৃতি, কলিকাতা অপেক্ষা বিস্তর অল্প মূল্যে, ভাড়া পাওয়া যায়।

বোম্বাই সহরের প্রধান উৎসব এই কয়টি;—দেওয়ালি, নারেল পুনাম (এই উৎসবে হিন্দুরা সমুদ্র গর্ভে নারিকেল উৎসর্গ করেন) জন্ম অষ্টমী, মহরম, এবং পর্টুগিজদিগের খৃষ্টীয় উৎসব। এই সকল উৎসবের মধ্যে দেওয়ালি ও নারেল পুনামের সময় সমারোহ সর্ব্বাধিক হইয়া থাকে।

বোম্বায়ে যাইলেই, Caves of Elephanta যাহাকে দেশীয়েরা "ঘারিপুরী" কহে, তাহা সকলেরই দর্শন করিয়া আসা উচিত। Appollo Bander হইতে বোটে করিয়া অথবা ছোট ছোট steam launch করিয়া অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসে এমন কি সদ্য সদ্যই এই গিরিগুহা দেখিয়া আসা যায়। এই গুহা বোম্বায়ের অদূরস্থিত একটি দ্বীপের উপর। এ গুহা নাসীকের পাণ্ডু গুহা হইতে বৃহৎ। ইহার নাম Elephanta Caves হইল, তাহার কারণ, এই দ্বীপের দক্ষিণ দিকে, উপকূল ভাগে, একটি প্রস্তরের হস্তীর মূর্ত্তি ছিল, এক্ষণে সে মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া প্রস্তর স্তূপে পরিণত হইয়াছে। সে প্রস্তর স্তূপ এই দ্বীপ হইতে তুলিয়া আনিয়া, Victoria উদ্যানে স্থাপিত হইয়াছে। এই সকল গুহা কবে ও কাহার দ্বারা সৃজিত, তাহার কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না। এইরূপ প্রবাদ আছে যে, এই গিরি গুহার সম্মুখে এক প্রস্তর ফলকে ইহার ঐতিহাসিক বৃত্তান্ত ক্ষোদিত ছিল, কিন্তু পর্টুগীজেরা, তাহা সে স্থান হইতে তুলিয়া লইয়া গিয়া Lisbon নগরে রাখিয়াছে এবং সম্প্রতি শুনা যাইতেছে যে ভারতবর্ষীয় কোন এক প্রাচীন বৃত্তান্ত ক্ষোদিত, এক প্রস্তর ফলক, Lisbonএ পাওয়া গিয়াছে; সম্ভবত, তাহাই এই ঘারিপুরীর প্রস্তর ফলক। এই সকল গিরিগুহায় হিন্দুদিগের প্রাচীন নিদর্শন বিস্তর আছে, বিস্তারিত করিয়া বলিলাম না, তাহার কারণ, উহাদের প্রকৃত বৃত্তান্ত জানিবার উপায়

নাই। কিন্তু তাহা হইলেও এ গিরিগুহা সকলেরই দেখিয়া আসা উচিত। এখান হইতে বোম্বাই ও সমুদ্রের দৃশ্য অতি সুন্দর। সহর হইতে বিহার হ্রদ ও "কেনেরি গুহা" এক দিনেই দেখিয়া আসা যায়। বিহার হ্রদ ও থানার মধ্যে, স্যালসিটি দ্বীপের উপর এক উচ্চ পর্ব্বতের গিরিগুহার নাম "কেনেরি গুহা।" এখানে প্রায় ১০০টি গুহা আছে। এ গুহা Elephanta হইতে প্রাচীনতর ও বৃহত্তর। এখানকার এক একটি গুহা পর্ব্বতের ভিতর এতদূর চলিয়া গিয়াছে, যে এ পর্য্যন্ত কেহ ভরসা করিয়া তাহার আদ্যোপান্ত দেখিয়া আসিতে পারেন নাই। কেহ কেহ বলেন যে এই পর্ব্বত গুহা বরাবর সুড়ঙ্গের মত, বোম্বায়ের ১০৮ মাইল উত্তরে ডামুয়ান পর্য্যন্ত প্রসারিত। একজন পর্টুগিজ, এ গুহা কতদূর গিয়াছে তাহা সন্ধান করিবার জন্য, গুহার মুখে কতক লোক সংগ্রহ করিয়া, এক বৃহৎ রজ্জুর এক প্রান্ত তাহাদের হস্তে ও অপর প্রান্ত নিজে ধরিয়া, এমন কি সাত ঘণ্টা গিয়াও শেষ না পাইয়া, নৈরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কেনেরি গুহার ভিতর বৌদ্ধ ঋষিদিগের বাস স্থানের বিস্তর নিদর্শন এখনো রহিয়াছে। এখন যে গুহাকে দরবার গুহা বলিয়া লোকে উল্লেখ করে, সে গুহাটি দেখিলে বোধ হয় যে তাহা বৌদ্ধদিগের বিদ্যালয় ছিল। এই গুহার স্থানে স্থানে সিংহ আসনে ও পদ্মাসনে বৌদ্ধের মূর্ত্তি আছে। এখানকার বৃহৎ গুহাটি ৮৮½ ফিট দীর্ঘ এবং ৩৮½ ফিট প্রশস্ত। এই গুহায়, পালী ভাষায় প্রস্তরের উপর বিস্তর লেখা আছে। "কেনেরি গুহা" সম্বন্ধে বলিতে হইলে, বিস্তর বলিবার আছে কিন্তু সে সকল কথা এখন বলিবার সময় হইবে না। বোম্বাই গিয়া যিনি কেনেরি গুহা না দেখিয়া আসিবেন, তাঁহার বোম্বাই দেখা মঞ্জুর নহে।

Carlee Caves কার্লীগুহা। বৌদ্ধদিগের এইরূপ যত গুহা আছে তন্মধ্যে কার্লীগুহা সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং উহার প্রাচীন নিদর্শনগুলি কিছুমাত্র নষ্ট হয় নাই। শালিবাহনের সময় এই গুহার নির্ম্মাণ হইয়াছিল বলিয়া অনেকেই অনুমান করেন। Heber সাহেব এই গুহা সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে "Altogether, it would form a very noble temple for any religion." কার্লীগুহা দেখিতে যাইতে হইলে, জি, আই, পি, রেল দিয়া গিয়া "বোরঘাটের" এক শৈল শৃঙ্গের উপর Lanowlee নামক ষ্টেসনে

নামিয়া যাইতে হয়। Lanowlee যাইবার পূর্ব্বে, Khandalar এষ্টেসন্‌ মাষ্টারকে, পরদিন প্রত্যূষে Lanowlee এষ্টেসনে একটি টাট্টু ঘোড়া রাখিয়া দিবার জন্য লিখিয়া যাইতে হয়; সে রাত্রে Lanowlee এষ্টেসনে, বিশ্রাম গৃহে কাটাইয়া, পরদিন প্রত্যূষে সুন্দর সুন্দর প্রার্ব্বত্য প্রদেশের দৃশ্য দেখিতে দেখিতে, পুনার পথে তিন মাইল দূরে কার্লীগুহা দেখিয়া আসা যায়।

· বোম্বায়ের ফল মূল সুস্বাদু, মৎস্য মাংস বড় উপাদেয়। সকল মৎস্যেরই স্বাদ একটু তপ্‌সে মাছের স্বাদের ন্যায়। Pumfled মৎস্য অতি উৎকৃষ্ট মৎস্য; দেখিতে পায়রা চাঁদার ন্যায়, কিন্তু তাহা অপেক্ষা অনেক বৃহৎ। বোম্বায়ে আহার্য্য দ্রব্য বড় মহার্ঘ; ৮।১০ টাকা ভাল চালের মন এবং ২॥০ সের করিয়া দুগ্ধ টাকায়।

বোম্বায়ের কলগুলি দর্শন করা নিতান্ত আবশ্যক। আমরা কয়েকটি কল্‌ দেখিয়াছি। এখানে দেশীয়দিগের প্রায় ৭০।৭৫টি কল্‌ আছে। আমি এই সকল কল্‌ দেখিবার সময়, পরিশ্রম ও সময়ের চমৎকার বিভাগ দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলাম। শেঠ প্রেমচাঁদ রায় চাঁদের পুত্র শেঠ ফকির-চাঁদ সঙ্গে করিয়া আমাদের এই সকল কল্‌ দেখাইয়াছিলেন। *

---

* (১) আমরা শেঠ প্রেমচাঁদের বাটিতে গিয়াছিলাম, তিনি যে গলিতে থাকেন তাহার নাম Love Lane প্রেম গলি, যে বাটীতে থাকেন তাহার নাম প্রেমোদ্যান এবং তাঁহার নিজেরো নাম প্রেমচাঁদ। এই সকল নামের সাদৃশ্য বড় সুন্দর।

(২) এই সকল কলের কর্ম্মচারী কেবল ইঞ্জিয়ার ব্যতীত আর সকলেই দেশীয়। কোন কোন কলে প্রায় দুই হাজার দেশীয় পুরুষ রমণী, বালক বালিকা প্রতিপালিত হইতেছে। মিলের তত্ত্বাবধারকদিগের বেতন কাহারো ৩০০, কাহারো বা ৪০০, ৫০০, ৬০০; ৭০০, ইহারো অধিক বেতন কাহারো কাহারো আছে। ইঁহাদের কার্য্য অতি গুরুতর। মিলে এত লোক কায করে, ইহাদের মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ মার্‌ পিট্‌ সর্ব্বদাই হইয়া থাকে, তত্ত্বাবধারককে সে সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া, কায চালাইতে হয়। পাঁচ মিনিটের জন্য মিলের কার্য্য বন্ধ হইলে, মহাজনের বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। একবার শুনিয়াছিলাম যে, যে নল দিয়া মিলের কলে জল সরবরাহ্‌ হইয়া থাকে, সেই নলের মুখে ছিদ্র আছে, তাহাতে কয়েকটি গেঁড়ি বসিয়া ছিল, তখনি মিলের সকল কার্য্য বন্ধ হইয়া গেল। কেন কল্‌ বন্ধ হইল

দাক্ষিণাত্যে ব্রাহ্মণ।

২।

ইতিপূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সারস্বত ও গৌড় ব্রাহ্মণ, পঞ্চ গৌড়ের অন্তর্গত। কিন্তু, যে সকল ব্রাহ্মণ সরস্বতী নদীর তীর হইতে গৌড় প্রদেশে গিয়াছিলেন এবং গৌড় হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন, সেই সকল ব্রাহ্মণ সারস্বত গৌড় বলিয়া অভিহিত হয়েন। কতকগুলি ব্রাহ্মণ, যে বঙ্গদেশ হইতে দাক্ষিণাত্যে আসিয়াছিলেন, তাহার কোন কোন নিদর্শনও পাওয়া যায়। তাঁহারা মৎস্য ব্যবহার করেন। যে সকল গৌড় ব্রাহ্মণ দ্রাবিড় ব্রাহ্মণদের নিকটে থাকেন, তাঁহারা প্রকাশ্যে মৎস্য ব্যবহার করেন না বটে, কিন্তু যাঁহারা গোমন্তকে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের মধ্যে মৎস্য ব্যবহার, প্রচলিত আছে। আমরা একদা এখানকার একটী ভোজন গৃহে উপস্থিত হইয়াছিলাম। তথায় মৎস্য দিয়া ব্যঞ্জন প্রস্তুত হইয়া থাকে এবং অভ্যাগতদিগের মধ্যে যাঁহারা ইচ্ছা করেন, তাঁহারা তাহা ভোজন করিতে পারেন। এখানকার বড় লোককে বাব বলিয়া সম্বোধন করা হয়। ইহা বাবু শব্দের অপভ্রংশ এরূপ অনুমিত হইতে পারে।

কতকগুলি ব্রাহ্মণ ত্রিহোত্র (তিরহুত) হইতে আসিয়া এতৎপ্রদেশে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহারা ত্রিহোত্র ব্রাহ্মণ নামে অভিহিত। কিন্তু তাঁহাদের সংখ্যা অতি অল্প। দাক্ষিণাত্যে দেশস্থ এবং কোকনস্থ সম্প্রদায় প্রবল। ইঁহারা গৌড় ব্রাহ্মণদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। মৎস্য

কেহই সন্ধান করিয়া উঠিতে পারেন না। মহাজনের বিস্তর ক্ষতি হইতে লাগিল, শেষে ইঞ্জিনিয়র আসিয়া, অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া, জলে নামিয়া নলের মুখে হাত দিবামাত্র সকল কল চলিতে লাগিল। যাঁহারা কারণ বুঝিলেন না, তাঁহারা হয়ত ইঞ্জিনিয়ারকে অবতার বিশেষ ভাবিতে লাগিলেন। এই সকল মিলের কার্য্য প্রণালী দেখিলে, ইচ্ছা করে, আমাদের পরিশ্রম ও সময় এইরূপে বিভাগ করিয়া লই।

আহার করেন বলিয়া গৌড় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কাছে অবজ্ঞার পাত্র। ঘৃণা-ব্যঞ্জক শেণুই শব্দে গৌড় ব্রাহ্মণগণ অভিহিত হয়েন। কিন্তু যদিও শেণুই শব্দ এখন মন্দ ভাবে ব্যবহৃত হয়, ইহার প্রকৃত অর্থ, শ্রেষ্ঠ এবং বিদ্বান্। শেণুই, শর্ম্মণ শব্দের অপভ্রংশ। গৌড় ব্রাহ্মণ ভিন্ন, দাক্ষিণাত্যের কোন কোন স্থানের ব্রাহ্মণগণ মৎস্য ও মাংস ভক্ষণ করেন, কিন্তু শ্রাদ্ধ বিবাহাদি সমারোহে যখন ব্রাহ্মণাদিকে ভোজন করান হয়, সে সময় ইহা ব্যবহৃত হয় না।

শাস্ত্র অনুসারে শ্রাদ্ধ কিম্বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আমিষ ব্যবহার হয়। প্রাচীন কালে ইহা নিবেদিত হইয়া ব্রাহ্মণদের বণ্টন করিয়া দেওয়া হইত। এই ব্যবস্থা অনুসারে, দেশস্থ এবং কোকনস্থ ব্রাহ্মণগণও কখন কখন কার্য্য করিয়া থাকেন। ইংরাজী ১৮৮৪ সালে, আলিবাগ নামক স্থানে, একজন কোকনস্থ ব্রাহ্মণ, একটী যজ্ঞ করিয়া, ২২টী মেষ বলি দিয়াছিলেন এবং যজ্ঞ শেষ হইলে, সেই মেষ মাংস রন্ধন করত ব্রাহ্মণদের ভোজন করাইয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যের গৌড় ব্রাহ্মণদের অনেক গুলি গোত্র। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত কয়েকটী প্রসিদ্ধ :—

(১) বাৎস্য (২) কৌণ্ডিল্য (৩) কৌশিক (৪) ভরদ্বাজ (৫) বশিষ্ঠ (৬) জামদগ্ন্য (৭) মৌদ্গল্য (৮) অত্রি (৯) কুৎস্য, সাংখ্য এবং সিদ্ধি (১০) গৌতম (১১) আঙ্গিরস (১২) নৈধ্রুব (১৩) কাশ্যপ (১৪) বিশ্বামিত্র (১৫) শাণ্ডিল্য (১৬) ধনঞ্জয় (১৭) সংখ্যায়ণ (১৮) গর্গ। ইঁহাদের মধ্যে বাৎস্য গোত্রের ব্রাহ্মণই অধিক। কৌণ্ডিল্য গোত্র তাহার নিম্ন স্থল অধিকার করিয়াছে। প্রাচীন কালে, ইঁহারা চারি বেদই অধ্যয়ন করিতেন। কিন্তু কালে ইঁহাদের মধ্যে কেবল ঋগ্বেদেরই চর্চ্চা রহিল এবং এই নিমিত্ত ইঁহারা ঋগ্বেদী বলিয়া অভিহিত।

যে সকল ব্রাহ্মণ এতৎপ্রদেশে আগমন করেন, তাঁহারা শাক্ত সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন। তাঁহারা বঙ্গদেশ হইতে আসিবার সময়ে, তাঁহাদের কুল দেবতা হর পার্ব্বতীকে সঙ্গে লইয়া আসেন। এখানকার ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, বাঙ্গালার উত্তর প্রদেশে ভাগীরথী তীরে একটী ক্ষেত্র আছে, তাহার

নাম মাঙ্গিরিশ এবং এই স্থান হইতে হর-পার্ব্বতীর মূর্ত্তি আনীত হইয়াছিল বলিয়া, এতদঞ্চলে, শিবের একটী নাম মাঙ্গিশ বা মঙ্গেশ হইয়াছে। গোমন্তকের অন্তর্গত কব্‌ড়ে নামক একটী ক্ষেত্রে, গৌড় ব্রাহ্মণদিগের গুরুকুলের একটী মঠ আছে। ইহার নাম কৈবল্য মঠ। এই মঠের অধিকারী শ্রীমৎ পরমহংস শ্রীমৎ আত্মানন্দ সরস্বতী স্বামী। এরূপ প্রবাদ যে, উত্তর দেশ হইতে গৌড় পাদাচার্য্য নামক এক ব্যক্তি আসিয়া এই মঠটী স্থাপিত করিয়াছিলেন। কিন্তু ইহা যে কোন্ সময়ে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহা কাহারও বিদিত নাই। বরদার অধিপতি, এই মঠের ব্যয় নির্ব্বাহ জন্য, মাসে মাসে বৃত্তি দিয়া থাকেন। এই মঠের শাখা চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে, এই কএকটী স্থানের মঠ প্রসিদ্ধ:—কাশী, প্রয়াগ, ব্রহ্মাবর্ত্ত, নাসিক, বালকেশ্বর (বোম্বাই), রামেশ্বর, গোকর্ণ, থানাপুর, সোনৌড়ে এবং বেলগাঁও। এই সকল মঠের কার্য্য নির্ব্বাহ জন্য, নানা স্থানের রাজা ও ধনী ব্যক্তিগণ অর্থের দ্বারা সাহায্য করিয়া থাকেন। প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, ইঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হয়েন। চৈতন্য দেব, এ প্রদেশে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়াছিলেন এবং তাঁহারই প্রচারের ফলে যে এতদঞ্চলের লোক হরিভক্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে আর সন্দেহ করা যায় না। এই বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের দুইটী মঠ আছে:—একটী কাশীতে এবং আর একটী গোকর্ণে।

গৌড় ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্র আলোচনায় কাল যাপন করেন। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা বৈদিক, তাঁহারা শূদ্রের পৌরোহিত্য কিম্বা দান গ্রহণ করেন না। বৈদিকদের মধ্যে, কএক জন উত্তম পণ্ডিত আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে, বেলগাঁয়ের লক্ষ্মণ ভট্ট উপাধ্যায়, কর্ণাটকের বেদমূর্ত্তি নারায়ণ ভট্ট এবং লক্ষণ ভট্ট, বিশেষ প্রসিদ্ধ। গৌড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে ভিক্ষুকের সংখ্যা অল্প। ইঁহাদের অনেকেই বৈষয়িক কার্য্যে ব্যাপৃত। অনেকে কারকুণ অর্থাৎ কেরাণী এবং পহোজী অর্থাৎ শিক্ষকের কার্য্য করেন। পহোজী পণ্ডিত শব্দের অপভ্রংশ। গৌড় ব্রাহ্মণদের মধ্যে কেহ কেহ কুলকর্ণী ও দেশপাণ্ডের কার্য্যও করেন। যাঁহারা সমস্ত গ্রামের আয় ব্যয়ের হিসাব রাখেন, তাঁহারা কুলকর্ণী নামে অভিহিত হয়েন এবং যাঁহারা সমুদয়

পরগণার [illegible], তাঁহাদের দেশপাণ্ডে বলে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ দেশীয় রাজা ও মোগল অধিপতির অধীনে মন্ত্রী ও অন্যান্য উচ্চপদ লাভ করিয়াছিলেন। কাহার কাহার জায়গীর আছে, এবং কেহ কেহ উত্তম রূপে ব্যবসা চালাইতেছেন। সম্প্রতি ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইংরাজী ভাষায় বিশেষরূপ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছেন। বোম্বাই হাইকোর্টের বিচারপতি খ্যাত নামা কাশীনাথ ত্র্যম্বক তেলাং এবং সুবিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ ও পণ্ডিত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর—গৌড় ব্রাহ্মণ। এতদঞ্চলের গৌড় ব্রাহ্মণদের ভাষা গোমন্তকী। ইহার সহিত মারহাট্টি ভাষার অনেক সাদৃশ্য আছে। কিন্তু নানা স্থানে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়াতে ইঁহারা ইঁহাদের নিজ ভাষা বড় ব্যবহার করেন না। মহারাষ্ট্র দেশবাসী গৌড় ব্রাহ্মণগণ মারহাট্টা, কর্ণাট বাসীগণ কানারাড়ি এবং মালবার বাসীগণ, মালবারী ভাষা ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে, আপন আপন গৃহ মধ্যেও ইঁহারা গোমন্তকী ভাষায় কথাবার্ত্তা কহেন।

গৌড় ব্রাহ্মণগণ যে স্থলে অবস্থিতি করেন, সেই স্থানের আচার ব্যবহার অবলম্বন করিয়া থাকেন। তবে তাঁহাদের মধ্যে যাহা বিশেষ রূপে প্রচলিত তাহা বিবৃত করিতেছি। শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট আট প্রকার বিবাহের মধ্যে, ব্রাহ্ম-বিবাহকে তাঁহারা শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করেন। শাস্ত্র অনুসারে ইঁহারা কন্যাকে নানা অলঙ্কারে বিভূষিত করিয়া, তাঁহাকে বিদ্বান ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করেন। ইঁহাদের মধ্যে, কন্যা বিক্রয় অতিশয় দূষণীয়। কন্যা বিক্রয়কে ইঁহারা নরমাংস বিক্রয়ের তুল্য হেয় বলিয়া বিবেচনা করেন। ইঁহাদের মধ্যে পাচক ব্রাহ্মণ পাওয়া কঠিন, কারণ ইঁহারা এ কার্য্যটীকে হেয় জ্ঞান করেন। ইঁহারা জাতি নির্ব্বিশেষে, হরিদাস,* পৌরাণিক, সাধু, পণ্ডিত, বিদ্যার্থী এবং ভিক্ষুক প্রভৃতির সাধ্যানুসারে অভাব পূরণ করিয়া

---

* ইঁহারা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন। প্রায়ই হরির কথা কহেন বলিয়া ইঁহাদের নাম হরিদাস। তিন চারি জনে একত্রিত হইয়া কীর্ত্তন হইয়া থাকে। কথক মহাশয় সম্মুখে দাঁড়াইয়া শাস্ত্রের কোন কোন অংশ ব্যাখ্যা দেবতার গুণ কীর্ত্তন এবং কোন কোন সাধুর চরিত্র বর্ণনা করেন। মধ্যে মধ্যে ব্যাখ্যানের কোন কোন ভাব লইয়া সংগীত করেন। তাঁহার পশ্চাতে

থাকেন। পর-উপকার সাধন ইঁহাদের জীবনের একটী ব্রত। এমন দেখা গিয়াছে যে, নিজে ঋণ করিয়াও ইঁহারা অপরের উপকার করেন। ইঁহারা যেমন পর-উপকার করেন, অপর কর্ত্তৃক উপকৃত হইলে, তাঁহার কাছে সেইরূপ বিশেষ রূপে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন। গৌড় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষদের গৌরবে আপনাদিগকে গৌরবান্বিত বিবেচনা করেন। তাঁহারা স্বকীয় তেজে তেজীয়ান। কোন ব্যক্তির তোষামোদ করা অতি হেয় জ্ঞান করেন। জাতীয় আচার ব্যবহারের যাহাতে কোন রূপ বৈলক্ষণ্য না হয়, তৎপক্ষে তাঁহারা বিলক্ষণ দৃষ্টি রাখেন। কোন ব্যক্তি বিরুদ্ধ আচরণ করিলে তিনি সমাজ কর্ত্তৃক দণ্ডিত হয়েন। ইঁহারা অল্পেতেই তুষ্ট থাকেন। ইঁহাদের উন্নতি পক্ষে ইহা একটী অন্তরায়। এই নিমিত্তই ইঁহারা অপর স্থানে যাইতে উদ্যোগী হন না। কোন কার্য্যে ব্যাপৃত না থাকিলে, এবং নিজ গ্রামের বাহিরে গিয়া অপর সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার অবগত না হইলে, লোকের মন সংকীর্ণ ভাব ধারণ করে। এই ভাবটী ইঁহাদের মধ্যে লক্ষিত হয়। ইঁহারা পরস্পর পরস্পরের কুৎসা করিয়া থাকেন। চারিশত বৎসর পূর্ব্বে, গৌড় ব্রাহ্মণগণ এক সম্প্রদায় ভুক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে দ্বেষভাব প্রবল হওয়াতে, তাঁহারা আর সদ্ভাবে থাকিতে পারিলেন না। ক্রমে তাঁহারা নানা দলে বিভক্ত হইলেন।

গৌরাঙ্গ স্তোত্র।

জয় পুরট-দ্যুতি-হর পীতকলেবর
নদিয়া-নগর-নটবর হে।
জয় উন্নতকন্ধর বাহুবৃহত্তর
ভালবিপুলতর ভাস্কর হে॥ ১

একজন তানপূরায় সুর দেয় এবং একজন পাখোয়াজ বাজায়। আজকাল, কোন কোন কথকের সঙ্গে হারমোনিয়ামও থাকে। শ্রোতাদের আমোদের জন্য কথক ঠাকুর কখন কখন হাস্যচ্ছলে গল্পের অবতারণা করেন। দেব মন্দিরে এবং গৃহস্থের বাটীতে কীর্ত্তন হইয়া থাকে।

জয় খণ্ডিতশশধরবদনমনোহর
মোহনগতিবকুঞ্জর হে।
জয় মুণ্ডিতশেখর রক্তাম্বরধর
দণ্ডকলিতকর ভাস্বর হে॥ ২

জয় করঙ্গ-সুন্দর-বেণু-ধনুঃ-শর-
শোভিতষট্কর ভয়হর হে।
জয় পাদসরোবর পঙ্কজ-সুন্দর
সেব্য-নিরন্তর-সুর-নর হে॥ ৩

জয় হরিকীর্ত্তন-পর পুলকিত-নিরন্তর
কদম্বকেশর তনুবর হে।
জয় প্রেম-পয়োঝর ঝরিত-মনোহর
নয়নেন্দীবর সুন্দর হে॥ ৪

জয় পূজিত-শঙ্কর-ব্রহ্ম-পুরন্দর
নামসুধাকর সাগর হে।
জয় নন্দ-গুণাকর-নাম-গণিত-কর
শেষাশ্রম-পর-শেখর হে॥ ৫

জয় ত্বং বিশ্বম্ভর বিশ্বকলুষহর
লক্ষ্মী-প্রিয়তর সহচর হে।
জয় মনুজ-সুরাসুর মনসগোচর
নিখিল-চরাচর শঙ্কর হে॥ ৬

জয় কৃষ্ণাভ্যন্তর বাহ্যকলেবর,
রাধা-দ্যুতি-ভর ভাস্বর হে।
জয় ভক্ত-হৃদয়-চর ভক্তি-রসাকর
ভক্তি-ভজন-পর তনু-ধর হে॥ ৭

জয়　ত্যক্ত-বিনশ্বর-বিষয়-বিষাকর
　　ভক্তাকৃতি-ধব ঈশ্বর হে।
জয়　কাম-বিজয়-কর, কান্তা-পরিহর,
　　রক্ষিত-কাতর-কিঙ্কর হে ॥ ৮
জয়　দুষ্টোদ্ধৃতি-কর দীন দয়াপর
　　ঘোর-তিমির-দর-সংহর হে।
জয়　কলি-কলুষাসুর-নিপীড়িতান্তর
　　শান্তি-সুধাপুর অঘ হর হে ॥ ৯
জয়　ভীম ভয়ঙ্কর-তরঙ্গ-দুস্তর-
　　সংসৃতি-সাগর তরি-বর হে।
জয়　বিগ্রহ-মন্দির-ভোগ-গরল-ধর-
　　দংশন জর্জ্জর-শীকর হে॥ ১০
জয়　তৃষিত-হৃদয়-নর-বাঞ্ছিত-জলধর
　　প্রেম-সুধাকর-নির্ঝর হে।
জয়　প্রেম-বিতর চির-চিহ্নিত-চামর-
　　তোমর-খর্পর-পদ-বর হে ॥ ১১

কথাটা কি ঠিক ?

এখন বাঙ্গালায় স্বাধীনমতবাদ প্রকাশের যুগ দেখা দিয়াছে। জন্‌ ষ্টুয়ার্ট মিলের দোহাই দিয়া এখন সকলেই স্বাধীন মতবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার চাহিতেছেন। তুমি শুন, আর নাই শুন, কথাটা ঠিক হউক, আর নাই হউক, স্বাধীন ভাবে যে কোন বিষয়ে আমার মতবাদ প্রকাশ করিবার অধিকার আছে, মিলের নজির দেখাইয়া, এখন ইংরাজি শিক্ষিত বা অর্দ্ধ-শিক্ষিত বাবুরা দাবি করিতেছেন। মিলের দোহাই দিলেও বেমিল এবং বেঠিক কথাই অনেক কাণে বাজে। সেই বেসুরা বেতালা কথা গুলায় কাণ ঝালা-

পালা করিলে, আর স্থির থাকিতে পারি না। বিরক্তি নিজে আসিয়া উত্তেজিত করিয়া তুলে। কাজেই আবার দু কথা বলিতে হয়। আমি বলিলেও তুমি কিছু করিতে পার না, কারণ আমিও মনে করিলে, মিলের দোহাই দিয়া, আমারও স্বাধীন মতবাদ প্রকাশের অধিকার আছে, এমত দাবি করিতে পারি।

এখন অনেক ইংরাজি শিক্ষিত বাবুর মুখে শুনিতে পাই যে, আপনাদিগের দোষেই ব্রাহ্মণেরা এখন অবনতি পাতকূয়ার পচা পাঁকে পড়িয়াছে। কথাটা কি ঠিক ? আমি বলি, সম্পূর্ণ বেঠিক—বেমিল—মিথ্যা।

তুমি বলিতেছ, "ব্রাহ্মণেরা আর্য্যজাতির সকল বর্ণকে বলপূর্ব্বক আপনাদিগের অধীনে দাসরূপে রক্ষা করিয়া, সকল বর্ণের উপর আধিপত্য করিত। এখন ব্রাহ্মণেরা নিজের দোষেই তাহার প্রতিফল স্বরূপ সেই প্রভুত্ব হারাইয়াছে। এখন আর ব্রাহ্মণদের কেহ তেমন মান্য করে কি ? কখনই না। তবেই বলিতে হয় যে, এখন ব্রাহ্মণদের অধোগতি হইয়াছে।"

আমি বলি বাপু। কথাটা বড়ই ভুল। তোমাদের সংস্কার যে, ব্রাহ্মণেরা বলপূর্ব্বক অন্যান্য জাতির উপর প্রভুত্ব করিতেন! আমি বলি, এ সংস্কারটা মূলেই ভুল। সমস্ত শাস্ত্র, পুরাণ, ইতিহাস খুঁজিয়া দেখ, সমস্ত আপ্তবাক্যের অনুসরণ কর, দেখিতে পাইবে, পাশবিক বল বা অস্ত্রবলের সহিত কোন ব্রাহ্মণেরই কোন সংশ্রব ছিলনা। "বলপূর্ব্বক প্রভুত্ব" বলিতে গেলে, সেই পাশবিক বল বা অস্ত্রবলের সহায়তার প্রয়োজন। তুমি সমগ্র সংস্কৃত গ্রন্থ, সমগ্র শাস্ত্রাদি মন্থন করিয়া, এমন একটি নিদর্শন উত্তোলন করিতে পারিবে না, যে, ব্রাহ্মণেরা অমুক স্থানে অস্ত্র প্রয়োগ বা শারীরিক বলপ্রয়োগ করিয়াছিলেন। পরশুরামের কথা বলিতে পার বটে, কিন্তু পরশুরামের প্রতিজ্ঞা এবং জন্মবৃত্তান্তটা পড়িলে, চুপ করিয়া থাকিতে বাধ্য হইবে। যাহা হউক, ব্রাহ্মণেরা যখন পাশবিক বা অস্ত্রবল প্রয়োগ করিতে জানিতেন না এবং করিতেনও না, তখন কিরূপে বলিতে পার যে, ব্রাহ্মণেরা বলপূর্ব্বক আধিপত্য করিতেন? আর একটা কথা—যদিই কেহ বলপূর্ব্বক আধিপত্য করে, সে আধিপত্য কয় দিন থাকে? জগতের ইতিহাস খুলিয়া দেখ, পাশবিক বলের জয় কোথায় চিরস্থায়ী—দীর্ঘস্থায়ী হইয়াছে? বলপূর্ব্বক

আধিপত্য করিতে যাইলেই প্রকৃতি তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবে, এবং সময় পাইলেই তোমাকে দু পায়ে মাড়াইবে। ইতিহাসকে জিজ্ঞাসা কর, সে এ কথার সাক্ষ্য দিবে। এক দিন নয়, এক বর্ষ নয়, যুগের পর যুগ, সহস্র বর্ষের পর সহস্র বর্ষ ধরিয়া ব্রাহ্মণেরা যখন আপনাদিগের প্রাধান্য রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন এবং আসিতেছেন, তখন কিরূপে বলিবে যে, ব্রাহ্মণেরা বাহুবল এবং অস্ত্রবলে প্রভুত্ব করিতেন? তাহা কখনই বলিতে পার না।

অবশ্য ব্রাহ্মণেরা অন্যান্য বর্ণের উপর আধিপত্য করিতেন। কিন্তু কিসের গুণে? কেবলমাত্র ধর্ম্ম, বিদ্যা, জ্ঞান, বুদ্ধি, নৈতিক নির্ম্মলতা এবং পবিত্রতার দ্বারা ব্রাহ্মণগণ আধিপত্য করিতেন। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র বর্ণের বা অন্যান্য (সঙ্কর) বর্ণদিগের সেরূপ ধর্ম্ম, জ্ঞান, বিদ্যা, বুদ্ধি, নৈতিক নির্ম্মলতা এবং পবিত্রতা ছিল কি? কখনই না। থাকিলে, অন্যান্য বর্ণ কখনই ব্রাহ্মণদিগকে শ্রেষ্ঠাসন দিত না। ব্রাহ্মণ বর্ণের যে সকল গুণ ছিল, অন্যান্য বর্ণের তাহা ছিল না; ব্রাহ্মণেরা নিজের চেষ্টায় যেরূপ মনুষ্যত্ব, শেষ দেবত্ব লাভ করেন, অন্যান্য বর্ণ তাহা করিতে পারে নাই। এক দিকে শিক্ষা, আর এক দিকে মূর্খতা, কাজেই প্রকৃতির নিয়মানুসারে শিক্ষারই জয় লাভ হয়। ব্রাহ্মণদিগকে মনুষ্যত্ব এবং দেবত্ব লাভ করিবার সমস্ত গুণ সমন্বিত দেখিয়াই অন্যান্য বর্ণ বিনা বল-প্রয়োগে, "বিনা অনুরোধে, সজ্ঞানে, স্বেচ্ছায়" ব্রাহ্মণ বর্ণের চরণে মন প্রাণ দেহ সমর্পণ করিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণের জন্য সমাজের, জাতির সর্ব্ব শ্রেষ্ঠাসন নির্দেশ করিয়া দেয়।

তোমরা যে বানর বংশ সম্ভূত, ডারউইনের উক্তিমত তাহা তোমরা মানিতে পার, কিন্তু ব্রাহ্মণ বর্ণ যে, সৃষ্টি কর্ত্তার বদন বিবর হইতে শ্রেষ্ঠ বর্ণরূপে সৃষ্ট, ইহা মানিতে চাও না, কারণ দুপাত ইংরাজি পড়িয়া, তোমার ধ্রুবজ্ঞান হইয়াছে যে, ইংরাজ যাহা বলে, তাহা অভ্রান্ত সত্য, আর এ দেশের প্রাচীন গ্রন্থে যাহা লিখিত আছে, তাহা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। তোমার পূর্ব্ব পুরুষগণ বৃক্ষে বৃক্ষে লম্ফে ঝম্ফে ভূকম্পিত করিয়া, কদলী ভক্ষণে কাননে কাননে বিহার করিতেন, তোমাদের এ বিশ্বাস আরও বদ্ধমূল হউক, আমি তাহা ভঙ্গ করিতে চাই না, ব্রাহ্মণ বর্ণ ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন, বেদের কথা মত তাহাও মানাইতে চাই না, কেবল ইতিহাসের অভ্রান্ত উক্তি ধরিয়াই বলি-

তেছি যে, ব্রাহ্মণ বর্ণ জগদীশ্বরের দ্বারা বা তুমি যদি নাস্তিক হও, তাহা হইলে, স্বভাবের দ্বারা, অবশ্যই সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বর্ণ রূপে আদিতে সৃষ্ট হইয়াছিলেন, একথা তুমি অস্বীকার করিতে পার না। অন্যান্য বর্ণ, আপনাদিগকে ধর্ম্ম, শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি, মানসিক উৎকর্ষতা, পবিত্রতা এবং নৈতিক নির্ম্মলতা প্রভৃতি বিষয় ব্রাহ্মণদিগের তুলনায় সম্পূর্ণরূপে হীন দেখিয়াই আপনারা সযত্নে ব্রাহ্মণদিগের জন্য যে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করিয়াছিল, ব্রাহ্মণেরা তদ্বিনিময়ে আপনাদিগের সাংসারিক সমস্ত মানবীয় সুখে জলাঞ্জলি দিয়া, অন্যান্য বর্ণের হিত সাধন, সমাজের মঙ্গল সাধন, স্বধর্ম্মের উন্নতি সাধন এবং স্বদেশের গৌরব বৃদ্ধির জন্য ক্রমাগত মস্তিষ্ক ক্ষয় করিয়া গিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বর্ণের নিকট হিন্দু জাতির অন্য সকল বর্ণই অশেষ ঋণে ঋণী—অসীম উপকৃত। উপকৃত বলিয়াই অন্যান্য বর্ণ, সেই ব্রাহ্মণ বর্ণের সবিশেষ আনুগত্য স্বীকার করিতে বাধ্য হয়। উপকৃত না হইলে, অন্যান্য বর্ণ কখনই ব্রাহ্মণ বর্ণকে কেবলমাত্র ধার্ম্মিক, জ্ঞানী, বিদ্বান, সচ্চরিত্র দেখিয়াই শ্রেষ্ঠাসন ছাড়িয়া দিত না। অক্সফোর্ড বিশ্ব বিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এক দল সাহেব-বেশী বাবুকে কোল, ভীল, এবং নাগাদিগের মধ্যে পাঠাইয়া দাও দেখি, তাহারা কি সেই বিদ্বান বাবুদলকে দেখিবামাত্রই মহোচ্চ সম্মান করিবে? কখনই না। তোমার শিক্ষা, জ্ঞান, বুদ্ধি তোমারই আছে, তাহার দ্বারা যদি আমার বা জাতির কোন উপকারই না হইল, তাহা হইলে কেনই বা আমি তোমার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব? সেই বাবুদল যদি কোল, ভীল নাগাদিগের মঙ্গল সাধন করিতে পারেন, তাহা হইলে, তাহারা সম্মানের পথ ছাড়িয়া দিতে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব করিবে না। তাই বলি, ব্রাহ্মণেরা বল প্রয়োগ করা দূরে থাক, অন্যান্য বর্ণই ইচ্ছা পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ বর্ণকে শ্রেষ্ঠাসন প্রদান করে এবং সেই ব্রাহ্মণ বর্ণ হিন্দু জাতির অসীম মঙ্গল সাধন করেন।

আর একটী কথা—তখন সকল বর্ণই কিছু কোল, ভীল এবং নাগাদিগের মত নিরন্তর অসভ্য বন্য বর্ব্বর ছিল না। ক্ষত্রিয় বর্ণ শিক্ষা জ্ঞান ধর্ম্ম বলে বিশেষ বলীয়ান এবং তাহার উপর তাহাদের বাহুবল প্রবল ছিল। বৈশ্য বর্ণের শিক্ষা জ্ঞানও অনুন্নত ছিল না। সিংহ বিক্রমী ক্ষত্রিয় বর্ণ যখন

নত মস্তকে ব্রাহ্মণদিগকে গুরু বলিয়া মান্য করিতেন, এবং করেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, ব্রাহ্মণ বর্ণের শিক্ষা, জ্ঞান, ধর্ম্ম, পবিত্রতা এতদূর উচ্চ অঙ্গের ছিল এবং ব্রাহ্মণ বর্ণ হিন্দু জাতির এত দূর হিত সাধন করিতেন যে, উন্নত শিক্ষিত বীর ক্ষত্রিয় বর্ণও স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণ বর্ণের আনুগত্য স্বীকার করেন। অন্য পক্ষে নিরক্ষর অসভ্য বর্ণের উপর জ্ঞান বুদ্ধি কৌশলে সহজে আধিপত্য বিস্তার করা সম্ভবে, কিন্তু শিক্ষিত জ্ঞানী বীরতেজা ক্ষত্রিয় বর্ণের উপর কখন সম্ভবে না। আর বল পূর্ব্বক আধিপত্য বিস্তার করিতে হইলে, জন্মবীর ক্ষত্রিয় বর্ণের উপর কখনই ব্রাহ্মণেরা আধিপত্য বিস্তার করিতে পারিতেন না। তাই বলি, তোমরা যে বলিতেছ, ব্রাহ্মণ বর্ণ বল পূর্ব্বক অন্যান্য বর্ণের উপর আধিপত্য করিতেন, এখন ভাবিয়া দেখদেখি, সে কথাটা কি ঠিক ?

তুমি বলিতেছ, "ব্রাহ্মণেরা নিজের দোষেই সেই প্রভুত্ব হারাইয়াছে।" আমি বলি, এ কথাটাও বড় ভুল। ব্রাহ্মণদিগের নিজের দোষ নাই, দোষ তোমাদিগের অন্যান্য বর্ণের। তুমি হিন্দু হও, আর নাই হও, তুমি যদি প্রাচীন শাস্ত্র পুরাণাদি পাঠ করিয়া থাক, তাহা হইলে অবশ্যই স্বীকার করিবে যে, ব্রাহ্মণ বর্ণ, অন্যান্য বর্ণের জন্য সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া মস্তিষ্ক ক্ষয় এবং শরীর পাত করিয়া গিয়াছেন। একটা জাতি গঠন করিতে হইলে, যাহা কিছু প্রয়োজন, একটা জাতিকে উন্নত করিতে হইলে যে কোন অনুষ্ঠানের আবশ্যক, ব্রাহ্মণ বর্ণ ই তাহা করিয়াছেন। উপদেশ, গ্রন্থ রচনা, পরামর্শ দান, বিধি সৃষ্টি, ব্যবস্থা প্রণয়ন, সামাজিক এবং সংসারিক কার্য্য প্রণালী নির্দ্দেশ, জাতি ভেদে—যোগ্যতা ভেদে—দায়িত্ব নির্দ্দেশ প্রভৃতি প্রত্যেক কাজই ব্রাহ্মণের কর্ত্তৃক হইয়াছে। অন্যান্য বর্ণ যেমন মহোপকৃত হইয়া, ব্রাহ্মণ বর্ণের সম্মান করিতে থাকে, সেই মত সত্যের সম্মান রক্ষার জন্য ইহাও ব্রাহ্মণ মাত্রেই স্বীকার করেন যে, যাহাতে, ব্রাহ্মণ বর্ণ উপরোক্ত কার্য্যগুলি সমাপন করিতে পারেন, তজ্জন্য অন্যান্য বর্ণ, ব্রাহ্মণ বর্ণের সামান্য প্রয়োজনীয় অভাবগুলি পূরণ করিয়া দিত। বানপ্রস্থ বা তপোবনবাসী ব্রাহ্মণদিগের অভাব প্রকৃতি নিজেই পূরণ করিত বটে, কিন্তু লোকালয়বাসী ব্রাহ্মণদিগের অভাব সকল অন্যান্য বর্ণ পূরণ

করিয়া দিত। বৈরাগ্যই ব্রাহ্মণের প্রধান অবলম্বনীয় ছিল। সেই বৈরাগ্যের কারণ হিন্দু জাতির অন্যান্য বর্ণের যে সকল সাংসারিক অভাব বা প্রয়োজন ছিল, তাঁহাদিগের তাহা ঘটিত না। লোকালয় বাসী সংসারী ব্রাহ্মণেরাও অতি সামান্যেই তুষ্ট থাকিতেন। কিন্তু অবশ্যই তাঁহাদিগের উদর জ্বালা ছিল, অবশ্যই আত্ম পালন এবং পরিবার পালনের জন্য সময়ের উপযোগী অভাব ছিল। শাস্ত্র পুরাণাদি দেখাইয়া দিতেছে যে, অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণ বর্ণের সেই উদরান্ন চিন্তা দূর এবং অভাব বিমোচিত করিয়া দিত। সেই সুবিধা সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াই ব্রাহ্মণ বর্ণ নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষা জ্ঞানালোচনার দ্বারা বংশানুক্রমে পূর্ব্ব পুরুষদিগের বৃত্তি রক্ষা করিয়া লোক হিতসাধন ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছেন। ব্রাহ্মণ বর্ণ যদি সাংসারিক সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া নিস্বার্থ ভাবে লোক হিতসাধন ব্রত অবলম্বনের সঙ্গে সঙ্গে উদরান্নের জন্য উপার্জ্জন করিতে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে, তাঁহাদিগের সেই ব্রত এতদূর সাধিত হইত কিনা, সে বিষয়ে কথা উঠিতে পারে। ব্রাহ্মণ বর্ণের দ্বারা উপকৃত হইয়া, অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণদিগের আত্ম পালন বা পরিবার পালনের সহায়তা করিতে থাকায়, ব্রাহ্মণ বর্ণ নিশ্চিন্ত মনে আপনাদিগের চির নির্দ্দিষ্ট পন্থায় গমন করিতে থাকেন, ইহার অন্য প্রমাণের প্রয়োজন নাই।

অন্যান্য বর্ণ যত দিন আপনাদিগের সেই দায়িত্ব পালন, অর্থাৎ ব্রাহ্মণদিগের সামান্য অভাব পূরণ করিয়া আসিয়াছেন, ততদিন ব্রাহ্মণ বর্ণ নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালনে, লোক হিত সাধন এবং শিক্ষা জ্ঞান ধর্ম্মালোচনার দ্বারা স্বধর্ম্ম এবং স্বজাতির মঙ্গল সাধনে ক্ষান্ত হয়েন নাই। যে দিন হইতে ক্ষত্রিয় বর্ণ আপনাদিগের দায়িত্ব পালনে ক্ষান্ত হইয়া পড়েন, যে দিন হইতে সিংহ বিক্রমী ক্ষত্রিয় রাজাগণ জননী জন্মভূমিকে রক্ষা করিতে অক্ষম হইয়া পড়েন, যে দিন হইতে বিজাতীয় বিধর্ম্মী শত্রুর পাপ পদ ভারতের বক্ষে পতিত হয়, সেই দিন হইতেই ব্রাহ্মণ বর্ণের নির্দ্দিষ্ট পন্থায় গতির প্রথম ব্যাঘাত ঘটে। যবন শাসনে হিন্দু জাতি এবং হিন্দু ধর্ম্ম বিষম সংঘাত প্রবত্ত হইলেও ব্রাহ্মণ বর্ণ তখনও আপনাদিগের নির্দিষ্ট ব্রতাবলম্বন করিয়া থাকেন। শেষ বিজাতীয় উৎপীড়ন অত্যাচারে হিন্দু ধর্ম্ম যখন আক্রান্ত হইয়া পড়িল,

তখন ব্রাহ্মণ বর্ণের নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালনের পথে বিষম বাধা আসিয়া দেখা দিল। নব নব শিক্ষা, জ্ঞান গর্ভ শাস্ত্র পুরাণাদি প্রণয়ন সেই সময় হইতে রুদ্ধ হইয়া যায়। কিন্তু ব্রাহ্মণ বর্ণ তখনও মহা বিভ্রাটে পতিত হইয়াও আপনাদিগের ব্রত পালনে ক্ষান্ত হয়েন নাই। বিশেষত অন্যান্য বর্ণ বিজাতীয় দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইলেও ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রতি ইচ্ছামত ব্যবহার এবং তাঁহাদিগের অভাব পূরণ করিতে কাতর না হওযায়, ব্রাহ্মণ বর্ণের ব্রত পালনের তত ব্যাঘাত ঘটে নাই। ভারতবর্ষের অন্যান্য সকল প্রান্তের হিন্দুগণই আজি পর্য্যন্ত সেই মত সহায়তা করিতে থাকায়, ব্রাহ্মণ বর্ণ আজিও সেই সেই স্থানে শিক্ষা জ্ঞান দ্বারা সম্মানিত হইয়া, পূর্ব্বপুরুষদিগের নির্দ্দিষ্ট পথে বিচরণ করিতেছেন। কিন্তু বঙ্গদেশের অন্যান্য বর্ণ, আপনাদিগেব পূর্ব্বপুরুষ গণের মত ব্রাহ্মণ বর্ণকে আর্থিক বা দ্রব্যাদির দ্বারা সহাযতা বা অভাব পূরণ করিযা দিতে ক্ষান্ত হইতে থাকায়, অগত্যাই বঙ্গের ব্রাহ্মণ বর্ণের পূর্ব্ব ব্রত পালনের বিষম ব্যাঘাত ঘটিয়াছে।

অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, ধর্ম্ম সাধন এবং নীতি, দেশ, এবং সমাজের মঙ্গল চিন্তাই ব্রাহ্মণ মাত্রেরই নির্দ্দিষ্ট ব্রত। উদরান্নের চিন্তা সংসার পালনের চিন্তা না থাকিলে, অল্পে তুষ্ট, সামান্য অভাব যুক্ত ব্রাহ্মণ বর্ণের সেই ব্রত পালনের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু অন্যান্য বর্ণ, পূর্ব্ব পুরুষদিগের ন্যায় ব্রাহ্মণ বর্ণের সহায়তা করিতে একেবারে ক্ষান্ত হওয়াতেই বঙ্গের ব্রাহ্মণ বর্ণ বিষম বিপাকে পতিত। বাঙ্গালার পরিষ্কার প্রাচীন ইতিহাস নাই। নানা গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, আদিশূরের শাসন প্রারম্ভে বঙ্গে সাত শত ঘর ব্রাহ্মণ ছিলেন। কিন্তু তাঁহারা অপ্রকাশিত কারণে পূর্ব্ব হইতে ব্রাহ্মণদিগেব নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালনে অক্ষম হইয়া পড়েন। সেই জন্য আদিশূর কর্ত্তৃক কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ-ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ ক্ষত্রিয় বা কায়স্থ আনীত হয়েন। তাঁহাদিগের বংশধরগণই এক্ষণে বঙ্গের হিন্দু সমাজের প্রধান বর্ণ রূপে বিরাজ করিতেছেন। আদিশূর চিরপ্রচলিত প্রথামত সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণকে গ্রামাদি দান করিয়া, তাঁহাদিগের আত্ম পালন বা পরিবার পালনের সমস্ত চিন্তা রহিত করিয়া দেন। সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণ বঙ্গে বাস করিয়া, শিক্ষা জ্ঞানালোচনার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের উপকার সাধনসহ আপনাদিগের ব্রত পালন

করিতে থাকেন। ক্রমশ তাঁহাদিগের বংশধরগণ অশেষ গুণমণ্ডিত হইলে, বল্লাল সেন তাঁহাদিগের বংশীয়গণকে কৌলীন্য উপাধির দ্বারা অলঙ্কৃত করেন। সে সময়ে রাজার ন্যায় অন্যান্য সকলবর্ণের সকল লোকই ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রতি পূর্ব্ব মত ব্যবহার করিতে থাকেন। তাহার পর সেন বংশের শাসন লোপ হইলে, এবং যবন শাসন আরম্ভ হইলে, দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটে। কিন্তু সে সময়েও অন্যান্য বর্ণ, ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রতি পূর্ব্ব মত ব্যবহার করিতে ক্ষান্ত না হওয়ায়, ব্রাহ্মণেরা নিশ্চিন্ত মনে আপনাদিগের ব্রত পালন করিতে সক্ষম হয়েন। ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভেও অন্যান্য বর্ণ ব্রাহ্মণদিগের পূর্ব্বমত অন্ন বা পরিবারগণের সহায়তা করিতে থাকেন। ভূস্বামীগণ ব্রহ্মোত্তর দান দ্বারা, সংসারীগণ অর্থ বা দ্রব্যাদি দান দ্বারা, ব্রাহ্মণদিগের ব্রত পালনের সুবিধা করিয়া দিতে থাকেন। দেশের সর্ব্বত্রই চতুষ্পাঠী স্থাপিত, ধর্ম্মালোচনা, শাস্ত্রচর্চ্চা এবং শিক্ষাজ্ঞান প্রদত্ত হইতে থাকে। সে অবস্থাতেও ব্রাহ্মণ বর্ণ আপনাদিগের নির্দ্দিষ্ট পথ ভ্রষ্ট হইতে ভ্রমেও ইচ্ছা করেন না। ক্রমে অন্যান্য বর্ণ যখন ব্রাহ্মণ বর্ণের সহায়তা করিতে যতই পৃষ্ঠপদ হইতে থাকে, ততই ব্রাহ্মণ বর্ণের পূর্ব্ব ব্রত পালন অসম্ভব হইয়া উঠে। সেই দিন হইতেই ব্রাহ্মণ বর্ণকে উদরান্নের জন্য চিন্তাসমূদ্রে নিমজ্জিত হইতে হয়। অর্থোপার্জ্জন চিন্তা আক্রমণ করিলে কখনই নিশ্চিন্ত মনে শিক্ষাজ্ঞানালোচনা করিয়া, নির্দ্দিষ্ট ব্রত পালন করিতে পারা যায় না, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে।

যত দিন বিশ্ব বিদ্যালয়ের যুবকগণ অধ্যয়ন করিতে থাকেন, ততদিন তাঁহাদিগের মধ্যে শিক্ষা-জ্ঞান-পিপাসু যুবকগণের হৃদয়ে কতই উচ্চাশা, শিক্ষা জ্ঞানার্জ্জনের জন্য কতই তৃষ্ণা বিরাজ করে; পরে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া, পাশ্চাত্য জগতের উচ্চাঙ্গের শিক্ষাজ্ঞান চর্চ্চার জন্য কতই বাসনা মনে মনে উদিত হইতে থাকে, অনেকেরই আবার আজীবন শিক্ষা জ্ঞানানুশীলনাকাঙ্ক্ষা কেমন প্রবল হইয়া উঠে, কিন্তু স্কন্ধের উপর সংসারের ভার পড়িবামাত্র—উদরান্নের জন্য বিষম ভাবনা আসিয়া ঘাড়ে চাপিবামাত্র—সেই যুবকের সেই শিক্ষা জ্ঞানানুশীলনের সমস্ত আশা ভরসা একেবারেই ফুরাইয়া যায়। তখন কেবল অর্থোপার্জ্জন জন্য সমস্ত চিন্তাশক্তি প্রয়োগ করিতে

বাধ্য হইয়া পড়ে। অন্ন-চিন্তা না থাকিলে, সংসারের জন্য ভাবনা না থাকিলে, বিলাতের বিশ্ব বিদ্যালয় সমূহে যেমন ফেলোসিপ্ আছে, এখানকার বিশ্ব বিদ্যালয় সমূহে সেইরূপ ফেলোসিপ্ থাকিলে, আমরা অবশ্যই উক্ত যুবকগণকে বিলাতের পণ্ডিত-মণ্ডলীর ন্যায় আজীবন শিক্ষা চর্চ্চায় থাকিয়া, স্বভাষা এবং স্বজাতির মহোপকার সাধনে লিপ্ত দেখিতে পাইতাম। কেবল উদরান্ন যেমন, এখানে বর্ত্তমান যুবক দলের উক্ত আশা পূর্ণ হইবার বিরুদ্ধে বাধা দিতেছে, কিছুকাল পূর্ব্ব হইতে শিক্ষা জ্ঞান ধর্ম্মালোচনায় চির-লিপ্ত ব্রাহ্মণ বর্ণকেও সেইমত বাধা দান করিয়া আসিতেছে। এই প্রধান বাধা না থাকিলে অন্যান্য বর্ণ আপনাদিগের পিতৃ পুরুষগণের ন্যায় ব্রাহ্মণ বর্ণের আত্মপালন—সংসার পালনের সহায়তা করিতে ক্ষান্ত না হইলে, কখনই ব্রাহ্মণ বর্ণকে নির্দ্দিষ্ট পন্থা ত্যাগ করিতে হইত না। কখনই ব্রাহ্মণ বর্ণের পূর্ব্বাবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটিত না। যখন অন্যান্য বর্ণের সহায়তার উপর নির্ভর করিয়া যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়া ব্রাহ্মণ বর্ণ আপনাদিগের অবলম্বিত ব্রত পালন করিয়া আসিয়াছেন, এবং যখন সেই সহায়তার অভাবেই স্বাভাবিক নিয়মানুসারে পরিবর্ত্তন অনিবার্য্য হইয়া পড়িয়াছে, তখন ব্রাহ্মণ বর্ণ যে, নিজে দোষী নহেন, ইহা সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। ব্রাহ্মণ বর্ণই দোষী বলিয়া, যাঁহারা বিষম চীৎকার করিতেছেন, তাঁহারা একবার নির্জ্জনে চিন্তা করিয়া দেখিলে, প্রধানত অন্যান্য বর্ণই যে দোষী, ইহা বেশ বুঝিতে পারিবেন।

তাহার পর তুমি বলিতেছ, ব্রাহ্মণ বর্ণের দুর্গতির এক শেষ হইয়াছে। আমি বলি এ কথাটাও সম্পূর্ণ ভুল। ব্রাহ্মণ বর্ণ যেমন চিরদিন সকল বর্ণের উপর প্রধান্য বিস্তার করিয়া আসিয়াছে, এই উনবিংশ শতাব্দীতে বিজাতীয় শাসনে পাশ্চাত্য শিক্ষা জ্ঞান বিজ্ঞানের রাজত্বে, একমাত্র সেই ব্রাহ্মণ বর্ণই অন্যান্য সকল বর্ণকে পশ্চাতে রাখিয়া আদর্শ স্বরূপে অগ্রসর হইতেছে। দেশগত এবং জাতিগত অবস্থা পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সকল বর্ণেরই অবস্থান্তর ঘটিয়াছে। ইংরাজ শাসনে ইংরাজি শিক্ষার গুণে এখন মুড়ি মিছরির এক দর হইয়াছে। সকল বর্ণই এখন পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট বর্ণগত দায়িত্ব এবং কর্ত্তব্য পরিহার করিয়া, নির্ভয়ে সমাজকে উপেক্ষা করিয়া, যে কোন স্বেচ্ছামত

কার্য্যাবলম্বনে সংসারে অগ্রসর হইবার ক্ষমতা পাইয়াছে। সমাজ মধ্যে বর্ণগত পার্থক্য পূর্ব্বমত প্রবল থাকিলেও, জাতি বর্ণভেদ প্রথা অক্ষত থাকিলেও, এক্ষণে যে কোন বর্ণের যে কোন ব্যক্তি পাশ্চাত্য শিক্ষা বলে সকলের সহিত প্রতিযোগিতা প্রদর্শনে সুখ, শান্তি, অর্থ, মান সংগ্রহ করিতে ক্ষমবান্। পরিবর্ত্তন যুগের মুখে সমাজগত, জাতিগত, প্রায় দেশগত আশ্রম গঠন চলিতেছে। এখন শিক্ষা প্রভাবে উন্নতি শব্দের অর্থ পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। সংস্কৃত শাস্ত্রে তোমার প্রগাঢ় অভিজ্ঞতা থাকিলেও তুমি শিক্ষিত নও, আর রামা মুদির পুত্র ছুপাতা ইংরাজি পাঠ করিলেও সে শিক্ষিত! বিজাতীয় শিক্ষা লাভের পর রাজ সরকারে চাকরি করিয়া অর্থোপার্জ্জনই এখন উন্নতির লক্ষণ। সকল বর্ণই এখন উন্নতি লাভের জন্য চেষ্টিত। অন্যান্য বর্ণের সাহায্যে বঞ্চিত হইয়া, ব্রাহ্মণ বর্ণের প্রায় পোনের আনা পুরুষ এখন আত্মপালন বা সংসারপালন জন্য সেই উন্নতি লাভ করিতে চেষ্টিত। এই উন্নতিশীল যুগে যে গুলিকে উন্নতি মূলক কার্য্য বলে, তুমি যে ব্রাহ্মণ বর্ণকে অধোগতি প্রাপ্ত বলিতেছ, আমি বলি, সেই ব্রাহ্মণ বর্ণ সর্ব্বাগ্রে সেই সকল উন্নতি প্রাপ্ত হইতেছে; সেই উন্নতি লাভ করিয়া অন্যান্য বর্ণের আদর্শ স্থানীয় হইতেছে।

একে একে গণিয়া যাও দেখিবে, উন্নতির পরিচায়ক সকল কার্য্যের অগ্রবর্ত্তী ব্রাহ্মণ। প্রথম বারিষ্টার জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, প্রথম সিবিলিয়ান সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, হাইকোর্টের প্রথম জজ পদ লাভকারী রমাপ্রসাদ রায়, জজাসনে প্রথম সমাসীন শম্ভুনাথ পণ্ডিত, প্রথম এটর্নি—বেণীমাধব বন্দ্যোপাধ্যায়, উন্নতিশীল যুবক দলের নিকট উন্নতির পরিচায়ক প্রথম বিলাত গমনকারী রাজা রামমোহন রায়, প্রথম খ্যাতনামা ইংরাজি কাগজের সম্পাদক হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রথম দেশীয় সংবাদ পত্র সম্পাদক রাজা রামমোহন রায়, প্রথম হিন্দু সংবাদ পত্র স্রষ্টা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ষ্টাণ্ডিং কন্সিল উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম বাঙ্গালা নাট্যকার—রামনারায়ণ তর্করত্ন, প্রথম নবন্যাস লেখক ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রথম কাউন্সিলের সভ্য, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হাইকোর্টের প্রথম ইণ্টরপ্রিটর শ্যামাচরণ সরকার, প্রথম স্কুল ইনস্পেক্টার—ভূদেব মুখোপাধ্যায়, প্রথম সেসনজজ—সত্যেন্দ্রনাথ

ঠাকুর, প্রথম ইঞ্জিনিয়ারি বিদ্যায় বি, সি, ই, উপাধিধারী আত্তকড়ি চট্টোপাধ্যায়, প্রথম এল, সি, ই, উপাধিধারী মথুরানাথ চট্টোপাধ্যায়, প্রথম বি, এ, বাবু বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রথম বি, এল, বাবু প্রতাপচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত ভাষায় প্রথম এম, এ(অনর ইন আর্ট) নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, ইংরাজি ইতিহাসের প্রথম্ এম, এ, মতিলাল সান্যাল—গণিত শাস্ত্রের প্রথম এম, এ, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদের প্রথম বৃত্তিলাভকারী আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম খ্যাত নামা বিলাত ফেরত ডাক্তার সূর্য্যকুমার চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা মেডিকেল কলেজের প্রথম সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, কলিকাতার প্রথম রেজিষ্টার চন্দ্রমোহন চট্টোপাধ্যায়, বাঙ্গালার প্রথম প্রধান রাজনৈতিক বাগ্মী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, ন্যাসনাল কংগ্রেসের প্রথম সভাপতি উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম ব্যাঙ্ক স্থাপন কর্ত্তা দ্বারকানাথ ঠাকুর, হাইকোর্টের প্রথম এসিসটেণ্ট রেজিষ্টার—গিরিশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, ভারতেশ্বরীর নিকট প্রথম সম্মান লাভকারী দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রথম সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অহিন্দুর পক্ষে উন্নতির পরিচায়ক প্রথমবিধবা বিবাহকারী শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, প্রাচীন সংগীত শাস্ত্রের প্রথম পুনরুদ্ধারকারী রাজা স্যর শৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর, জগতের সমধিক সংখ্যক ভাষায় প্রথম অভিজ্ঞ কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দেশীয় পরীক্ষক কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে সংগীতের প্রথম স্বরলিপি প্রণেতা ক্ষেত্র মোহন গোস্বামী, প্রথম সাহসী বীর ফাইটীং মুনসেফ প্যারিমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রথম বেলুনারোহী রামচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। আরও লিখিলে পুঁথি বাড়িয়া যায়। যাহা হউক এই তালিকাটী দেখাইয়া দিতেছে যে, সকল বর্ণের অগ্রে ব্রাহ্মণ বর্ণ ই বর্ত্তমান কালের উন্নতির পরিচায়ক প্রত্যেক কার্য্যে প্রথম আদর্শ স্থানীয় হইতেছেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, ইহা ব্রাহ্মণ বর্ণের অধোগতি না উন্নতির পরিচায়ক ?

বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি—উচ্চ শিক্ষার পরিচায়ক। সে তালিকার প্রতি দৃষ্টি দিলে কি দেখিতে পাই ? আমরা বেশ দেখিতে পাই যে, ব্রাহ্মণ বর্ণ পুরাকালে যেমন শিক্ষা বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন, বর্ত্তমানেও সেই মত

অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রহিয়াছেন। বাঙ্গালার লোক সংখ্যা হিসাব ধরিলে ব্রাহ্মণের মধ্যেই শিক্ষা চর্চ্চা অধিক। উচ্চ উপাধিধারী ব্রাহ্মণই অধিক। ১৮৮২। ৮৩ খ্রীষ্টাব্দের বাঙ্গালার এড্মিনিষ্ট্রেসন রিপোর্টের ১৫২। ১৫৩ পৃষ্ঠায় লেখা আছে যে, বর্দ্ধমান, প্রেসিডেন্সি, ঢাকা, রাজসাহী, এবং চট্টগ্রাম এই পাঁচটী ডিবিজন লইয়া খাস বাঙ্গালা দেশ; এই পাঁচটি ডিবিজনেই খাটী বাঙ্গালীর বাস। সেই খাস বাঙ্গালার মোট ব্রাহ্মণ পুরুষ সংখ্যা ৫৪০৬০৩ জন এবং অন্যান্য বর্ণের পুরুষ সংখ্যা মোট ৮০৮৩৪১৯ জন। এখন বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দের ক্যালেণ্ডার হইতে ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং অন্যান্য বর্ণ বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হইতে গত বর্ষ পর্য্যন্ত কত উপাধি পাইয়াছেন, নিম্নে তাহার তালিকা দিলাম—

	ব্রাহ্মণ	অন্যান্য বর্ণ।
এম এ...	২১১ জন	৩০৫ জন
বি এ...	৯০৮ ”	১৩৯৩ ”
বি এল...	৪৪৩ ”	৬৯৪ ”
এম বি...	৪৫ ”	৬৪ ”
এল এমএশ	১১৭ ”	২৭৪ ”
বি,সি, ই...	১০ ”	১১ ”
এল সি ই	৩০ ”	৩২ ”
	মোট ১৭৬৪ জন *	২৭৭৩ জন *

এখন দেখা যাইতেছে যে, ৫৪০৬০৩ জন ব্রাহ্মণ পুরুষের মধ্যে ১৭৬৪ জন বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ উপাধি পাইয়াছেন, অন্যপক্ষে ৮০৮৩৪১৯ জন অন্য বর্ণের মধ্যে ২৭৭৩ জন উপাধি পাইয়াছেন। এখন জিজ্ঞাস্য কোন্ বর্ণের মধ্যে উচ্চ শিক্ষার প্রাবল্য অধিক? কোন্ বর্ণই বা বর্ত্তমান প্রতিযোগিতা সংগ্রামে জয়ী হইতেছে? এফ্, এ, এবং এণ্ট্রান্স পাশকরা বা অনুত্তীর্ণ ইংরাজিওয়ালা ব্রাহ্মণ সংখ্যাও যে, অন্যান্য বর্ণ অপেক্ষা অধিক তাহা আর

* ইহার মধ্যে রায়, রায়চৌধুরী, হালদার এবং মজুমদার প্রভৃতি উপাধি-ধারীর তালিকা করা হয় নাই, কারণ তম্মধ্যে ব্রাহ্মণও আছে এবং অন্যান্য বর্ণও আছে।

বল্লিয়া দিতে হইবে না। এখন জিজ্ঞাসা করি ইহা কি ব্রাহ্মণ বর্ণের অধোগতির পরিচায়ক ?

এখন জিজ্ঞাসা করি ব্রাহ্মণ জাতির অধোগতি হইয়াছে, তোমাদের একথাটা কি ঠিক ? ব্রাহ্মণ বর্ণ নিস্বার্থভাবে কেবলমাত্র স্বজাতীয় এবং স্বদেশীয়গণের উন্নতি এবং মঙ্গল সাধন জন্য সংসারের সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া যে ব্রত অবলম্বন করিয়া যুগের পর যুগ অতিক্রম করিয়া আসিয়াছেন, কেবল মাত্র স্বজাতির দোষেই তাঁহারা সেই ব্রত পালনে বর্ত্তমানে অসমর্থ হইয়াছেন মাত্র।

কিন্তু অসমর্থ হইলেও এই পরিবর্ত্তন যুগে অন্যান্য বর্ণের সহিত প্রতিযোগিতা সংগ্রামে জয়ী হইয়া বর্ত্তমানের উন্নতিমূলক সকল কার্য্যের আদর্শ হইতেছেন, এবং ব্রাহ্মণ বর্ণ যে, শ্রেষ্ঠ রূপে সৃষ্ট, তাহাও সকল বিষয়েই আজি পর্য্যন্ত প্রমাণিত করিতেছেন। ব্রাহ্মণ বর্ণের যে, অধোগতি হইয়াছে বলিতেছ, আবার জিজ্ঞাসা করি, সে কথাটা কি ঠিক ?

শর্ব্বাণী।

শর্ব্বাণী এক খানি হিন্দু সমাজের আখ্যায়িকা, হিন্দু ভাবে লেখা। শ্রীযুক্ত কালীময় ঘটক প্রণীত। আমরা গল্প ভাগের স্থূল কথার একটি খতিয়ান দিব, নায়িকা শর্ব্বাণীর চরিত্রের একটু আধটু নমুনা দিব, গ্রন্থের অন্যরূপ সমালোচনা করিব না। চরিতাষ্টক রচয়িতার ভাব-ব্যক্তির বা ভাষা-শক্তির বিষয়ে নূতন করিয়া কিছু, নাই বলিলাম।

নদীয়া জেলায় সুরনগর, কৃষ্ণপুর, মেহেরপুর প্রভৃতি গ্রামগুলি নিকটানিকটি বিশেষ বর্দ্ধিষ্ণু গণ্ডগ্রাম; যে সময়ের কথা হইতেছে, ত্রিশ বত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে, কথিত গ্রাম তিনখানি বিশেষ সমৃদ্ধি-শালীই ছিল; তবে সে সময়ে নদীয়া জেলায়, দাঙ্গা হাঙ্গামা সর্ব্বদা হইত; এখন আমরা যেরূপ

নির্জ্জীবতায় সমৃদ্ধি বুঝি, তখন লোকে তাহা বুঝিত না; গ্রামগুলিতে সমৃদ্ধি থাকিলেও, শান্তি ছিল না। বিশেষ, কৃষ্ণপুর ও সুরনগর পাশাপাশি গ্রাম, অথচ দুই গ্রামের দুই জমীন্দারদের মধ্যে চিরশত্রুতা ছিল; তাহাতে তাঁহাদের এলাকায় মৌজে সকল, বেঁধা যোড়া—সুতরাং সুরনগরে ও কৃষ্ণপুরে বিবাদ লাগিয়াই ছিল।

সুরনগরের জমীন্দার সতীপতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিষয়ও যেমন, দৎপতও তেমনই। জমীন্দারী, মহাজনী, তেজারতী, নীলকুঠী প্রভৃতিতে প্রায় বার্ষিক লক্ষ টাকা আয়। আর লাঠিয়াল, সড়কি-ওয়ালা, নগদি লস্কর, হাতী ঘোড়ায় গ্রাম সর্ব্বদা থরহরি কম্পিত। বিদ্যাসুন্দরের পাঠ বদলিয়া, সতীপতী বন্দ্যোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে,—

অর্দ্ধেক বয়স তাঁর, এক পাটরাণী,
পাঁচ পুত্র বাঁড় য্যের সবে যুব-জানি।

তবে বীরসিংহের মত এক কন্যা নহে, পাঁচ কন্যা: কনিষ্ঠা শর্ব্বাণী। বন্দ্যোপাধ্যায়ের আব আর জামাইগুলিই ঘর-জামায়ে, কেবল শর্ব্বাণীর স্বামী ভৈরবচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, সে ধাতুর লোক নহেন; শ্বশুরালয়ে থাকিতেন না। উপরন্তু যে কৃষ্ণপুরেব জমীন্দারদেব সঙ্গে সুরনগরের বাঁড় য্যেদের চির বিরোধ, তাঁহাদেরই সরকারে প্রধান কর্ম্মচারীর কার্য্য করিতেন। ইহাতে সতীপতি বাবু দুঃখিতও ছিলেন, ক্রোধিতও ছিলেন।

কৃষ্ণপুরের জমীন্দারদের বিষয় আশয় তেমন অধিক ছিল না; কিন্তু লাঠির জোরে তাঁহারা চিরদিনই দুর্দ্দান্ত; তাহার পর ভৈরবচন্দ্রকে পাইয়া অবধি তাঁহাদের বল, ভরসা, সাহস, দ্বিগুণিত হইয়াছিল। ভৈরবের দুর্জ্জয় সাহস, অতুলবিক্রম, নিপুণ অস্ত্র শিক্ষা, বিষম কূট কৌশল, অসীম উদারতা, ঐকান্তিক প্রভুভক্তি, প্রবলা কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা এবং আশৈশব-প্রতিপালিতা যুদ্ধ-প্রবৃত্তি থাকাতে, দক্ষজামাতা মহাভৈরবের ন্যায়, তিনি শ্বশুরের মহা বিরাগ ভাজন হইয়াছিলেন। সতীপতি বাবু দক্ষরাজের ন্যায় সর্ব্বদা জামাতার মৃত্যু কামনা করিতেন কিনা, ঠিক বলা যায় না, এক সময়ে প্রাণ মনে করিয়াছিলেন, সেই সময়েই আমাদের গল্পারম্ভ।

ভৈরবের পিতামহ মেহেরপুরের মধ্যে একজন প্রধান ভূস্বামী ছিলেন,

ভৈরবের পিতার সময় হইতে অবস্থা হীন হয়; কতকটা স্বীয় অবস্থার উন্নতি করিবার জন্য, আর কতকটা নিজ প্রবৃত্তি বশে, ভৈরব চাকরি স্বীকার করিয়াছিলেন। কাজেই দাঙ্গা হাঙ্গামায় সর্ব্বদাই লিপ্ত থাকিতেন।

১২৭৫ সালে মাঘমাসে, সরস্বতী পূজার পূর্ব্ব দিন, শঙ্করপুর মহলের দখল লইয়া সুরনগরের ও কৃষ্ণপুরের জমীন্দারদের লোকজন মধ্যে বহাম দাঙ্গা হয়। ঐ দাঙ্গায় এক পক্ষের ছয় জন হত ও দশজন আহত এবং অপর পক্ষের তিন জন আহত হইয়াছিল। সেই রাত্রিতে ভৈরব শ্বশুরালয়ে সুরনগরে আসেন; তাঁহার প্রাণের পত্নী শর্ব্বাণীর নিকট আপনার কতকগুলি পোশাক রাখিয়া প্রত্যূষে চলিয়া যান। ভৈরব ভাল ঘোড়সওয়ার; ভোর থাকিতেই হুগলি ষ্টেশনে উপস্থিত হয়েন; সেই খানে এক খানি দোকানে আহারাদি করিয়া, পঞ্চাশ টাকার এক খানি নোট ভাঙ্গান; দোকানদারকে কিছু অর্থ দিয়া সেই নোট ভাঙ্গানির হিসাব পাঁচ দিন পূর্ব্বের তারিখ দিয়া তাহার খাতার জমা খরচ করান। তাহার পর টিকিট লইয়া বর্দ্ধমান যাত্রা করেন, পথে ইচ্ছা পূর্ব্বক টিকিটখানি ফেলিয়া দেন। বিনা টিকিটে বর্দ্ধমানে রেলে আসিয়াছেন, এই অপরাধে বর্দ্ধমানে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েন। কারাধ্যক্ষকে ও হাকিমের প্রধান আমলাকে উৎকোচ দিয়া, তাঁহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞার তারিখ ও কারা প্রবেশের তারিখ, মুদীখানার জমাখরচের মত, পাঁচদিন পিছাইয়া রেজিষ্টরি ভুক্ত করিয়া রাখান।

ভৈরব ইচ্ছা পূর্ব্বক টিকিট ফেলাইয়া দিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতেছেন, সরকারি বেসরকারি লোকদের দিয়া জাল করাইতেছেন, কেন করাইতেছেন, তাহা বুঝিতেই পারা যাইতেছে। শঙ্করপুরের দাঙ্গার সময়ে তিনি যে শঙ্করপুরে ছিলেন না, বর্দ্ধমানের কারাগারে ছিলেন, কি আর কোথাও ছিলেন, এমনই কিছু একটা প্রমাণ করা পরে আবশ্যক হইবে, ভৈরব তাহা বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

তিনি ঠিকই বুঝিয়াছিলেন। কেননা কিছু দিন পরে জানা গেল শঙ্করপুরের দাঙ্গা জামাতা ভৈরব কর্ত্তৃকই হইয়াছে নিশ্চয় জানিয়া, সতীপতি বাবু দক্ষরাজের মত কনিষ্ঠ জামাতার মৃত্যু কামনা করিয়া কৃষ্ণনগরের সেশন আদালতে ভৈরবের বিরুদ্ধে খুনী মোকদ্দমা চালাইতেছিলেন।

ভৈরবের সহায়কারী কৃষ্ণপুরের কয় জন কর্ম্মচারী সতীপতি বাবুর অর্থে বশীভূত হইয়া সাক্ষ্য দিল, যে, ভৈরবের হুকুমে শঙ্করপুরের দাঙ্গা হয়, এবং তিনি নিজে কয় ব্যক্তিকে খুন করেন; কিন্তু সতীপতি বাবুর পক্ষের চাসা সাক্ষীরা বলিল, একজন তুরগ সওয়ার গোরা দাঙ্গা করিয়াছিল ও হুকুম দিয়াছিল। যে পোষাক ভৈরব শর্ব্বাণীর নিকট রাখিয়া যান, কৌশলে তাহা শর্ব্বাণীর নিকট হইতে লইয়া, এক দাসীকে দিয়া, তাহা সেশনে দাখিল করা হইল, দাসী বলিল, মাঘ মাসে এক রাত্রি ভৈরব শ্বশুর বাড়ী রাত্রিতে আসিয়াছিলেন, প্রত্যূষে তাহার হস্তে কাপড়ের পুটলী দিয়া চলিয়া যান। দেখা গেল সে গুলি সাহেবের পোষাক। লোকে বুঝিতেছিল, ও বিচারকও বুঝিতেছিলেন, যে ভৈরবই সাহেব বেশে দাঙ্গা ও খুন করিয়া ছিলেন। কিন্তু হুগলি ষ্টেশনের মুদীর জোবানবন্দিতে ও বর্দ্ধমানের কারাগারের ও কোর্টের রেজিষ্টরি বহি দ্বারা বুঝা গেল, যে ভৈরব, দাঙ্গার সময়ের পূর্ব্বেই হুগলি হইতে বর্দ্ধমান যান, ও দাঙ্গার সময়ে সরকারি জেলে কয়েদী ছিলেন। সুতরাং ভৈরব বেকসুর খালাস। সতীপতি জামাতাকে ফাঁসি কাঠে ঝুলাইতে পারিলেন না, মর্ম্মাহত হইলেন; আক্রোশে শর্ব্বাণীর যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করিতে লাগিলেন।

ভৈরব শাশুড়ী ঠাকুরাণীর সম্মতি সাহায্যে শর্ব্বাণীকে রাত্রিযোগে সুরনগর হইতে মেহেরপুরে নিজালয়ে আনিয়া তাঁহার উদ্ধার সাধন করিলেন। সতীপতির আক্রোশ আরও বাড়িল, তিনি অধিকতর মর্ম্মাহত হইলেন।

ইহার পর ভৈরব নানা বীরকীর্ত্তি করিয়াছিলেন; কলিতে মহাভারত রচনার তত সুবিধাও নাই এবং অনেক অসুবিধাও আছে, ইহা ভাবিয়া চিন্তিয়া গ্রন্থকার সে সকলের বর্ণনা করেন নাই, দুই তিনটি মাত্র বর্ণনা করিয়াছেন। আমরা সে সকলেরও উল্লেখ করিব না—করিলে, হয়ত সমালোচন-রূপ এই লক্ষ্মণ তর্পণেই পিতৃপুরুষদের উদ্ধার সাধন ভাবিয়া, পাঠকগণ শর্ব্বাণী অধ্যয়ন রূপ রীতিমত তর্পণে উপেক্ষা করিতে পারেন। বলিতে হইবে না, সেটা আমাদের একেবারেই ইচ্ছা নয়।

ভৈরবের শেষকীর্ত্তি বা অকীর্ত্তির কথা বলিতেই হইবে, নহিলে শর্ব্বাণী উপন্যাসের অদ্ভুত উপসংহার বুঝা যাইবে না।

কৈবর্ত্ত ফকীরচাঁদ বিশ্বাস সতীপতি বাবুর সমস্ত নীল কুঠীর সুপরিণ্টেণ্ডেণ্ট ছিল। সে লোকটাও খুব জাঁহাবাজ; তাহাকে পাইয়া সতীপতী বাবু ভৈরবের উপর আক্রোশটা মিটাইতেন। ফকীরচাঁদ শঙ্করপুরের মোকাদ্দামায় ভৈরবকে দণ্ডিত করিতে বিশেষ যত্ন পাইয়াছিল। ভৈরব তাহা জানিতেন।

ফকীরচাঁদের প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষের পালা কৃষ্ণপুরের হাতীতে ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া ফকীরচাঁদ মাহুতকে মার ধর করে, হাতীটার দুরবস্থা করে। ভৈরবের প্রভু ইহার প্রতিশোধ লইতে ভৈরবকে অনুরোধ বা অনুজ্ঞা করেন। পুনার গঁদ্ধে মনসা নাচেন; ভৈরব মহা উৎসাহে সেই হাতীতে করিয়া গিয়া প্রতিষ্ঠিত অশ্বত্থ বৃক্ষ প্রায় শাখা-শূন্য করিলেন। ফকীরচাঁদ নিবারণ করিতে ও বাধা দিতে আসিল, ভৈরব স্বহস্তে ফকীরের জঙ্ঘা ভাঙ্গিয়া দিলেন। ফকীর বিকট চীৎকার করিল; ভৈরব ভাবিলেন "কি উৎকট পাপ করিলাম।"

এবার মোকদ্দামায় ভৈরবের প্রতি সপরিশ্রম দশ বৎসর কারাদণ্ডের বিধান হইল। অনেক চেষ্টাতেও কিছুতে কিছু হইল না।

কারা প্রবেশের সময় ভৈরবের আচরণ, ভৈরবের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভীম শর্ব্বাণীর নিকট পাঁচ বৎসর পরে, যে রূপ বর্ণন করেন, তাহা বলিতেছি,—

"যখন ফাটকের হুকুম হইল,—কোনও কয়েদীর মুখে যে ভাব দেখা যায় না,—দাদার মুখে সেই ভাব দেখিলাম। পূর্ব্বে যেমন,—পরেও তেমনই। যেন পিতৃ সত্য পালনার্থ আত্ম-প্রসাদ-প্রসন্ন বদনে রামচন্দ্র বনে গেলেন।"

"আমারে আলিঙ্গন করিয়া বলিলেন, 'ভীম, বোধ হয়, জন্মের মত চলিলাম। আমার আশা ত্যাগ কর। তুমি ছেলে মানুষ। বড় অসময়ে তোমার উপর বৃহৎ সংসারের ভার পড়িল। সকল দিকে দৃষ্টি রাখিয়া সাবধানে চলিবে। আমি যত দিন পত্র না লিখিব, তত দিন বাটীতে এ সংবাদ প্রচার না হয়।' 'অর্জ্জুন বড় হইলে, তাহাকে যেমন লেখা পড়া শিখাইবে, তেমনই ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দিও'।"

কারাগারে গিয়া ভৈরব ভাবিতেছেন, "আমি কারাগারে আসিলাম, রাজার অসি আমার শিরে পতিত হইল। দেবতার শোণিত তৃষা তৃপ্ত হইল। সতীপতির চির বাসনা পূর্ণ হইল। ফকীরচাঁদের প্রতিহিংসানল

নির্ব্বাপিত হইল। শর্ব্বাণীর সর্ব্বনাশ হইল। এ সব নিশ্চিত,—কিন্তু আমার কি হইল, এখনও ভাবি নাই—ভাবিবার সময় উপস্থিত।” “ভগবান্ অনাদি-অনন্ত-কাল-রূপ ছক পাতিয়া স্বকীয় চিচ্ছক্তির বিকার দ্বারা দেবীর সহিত খেলায় বসিয়াছেন।” “অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত বস্তু ভগবল্লীলার উপকরণীভূত হইয়া স্থাপিত হইয়াছে।” “তাঁহার নেত্রের উন্মীলনে লীলার আরম্ভ ও নিমীলনে উপসংহার হইতেছে।” “আমি ভগবানের একটি অনুমিত লীলোপকরণ ভিন্ন আর কিছুই নহি।” “আমার অস্তিত্বের পরিমাণ অননুভবনীয় সূক্ষ্ম।” “একগাছি কেশ শতধা বিভক্ত, সেই অংশকে পুনঃ শতধা—সেই অংশকে পুনঃ শতধা—এই রূপ কোটিভাগে বিভক্ত করিলে যাহা হয়, চিদ্ঘন পূর্ণ-পুরুষ ভগবানের নিকট—আমার আত্মিকাংশ তদপেক্ষাও সূক্ষ্ম। এইত ভৈরবত্ব নির্ণয়। যখন লীলারসোল্লাসী ভগবানের করকমল কর্তৃক চালিত হই, তখন এই বুদ্ধি, আর যখন প্রতিপক্ষ মহামায়ার মহামোহান্ধকারময় কর কমলে নিপতিত হইয়া তৎকর্তৃক পরিচালিত হই, তখন আপনাকেই এই বিশ্বের ঈশ্বর বলিয়া অহঙ্কার করি, তখনই মুক্তিকে বন্ধন ও বন্ধনকে মুক্তি মনে হয়।” ফল কথা “আমি কিছুই নহে, কারাদণ্ডও কিছুই নহে—মনের ভ্রম মাত্র। এখন দেখা চাই,—আমার কি হইল? যে অবস্থা ব্রহ্মে সমাহিত করিবার অনুকূল তাহাকে সমাধি কহে।—’ ‘অহং ব্রহ্মেত্যবস্থানং সমাধিরিতি গীয়তে।’ লোকে বলুক, আমার দণ্ড হইয়াছে, কিন্তু আমি বলিব আমার সমাধি হইল।”

“ভৈরব জেলে আসিবার কিছুদিন পরেই একজন প্রাচীন কয়েদী, দয়াধর্ম্মবশে ভৈরবকে অনেক আশ্বাস দিয়াছিল। আরও কিছু দিন গেলে, সে ভৈরবকে বলিল, ‘ভদ্রলোকের ছেলে ফাটকে আইলে তিন দিনে কালীমূর্ত্তি হইয়া যায়। কিন্তু বাপু তুমি আজি দুই বৎসর জেলে আসিয়াছ,—বর্ণ যেন দিন দিন কাঁচা সোণা হইতেছে।’ ‘জামাই শ্বশুর বাড়ী গেলে, তার যেমন স্ফূর্ত্তি, তোমারও ঠিক তাই। মুখে একটু একটু হাসি লেগেই আছে। কয়েদ খাটাই বুঝি তোমার বাপ পিতামহের ব্যবসা?’ ভৈরব হাসিয়া কহিলেন, ‘ভগবান্ যে অবস্থায় রাখেন’।”

আরও কিছু দিন গেলে ভৈরব ডাকিয়া আনিয়া সেই কয়েদীকে একখানি

পত্র পড়িতে দিলেন। পত্র পাঠ করিয়া কয়েদী কহিল, "আমায় এ পত্র পড়াইলে কেন?"

ভৈরব বলিলেন, "তুমি আমাকে ভালবাস, আমার অমন সুসম্বাদটা তুমি শুনিবে না?" "তোমার স্ত্রী তোমার শোকে গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে, মাওড়া নাবালকেরা মায়ের জন্য কাঁদিয়া প্রাণ হারাইতেছে, এই বুঝি তোমার সুসংবাদ?" কথা বলিতে বলিতে কয়েদীর চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। ভৈরব কহিলেন, "সুসম্বাদ বৈকি? আমার ফাটকে, আমিত এক দিনের জন্য দুঃখী নহি। কেবল এক জনের জন্য বুকে শেল ছিল, (ভৈরব তোমার না সমাধিস্থ হইয়াছে!) এখন তাহাও গেল।" কয়েদী কহিল, "অনেক ডাকাত দেখেছি—বাহিরে গোহত্যা, নরহত্যা, ঘর জ্বালানি যত উৎকট কার্য্য সবই করে, কিন্তু স্ত্রীপুত্রের জন্য কাঁদে। তোমার মত ভিতরে বাহিরে ডাকাত, কোন রাজ্যে দেখি নাই।" ঠিক কথা! ভৈরব অন্তরেও ঘরজ্বালানি করিয়াছে।

বাস্তবিক কি শর্ব্বাণী আত্মহত্যা করিয়াছেন? তাহা কখনই হইতে পারে না। সোণার চাঁদ অর্জ্জুনকে ফেলাইয়া, হিন্দুর মেয়ে স্বামী বিরহে মহাপাপের আশ্রয় লইয়াছে, এই উপন্যাসে এমন কথাটা থাকিলে, আমরা কখনই ইহার আলোচনায় এত ছাপার কালী নষ্ট করিতাম না। শর্ব্বাণীর চরিত্রে হিন্দু রমণীর অপূর্ব্ব স্বর্গীয় ভাব পরিস্ফুট হইয়াছে বলিয়াই এবং সেই শর্ব্বাণী চরিত্রের পরিচয় দিব বলিয়াই, তাহার ভূমিকা স্বরূপ গল্পের পরিচয় দিলাম। গ্রন্থকার বলিতেছেন, "শর্ব্বাণীর উদ্বন্ধন সম্বাদে ভৈরব কারা মধ্যেই আত্মহত্যা করিবেন, বোধ হয়, এই অনুমানে ভীমের হস্তাক্ষর জাল করিয়া, সতীপতি বাবু ঐ পত্র পাঠাইয়া থাকিবেন।" যে যাহাই করুক, শর্ব্বাণী যে আত্মহত্যা রূপ মহা পাপ করেন নাই, এবং আপনার মাতৃত্ব পদবী বিস্মৃত হন নাই, তাহা আমরা নিশ্চয় বলিতে পারি। ভরসা করি, শর্ব্বাণীর পরিচয় পাইলেই পাঠক আমাদের মতে মত দিবেন।

শর্ব্বাণী কেমন ঘরের মেয়ে, কেমন ঘরের বৌ, তাঁহার পিতা ও পতি কে ও কিরূপ চরিত্রের লোক, তাহা পাঠক অনেকটা জানিতে পারিয়াছেন, এখন শর্ব্বাণী নিজে কিরূপ, তাহাই শুনুন।

শর্ব্বাণীর বড় ইষ্ট নিষ্ঠা। পিতৃ ভবনে প্রত্যহ যখন তিনি পৌর্ব্বাহ্নিক

পূজা করিতেন, তখন "সেই শান্ত, গম্ভীর, সুগন্ধময় অল্পালোক-ভাসিত মন্দির মধ্যে তাঁহার পুজোপকরণ মধ্যবর্ত্তিনী সুন্দরীকে, গিরি রাজার হৈম-ভবন বাসিনী নগেন্দ্র-নন্দিনী শর্ব্বাণী বলিয়া ভ্রম হইত।" তাহার পর শর্ব্বাণী শত-শত পারাবতকে চাউল কলাই দিতেন; কোকিল ও পাপিয়ার পিঞ্জরে দুগ্ধ, রম্ভা, ছাতু দিতেন; উৎসৃষ্ট পুষ্প, বিল্বপত্র, ও একখানি নৈবেদ্য হরিণ শিশুকে প্রদান করিতেন। শর্ব্বাণীর একটি কুক্কুরী ও একটি মার্জ্জারী ছিল, প্রতিদিন আহারান্তে সেই দুটিকে অন্ন, দুগ্ধ ও মৎস্য আহার করিতে দিতেন। একটি বৎস ছিল, তাহার রীতিমত সেবা করিতেন। প্রতিদিন এক একজন ব্রাহ্মণকে একটি যজ্ঞোপবীত, কিছু সন্দেশ ও একটি সিকি দিতেন। এগুলি তাঁহার পিত্রালয়ে পূর্ব্বাহ্নের নিত্য কার্য্য। আর নিত্যকার্য্য রন্ধন শিক্ষা। স্বামীকে মনের মত রন্ধন করিয়া খাওয়াইবেন বলিয়া, শর্ব্বাণী পূজাহ্নিকের মত রন্ধন কার্য্য শিক্ষা করিতেন। পিত্রালয়ে শর্ব্বাণীর অপরাহ্নের নিত্যকার্য্য সমবয়সী ভাইঝি বধূঝিদের সহিত গল্প গুজব ও হাস্য পরিহাস; তাহার পর সকলে মিলিয়া অন্তঃপুর-সরে গা ধোয়া ও কাপড় কাচা। শর্ব্বাণী পিত্রালয়ে বৈকালে ও সায়ংকালে কি করিতেন, গ্রন্থে তাহা লেখা নাই—তবে গ্রন্থকারের হইয়া আমরা এতটুকু বলিতে পারি, যে তাঁহাকে সকল কথাই বলিতে হইবে, এমন কিছু কথা নাই। একজন পল্লীগ্রামের সাক্ষী, জেরার দায়ে বিরক্ত হইয়া উকীল ও হাকীমকে বলিয়াছিল, "মোর ওপর এত সওয়াল দিতেছ কেন, মোট কথা, মুইত এক বার ছাড়ি, দশ বার বললাম—আপনকারা রাশ রাশ টাকা খান, মোনাসেফ করে সব কথা লেখেন না।" শর্ব্বাণীর গ্রন্থকারও অবশ্য পাঠক সমালোচকের উপর ঠিক সেই রূপ দাবি করিতে পারেন। এ দাবি সঙ্গত। তাঁহার শ্বশুরালয়ে এক দিনের সায়ংকালিক পরিচয়ে, শর্ব্বাণীর সান্ধ্যজীবনের নমুনা আমরা পাইয়াছি—তা'হ'তে মোনাসেফ মত বুঝিতে পারি। সেই পরিচয় এই;—

"শর্ব্বাণী বৈকালিক বেশ বিন্যাস সম্পাদন করিয়া একখানি পবিত্র কৌষেয় বসন পরিধান করিলেন। পরে বাটীর অন্যান্য পরিজন সহ শ্যামসুন্দরের আরতি দর্শন করিয়া আসিলেন। সায়ংকালীন (?) আহ্নিক ও জপ শেষ করিলেন। অনন্তর বসন পরিবর্ত্তন পূর্ব্বক যথা সময়ে শয়ন

মন্দিরে গমন করিলেন। ভৈরব তখনও প্রত্যাগত হন নাই। শর্ব্বাণী একখানি পদাবলী গ্রন্থ লইয়া পাঠ করিতে লাগিলেন।"

তবেই এই মোনাসেফ হইতেছে যে, শর্ব্বাণী পিতৃগৃহে পদাবলী শিক্ষা করিয়াছিলেন, এখন সন্ধ্যার পর তাহারই রসগ্রহ করিয়া থাকেন।

শর্ব্বাণীর পদাবলী পাঠের কিরূপ ফল হইয়াছে শুনুন ;—

শর্ব্বাণী।———আমি পদাবলীর একটি পদ পড়িতেছি।

ভৈরব। পদটা কি শুনিতে পাই না ?

শর্ব্বাণী। শুনিতে পাও, কিন্তু তুমি যেন মনে করিও না, আমি তোমাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছি। ইহা শ্রীকৃষ্ণের প্রতি শ্রীমতীর উক্তি। তবে পড়িব নাকি ?

ভৈরব। পড়ই না শুনি।

শর্ব্বাণী। (পুস্তকে দত্ত দৃষ্টি হইয়া)

তুমি আমার প্রাণ সখা
হৃদয়ের লুকান ধন,
তোমায় না দেখে, কাতর প্রাণী,
দেখে, জুড়াল জীবন,
বহুদিন অন্তে বধু সুধাবৃষ্টি এ মিলন।

ভৈরব। একবার পুস্তকখানা আমার হাতে দাও, পদটা আমি নিজে পড়ি।

শর্ব্বাণী হাসিতে হাসিতে "আর পড়ে না" বলিয়া পুস্তকখানি আলমারিতে তুলিয়া চাবি বন্ধ করিলেন। ভৈরব পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন, পদটা পুস্তকের নহে।"

স্বামী-সঙ্গিনী শর্ব্বাণীর ব্যঙ্গ ঐরূপ। এই স্থলে শর্ব্বাণীর চঞ্চলা রসময়ী মূর্ত্তি বিকশিত হইয়াছে। কিন্তু শর্ব্বাণীর অন্য মূর্ত্তি—গাঢ় গম্ভীরা মূর্ত্তিও আছে। অধিকাংশ হিন্দু যুবতীতেই আছে। মনোরমাতে সেই দুই মূর্ত্তির বিরোধ প্রদর্শন করিয়া, বঙ্কিম বাবু সাধারণ হিন্দুযুবতীর বিচিত্র চরিত্র বুঝাইয়া দিয়াছেন মাত্র।

শর্ব্বাণীর গাঢ় গম্ভীরা মূর্ত্তি দেখুন, স্ত্রী পুরুষের মধ্যে কাহার অগ্র পশ্চাৎ মৃত্যু বাঞ্ছনীয়, তাহারই জল্পনা হইতেছে। স্বামীর প্রশ্নে শর্ব্বাণী বাল্যাভ্যস্ত শ্লোক আওড়াইয়া উত্তর দিলেন ;—

"পুত্র রেখে স্বামীর কোলে,
মরি যেন গঙ্গাজলে॥"

শ্লোক বাল্যাভ্যস্ত বটে—কিন্তু তা বলিয়া, আমাদের বিশ্ববিদ্যাবাগীশদের মত কেবল, কণ্ঠস্থ বা মুখস্থ নহে। কেবল শর্ব্বাণীর কেন, সকল হিন্দুর মেয়ের মনের ভাবই ঐরূপ; শর্ব্বাণীর শ্লোক শুনিয়া ভৈরব, অৰ্দ্ধ স্বগতভাবে বলিলেন, "তুমি মরিলে আমি কিরূপে থাকিব?" শর্ব্বাণী সেইরূপ ভাবেই বলিলেন, "তোমার কত শর্ব্বাণী মিলিবে।" ভৈরব বলিলেন, "——তুমি গেলে, আর কাহাকে ভাল লাগিবে? তুমি হৃদয়ের যে স্থানে আসন পাতিয়াছ, তুমি গেলে সে আসন চিরকাল শূন্য রহিবে। তাহাতে বসাইবার মানুষ পাইব না।" তখন শর্ব্বাণী ধীরে ধীরে বলিলেন, "তবে কি আমার আগে যাওয়া হইবে না?" ভৈরবের মলিন মুখ দেখিয়া ও তাঁহার ভাবি কষ্টের কথা শুনিয়া, শর্ব্বাণী বাল্যাভ্যাস ভুলিয়া গেলেন, হিন্দু রমণীর চিরশিক্ষা সীঁথের সিন্দুর থাকিতে থাকিতে শমন ভবন যাত্রার সুখ ভুলিয়া গেলেন, হিন্দু রমণীর পক্ষে কঠোরতর উপদেশ—শর্ব্বাণীর হৃদয়ে উজ্জ্বলতর হইল; তাহাতেই শর্ব্বাণী জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তবে কি আমার আগে যাওয়া হইবে না?" স্বামীর অসম্মতিতে গৃহস্থ রমণীর কোন কার্য্যই করিতে নাই, মরিতেওত নাই? "তবে কি তোমার আগে আমার যাওয়া হইবে না?" ভৈরব বলিলেন, "যদি অগ্র পশ্চাৎ যাওয়াই বিধির বিধান হয়, তবে তুমিই অগ্রে যাইও।' শর্ব্বাণী, "কেন" বলিতে পারিলেন না, তাঁহার চক্ষু উত্তর ভিক্ষা করিতে লাগিল। ভৈরব তাহা দেখিয়া কহিলেন, "তোমার অভাবে আমার যে কষ্ট হইবে, তাহা সহিব। কিন্তু আমার অভাবে তোমার যে কষ্ট হইবে, তাহা মরিযাও সহিতে পারিব না।" শর্ব্বাণীর পদ্ম-পলাস নেত্র হইতে টস্ টস্ করিযা কয়েক ফোঁটা জল পড়িল। কহিলেন,—"প্রাণেশ্বর! পতির আগে পত্নীর মরণ যে আশীর্ব্বাদ, তাহা শিখিয়াছি অনেক দিন—কিন্তু কেন বাঞ্ছনীয় তাহা বুঝিলাম আজ। আমার বৈধব্য দুঃখ যদি মরিয়াও সহিতে না পার, তবে তোমার আগে আমার মরণই মঙ্গল।"

গ্রন্থকারের এই মুন্সীয়ানা অতি সুন্দর। ইহাতে হিন্দু রমণীর বাল্যশিক্ষার

সবিবতা দেখান হইয়াছে। হিন্দু নারী পুরুষের কষ্ট সহিষ্ণুতা অধিকতর স্বীকার করিয়াও, আপনি জিতিয়াছেন ও নিজ জেদ বাজায় কবিযাছেন ; আর গ্রন্থকার দুই চারিটি কথায় শর্ব্বাণীর ধীর গম্ভীরা মূর্ত্তি পরিস্ফুট করিয়াছেন। বড় সুন্দর!

ভৈরবের যখন পাঁচ বৎসর কারাবাস ভোগ হইয়াছে, তখন শর্ব্বাণীর সম বয়সী ও বাল্য সঙ্গিনী একান্ত ব্যথার ব্যথী বনুঝি কৃশোদরী শর্ব্বাণীকে দেখিতে আসিয়াছিলেন। কিছুদিন পরে কৃশোদরী বলিলেন, "ছোট মাসী মা! তোকেত মানুষ বোধ হয় না, যেন সোণার প্রতিমা কাঠাম সার হইয়াছে। অঙ্গ ময়লা—কাপড়ে ময়লা—মাথায় তেল নাই, গায় গহনা নেই—যেন কাঙ্গালের মেয়ে পাগল হইয়াছে। মাসী, তোর দুঃখিনীব বেশ দেখিলে, আমার বুক ফাটিয়া যায। মাসী, তোর পায়ে পড়ি, আজ তোর গা পরিস্কার করিয়া চুল বাঁধিয়া দিব। তুই—এইস্ত্রী, এমন হইয়া থাকিলে, যে মেসো মহাশয়ের অমঙ্গল হইবে।" শর্ব্বাণী বলিলেন—"আমি এইস্ত্রী, আয়তি চিহ্ন স্বরূপ মাথায় সিন্দুর রাখিয়াছি—ইচ্ছা হয় ভাল করিয়া সিন্দুর পরাইয়া দেও। কিন্তু আর কিছু করিও না। স্বামী ঘরে না থাকিলে, আমাদের বেশ করিতে নাই।" এই কথা বলিয়া শর্ব্বাণী দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন।

গ্রন্থকার বলিতেছেন, "এই স্থলেই এ আখ্যায়িকার বিষয়ীভূতা শর্ব্বাণী প্রতিমার "বিজয়া" হইল।" এতক্ষণ পরে গ্রন্থকারেব সহিত আমাদের বিরোধ উপস্থিত। আবার সেই দক্ষালয়ের কথা বলিয়াই জিজ্ঞাসা করি, মহা-ভৈরবের অপমানে মর্ম্মাহত হইয়া মহা-শর্ব্বাণী দক্ষালয়ে মহাশয়নে শায়িতা হইয়াছিলেন—তাহাতে শর্ব্বাণীর বিজয়া হইয়াছিল কি? বিষ্ণু মহাচক্রে শর্ব্বাণীর দেহ খণ্ড বিখণ্ড করিয়াছিলেন,—এক এক খণ্ডে শর্ব্ব শর্ব্বাণী হইয়াছে। শর্ব্বাণীর "বিজয়া" হইল বলিলেই হয় না। বড় ভৈরব কারাগারে, কিন্তু ছোট ভৈরব অর্জ্জুন যাহার অঙ্কে শোভা করিতেছে, তাহার কিসের বিজয়া? আমরা দিব্য চক্ষে দেখিতেছি, পট্টবাসেই হউক, আর রুক্ষ কেশেই হউক, শর্ব্বাণী সর্ব্ব কালেই পূজিতা হইবে।

ভারতার রোদন।

একতালী—ভৈরবী।

অবোধ সন্তান তুই করিস্ রে আব্দার!
না বুঝিলি নিজ দশা, দুর্দ্দশা আমার।
ব্রহ্মার তনয়া আমি, নারায়ণ মম স্বামী,
মহাকাল কোপে এবে পাই রে সংহার॥

ব্রহ্মার মানস সরে, শ্বেত পদ্ম থরে থরে,
'পদ্মবনে হংস সনে' করেছি বিহার।
এখন এ কালীদহে, কালী অঙ্গে রক্ত বহে,
চারি দিকে কাল সর্প গর্জ্জে অনিবার॥

নারায়ণ পদ সেবি, ধরায় আছিনু দেবী,
আদরের আদরিণী ছিলাম সবার।
কি পাপে পাপিনী আমি, শ্রীপদে ঠেলিল স্বামী,
নাহি জানি ভাল মন্দ কপাল আমার॥

শিরে বসি মহাজন, লয় যত রত্ন ধন,
শূন্য সব ধান্য গোলা, ত্রিশূন্য ভাণ্ডার।
তবু ত রে ক্ষান্ত নহে, অঙ্গের শোণিত চাহে,
নিজস্ব সর্ব্বস্ব দিয়ে নাহি রে নিস্তার॥

বসন ভূষণ নাই, অঙ্গে ধূলা মাটী ছাই,
রুক্ষ কেশে হয়েছে রে শিরে জটাভার।
পিতার বিরাগে পড়ি মাতা তোর গড়াগড়ি,
উৎসবের ছড়াছড়ি এখন তোমার॥

থরে থরে ফুল মাল, উড়াও নিশান লাল,
বাদ্য ভাণ্ড গণ্ডগোল কর অনিবার।
করিস্ উৎসব মেলা, খেলিস্ যে কিবা খেলা,
এই কি সময় বাছা তোর খেলিবার?

শত্রু মুখে দিয়ে ছাই, তোর মুখ পানে চাই,
বয়সের চিহ্ন সব দেখি যে তোমার।
এমন কপাল মোর, না হইল জ্ঞান তোর,
না বুঝিলি দুঃখ দশা এ দুঃখিনী মার!!!